দ্য বিট্রেয়াল অভ ইস্ট পাকিস্তান

লে. জে. এ. এ. কে. নিয়াজি

অনুবাদ । ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি

ইস্টার্ন কমান্ডের লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি হলেন সেই ব্যক্তি যাকে এমন এক দুর্ভাগ্যজনক অপারেশনের নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল যার ফলে পাকিস্তানের বিভক্তি ঘটেছে। পাকিস্তানের ইতিহাসে সেই অবিস্মরণীয় বছর ১৯৭১ সম্পর্কে অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু অবশেষে এই ঘটনার অন্য যে প্রধান নায়ক যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য দায়ী ঘটনাবলী সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন।

এ বই ইতিহাসের অনেক শূন্যতা পূরণ করবে। লে. জেনারেল নিয়াজি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বেশি পদকপ্রাপ্ত সৈন্যদের একজন। তিনি ছিলেন কোয়েটায় স্কুল অভ ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাকটিক্স-এর কমান্ডার এবং কোয়েটায় কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের ইনস্ট্রাকটর। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রচ্ছদ : : মশিউর রহমান

ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

জন্ম ১ জানুয়ারি, খুলনা।

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজের ১৬তম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। এমবিবিএস পাশ করেন ১৯৯৩ সালে। ছাত্রজীবনে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সার্জারি বিভাগে কর্মরত রয়েছেন। তিনি থোরাসিক সার্জারিতে এমএস করছেন।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লেখালেখি করেন প্রচুর। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, পাক্ষিক ও মাসিকে নিয়মিত লিখছেন। যদিও লেখালেখির শুরুটা কবিতা দিয়েই, কিন্তু বর্তমানে বেশি ব্যস্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক লেখালেখিতে। সায়েন্সফিকশন এবং ভৌতিকগল্পও লিখছেন প্রচুর। অনুবাদেও সমান দক্ষ। ইতোমধ্যে তার সায়েন্সফিকশন এবং ভৌতিক গল্পের অনুবাদের বই বেরিয়েছে। প্রথম কবিতার বই *একজন স্বপ্ন পুরুষের কাছে মৃত্যুর অনুবাদ* প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। বাংলায় প্রথম দীর্ঘ সায়েন্সফিকশন কবিতা লেখেন তিনি, *পৃথিবীর মৃত্যুতে কাঁদেনি কেউ* শিরোনামের এই সায়েন্সফিকশন কবিতাটি প্রকাশিত হয় অন্যদিন পত্রিকায়। স্বাস্থ্য বিষয়ক লেখালেখিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৯ সালে পেয়েছেন *আনোয়ারা-নূর* পুরস্কার। তাঁর স্বাস্থ্য বিষয়ক বইগুলো ব্যাপক পাঠক জনপ্রিয় হয়েছে। *রহস্য পত্রিকায়* তিনি পাঠকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেন। *উন্মাদ* পত্রিকায় তিনি পরিকল্পনা বিভাগে রয়েছেন। তিনি একটি জাতীয় দৈনিকের সাব এডিটর।

দ্য বিট্রেয়াল অভ ইস্ট পাকিস্তান

লেঃ জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী
এইচ জে বার, এসপিকে, এসকে, এমসি, পিএসসি কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ড

দ্য বিট্রেয়াল অভ ইস্ট পাকিস্তান

লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি

অনুবাদ :

ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

আফসার ব্রাদার্স

প্রথম প্রকাশ ❑ আগস্ট ২০১৬

প্রকাশক ❑ আসমা আরা বেগম
আফসার ব্রাদার্স ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১১৮০৩৫

অক্ষর বিন্যাস ❑ ফোর ব্রাদার্স কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
১৭/১ কে.জি. গুপ্ত লেন, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ❑ জি জি অফসেট প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ❑ মশিউর রহমান

মূল্য ❑ ৪০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70166-0002-9

The Tetrayal of East Pakistan, By Left. General A.A.K Niazi,
Translated by Dr. Mizanur Rahman Kallol
Published by Asma Ara Begum, Afsar Brothers,
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100, Date of Publication : February 2016.
Price : 400.00 Tk. Only

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার শ্বশুর
মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও যোদ্ধা
মুহম্মদ আতাউর রহমান

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

অপ্রিয় স্মৃতিগুলোকে ফেলে দেয়া মানব চরিত্রের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এমন কিছু ঘটনা আমাদের জীবনে গভীর ছাপ ফেলে যেগুলোর স্মৃতি কখনো মুছে ফেলা যায় না। এ ধরনের স্মৃতি সংরক্ষণ করা প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হবার স্মৃতিগুলো এখনো আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, কারণ এ ঘটনা জাতিকে বিভক্ত করেছে এবং ভেঙে চুরমার করেছে তার অহংকার।

১৯৭৪ সালে আমি ভারত থেকে ফিরলাম, ওখানে যুদ্ধবন্দি ছিলাম আমি, দেখতে পেলাম পাকিস্তানে রাজনৈতিক আবহ শান্তিপূর্ণ অবস্থা থেকে অনেক দূরে। ক্ষমতা রয়েছে তাদের হাতে যাদের সংঘর্ষমূলক নীতির কারণে পাকিস্তান ভেঙেছে। আমার আশঙ্কা সত্য হলো। ইস্টার্ন সেনাদলের কাঁধে দায় চাপানো হয়েছে। ইস্টার্ন সেনাদলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এসব অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল পাকিস্তানের ভাঙ্গনে জুলফিকার আলি ভুট্টোর অসৎ ভূমিকা থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য।

ক্ষমতাসীন সরকার সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। জাতিকে উত্তেজিত করা হয়েছে সাজানো ও বানানো মিথ্যে গল্প শুনিয়ে। ভুট্টোর নির্দেশে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স লেখকদের ভাড়া করেছিল। অবশ্য এতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এরও নিজস্ব স্বার্থ ছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে হাই কমান্ড এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে কমান্ডারদের কৃতিত্ব ছিল যাচ্ছে তাই। যুদ্ধের সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকেও এক সপ্তাহের আরো কম সময়ের মধ্যে তারা দেশে ৫,৫০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড হারায়। এ কলঙ্কের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য তারা তৎপর হয়ে উঠেছিল।

আমার এ বই প্রকাশে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে, তবে একেবারে প্রকাশ না করার চেয়ে দেরিতে প্রকাশ করা ভালো। অবশ্য বইটি এর আগে প্রকাশ করা যেত না কারণ পরিস্থিতি এ বই প্রকাশের জন্য অনুকূলে ছিল না। রাজনৈতিক কারণে ভুট্টো আমাকে গ্রেফতার করেছিলেন এবং জেনারেল জিয়াউল হক আমাকে আটকে রেখেছিলেন। মি. ভুট্টো সিজারের চেয়ে পরাক্রমশালী ছিলেন, ক্ষমতা বলে তিনি হয়েছিলেন চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিসট্রেটর, এ পদবি তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায়ও ব্যবহার করেছেন, তিনি কখনো এ বইটি প্রকাশের অনুমতি দিতেন না কারণ এতে তার রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতো। জেনারেল জিয়ার সরকারের

আচরণ ছিল আরো নিষ্ঠুর। উভয় সরকারের কর্ণধাররা পুরো ব্যাপারটিকে খুব ভয় পেতেন এবং তারা চাননি সত্য প্রকাশিত হোক।

এ গল্প এক লড়াকু সৈনিকের ব্যক্তিগত কাহিনী, যে ছিল ভাগ্যবান। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সব যুদ্ধে প্রায় সব ধরনের পরিবেশ ও আবহাওয়ায় লড়াই করার সুযোগ পেয়েছিল। আমি আরো ভাগ্যবান যে একটা ক্ষুদ্র প্লাটুন থেকে বিশাল বাহিনী, ইস্টার্ন সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়েছি যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী, আর অপারেশনের জায়গা ছিল মূল ভূখণ্ড পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বহু দূরে।

সামরিক কমান্ডার হিসেবে আমি এক কঠিন স্থানে দায়িত্ব পেয়েছিলাম, আমাদের নিজেদের জনগণ, বাঙালিরা কেবল আমাদের প্রতি বৈরিই ছিল না, তারা সক্রিয়ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। আমার হাই কমান্ড অবস্থান করছিল এক হাজার মাইল দূরে, তাই আমি সঠিক সময়ে কোনো পরামর্শ পাইনি। একই সাথে হাই কমান্ডকে এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হতেও আগ্রহী মনে হয়নি। আমার অধীনস্থ বাহিনী ছিল দুর্বল এবং অপর্যাপ্ত অস্ত্রে সজ্জিত, উল্লেখ করার মতো আমাদের কোনো বিমান বা নৌ-সাহায্য ছিল না।

১৯৭০-এর নির্বাচনের ঠিক পরপর মি. ভুট্টো অর্থনৈতিক বিভাগের উপদেষ্টা এম. এম. আহমদ ও পরিকল্পনা বিভাগের ডেপুটি চেয়ারম্যান মি. কামারুল ইসলামকে নির্দেশ দেন একটি কাগজ তৈরির জন্য যেখানে প্রমাণ থাকবে যে পূর্ব পাকিস্তান ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান ভালোভাবে টিকে থাকতে পারবে। ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারিতে মেজর-জেনারেল ওমর রাজনীতিবিদদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় যেতে নিষেধ করেন, তিনি বলেন, ঢাকা ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দেয়াই বরং ভালো। মি. ভুট্টো হুমকি দেন, অ্যাসেমব্লির যে সব নির্বাচিত সদস্য অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকা যাবেন, তাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। তিনি চূড়ান্তভাবে বলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের পরস্পর পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত, এটা তিনি বলেন তার বিখ্যাত ভাষায় 'ইধার হাম, উধার তুম' (আমি এপাশে, তুমি ওপাশে)। মূলত ভুট্টো অখণ্ড পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতার ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; তার প্রচেষ্টা ছিল সরকার গঠনে মুজিবের সাথে আপোষ করা। আর এটা কেবল সম্ভব হবে যদি পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে।

পাকিস্তান ভাঙার চূড়ান্ত পরিকল্পনা হয় ভুট্টোর নিজ শহর লারকানায় জেনারেল ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে এক বৈঠকে। এ পরিকল্পনা, যা এম. এম. আহমদ পরিকল্পনা নামে পরিচিত, এর লক্ষ্য ছিল একজন উত্তরাধিকারী সরকারবিহীন

অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করা, যার অর্থ : যুদ্ধে হেরে যাওয়া। সুতরাং ইয়াহিয়ার সামরিক চক্র ও ভুট্টোর স্বার্থন্বেষী ব্যক্তিদের গোষ্ঠীর সকল কর্মকাণ্ড যুদ্ধে হেরে যাবার লক্ষ্যে ধাবিত হয়। তারা রাজনৈতিক নিষ্পত্তি, অথবা যুদ্ধ বিরতি কোনোটাই চান নি। 'পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ হবে পশ্চিম পাকিস্তানে,' এ ধরনের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় পাকিস্তানের জন্ম লগ্ন থেকেই। কিন্তু তারা কাজ করতে থাকেন তাদের পরিকল্পনায়, 'একটি উত্তরাধিকারী সরকারবিহীন অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করো।'

দীর্ঘ আট মাস ব্যাপী বিদ্রোহ সত্ত্বেও ভারত পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে কোনো বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। হতাশা থেকে ভারত ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে। এ যুদ্ধে তারা আধা-সামরিক বাহিনী সহ প্রায় পাঁচ লাখ সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। এছাড়া প্রস্তুত রাখা হয় চীন সীমান্তে মোতায়েন করা আরো পাঁচ লাখ সৈন্য। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ভারতীয় হামলা সম্পর্কে জানান হলে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমি কী করতে পারি? আমি পারি কেবল প্রার্থনা করতে।' এই একটি বাক্য দ্বারা ইয়াহিয়া দেশের প্রধান ও সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তার সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ করেন। অথচ ইয়াহিয়া খান তার 'প্রার্থনা' না করে আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা অনুসারে অর্থাৎ... 'পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ হবে পশ্চিম পাকিস্তানে'-এ পরিকল্পনায় ব্যাপক যুদ্ধ শুরু করতে পারতেন যার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে ইতোমধ্যে আমাদের সংরক্ষিত সৈন্যদের প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। সংকেত পেলেই আমাদের এই সংরক্ষিত সৈন্যরা চলতে শুরু করত। পশ্চিমে আমাদের যেখানে ছিল পাঁচটি স্ট্রাইকিং ফোর্স, সেখানে ভারতীয়দের ছিল মাত্র তিনটি। স্ট্রাইকিং কোর্সের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় এবং যুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের মতো অবস্থানে থাকায় আমাদের জয়লাভ করার সম্ভাবনা ছিল প্রতিটা ক্ষেত্রে।

ক্ষমতাসীন সরকার ভারতীয় হামলার বিষয়টি তৎক্ষণাৎ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তুলতে চায়নি। এর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান ইস্টার্ন গ্যারিসনের ছোট, সামান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক্লান্ত সৈনিকদের পরাজিত করে ভারতকে জয়ী হবার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া। দ্রুত পাল্টা আক্রমণ করার জন্য নয়, বরং পশ্চিমাংশের সৈনিকদের আবির্ভাব ঘটে একটা ভগ্ন ও বিশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান হিসেবে। আর এ অবস্থা ইস্টার্ন গ্যারিসনের অবস্থানকে আরো সঙ্কটপূর্ণ করে তোলে। যা হোক। আমাদের সব ঘাটতি এবং হাই কমান্ডের বিমাতাসুলভ আচরণ সত্ত্বেও, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং যুদ্ধে অবসন্নতা সত্ত্বেও আমরা যুদ্ধ করেছি এবং আমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে আমরা পালন করেছি। পক্ষান্তরে, ওয়েস্টার্ন গ্যারিসন সব সুযোগ সুবিধা এবং অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও চরম বিশৃঙ্খল ও ভেঙে পড়ার মতো

অবস্থায় পতিত হয়। তারা ৫,৫০০ বর্গ মাইল ভূখণ্ড হারায় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তান ধ্বংস করার মতো অবস্থানে পৌঁছে যায় তাদের সুপ্রিম কমান্ডারের তত্ত্বাবধানে এবং তার অধিনস্থ তিন বাহিনী (আর্মি, নেভি, ও এয়ার ফোর্স)–এর নিস্তেজ প্রতিরোধের কারণে।

আমি এখানে জোর দিয়ে বলতে চাই যে, যেখানে শত্রুরা সংখ্যায় ছিল বেশি এবং তাদের অবস্থাও যেখানে ছিল অনুকূলে সেখানে আমার কমান্ডাররা এবং আমি অত্যন্ত সীমিত সম্পদ ও শক্তি দিয়ে যা অর্জন করেছি তা সম্ভব হয়েছে আমার কমান্ডারদের আত্মত্যাগ, সাহস ও কর্তব্য পরায়নতার জন্য। তারা কোনো দ্বিধা না করেই তাদের সামর্থ, ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নিয়ে তাদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন।

এসব গুণ আমাদেরকে এনে দিয়েছে সফলতা এবং এর কারণে আমাদের শক্তিশালী ঘাটি ও দূর্গ সমূহের সামনে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিশ্চল হয়ে পড়ে। আমরা একটি শক্তিশালী শত্রুকে তাদের লক্ষ্য অর্জনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছি এবং আমরা তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো অবস্থায় ছিলাম।

আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু জান্তার পরিকল্পনায় তা ছিল না। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় অস্ত্র সমর্পণের। যখন আমি ইতস্তত করছিলাম, তখন আমাকে বলা হয় যে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা চরম সঙ্কটপূর্ণ। এরপর পশ্চিম পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের রক্ষা করতে আমাদেরকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া হয়। আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য এ অপমান মেনে নিলাম। ১৫ ডিসেম্বরের পোল্যান্ড অথবা রাশিয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা আমাদের সম্মান তথা দেশকে রক্ষা করতে পারতাম। আমরা অবশ্যই আত্মসমর্পণের অপমান এড়িয়ে যেতে পারতাম যদি তারা আমাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অনুমতি দিত।

আমার ওপর অর্পিত কাজ এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় যেমন আমার আওতায় অল্পসম্পদ, ভারি অস্ত্রশস্ত্রের অভাব এবং বিমান ও নৌবাহিনীর অনুপস্থিতি অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং তুলনা করতে হবে ওয়েস্টার্ন গ্যারিসনের দুঃখদায়ক কীর্তির সাথে, যার ছিল সকল সুবিধা। এসব না বুঝলে পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭১ সালের যুদ্ধের প্রকৃত চিত্র বোঝা কঠিন হবে। এই যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের পতন হয় যা ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং মি. ভুট্টোর পূর্ব পরিকল্পিত ও সাজানো ষড়যন্ত্র।

আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি
লাহোর, ১৯৯৫

অনুবাদকের কথা

লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজির লেখা 'দ্য বিট্রেয়াল অভ ইস্ট পাকিস্তান' বইটি কখনো অনুবাদ করব ভাবিনি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিয়াজি ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার। তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে তিনি যুদ্ধকালীন আটমাস দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তিনি মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তার আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের। সুতরাং নিয়াজির এ বইটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আমরা জানতে পারব আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একজন পাকিস্তানী সেনার দৃষ্টিভঙ্গি। যদিও নিয়াজি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে লড়াই করেছেন, তবু তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুদ্ধের মূল্যায়ন আমাদের জানা প্রয়োজন যেহেতু তিনি ছিলেন সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার। এ বইয়ে তিনি পাকিস্তান ভাঙার জন্য দায়ী করেছেন জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেনারেল ইয়াহিয়া ও টিক্কাখানকে। তিনি তাদেরকে অভিহিত করেছেন পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। তার মতে এই তিন ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান ভেঙেছেন। এ বইয়ে নিয়াজির অনেক বক্তব্যের সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি, অনেকেই করবেন। বইয়ে তিনি নিজের বাহাদুরীর কথাই শুধু তুলে ধরেছেন, নিজের কৃতিত্বের কথা বেশি করে বলতে গিয়ে কখনো কখনো তুলে ধরেছেন অতিরঞ্জিত, বিকৃত তথ্য এবং সাথে সাথে এড়িয়ে গেছেন বাঙালিদের সাহসী ভূমিকা ও কৃতিত্বের কথা। নিয়াজি বিশ্বাস করতেন যে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান সংকট একটি রাজনৈতিক সংকট, এটির সমাধান কোনো সামরিক যুদ্ধের মাধ্যমে হতে পারে না। তাই তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে জরুরি বার্তা পাঠিয়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ও বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে মুক্তিদানের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া তার আবেদনে সাড়া দেন নি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ যখন ঢাকায় গণহত্যা চালানো হয় তখন সেটাকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি নিয়াজি। তিনি ১৯৭১-এর সংকটের জন্য বাঙালিদের দায়ী করেন নি, দায়ী করেছেন ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও টিক্কা খানকে। তবে একথাও ঠিক যে তিনি নির্বিচারে বাঙালি হত্যাকে নিরুৎসাহিতও করেননি। যদিও তিনি বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানী

শাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নিপীড়নের কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশেই তিনি দায়িত্ব পালন করতে এসেছিলেন।

তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধে আত্মসমর্পণ একজন সৈনিকের জন্য চরম অপমানের, তার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা ভালো। তাকে উপরের নির্দেশে সেই গ্লানিকর আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে এবং এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন ভুট্টো, ইয়াহিয়া ও টিক্কাখানকে।

এ বইয়ের ঘটনাগুলোকে তিনি বর্ণনা করেছেন একজন লড়াকু সৈনিক হিসেবে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে।

৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণে তিনি নিজের বীরত্বের কথাই বলেছেন, বলেননি বাঙালিদের বীরত্বের কথা, তিনি ৭১-এর যুদ্ধের পরাজয়ের জন্য দায়ী করেছেন ভুট্টো-ইয়াহিয়ার সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রকে, তিনি এটাকে বলেননি বাঙালিদের বিজয়। তিনি নিজেদের আত্মত্যাগের কথাই বলেছেন, বলেননি সাতকোটি বাঙালির সাহসের কথা। তিনি বইটি উৎসর্গ করেছেন যারা অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষায় কঠোর লড়াই করেছিলেন, চরম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন এবং অপমান সহ্য করেছিলেন— সেই সব সেনাবাহিনীর সাহসী সদস্য, সিভিল আর্মড ফোর্সেস, বেসামরিক কর্মকর্তা, পশ্চিম পাকিস্তানের পুলিশ এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজাকার ও মুজাহিদদের। ... যাহোক, ইতিহাস চলে তার আপন গতিতে। জেনারেল নিয়াজি ইতিহাসেরই একটা অংশ। তাই তার নিজের অভিজ্ঞতাকে বাঙালি পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই এ বইয়ের অনুবাদ করা হলো।

ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল
ঢাকা ন্যশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৫৩/ জনসন রোড, ঢাকা।

সূত্রপাত

এ বই প্রকাশে দেরি হওয়াটা হয়েছে শাপে বর। এটা সত্য যে সময় হচ্ছে একটা বিরাট উপশমক। এটা ব্যাপক মিথ্যাকেও প্রকাশ করে বটে। যদি বইটা আগে লিখতাম, তাহলে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয়া যেত না। সময় এগিয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু সত্য উদঘাটিত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে পাকিস্তানের বিভক্তি ছিল একটা সাজানো আত্মসমর্পণ, কোনো সামরিক ব্যর্থতা নয়। সে সময় যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তারা ১৯৭১ এর ডিসেম্বরের অনেক আগেই পূর্বপাকিস্তান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

লারকানা পরিকল্পনা অনুযায়ী জেনারেল ইয়াহিয়া এবং মি. ভুট্টোর মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়, পূর্ব পাকিস্তানকে ছেড়ে আসা হবে একটা উত্তরাধিকারী সরকারবিহীন অবস্থায়। *পাকিস্তান'স ন্যাশনাল সিকিউরিটি প্রবলেমস*-বইয়ের লেখিকা মিসেস ফরিদা আহমেদ আমাকে লিখে জানান যে, জনাব আগা শাহী এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ এর ৯ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন সৈন্যদের আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি প্রতিনিধিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঠিক সে সময় আমরা সীমান্তে অথবা সীমান্তের কাছাকাছি শত্রুদের ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। শত্রুদের অব্যাহত হামলা প্রতিরোধ করেও সৈন্যরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল।

১৯৭১-এর শোকবহ ঘটনার কথা মনে পড়লে এখনো ভেসে ওঠে দ্বন্দ্ব, রক্তপাত এবং ধ্বংসযজ্ঞের তিক্ত স্মৃতি। এটা হচ্ছে সামরিক শক্তি সমর্থিত একটা রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের কাহিনী, যাতে বাইরে থেকে সাহায্য করেছে ও উৎসাহ যুগিয়েছে আমাদের শত্রুরা, যার পরিণামে ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে দেশ। অভ্যুদয় ঘটেছে বাংলাদেশের।

পাকিস্তানের ভাঙন এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা পাল্টে দিয়েছ এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ভারসাম্য। ঘটনার গুরুত্ব আকর্ষণ করেছে অসংখ্য লেখকের মনোযোগ, কিন্তু খুব কম লেখকই এ সংকটকে সঠিক দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম হয়েছেন। অধিকাংশ লেখক লিখেছেন শোনা কথা, অনুমান ও গুজবের ওপর ভিত্তি করে যা আসল ঘটনা থেকে অনেক দূরে। তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অধিকাংশ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। আমি এসব লেখকের নাম ও ভুলগুলো উল্লেখ করতে চাই না।

সামরিক লোকেরাও এরকম কিছু বই লিখেছেন। *ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ* নামে একটি বই লিখেছেন মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) ফজল মুকিম যাকে এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন জনাব ভুট্টো ও জেনারেল টিক্কা (তাঁরা প্রথমে অনুরোধ করেছিলেন মেজর জেনারেল সরফরাজকে, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন)। এ বইয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে তথ্য বিকৃত করা হয়েছে। ফজল মুকিম পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের বর্ণনা লেখেন রাওয়ালপিন্ডিতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে বসে, যারা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যারা যুদ্ধ করেছেন তাঁদের সাথে কোনো কথা না বলেই। তিনি তাঁর বইয়ে নির্ভর করেছেন ভারতীয় লেখক ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ফেরত পাঠানো লোকদের বক্তব্যের ওপর। মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) ফজল মুকিমকে একজন স্টাফ অফিসার ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে একটি অফিস দেয়া হয়েছিল। অভিযোগ রয়েছে তাঁকে নাকি অর্থের জোগানও দেয়া হয়েছিল। তাঁকে অধিকার দেয়া হয়েছিল গোপনীয় কাগজপত্র দেখার। কিন্তু সে অধিকার তাঁর ছিল না। অথচ আমি দেশে ফেরার পর যখন আমি রিপোর্ট লিখছিলাম তখন আমাকে গোপনীয় কাগজপত্র দেখতে দেয়া হয়নি। সরকারি প্রচার মাধ্যমে তার বইয়ের ব্যাপক প্রচার চালানো হয়, এবং সেনা ইউনিট গুলোকে বলা হয় বইটি কিনতে। কোনো সরকারি বিতর্ক ছাড়াই বইটিকে যুদ্ধ সম্পর্কে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের ভাষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। জেনারেল টিক্কা খান তার পরামর্শ দাতা জনাব ভুট্টোকে খুশি করার জন্য বইটি অনুমোদন করেন এবং পুরস্কার হিসেবে মুকিমকে প্রতিরক্ষা সচিব পদে নিয়োগ দেয়া হয়।

মরহুম ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক সালিক *উইটনেস টু সারেন্ডার* নামে একটি বই লিখেছেন। মেজর অবস্থায় তিনি ছিলেন আমার গণসংযোগ অফিসার (পিআর ও)। বিভিন্ন সেনা সজ্জা ও ইউনিট পরিদর্শন কালে তিনি আমার সঙ্গে থাকতেন। পেশাগত ভাবে তিনি ছিলেন একজন রিপোর্টার, সামরিক বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ তাঁর ছিল না কিংবা ছিল না যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা এবং সামরিক অপারেশন সম্পর্কেও কিছু বুঝতেন না তিনি। এ ধরনের সামরিক বিষয়ের ব্যাপকতা ছিল তাঁর ধারণার বাইরে।

সালিক যুদ্ধবন্দি হিসেবে ভারত থেকে ফেরার ঠিক পরপরই উর্দুতে একটি বই লেখেন যার নাম *হামান ইয়ারান দোজখ*। তাঁর লেখা দুটো বইয়ের মধ্যে বৈষম্য একথাই সাক্ষ্য দেয় যে তিনি তাঁর প্রভুদের খুশি করার জন্য মনগড়া বিকৃত ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন। সালিক আমার বিরুদ্ধে লিখেছেন, অথচ আমিই তাঁকে রক্ষা করেছিলাম বাঙালিদের হাত থেকে যারা তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

তার বই *উইটনেস টু সারেন্ডার* একরাশ মিথ্যের ছড়াছড়ি। ফজল মুকিমের মতো তিনিও জেনারেল টিক্কা এবং জনাব ভুট্টোর নির্দেশ মতো বইটি লেখেন আমাকে সুনামহানি করার জন্য, কিন্তু বইটি ছাপা হবার সময় ভুট্টোকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

আমার স্টাফ অফিসারদের একজন মেজর সালিককে আমার পিআরও হিসেবে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রেসনোট দিতেন বিলি করার জন্য। সামরিক কাজ-কর্ম সম্পর্কে

যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা জানেন যে শুধুমাত্র সিনিয়র অফিসারদের এবং অপারেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের অপারেশন রুমে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেয়া হয়। সালিক তার *হামান ইয়ারান দোজখ* বইয়ে স্বীকার করেছেন যে অপারেশন নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনায় তাঁকে অপারেশন রুমে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হতো না। তাঁর বইয়ের নামকরণও ঠিক নয়। তিনি ছিলেন আত্মসমর্পণের অংশ, আত্মসমর্পণের সাক্ষী নন। তাঁকে ভালোভাবেই পুরস্কৃত করা হয়। তিনি ব্রিগেডিয়ার হন।

১৯৭১-এর যুদ্ধ সম্পর্কে সরকারি ভাষ্য তৈরি করার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) শওকত রিজাকে নিয়োগ করে। এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছুই হতে পারে না। একটি ডিভিশনের কমান্ড থেকে আমি তাঁকে অপসারণ করেছিলাম তাঁর অযোগ্যতা, কাপুরুষতা এবং যুদ্ধের চাপ সহ্য করার মতো মনোবল না থাকার কারণে। তার *দি পাকিস্তান আর্মি ১৯৫৬–৭১* বইটি পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন যুদ্ধের এবং সেনা ইউনিটের অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্যে ভরা।

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর আরেকটি বই লেখার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) কামাল মতিনকে নিয়োগ করেছে। মজার ব্যাপার হলো যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পূর্ব পাকিস্তানের ওপর এত বই প্রকাশ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর কোনো বই প্রকাশ করছে না, যেখানে আমাদের জেতার মতো পর্যাপ্ত সৈন্য, সম্পদ এবং অনুকূল পরিবেশ ছিল। তবু আমাদের অপারেশগুলো ভণ্ডুল হয়ে যায় এবং আলাদা হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান। জেনারেল টিক্কা এবং জনাব ভুট্টো নিজেদের ব্যর্থতা ও অপকর্ম ঢাকার জন্য মুকিম ও সালিককে নিয়োগ করেছিলেন, তবে মতিনকে নিয়োগ করেন জেনারেল বেগ, যিনি শওকত রিজার স্টাফ অফিসার ছিলেন, কিন্তু মেয়াদকাল শেষ হবার আগেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন। মতিন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে বসে সব সুবিধা পাচ্ছেন এবং বই লিখছেন।

আরেকটা বই, যেটা মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) রাও ফরমান আলির লেখা *'হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড'* সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বইটা মিথ্যায় ভরা। চক্রান্ত ও জালিয়াতির মাধ্যমে তিনি টিকেছিলেন পাঁচ গর্ভনরের অধীনে। তিনি ছিলেন অসৎ চরিত্রের লোক। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি গর্ভনর মালিকের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন একটা মিথ্যা সামরিক পরিস্থিতি চিত্রণের মাধ্যমে। আমাকে না জানিয়ে তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে কিছু বার্তা পাঠান এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের আগেই তিনি একটি অত্যন্ত গোপনীয় বার্তা প্রকাশ করে দেন যার স্পষ্ট অর্থ ছিল পাকিস্তান ভেঙে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট এ বার্তা বাতিল করে দেন। তবে ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। ফরমান তার বইয়ে অসত্য কথা লিখেছেন। তিনি গোপনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল স্যাম মানেকশ-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। ভারতের সঙ্গে তার যোগাযোগের ব্যাপারটা আমি জানতে পারি ১৫ ডিসেম্বর জেনারেল মানেকশ-এর বার্তার মাধ্যমে। তিনি বলছিলেন যে ইতোমধ্যে তার সাথে আত্মসমর্পনের বিষয়ে কথা হয়েছে।

এ কথা সত্য যে একটা যুদ্ধে কমান্ডিং জেনারেল ও তার সৈন্যরা প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এমন কিছু বিষয় থাকে যা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অথচ বিষয়গুলোর ফল যুদ্ধে সুদূর প্রসারী। কেউ সামরিক পতনের ব্যাপারে বই লিখতে চাইবে

তাকে অনেক বিষয় বিবেচনা করতে হবে। আবহাওয়া জনিত অবস্থা, ভৌগলিক অবস্থান, কমান্ডারের ওপর ন্যস্ত রাজনৈতিক ও সামরিক মিশন, এ কাজের জন্য নিয়োজিত পর্যাপ্ত সৈন্য, দায়িত্বপালনের স্থানের বিস্তৃতি ও ধরন, স্থানীয় পরিস্থিতি, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, পর্যাপ্ত সম্পদ, ঘাঁটি থেকে দূরত্ব, সঠিক ধরনের অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের প্রাপ্যতা, নতুন ও অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েনের সামর্থ, রিজার্ভ সৈন্যের প্রাপ্যতা নৌ ও বিমান সহায়তা, গোয়েন্দা সংস্থার বিন্যাস। চিকিৎসা সুবিধা এবং শত্রুর শক্তি, সম্পদ ও পর্যাপ্ত সুবিধা। একজন কমান্ডিং জেনারেলের দক্ষতা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার আগে অবশ্যই এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

যেসব লেখক ১৯৭১-এর যুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন তাদের প্রায় সবাই পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধকে পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধ থেকে আলাদা করেছেন। এই বর্জন অন্যায় ও বিভ্রান্তিকর। পূর্ব ও পশ্চিমের যুদ্ধের পরিকল্পনা ছিল সহগামী এবং পরপর সংযুক্ত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, পশ্চিম রনাঙ্গণেই ছিল মূল ও চূড়ান্ত যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে ছিল জয়ের কথা।

একইভাবে অধিকাংশ লেখক যুদ্ধের পরিবেশগত উপাদান এবং তাদের প্রভাব বিবেচনায় আনেন নি। সামরিক অভিযানে জাতীয় কৌশল, রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা, অর্থনৈতিক অবস্থা, কুটনৈতিক আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক অভিযানকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হলো বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া।

সামরিক অভিযানের অর্থ হলো একটা লক্ষ্য অর্জনের উপায়, এটা হলো চাকার মধ্যে আরেকটি চাকা। সে কারণে একজন লেখকের জন্য যুদ্ধের সময় জাতীয়-কৌশল ও তার নিহিতার্থ উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ।

সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার হলো, ১৯৭১ এর যুদ্ধের ওপর লেখা বইয়ের একজন লেখকও একটা বিশাল শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থায় আমার ওপর অর্পিত অথবা আমার ক্ষুদ্র, পরিশ্রান্ত ও অপর্যাপ্ত অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর কথা বিবেচনা করেন নি।

এমন সময় এসেছে জেনারেল ইয়াহিয়া, জনাব ভুট্টো ও মুজিবুর রহমান এবং তাদের বিশ্বস্ত লোকদের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সত্য কথা বলার।

আমার বইয়ের কাহিনী হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং সত্যিকার ভাবে আমার দেখা, অভিজ্ঞতা ও অনুভবের নথিপত্র।

ইস্টার্ন কমান্ডের আমার বীর যোদ্ধারা যারা একটি বৈরি ভূখণ্ডে দীর্ঘ নয় মাস ব্যাপী নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করেছে প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশে, যা পৃথিবীর আর কোনো বাহিনীর ক্ষেত্রে ঘটেনি। বিশ্রাম ছাড়া, আরাম ছাড়া, প্রয়োজনীয় সহায়তা ছাড়া, আমোদ প্রমোদ ছাড়া, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়–এবং যাদেরকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে অস্ত্র সমর্পণ করে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে–তাদেরকে সমর্থন করা আমার নৈতিক দায়িত্ব।

অধ্যায় ১

প্রাথমিক জীবন

আমার নাম আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি, তবে আমি 'টাইগার নিয়াজি' হিসেবে বেশি পরিচিত। এ খেতাবটা আমাকে দিয়েছিলেন ১৬১ ভারতীয় পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ওয়ারেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মায় আমার বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাকে খেতাব দেয়া হয় *'তারিক-বিন-জিয়াদ'*। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাকে কোহিমাতে মিলিটারি তারকা দেয়া হয় এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে আমি দু'বার *'হিলাল-ই-জুরাত'* খেতাবে ভূষিত হই, একবার ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে অন্যবার ১৯৭১-এর যুদ্ধে। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে *'সিতারা-ই-খিদমত'* এবং *'সিতারা-ই-পাকিস্তান'*। আমি চব্বিশটা পদক পেয়েছি। আমাকে প্রশংসাপত্র দেয়া হয়েছে। মেজর থেকে আরো ওপরে আমার সব পদোন্নতি হয়েছে দ্রুত। আমাকে যখন ইস্টার্ন গ্যারিসনের কর্তৃত্ব দেয়া হয়, যেটা ছিল সামরিক বাহিনীর তৃতীয় সিনিয়র পদ, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের তালিকায় আমি ছিলাম বারতম। বিভিন্ন সেক্টর পরিদর্শনে গেলে আমার সেনা দলকে দেখে সবাই চিৎকার দিত *'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, নিয়াজি তদবির, আল্লাহ-আকবর।'* আমাকে ইপকাফ (ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস)-এর সদস্যদের কমিশন এবং পূর্ব পাকিস্তান গ্যারিসনের সদস্যদের এসজে (সিতারা-ই-জুরাত) বীরত্বপদক প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়। ভারতীয়রা আমাকে সৈনিকদের সেনাপতি বলে সম্বোধন করত। আমার বীরত্বের জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছি নিজেকে জাহির করার জন্য নয়, বরং আমার কর্তব্য পালনে কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য। কর্তব্য পালনে সর্বদা আমি দেশকে নিজের চেয়ে ওপরে স্থান দিয়েছি।

আমি ১৯১৫ সালে বালো-খেল নামে একটা ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। গ্রামটা মিয়ানওয়ালি শহর থেকে দু মাইল দূরে সিন্ধু নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত। বর্তমান মিয়ানওয়ালি এবং মিয়ানওয়ালি জেলার ইসা-খেল তহসিল একসময় বান্নু জেলার অংশ ছিল। ব্রিটিশরা এক অজ্ঞাত কারণে বান্নু জেলা থেকে এ অংশটা কেটে নেয় এবং নতুন মিয়ানওয়ালি জেলা গঠন করে। ফয়সালাবাদ জেলার লুন্দিয়ানওয়ালায় চৌদ্দটি চক (গ্রাম) রয়েছে নিয়াজিদের, যারা বসতি স্থাপন করে ব্রিটিশদের

মাধ্যমে। স্থানীয় লোকজন এ এলাকাকে এখনো বান্নু টুকরি (খণ্ড) হিসেবে ডাকে।

আমি জন্মগ্রহণ করি এক নিয়াজি পরিবারে। নিয়াজিরা হলো আফগানদের বংশধর যারা গজনি ও কান্দাহার থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসে এবং ছড়িয়ে পড়ে ভারত ও পাকিস্তানে। নিয়াজিদের বেশির ভাগ লোক বাস করে মিয়ানওয়ালি জেলাতে, এ জেলার সিন্ধু নদের উভয় তীরে তাদের বসবাস, এটা পাঠানদের বসতির শেষ পূর্ব প্রান্ত। এছাড়া নিয়াজিরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জেলা বান্নু, কোহাট ও ডেরা ইসমাইল খান এবং বেলুচিস্তানের কোয়েটা ও পিসিন জেলাতেও বসবাস করে। করাচি ও ফয়সালাবাদেও তাদের বসতি রয়েছে। ১৯৪৭ এর আগস্টে দেশ বিভাগের পর ভারতের পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুর ও জলন্ধরে বসবাসকারী বহু নিয়াজি পরিবার পাকিস্তানে চলে আসে, যদিও কিছু রয়ে গেছে বিশেষ করে বেরিলি ও রামপুরে। নিয়াজিদের একটা বিরাট অংশ এখনো আফগানিস্তানে রয়ে গেছে।

নিয়াজিদের গ্রামীণ জীবনে পরিলক্ষিত হয় উপজাতীয় প্রথা ও ঐতিহ্য। আজকের দিনেও সেখানে বন্দুকের জয়। প্রতিশোধ এবং পাল্টা প্রতিশোধের ঘটনা সাধারণ দৃশ্য। প্রতিশোধ গ্রহণের আদিম ইচ্ছায় একটা পরিবার অধিক পুত্র সন্তান কামনা করে। সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয়া হয় বন্ধুত্ব এবং আনুগত্যকে। নিয়াজিরা সৈনিক হিসেবে চাকরি করে আসছে শত শত বছর ধরে। সৈনিক বৃত্তি হলো তাদের পেশা। তাদের কবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র। নিয়াজিদের মধ্যে কিছু বিখ্যাত জেনারেলের জন্ম হয়েছে। মোগল সম্রাট বাবর তার বইয়ে লিখেছেন যে হিন্দুস্তান অভিযানের সময় যখনই তিনি নিয়াজি অধীন ভূখণ্ড অতিক্রম করতেন, চলাচল কিংবা তাঁবুতে থাকাকালীন আক্রমণের ভয়ে তিনি নিজেই নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখাশুনা করতেন।

নিয়াজিদের স্বর্ণযুগ শুরু হয় শের শাহ সুরি ক্ষমতায় এলে। ওলাফ ক্যারো-এর মতে এ গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক শের শাহ-এর সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। ১৫৪০ সালে তার বিশ্বস্ত সেনাপতি হায়বাত খান, যিনি একজন নিয়াজি, বাবরের পুত্র মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ে বিরাট অবদান রাখেন। এরপর শেরশাহ পাঞ্জাব ছাড়েন হায়বাত খানের ওপর দায়িত্ব দিয়ে। হায়বাত খান ৩০,০০০ আফগান অশ্বারোহী সেনাদল নিয়ে দখল করেন রোটাস দূর্গ। যখন তিনি বালুচদের কাছ থেকে মুলতান এবং তার আশেপাশের অঞ্চল দখল করেন, তখন তাকে সর্বোচ্চ পদে উন্নীত করা হয় এবং তাকে খেতাব দেয়া হয় *'মসনদ-ই-আলা, আজম হুমায়ুন'*। এ খেতাব ইতোপূর্বে মাত্র দুজনকে দেয়া হয়। ইসা খান নিয়াজি শের শাহ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন ভারত থেকে হুমায়ুনকে বিতাড়িত করার জন্য।

১৯৬৫-এর যুদ্ধে সাবমেরিন *গাজি*-এর কমান্ডার হিসেবে অ্যাডমিরাল কেরামত রহমান নিয়াজি তাঁর সাহসিকতা প্রমাণ করেছিলেন ভারতীয়দের বিরুদ্ধে। তাঁর

চমৎকার কৃতিত্বের জন্য তাকে এস জে *(সিতারা-ই-জুরাত)* খেতাব দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন মেহবুব খান নিয়াজি কোনো পাকিস্তানি অফিসার যিনি প্রথম এসজে পুরস্কার পেলেন কাশ্মীর অপারেশনে। ১৯৬৫-এর যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য ক্যাপ্টেন হেদায়েত উল্লাহ্ খান নিয়াজি (পরে মেজর জেনারেল) এবং মেজর আব্দুল রব নিয়াজি (পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) কে এসজে খেতাব প্রদান করা হয়। রেঞ্জার্সের নায়েক আব্দুল সাত্তার খান নিয়াজিকে পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সাহস ও বীরত্বের জন্য ভারতীয়রা সামরিক মর্যাদায় সমাধিস্থ করে। পুলিশের ডেপুটি সুপারেন্টেডেন্ট ইকরাম উল্লাহ খান নিয়াজিকে দস্যুদের বিরুদ্ধে অতুলনীয় সাহস দেখানোর জন্য পুলিশ-পদক প্রদান করা হয়। তাঁর বীরত্বের নিদর্শন হিসেবে রাভি ব্রিজের কাছে (লাহোর) একটা গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে।

খেলাধুলাও নিয়াজিরা নাম করেছেন। তারিক এবং কাইয়ুম নিয়াজি হকিতে অনেক আন্তর্জাতিক ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ক্রিকেট জগতের কিংবদন্তি ইমরান খান নিয়াজির কোনো জুড়ি নেই। আমার ছেলে মেজর আমান উল্লাহ খান নিয়াজি হলো পাকিস্তানের দ্রুততম দৌড়বিদ এবং আমার ছোট ছেলে হাবিব উল্লাহ নিয়াজি তেহরান থেকে ঢাকা পর্যন্ত একটানা গাড়ি চালনা প্রতিযোগিতায় ট্রফি পেয়েছে।

আমার ছেলেবেলায় গ্রামীণ জীবন ছিল সাধারণ। জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন পরিবারের কর্তা এবং তার ছিল সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা। রাতে মুরব্বিরা বৈঠকখানায় বসে হুক্কা খেতে খেতে কিংবা এক চিমটি নস্যি নিতে নিতে গল্প করতেন। কাবাডি ছিল একটি জনপ্রিয় খেলা। দু'গ্রামের মধ্যে খেলা হতো এবং ছেলে বুড়ো সবাই তা দেখতো। কোয়েল, তিতির এবং খরগোশ শিকার খুব জনপ্রিয় ছিল। বর্শা দিয়ে শূকর শিকার ছিল একটি সাধারণ খেলা। ছোট ছোট ছেলেদের ব্যক্তিগত অস্ত্র ছিল গুলতি, এটা তারা হাতে রাখত কিংবা গলায় ঝুলিয়ে রাখত।

গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল মাত্র একটি। মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় ছিল মিয়ানওয়ালিতে। আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে। বাচ্চাদের কিংবা তাদের বাবা-মায়ের কারো স্কুলের প্রতি আগ্রহ ছিল না। প্রতিটা শিশু যেত গ্রামের মসজিদে, প্রার্থনা করত এবং পবিত্র কোরান তেলওয়াত করত। গ্রামে প্রবেশিকা পরীক্ষাকে বিবেচনা করা হতো উন্নতি লাভের সর্বোচ্চ সিঁড়ি। মিয়ানওয়ালি জেলায় কোনো কলেজ ছিল না। ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিই 'ওয়াই' ক্যাডেট হিসেবে।

শুরুতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা ছিল ব্রিটিশ। ভারতীয়রা কেবল পদোন্নতি পেত সুবেদার-মেজর, সুবেদার অথবা জমাদার র‍্যাংকে যাকে বলা হতো ভিসিও (ভাইস রয়ে'স কমিশন্ড অফিসার্স)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার কিছু নির্বাচিত ভারতীয়দের কমিশন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এসব কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য স্যান্ডহার্স্টে পাঠান হতো এবং তাদেরকে বলা হতো কে সি ও

(কিং'স কমিশনড অফিসার্স)। পরে এ উদ্দেশ্যে দেরাদুনে ইনডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি (আই এম এ) খোলা হয়। আই এম এ-তে ঢুকতে হতো উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, সশস্ত্র বাহিনী থেকেও কিছু কিছু প্রার্থীকে আই এম এ-তে নেয়া হতো। তাদেরকে ইনডিয়ান আর্মি স্পেশাল ক্লাস উত্তীর্ণ হতে হতো, তারপর মুখোমুখি হতে হতো সিলেকশন বোর্ডের। দেরাদুন থেকে যেসব ক্যাডেট বের হয়ে আসত, তাদেরকে বলা হতো আই সিও (ইনডিয়ান কমিশন্ড অফিসার্স)। এই আই সি ও দের আবাসিত করার জন্য কয়েকটা ভারতীয় ব্যাটালিয়ন ও রেজিমেন্ট গঠন করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দানে অফিসার ট্রেনিং স্কুল খোলা হয়। অফিসার ট্রেনিং স্কুল থেকে বের হওয়া কর্মকর্তাদের ইসিও (ইমার্জেন্সি কমিশন্ড অফিসার্স) বলা হতো। আমি ব্যাঙালোর অফিসার ট্রেনিং স্কুল থেকে বের হই ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ এবং নিয়োগ পাই রাজপুত রেজিমেন্টে, যার ট্রেনিং সেন্টার ছিল ফতেহগড়ে। ব্যাঙালোরে প্রশিক্ষণ কালে আমাকে মেজর ব্লেয়ার-এর অধীনে একাদশ কোম্পানির ক্যাডেট কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ থেমে গেলে সব ইসিও-কে সিলেকশন বোর্ডে উপস্থিত থাকতে বলা হয় এবং যারা অনুমতি পায় তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর রেগুলার অফিসার হয়। এদেরকে এরপর থেকে বলা হতো আই সি ও (ইনডিয়ান কমিশন্ড অফিসার্স)। আমি সিঙ্গাপুরে সিলেকশন বোর্ডে হাজির হই। আমি অনুমতি পাই এবং আইসিও ৯০৬ হই।

ট্রেনিং সেন্টার থেকে লে. প্যাডাক ও আমি ওয়েস্টার্ন ডেসার্টে ৪/৭ রাজপুত ফাইটিংয়ে যোগ দিই। ১৯৪২-এর ৩০ অক্টোবর আমরা মিশরের উদ্দেশ্যে বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়ি। জাহাজ থেকে পোর্ট ইসমাইলিয়ায় নামার পর আমাদেরকে নেয়া হয় মিনা ক্যাম্পে, ওটা কায়রোর উপকণ্ঠে পিরামিড গুলোর কাছে। আমাদের নিজ নিজ ইউনিটে পাঠানোর আগে অফিসার ও জওয়ানদের ব্যাপক অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র ও মরুভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষ হয় মহড়ার মাধ্যমে, এ মহড়ায় কামান, মর্টার ও মেশিনগান থেকে তাজাগুলি ছোড়া হয়। মহড়ায় আমি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে আক্রমণ কারী কোম্পানির নেতৃত্ব প্রদান করি। আমার দক্ষতা ও গভীর আগ্রহ দেখে সিনিয়র অফিসাররা এত খুশি হন যে আমাকে মিনা ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেবার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু আমি ক্যাম্পে দায়িত্বপালন করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি এবং ব্যাটালিয়নে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করি।

আমাকে ৪/৭ রাজপুত রেজিমেন্টের ইনটেলিজেন্স অফিসার হিসেবে নিয়োগ

দেয়া হয়। আমাদের ব্যাটালিয়ন ছিল ব্রিগেডিয়ার হিউজের নেতৃত্বাধীন ১৬১ ব্রিগেডের অংশ। মেজর জেনারেল ব্রিগস ছিলেন পঞ্চম ভারতীয় ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং। আমি যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করি যা পরবর্তীতে ভারত, বার্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। পঞ্চম ভারতীয় ডিভিশনকে শীঘ্রই ইরাকে পাঠানো হয় এবং এটা পারস্য—ইরাক ফোর্সের অংশে পরিণত হয়। ইরাকে সৈন্য সংগ্রহ করা হয় ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ইন্দো-ইউরোপীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ইরান ও ইরাকে জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে আমরা চলে যাই ফতেহগড়ে, আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ফতেহগড় থেকে আমরা যাই চাস-এ। এটা বিহারের রাঁচির কাছে একটা ছোট্ট শহর, যেখানে আমাদের ডিভিশনকে জড় করা হয় বার্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে জঙ্গল প্রশিক্ষণের জন্য। প্রশিক্ষণ এলাকা থেকে ১৬১ ব্রিগেডকে বাংলার টেকনাফ উপদ্বীপে সরিয়ে নেয়া হয়, যেটা বার্মা সীমান্তের খুব কাছে। আমাদের ব্যাটালিয়ন অবস্থান করে নিহলায়। এখানে আমরা ব্যাপক জঙ্গলযুদ্ধ প্রশিক্ষণ শুরু করি। আমাদের ব্রিগেডকে প্রথমে নির্দেশ দেয়া হয় বার্মার আরাকানে রাজালিন দুর্গ দখলের, যা আমরা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করি। যদিও আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, তবু আমরা মরুভূমি ও জঙ্গল যুদ্ধের পার্থক্য বুঝতে পারি।

বাউথি-দায়ুং টানেল

আমাদের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট ছিল বাউথি-দায়ুং। এটা আরাকানের একটা ছোট্ট শহর। শহরটা চারদিক দিয়ে নিচু পাহাড় ও ঘন জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। বর্ষাকালে ভূমি ধসে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবার কারণে রেল লাইন যোগাযোগের গুরুত্ব বেড়ে যেত। পাহাড়ি এলাকায় যাবার জন্য ছিল দুটি রেল লাইন সুড়ঙ্গ, একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব ছিল প্রায় একশ গজ, শহর থেকে সুড়ঙ্গের অবস্থান ছিল প্রায় এক হাজার গজ দূরে। শত্রুরা সুড়ঙ্গ দুটো ধ্বংস করে ফেললে কিংবা দখল করে নিলে বাউথি-দায়ুং অথবা সামনের দিকে আমাদের অভিযান থেমে যেত। অগ্রগামী সৈনিকদের কাছে মালপত্র পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করার জন্য সুড়ঙ্গ দুটোর নিয়ন্ত্রণ নেয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সুড়ঙ্গ দুটো দখলের দায়িত্ব দেয়া হয় ১৬১ ব্রিগেডকে। ব্রিগেডিয়ার ওয়ারেন ৪/৭ রাজপুত, ১/১ পাঞ্জাবি এবং রয়্যাল ওয়েস্ট কেন্ট-এর কিছু গেরিলা প্লাটুন নিয়ে একটি গেরিলা কোম্পানি গঠন করেন। আমাকে এ গেরিলা কোম্পানির অধিনায়ক করা হয়। শত্রুর সৈন্য সমাবেশের প্রতি দৃষ্টি রেখে দু পর্যায়ে সুড়ঙ্গ দুটো দখলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে আমরা হামলা করি এবং দক্ষিণ সুড়ঙ্গ দখল করি। শত্রু পক্ষের পাঁচ জন মারা যায় এবং চার জন আহত হয়। এরপর বাম সুড়ঙ্গে হামলা চালিয়ে তা দখল করা হয়। সাতটি মৃতদেহ ফেলে পালিয়ে যায় শত্রুরা। আমাদের পক্ষে নিহত হয় দুজন এবং মারাত্মক আহত হয় আট জন।

আমার কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল কার্গিল এবং ব্রিগেডিয়ার ওয়ারেন খুশি হন এ অপারেশনের সফলতায়। আমাকে ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস অর্ডার (ডিএসও) পদক প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। যদিও নিয়ম অনুযায়ী সিনিয়র অফিসারদের ডিএসও দেয়া হয়, কিন্তু আমিই একমাত্র লেফটেন্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন) যাকে এ পদকের জন্য মনোনীত করা হয়। সুপারিশে আমার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। সেক্রেটারি অভ স্টেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে প্রশংসাপত্র আমাকে প্রদান করা হয় তা নিচে দেয়া হলো :

৫ এপ্রিল, ১৯৪৫-এর লন্ডন গেজেটে প্রকাশিত সূত্র ও সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৭ম রাজপুত রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন (ভারপ্রাপ্ত) আমির আব্দুল্লাহ খান, এম. সি.-কে তার বীরত্বের জন্য আমি রাজার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তাকে প্রশংসাপত্র প্রদান করছি।

এস, আই, গ্রিস

সেক্রেটারি অভ স্টেট ফর ওয়ার

* * *

ইতোমধ্যে জাপানির বার্মা দখল করে ভারত আক্রমণ করে এবং আসামে ঢুকে পড়ে। ১৬১ ভারতীয় পদাতিক বাহিনীকে বার্মা থেকে আসামের কোহিমায় এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। উদ্দেশ্য অগ্রগামী জাপানিদের বাধা দেয়া। ৫ম ভারতীয় ডিভিশনের বাকি সৈন্যদের নির্দেশ দেয়া হয় আসামের ইম্ফলে যাবার জন্য। কোহিমাতে পৌঁছতে না পৌঁছতে জাপানিদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

জাপানিদের প্রচুর ভারী মর্টার ও ভারী কামান ছিল, যেগুলো তারা হাতি দিয়ে বয়ে আনে। জঙ্গল যুদ্ধে ছিল তারা অভিজ্ঞ, তারা দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। তারা আমাদের ওপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে অবস্থার পরিবর্তন ও সাঁড়াশি হামলা চালিয়ে। জাপানিদের অগ্রসর হবার এক মাত্র রাস্তাটি ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণে। গর্তে অবস্থান করার আগে আমাদের ওপর মর্টার ও কামানের গোলাবর্ষণ করে প্রচুর ক্ষতি করা হয়। আমাদের জীবিত সৈন্যরা গর্তে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে এবং যোগাযোগ রক্ষা করে চলে নিজেদের মধ্যে। আমাদের চেয়ে জাপানিরা আশেপাশের উঁচু পাহাড় গুলো দখল করে নেয়। তারা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে এবং গুলি করে। রাতের অন্ধকারে আমাদের তৎপরতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আমাদের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ওয়ারেন ছিলেন সাহসী ব্যক্তি। তিনি আমাদের শিখিয়ে ছিলেন যে নিষ্ক্রিয়তা হচ্ছে মৃত্যুর সমান। তাই আমরা টহল, চোরাগুপ্তা হামলা ও নজরদারির মাধ্যমে আমাদের সৈন্যদের মনোবল জোরদার করে তুললাম। প্রায় এক সপ্তাহ পর আক্রমণের তীব্রতা কমে যায়, তবে অব্যাহত থাকে অবরোধ। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয় একটি জাপানি রসদবাহী সৈন্যদলের ওপর

হামলা চালানোর। আমরা সফল হই। হামলায় দশ জনের সবাই মারা যায়।

শেষমেষ আমাদের উদ্ধার করার জন্য ২য় ব্রিটিশ ডিভিশন এগিয়ে আসে এবং তের দিন পর অবরোধ ভেঙে পড়ে। ব্রিগেডিয়ার ওয়ারেন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তার সৈন্যদের মোতায়েন করেছিলেন এবং চমৎকারভাবে আত্মরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। সীমিত সম্পদ নিয়ে তিনি কোহিমায় তের দিন জাপানিদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করতে সক্ষম হন এবং এ অঞ্চল দখলে জাপানিদের আশা গুঁড়িয়ে দেন। তাকে ডি এস ও প্রদান করা হয়। জাপানিরা ভারতের অভ্যন্তরে আরো অগ্রাভিযানের ঝুঁকি উপলব্ধি করতে পেরে তাদের পরিকল্পনা ত্যাগ করে এবং আসাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করে সুশৃঙ্খলভাবে।

ঢালু পাহাড়ে ফাঁদ

দু' সপ্তাহ বিশ্রামের পর আমাদেরকে ভাতা দেয়া হয়। ১৬১ ব্রিগেডকে নির্দেশ দেয়া হয় জাপানি সৈন্য প্রত্যাহারে বাধা, তাদের হয়রানি এবং তাদের দল ও যানবাহন ধ্বংস করতে। বিগ্রেডের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪/৭ রাজপুতকে নির্দেশ দেয়া হয় রাস্তা অবরোধ, শত্রুদের ওপর হামলা ও তাদের হয়রানি করার। একজন লেফটেন্যান্ট হিসেবে ব্রাভো ও চার্লি কোম্পানির সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। আমি ছিলাম লেফটেন্যান্ট রিচার্ডসন এর সিনিয়র, তিনি চার্লি কোম্পানিকে নেতৃত্ব দিতেন। নিয়ম অনুযায়ী দুটি সম্মিলিত কোম্পানির অপারেশনে নেতৃত্ব দিতে হয় ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড (২১/সি) কে। কিন্তু এই কঠিন মিশনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমাকে। আমি এমন উঁচু জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করি, যেখান থেকে গুলি করা সহজ হয়। ট্রেনচগুলো ছিল শত্রুদের ধোঁকা দেবার জন্য সঠিক।

ফাঁদে ফেলতে আমরা জাপানিদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরদিন একদল সৈন্য রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি সুবেদার ভরত সিং-এর অধীনে একটি প্লাটুন পাঠাই আগে থেকে প্রস্তুত পেছনের একটি অবস্থানে, মূল বাহিনী থেকে অগ্রসরমান জাপানি সৈন্যদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য। অগ্রসরমান জাপানি সেনাদল ভরত সিং-এর সেনাদলকে অতিক্রম করা মাত্র তাদের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয় এবং তাদেরকে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। আমরা গুলি করা থেকে বিরত থাকি। আমাদের অবস্থান অদখলকৃত ভেবে জাপানি সেনা কমান্ডার পাহাড়ের চূড়ার দিকে ছুটে যান কিন্তু তার সৈন্যরা আমাদের গোলাবর্ষণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। জাপানি কমান্ডার এক অংশ সৈন্য উদ্ধার করেন এবং আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন।

জাপানি অফিসাররা তলোয়ার বহন করায় তাদেরকে শনাক্ত করা সহজ হয়। লে. রিচার্ডসনকে সৈন্যদের দায়িত্বে রেখে আমি এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে শত্রু অধিকৃত একটি এলাকা ঘেরাও করি। ক্রলিং করে ও নিজেদেরকে আড়াল করে আমরা তাদের কাছে এসে পড়ি। এক ঘণ্টার মধ্যে বেশির ভাগ জাপানি সৈন্য

নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারা হয় তাদের নিজেদের গুলিতে আত্মহত্যা করে অথবা আমাদের গুলিতে মারা যায়। তারা কখনো আত্মসমর্পণ করেনি। দলের কমান্ডার তখনো জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন গর্বিত ও দুঃসাহসী। তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে তার তলোয়ার উঁচু করে ধরলেন এবং আমাকে আহ্বান করলেন তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আমি আমার লোকদের বললাম তাকে যেন গুলি না করে। দুজন জওয়ানকে পাঠালাম আশেপাশে কোনো জাপানি সৈন্য আছে কিনা তা দেখতে। আমি আমার অবস্থান থেকে উঠে এলাম, জাপানি অফিসার যুদ্ধ করার ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে বয়স্ক। ক্রুদ্ধ ষাড়ের মতো তিনি আমাকে আক্রমণ করলেন। আমি প্রতিহত করলাম তার আক্রমণ। তার দ্বিতীয় আক্রমণের সময় আমি তার গলায় বর্শা নিক্ষেপ করলাম। এটা আমি কিনেছিলাম কোহিমায় এক নাগার কাছ থেকে।

আমার সৈন্যরা শৃঙ্খলা ও সাহস প্রদর্শন করে। প্রশংসা করা হয় এ কর্মকাণ্ডের এবং আমাকে দ্রুত পদোন্নতি দেয়া হয়। বিগ্রেডিয়ার ওয়ারেন তখন আমাকে 'টাইগার' নাম দেন। এরপর থেকে আমি এ নামে পরিচিত হয়ে উঠি।

কিকরিমার টেকরিজ

রাজপুত রেজিমেন্টকে এরপর মোতায়েন করা হয় কিকরিমায়, এটা আসামের একটি গ্রাম। এলাকাটা ছিল পাহাড়ি এবং ঘন জঙ্গলে ঘেরা। সব ঋতুতে উপযোগী একটি রাস্তা কিকরিমা থেকে টেকরিজের দিকে গেছে, এরপর হঠাৎ বাঁক নিয়ে একটি এলাকা দিয়ে গেছে যেখানে ১/১ পাঞ্জাব, ১৬১ ব্রিগেডের আরেকটি ব্যাটালিয়ন মোতায়েন ছিল। জাপানিরা টেকরিজ দখল করে নিয়েছিল এবং তারা রাস্তাটি নিয়ন্ত্রণ করত। টেকরিজে শত্রুর শক্তি সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার জন্য লে. কর্নেল কারগিল আমাকে দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে আমার সেনাদল উঠিয়ে নিয়ে সেদিকে যাবার নির্দেশ দেন। আমি এ অপারেশনের বিস্তারিত বিবরণ দেব না। আমার কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল কারগিল যে রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন এবং ব্রিগেডিয়ার ওয়ারেন অনুমোদন করেছিলেন, তা নিচে দেয়া হলো। এতে যুদ্ধের সঠিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

"এই অফিসারকে ১৯৪৪ সালের ১১ জুন নির্দেশ দেয়া হয় আসাম বার্মা সম্মুখ ভাগের জেসামি সড়কে কিকরিমা এলাকায় আমাদের অবস্থানের বাইরে তার সেনাদলকে নিয়ে যাবার জন্য শত্রুর শক্তি সম্পর্কে ধারণা করতে।

তিনি ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার্সে এসে রিপোর্ট করেন যে শত্রুর অবস্থান খুব শক্তিশালী এবং তিনি অনেক বাংকার দেখতে পেয়েছেন। তার মতে, যদি তিনি হামলা চালাতেন তাহলে তিনি আকস্মিক বিজয় অর্জন ও শত্রুর মারাত্মক ক্ষতি করতে পারতেন। ৩৫ জন সৈন্য (তখনকার দিনে কোম্পানি কমান্ডার সহ ৩৫ জন সৈন্য নিয়ে একটা কোম্পানি গঠন হতো) নিয়ে তাকে এ হামলা চালানোর অনুমতি

দেয়া হয়। এত দক্ষতার সঙ্গে তিনি অভিযান পরিচালনা করেন যে তার অগ্রবর্তী প্লাটুন শত্রুর তিনটি বাংকার পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়। অগ্রবর্তী প্লাটুনে প্রাণহানি শুরু হলে ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ নিজে দ্বিতীয় প্লাটুনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং শত্রুর তিনটে বাংকার দখল করেন। অগ্রবর্তী প্লাটুন রিপোর্ট করে শত্রুরা পাল্টা হামলার জন্য তাদের দক্ষিণ পার্শ্বে সংগঠিত হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়ে সুনিপুণভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যান এবং ই ওয়াই রাইফেলের সাহায্যে পাঁচটি গ্রেনেডের সব কটি ছুঁড়ে মারেন। এতে শত্রুপক্ষের অন্তত ৩০ জন মারা যায় এবং তিনি শত্রুর পাল্টা হামলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। এরপর তিনি তার সেনাদলের অবস্থান পুনর্বিন্যাস করেন এবং শত্রুর অব্যর্থগুলি ও প্রচণ্ড হামলার মুখে তার অবস্থান ধরে রাখেন। তাকে অবস্থান ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হলে অত্যন্ত দক্ষতা ও ঠাণ্ডা মাথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব প্লাটুন প্রত্যাহার করেন, এ সময় প্রতিবার তিনি সবার পেছনে থাকতেন। যুদ্ধে জাপানিরা কমপক্ষে ৬০ জন মারা যায়। এরপর দিন জাপানিরা ছেড়ে যায় এলাকা যার কৃতিত্ব ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহর।

বিজয়ের জন্য অনেক মূল্য দিতে হয় আমাদের; আট জন মারা যায়, বাকিরা আহত হয়, কেউ সামান্য এবং কেউ মারাত্মক। তিনটি গুলি লাগে আমার। একটি গুলি আমার রসদবাহী থলে ভেদ করে উরুতে, দ্বিতীয়টি আমার কাঁধের ব্যাগ ছিঁড়ে ফেলে এবং তৃতীয়টি ছিঁড়ে ফেলে আমার বুটের তলা। আমার ক্ষতগুলো মারাত্মক ছিল না।

ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার্স একটু উঁচু জায়গায় থাকায় সেখানে থেকে লক্ষ্যস্থল দেখা যেত। লে. কর্নেল কার্গিল এবং ব্রিগেডিয়ার 'জাডি' ওয়ারেন যুদ্ধের অগ্রগতির পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন বাইনোকুলারের সাহায্য। টেকরি দখলের পর লে. কর্নেল কার্গিল নীরবতা ভেঙে আমাকে অভিনন্দন জানান আমার সৈন্যদের চমৎকার কৃতিত্বের জন্য। যুদ্ধের ফলাফলে খুব আনন্দিত হন ব্রিগেডিয়ার ওয়ারেন। আমাকে তৎক্ষণাৎ মিলেটারি ক্রস (এম সি) পদক দেয়া হয়। কোর কমান্ডার, টেলিফোনে অভিনন্দন জানান আমাকে। সরকারি নথি পরে পাঠান হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বার্মার যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। ১৪তম আর্মি কমান্ডার জেনারেল স্লিমকে নাইট এবং তার তিনজন সেনা কমান্ডার ও কিছু সিনিয়র অফিসারকে পুরস্কার দেয়া হয়। একই দিনে একজন ভারতীয় অফিসার ও আরো একজন ভারতীয় ভাইসরয় কমিশন্ড অফিসার (ভিসিও) কেও পুরস্কৃত করা হয়।

ভারতের ভাইসরয়ের কাছ থেকে একজন ভারতীয় অফিসারের যুদ্ধের জন্য পুরস্কার হিসেবে পদক প্রাপ্তি এক বিশাল সম্মানের ব্যাপার। ১৪তম আর্মি থেকে আমিই ছিলাম সেই ভারতীয় অফিসার যাকে এই সম্মান দেয়া হয় এবং যতদূর মনে

পড়ে সুবেদার মান বাহাদুর থাপা ভিসিওকেও মনোনীত করা হয়। ভারতের সবচেয়ে উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা স্কোয়াড্রন লিডার মেহের সিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অ্যাডমিরাল মাউন্টব্যাটেন পদকগুলো ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের কাছে হস্তান্তর করেন, তিনি নিজ হাতে এসব পদক পিন দিয়ে আমাদের বুকে এঁটে দেন।

* * *

এরপর, লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন জাভা পৌঁছলেন, তাকে ৫ম ভারতীয় ডিভিশন গার্ড অভ অনার প্রদান করে। এ গার্ড গভ অনারে নেতৃত্ব আমি দেই *ফৌজি আকবা*-এ সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালের ২৫ মে।

পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিনায়ক অ্যাডমিরাল মাউন্টব্যাটেন যখন নেদারল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিস সফরকালে বাটাভিয়া সফর করেন, সেখানে বিমান বন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান মেজর নিয়াজি, এম সি, গ্রাম–বালো খেল, ডাকঘর–মিয়ানওয়ালি, পাঞ্জাব। মেজর নিয়াজি রাজপুত রেজিমেন্টের ৪র্থ ব্যাটালিয়ন আয়োজিত গার্ড অভ অনারের কমান্ডার ছিলেন।

অ্যাডমিরাল মাউন্টব্যাটেন মেজরের প্রশংসা করেন তার চৌকস উপস্থিতির জন্য এবং যুদ্ধে তার বীরত্ব সম্পর্কে তিনি খোঁজ নেন। মেজর নিয়াজি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১১ বছর আগে, তিনি পশ্চিম মরুতে ৫ম ডিভিশনে দায়িত্ব পালন করেন, যতদিন না তাদেরকে বার্মা ফ্রন্টে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৪৩ সালে সামরিক রিপোর্টে তার কথা উল্লেখ করা হয় এবং কোহিমার জঙ্গলে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন ও নেতৃত্ব দানের জন্য তাকে মিলিটারি ক্রস প্রদান করা হয়। তিনি এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন–'ডি' কোম্পানির, যেটা ব্যাটালিয়নের দুটি মুসলিম কোম্পানির একটি।

মেজর নিয়াজি গত বছর সুরাবায়া পৌঁছান এবং এমন একটি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন যার ফলে এ শহর সশস্ত্র দস্যুমুক্ত হয়। এরপর তার ব্রিগেড বাটাভিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে থেকে তারা বান্দুং-এ শরণার্থীদের জন্য খাদ্য বোঝাই করা কনভয় পাহারা দিয়ে পৌঁছে দেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তন

বার্মা থেকে আমাদেরকে সিঙ্গাপুর আক্রমণের জন্য পাঠান হয়, কিন্তু এ আক্রমণ শুরু হবার আগে জাপানিরা আত্মসমর্পণ করে। ওখান থেকে আমাদের ইন্দোনেশিয়া পাঠান হয়। প্রায় তিন মাস ওখানে অবস্থান করি আমরা, তারপর ভারতে ফিরে যাই।

আমরা জাভা ত্যাগ করি ১৯৪৬ সালের ৩০ মে। জাকার্তায় জাহাজে চড়ে যাত্রা করি, নামি মাদ্রাজে। ৫ম ভারতীয় ডিভিশন ছিল রাঁচিতে। অধিকাংশ পদে রদবদল করা হয়। আমাদের নতুন কমান্ডিং অফিসার ছিলেন একজন বৃদ্ধ ইংরেজ, নাম বার্টন। ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন দক্ষিণ ভারতের ব্রিগেডিয়ার থোরাট। ডিভিশনাল

কমান্ডার ছিলেন জেনারেল রাসেল, তিনি পরিচিত ছিলেন রাসেল পাশা নামে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল র‍্যাংকেন ছিলেন ইস্টার্ন কমান্ড কমান্ডার।

অবিলম্বে আমি ট্যাকটিক্যাল কোর্স করার জন্য দেরাদুনের কাছে ক্লিমেন্ট টাউনে যাই। এ কোর্সে উর্ধ্বতন ব্রিটিশ ও ভারতীয় অফিসাররা যোগ দেন। আমাদের দুজন কিং'স কমিশন্ড অফিসার ছিলেন লে. কর্নেল মোহাম্মদ আফজাল জানজুয়া এবং মেজর আফজাল শেখ, যিনি পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল হয়েছিলেন। এ কোর্সে অনেক ভারতীয় কমিশন প্রাপ্ত অফিসারও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি এভারেস্ট গ্রেডের চেয়ে ভালো করি এবং আমাকে ইন্সট্রাক্টর হিসেবে ক্লিমেন্ট টাউন ট্যাকটিক্যাল স্কুলে নিয়োগ দেয়া হয়।

দেশ বিভাগের সময় আমি ক্লেমেন্ট টাউনে ইন্সট্রাকটর ছিলাম। যেসব ছাত্র এখানে কোর্স করছিলেন তাদের অনেকেই ছিলেন মুসলমান। সেখানে কর্মরত অনেক কেরানিও ছিলেন মুসলমান। কায়েদ-ই-আজম-এর প্রচেষ্টায় অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে রওনা হবার জন্য আমরা আমাদের জিনিসপত্র গোছাতে থাকি।

পাকিস্তানে আগমন

অগ্রবর্তীদল হিসেবে আমাকে পাকিস্তানে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। পালামপুর বিমানবন্দরে আমি বিমানে আরোহণ করি এবং অবতরণ করি লাহোরে। আমি রাওয়ালপিন্ডিতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে যাই। সেখানে আমি রিপোর্ট করি কর্নেল লাউদার (পরে মেজর জেনারেল)-এর কাছে যাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল স্টাফ কলেজের কমান্ড্যান্ট হিসেবে। তিনি আমাকে কোয়েটা যাবার নির্দেশ দেন যেখানে অন্য ইন্সট্রাক্টররাও যাচ্ছেন। আমাকে জানান হয় যে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াহিয়া খান (পরে জেনারেল এবং সি-ইন-সি) সেখানে রয়েছেন। আমি কর্নেল ইয়াহিয়ার কাছে স্টাফ কলেজকে কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ নামকরণ এবং এটাকে দুটি অংশে–স্টাফ ও ট্যাকটিক্যাল করার প্রস্তাব দিই। আমাকে ট্যাকটিক্যাল উইং এর কাজ চালাবার জন্য শ্রেণীকক্ষগুলোর অর্ধেকটা নিতে বলা হয়।

স্টাফ কলেজের লাইব্রেরি ছিল অবিভক্ত ভারতের সেরা লাইব্রেরি। অনেকে অন্যায়ভাবে অভিযোগ করেছেন যে, দেশ বিভাগের পর তারা এর মালিকানা নিয়ে নেয়; এটা আমি কী করেছিলাম তার সত্যি গল্প।

যখন আমি কোয়েটা পৌঁছলাম, সেখানে ইতোমধ্যে হিন্দু, শিখ ও ব্রিটিশ ছাত্র, স্টাফ ইনস্ট্রাক্টররা রয়েছে। মেজর লতিফ (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার লতিফ, যিনি রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন) এ কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন। তাকে লাইব্রেরির দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। লাইব্রেরিয়ান ছিলেন একজন ভারতীয় খ্রিস্টান যিনি লাইব্রেরির গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো লুকাতে শুরু করেছিলেন। লাইব্রেরিয়ান এবং লতিফের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। পরিস্থিতি খারাপের

দিকে গেলে লে. কর্নেল ইয়াহিয়া খান আমাকে এ লাইব্রেরির দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেন। আমি লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করি। কিন্তু তার আচরণ ছিল নোংরা। শীঘ্রই আমি উপলব্ধি করি যে অন্য কৌশল অবলম্বন করে লাইব্রেরির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তাই আমি ক্যাপ্টেন ইসহাককে বালুচ রেজিমেন্টাল সেন্টারে, যেটা কোয়েটাতে অবস্থিত, সেখানে যেতে বলি এবং সেখান থেকে এক সেকশন পদাতিক সৈন্য নিয়ে আসতে বলি। লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরি বন্ধ করতে গেলে আমি তাকে ঘুষি মারি এবং চাবি ছিনিয়ে নিই। ক্যাপ্টেন ইসহাককে আমি নির্দেশ দেই একজন সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েনের যাতে কেউ লাইব্রেরির তালা ভাঙতে না পারে। আমি অফিসারদের ফেরত দেয়া বইগুলো সংরক্ষণে একটি রুমের ব্যবস্থা করি যে পর্যন্ত না নতুন লাইব্রেরিয়ান দায়িত্ব গ্রহণ করে। যখন আমি লে. কর্নেল ইয়াহিয়া খানের কাছে রিপোর্ট পেশ করলাম, তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কিছুদিন অদৃশ্য থাকুন।' তাই করলাম আমি।

১৯৪৮ সালের শেষটা পর্যন্ত আমি কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজে নিয়োজিত ছিলাম। স্টাফ কলেজের পর্ব আমি শেষ করি ১৯৪৯ সালে এবং আমাকে পিএসসি (পাস্ড স্টাফ কলেজ) পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

কোয়েটা থেকে আমাকে কোহাটে অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলে জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড টু হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কর্নেল হালসে, যিনি ছিলেন স্টাফ কলেজের ট্যাকটিক্যাল উইং-এর কমান্ডিং অফিসার, তাকে অফিসার ট্রেনিং স্কুলের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

১৯৫১ সালে ডিএসও জেনারেল মোহাম্মদ আকবর খানের যোগসাজসে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র সংঘটিত হয়। এ সময় তাল–এ অবস্থানরত ২/১ পাঞ্জাব এর নেতৃত্বে ছিলেন লে. কর্নেল এন. এম. আবরার। ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন ক্যাপ্টেন খিজির। এ রকম অভিযোগ ছিল যে, আবরারের নেতৃত্বাধীন ২/১ পাঞ্জাব পিন্ডিতে পৌঁছে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে এবং সিনিয়র অফিসারদের গ্রেফতার করবে। কিন্তু তার বদলে আবরার ও খিজির গ্রেফতার হয়ে যান। কমান্ডিং অফিসার গ্রেফতার হওয়ায় ২/১ পাঞ্জাব নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। জেনারেল মোহাম্মদ আয়ুব খান, দ্য সি.-ইন-সি, ২/১ পাঞ্জাব -এর নেতৃত্ব দেয়ার জন্য একজন সৎ ও দক্ষ অফিসারকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। তার প্রথম কাজ হবে ২/১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে তদন্ত করা ও রিপোর্ট প্রদান করা। আমাকে ২/১ পাঞ্জাব-এর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে নির্বাচিত করা হয় ও নিয়োগ দেয়া হয়, যদিও আমি ১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কেউ ছিলাম না। আমি ছিলাম ৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এবং অনেকের চেয়ে জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদোন্নতি দিয়ে আমাকে এ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৫১ সালের এপ্রিলে আমি কমান্ড গ্রহণ করি।

পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর আমি ব্যাটালিয়নের কোনো দোষ দেখতে পেলাম না এবং আমি এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দাখিল করলাম। ব্যাটালিয়নকে লাহোরে স্থানান্তর করা হয় এবং প্রশিক্ষণ মৌসুমের পর এটিকে ১০ ডিভিশনের শ্রেষ্ঠ ব্যাটালিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ফিল্ড মার্শাল অচিন লেক আমাদেরকে পরিদর্শন করেন ১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কর্নেল কমান্ড্যান্ট হিসেবে। পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, ৬৬ (২/১ পাঞ্জাবের পুরান নাম)-এর অবস্থা খুব ভালো এবং যে কোনো বিচারে এটি শ্রেষ্ঠ ব্যাটালিয়ন হওয়ায় দাবি রাখে। আমি সত্যি এ ব্যাটালিয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমার কমান্ড ছিল ২৪ অক্টোবর ১৯৫৩ পর্যন্ত।

২/১ পাঞ্জাব থেকে আমাকে নিয়োগ দেয়া হয় কোয়েটার স্কুল অভ ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাকটিক্স-এ। আমি ক্লাস 'এ' ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে জুনিয়র লিডারস উইং-এর দায়িত্ব গ্রহণ করি। এ স্কুলে আমি দায়িত্বে থাকি ২৬ আগস্ট ১৯৫৬ পর্যন্ত, এরপর আমাকে নিয়োগ দেয়া হয় ৮ ডিভিশনে জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড হিসেবে। এটাও কোয়েটায় অবস্থিত। আমি ৮ ডিভিশনে থাকি ২০ জুন ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত। এরপর আবার রেজিমেন্টের কাজে ফিরে যাই। আমাকে ১/১৪ পাঞ্জাব (৫ পাঞ্জাব শেরডিলস) রেজিমেন্টে নিয়োগ দেয়া হয়, এটি পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় অবস্থিত। আমি ৮ ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং জেনারেল বখতিয়ার রানা, এম সি,-কে আমার ডিউটির দু' বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই আমার বদলির কারণ প্রসঙ্গে জানতে চাই। তিনি উত্তর দেন, 'আমি আমার ডিভিশনে তোমাকে নিয়োগ দেয়ার জন্য সামরিক সচিবকে অনুরোধ করেছিলাম। আমি খুব খুশি তোমার কাজ ও শৃঙ্খলায়। কিন্তু তোমার বর্তমান নিয়োগ হয়েছে কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল আইয়ুব খানের নির্দেশে। যেহেতু ১/১৪ (শেরডিলস) হলো চিফের নিজের ব্যাটালিয়ন, তাই তিনি সব সময় নিজে ১৪ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার নির্বাচন করেন।'

সুতরাং আমাকে আবার রেজিমেন্টাল কাজ পরিবর্তন করতে হয়। ৮ পাঞ্জাব থেকে ১ পাঞ্জাবে পরিবর্তিত হই এবং এরপর আমি ১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের হয়ে যাই।

১/১৪ পাঞ্জাব (শেরডিলস) ছিল মেজর জেনারেল ওমরাও খান, একজন দক্ষ জেনারেল-এর নেতৃত্বাধীন ১৪ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার্স ব্যাটালিয়ন। ঢাকায় অবস্থান কালে শেরডিলস অফিসারদের ভারসাম্য রক্ষা, সম্মান এবং সৈন্য বহনে সুনাম অর্জন করে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটি রাস্তা আমার নামে 'টাইগার রোড' নামকরণ করা হয়। এ নাম পরিবর্তন করা হয়নি। ক্যাপ্টেন গওহর আইয়ুব, জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পিকার, লে. আসিফ নেওয়াজ, পরে সি ও এ এস, এবং লে. আলম জান মাসুদ, পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সবাই ১/১৪ পাঞ্জাবে আমার নেতৃত্বে কাজ করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে আমার কর্তব্য সফলভাবে শেষ হবার পর আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে জাহাজে উঠি ১৯৫৭ সালের ১০ নভেম্বর। করাচি থেকে ১/১৪ পাঞ্জাবকে ট্রেনযোগে লাহরে নেয়া হয়। সেখানে আমরা ১০৬ তম ব্রিগেডের অন্তর্ভুক্ত হই যার নেতৃত্বে ছিলেন ১০ ডিভিশনের ব্রিগেডিয়ার ওয়াহিদ হায়দার এবং জেনারেল অফিসার কমান্ডিং হিসেবে মেজর জেনারেল আজম খান।

লাহোরে আসার পর থেকে আমরা সেনাবাহিনীর একটা নতুন ট্যাকটিক্যাল প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করি যেটা 'নিউ কনসেপ্ট' নামে পরিচিত। এটা ছিল কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল আইয়ুব খানের আইডিয়া। এ কনসেপ্টের মূল বিষয়বস্তু যাতে প্রত্যেক অফিসার বুঝতে পারে সেজন্য পেপারগুলো লিখতে হতো, আলোচনা করা হতো, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। এ কারণে প্রতিরক্ষা কৌশলের সব দিক তুলে ধরার জন্য ডেমোন্সট্রেশনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১০৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার গুল মওয়াজকে দেয়া হয় ডেমোন্সট্রেশনের দায়িত্ব। ১০৩ ব্রিগেডের অবস্থান লাহোর ক্যান্টনমেন্টে। মেজর জেনারেল (পরে জেনারেল) হামিদ ও তার স্টাফ অফিসার কর্নেল উমর (পরে মেজর জেনারেল) পেপারওয়ার্ক করছিলেন। এ সময়ে একজন পরামর্শ দিল যে যেহেতু লে. কর্নেল নিয়াজির যুদ্ধে বিরাট অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি একজন ইনস্ট্রাক্টরও ছিলেন। তাই ডেমোন্সট্রেশনের দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দেয়া হোক। সুতরাং আমার ব্যাটালিয়ন ১০৬ ব্রিগেড থেকে ১০৩ ব্রিগেডে স্থানান্তরিত হয়। আমার ওপর দায়িত্ব দেয়া হয় প্রতিরক্ষা কৌশলের ডেমোন্সট্রেশন প্রদানের–আমাদের নতুন কনসেপ্ট।

আমি টিলা ফিল্ড ফায়ারিং এলাকায় ট্যাকটিক্যাল কনসেপ্ট অনুযায়ী ব্যাটালিয়নকে বিভিন্ন পর্যায়ে মোতায়েন করি। কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এবং আমন্ত্রিত বিদেশি মিলিটারি অ্যাটাশে গণ-ডেমোন্সট্রেশন প্রত্যক্ষ করেন। ডেমোন্সট্রেশনে শেরডিলস-এর উঁচু মানের কর্মকাণ্ড দেখে মুগ্ধ হন জেনারেল আইয়ুব খান।

আমি ৫ পাঞ্জাব (শেরডিল)-এর নেতৃত্ব দেই ১০ জুন ১৯৬১ পর্যন্ত। এরপর আমাকে নিয়োগ দেয়া হয় ৫১ ব্রিগেডে, তার কমান্ডার হিসেবে। এ ব্রিগেডকে সিয়াটোর অধীনে লাওসে পাঠানোর জন্য মনোনীত করা হয়। তখন আমি ছিলাম একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকে পদোন্নতি লাভ করার মতো যথেষ্ট সিনিয়র নই। তবু ৫১ ব্রিগেড কমান্ড করার জন্য নির্বাচন করা হয় আমাকে। আমাকে রাতারাতি পদোন্নতি দেয়া হয়। লাওসে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা যাইনি। এর কারণ জানান হয়নি আমাদের।

করাচিতে ৫১ ব্রিগেড কমান্ডিং ছাড়াও আমাকে করাচি ও সিন্ধুর সামরিক প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিভিন্ন মহলের চাপ ও প্রলোভনের মুখে কাজ করতে হয়েছে আমাকে। আল্লাহর রহমতে আমি করাচি ও সিন্ধুকে ভালোভাবে এবং সুনামের সঙ্গে শাসন করি। আমাকে *সিতারা-ইন-খিদমত* পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

সংযুক্ত 'সি'

পত্র-৪৭৭ এর প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ এস. কে. সম্মামনা

ব্রিগেডিয়ার আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি, এইচ জে, এস কে, এম সি।

করাচি, হায়দ্রাবাদ, মিরপুর খাস ও বাহওয়ালপুর-এর সিভিল ডিভিশনগুলোর উঠতি ফসল ও ফলবাগান পঙ্গপালের উপদ্রবে ধ্বংস হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যদি একজন ব্যক্তিকে এসব রক্ষা কৃতিত্বের জন্য বাছাই করতে হয়, তাহলে তিনি হলেন ব্রিগেডিয়ার আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি, এম সি, কমান্ডার ৫১ ব্রিগেড। তাকে খুব সংক্ষিপ্ত নোটিশে পঙ্গপাল দমনের অভিযানের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। তার সম্পদের পরিমাণ ছিল সীমিত এবং এছাড়া তাকে বিভিন্ন ধরনের বেসামরিক সংস্থাও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। পঙ্গপাল নির্মূলে বিভিন্ন সংস্থার কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে সফল ব্রিগেডিয়ার নিয়াজি, এতে তার বিরাট দক্ষতা, কৌশল, সহিষ্ণুতা ও যোগ্যতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

প্রথম দিকে করাচি ও হায়দ্রাবাদের সিভিল ডিভিশন গুলোতে এ অভিযান সীমাবদ্ধ ছিল। পরে এ অভিযান বিস্তৃত হয় খায়েরপুর ও বাহাওয়ালপুরে। এতে প্রচণ্ড চাপ পড়ে তার সম্পদের ওপর। কিন্তু বিশাল মনোবল ও অটল বিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ায় তিনি এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠেন। এ কাজে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেন তার অধীনস্থ সৈন্য ও সম্পদ।

পুরো অভিযানে তার আচরণ ও কাজ সবাইকে-বিশেষভাবে বেসামরিক প্রশাসনকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং এতে সেনাবাহিনীর সম্মান বেড়েছে। এক মাসের বেশি দিনে প্রায় ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তার মুখ প্রফুল্ল ও সতেজ ছিল।

গোপন তথ্য

৫১ ব্রিগেড থেকে আমাকে কমান্ড্যান্ট হিসেবে স্কুল অভ ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাকটিকস-এ নিয়োগ দেয়া হয়। আমি সেখানে ১৬ নভেম্বর ১৯৬৩ থেকে ১২ মে ১৯৬৫ পর্যন্ত কর্মরত ছিলাম। সেখানে কঠোর পরিশ্রম করতাম এবং বিশ্রামের জন্য সময় পেতাম খুব কম। সৈন্যবিহীন পুরান ট্যাকটিক্যাল মহড়াগুলো আবার লেখা হয় এবং নতুন মহড়া প্রবর্তন করা হয়। আমি যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত একটি নমুনা মহড়া চালু করি, যেটা খুব প্রশংসিত হয় এবং সেনাবাহিনীর কিছু ধরন এ মহড়া প্রবর্তন করে। এছাড়া আমি সেনাবাহিনীকে রোটেটিং রাইফেল রেঞ্জ সিস্টেমও উপহার দেই। এ ব্যবস্থায় সময় ও জনশক্তি বেঁচে যায়। আমি ট্যাংক বিধ্বংসী কামান ও মাঝারি মেশিনগানের জন্য নতুন ট্রেঞ্চ খনন করার কৌশল উদ্ভাবন করি। সেনাবাহিনীতে, বিশেষ করে ৮ ও ১০ ডিভিশন প্রতিরক্ষা এলাকায় এখনো আমার উদ্ভাবিত ট্রেঞ্চ কার্যকর রয়েছে।

অধ্যায় ২

১৯৬৫ সালের যুদ্ধ

ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্তির মূলে রয়েছে ঘৃণা ও শত্রুতা। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের কারণ ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করার ব্যর্থতা। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং সব বিচ্ছেদ দূরীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যুদ্ধক্ষেত্রে।

স্কুল অভ ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাকটিকস, যেখানে আমি কমান্ড্যান্ট ছিলাম, সেটা বন্ধ হয়ে আসে। স্টুডেন্ট অফিসার এবং ইনস্ট্রাক্টরদের তাদের নিজ নিজ ইউনিট ও ব্যূহে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। ন্যূনতম কিছু কর্মচারী রয়ে যায় অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, স্টোর ও বাসস্থান দেখাশোনা করার জন্য। আমাকে ১৪ প্যারা ব্রিগেডের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়, যেটা ভাই ফাইরুতে অবস্থিত এবং লাহোর থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে। আমি সিগনাল কোরের ব্রিগেডিয়ার সুলেমানের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করি। মেজর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৭ম পদাতিক বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন লে. জেনারেল আলতাফ কাদিরের কাছ থেকে। অভিজ্ঞতা ও যুদ্ধ পরবর্তী কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে অফিসারদের বিভিন্ন ব্যূহ ও ইউনিটে নিয়োগ দেয়া হয়। যুদ্ধ শুরু হবার সাথে যে সব অফিসারকে যুদ্ধকালে সামরিক অভিযানে অক্ষম বলে বিবেচনা করা হয়, তাদেরকে বিভিন্ন ইউনিট ও ব্যূহের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে নেয়া হয়।

১৪ প্যারা ব্রিগেডের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর আমি সত্যিকারের যত্নের সঙ্গে আমার ব্রিগেডকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করি। আমার ব্রিগেড ছিল মেজর জেনারেল ইয়াহিয়ার নেতৃত্বাধীন ৭ ডিভিশনের অংশ।

এ সময়ে, কাশ্মিরে অপারেশন জিব্রাল্টার পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অপারেশন জিব্রাল্টার পরিচালনার নেতৃত্ব দেবার কথা বলা হয় ১২ ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল আখতার মালিককে। জেনারেল আখতারের অনুরোধে আমাকে রাওয়ালপিন্ডিতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে তলব করা হয়। সেখানে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয় মারিতে অবস্থিত ১২ ডিভিশনের হেডকোয়ার্টাসে রিপোর্ট করার। জেনারেল আখতারকে আমি ভালোভাবে চিনতাম, যখন আমি মেজর

হিসেবে কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের ট্যাকটিক্যাল উইং-এর ইন্সট্রাক্টর ছিলাম। ইয়াহিয়া খান ও আখতার মালিক দু'জনেই লেফটেন্যান্ট কর্নেল থাকাকালে স্টাফ উইং-এর ইন্সট্রাক্টর ছিলেন। ১০ ব্রেইথওয়েট রোডে এক বাড়িতে আমরা তিনমাস একত্রে বসবাস করেছি। আমাদের পরিবার আমাদের সঙ্গে না থাকায় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ৭ ডিভিশন থেকে আমি আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার্স ও এক ব্যাটালিয়ন সহ ১২ ডিভিশনে স্থানান্তরিত হই। এটা ছিল জিওসি ১২ ডিভিশনের বিশেষ অনুরোধ।

আমার ব্রিগেড মেজর ইমতিয়াজ (আর মেজর জেনারেল)-কে সঙ্গে নিয়ে আমি মারিতে ১২ ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার্সের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। জেনারেল আখতার আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি আমাকে মুজাফফরাবাদে ১নং সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলেন। তার চাম্ব-জুরিয়ান অপারেশনের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় তার অবর্তমানে আজাদ কাশ্মিরের রাজধানী মুজাফফরাবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো একজন বিশ্বস্ত অফিসারের প্রয়োজন ছিল। অবস্থান আশানুরূপ পরিবর্তন হওয়াতে ১২ ডিভিশন কমান্ডারের পক্ষে যে-কোনো সিদ্ধান্ত দ্রুত নেয়া হয়।

ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক দখলকৃত এলাকা সম্পর্কে তিনি মানচিত্রে ব্যাখ্যা করেন, এখানে ভারতীয়রা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। এখান থেকে মুজাফফরাবাদ দখলের জন্য অপারেশন পরিচালনা করা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। তিনি আমাকে পরদিন অপারেশন অঞ্চলে রওনা হবার নির্দেশ দেন। তিনি আমাকে আরো নির্দেশ দেন যে, কোনো অবস্থায় শত্রুরা যেন মুজাফফরাবাদের দিকে এগিয়ে আসতে না পারে। জেনারেল আখতার একই দিনে চাম্ব-এর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কর্নেল স্টাফ কর্নেল ইজাজ (পরে মেজর জেনারেল) –কে রেখে আসা হয় ১২ ডিভিশন অপরেশন রুম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

যখন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান, জেনারেল মুসা এবং তাদের স্টাফ অফিসাররা এসে পৌঁছেন, আমি তখনো ১২ ডিভিশন হেডকোয়ার্টার্সের অপারেশন রুমে ছিলাম। আখনুর দখলের পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তন করা হয়। এটা ছিল খুবই চমৎকার পরিকল্পনা, কিন্তু আলোচনার সময় ধরা পড়েছে এতে একটি ত্রুটি রয়েছে। অন্যান্য সেক্টরের নিরাপত্তার চিন্তা না করে এ পরিকল্পনা নেয়া হয়। শত্রুর আনুষঙ্গিক বিষয়, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সংশ্লিষ্টতা এবং সার্বিক পরিকল্পনা, বিশেষ করে শত্রুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করা হয়নি। আমি বললাম : 'যেহেতু আখনুর দখল করে নিলে জম্মু কাশ্মিরের গুরুত্বপূর্ণ পথ বিচ্ছিন্ন হবে, কিন্তু ভারত আমাদের মনোযোগ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে ধরুন লাহোরের বিরুদ্ধে, অথবা পাঞ্জাবের জন্য হুমকি হতে পারে এমন কাজের জন্য আমাদের ওপর মানসিক চাপ বৃদ্ধি করতে প্ররোচিত করবে না তো?' যা হোক, অপারেশন জিব্রাল্টার-এর সম্ভাব্য সাফল্যে সবাই এত বেশি উদ্বেলিত ছিল যে আমার কথা কেউ শোনেনি। সব

বিবেচনা স্রেফ বাতিল হয়ে যায়।

পরদিন আমি মুজাফফরাবাদে পৌঁছলাম এবং ১ আজাদ কাশ্মির ব্রিগেডের দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খিলজি তখন উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তার বিএম এবং ডিকিউ উপস্থিত ছিলেন। ১৪ প্যারা ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার্স ও তার একটি ব্যাটালিয়ন ১/১ পাঞ্জাব যার নেতৃত্বে ছিলেন লে. কর্নেল নসরুল্লাহ আমাদের সঙ্গে মুজাফফরাবাদে যোগ দেয়।

৫ পাঞ্জাব (শেরডিলস)-এর পাল্টা হামলা

আমি ৫ পাঞ্জাব (শেরডিলস)-এ পৌঁছলাম সকালে। কামানগুলো যখন গন্তব্যে নেয়া হচ্ছিল, আমি ব্যাটারি কমান্ডার মেজর জায়েদিকে সঙ্গে নিই, তিনি আমার কাছে কামান মোতায়েন ও কামানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলের ব্যাখ্যা দেন। লে. কর্নেল হাসান আমাকে সৈন্য মোতায়েন ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত স্থানের বর্ণনা দেন। ভারতীয়দের অবস্থান ছিল উঁচু ভূমিতে, আর ৫ পাঞ্জাবের অবস্থান ছিল তুলনামূলক নিচু জায়গায়। আমাদের অবস্থানের এক জায়গায় ঢালু একটা জায়গা ছিল যা সুবিধাজনক বলে মনে হয়, কারণ উঁচু অবস্থান থেকে শত্রুরা ঢালু বেয়ে নেমে এলে তারা আমাদের ছোট ছোট অস্ত্রের আওতায় এসে পড়বে। পেছনের অবস্থান থেকে আজাদ কাশ্মির ব্যাটালিয়নও শত্রুর ওপর মেশিনগানের গুলি চালাতে পারবে। দুটি ব্যাটালিয়ন পরস্পরকে সহায়তা করে যাচ্ছিল। এলাকায় একটি পাহাড় ছিল, যে কেউ এখান থেকে পাকিস্তানিদের তৎপরতা দেখতে পাবে। লে. কর্নেল হাসান আমাকে বললেন যে পাহাড়টি আগে আমাদের ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা ভারতীয়রা দখল করে নেয়। 'আপনি আসার একদিন আগে আমরা অবস্থানটি হারাই। এটা এখন দখল করে নিয়েছে দুটো ভারতীয় সেনাদল।'

আমি কর্নেল হাসানকে নির্দেশ দিই পরদিন পাল্টা হামলা চালিয়ে পাহাড়টি দখল করতে। যেহেতু ব্যাটারি কমান্ডার উপস্থিত ছিলেন, তাকে শত্রুর কয়েকটি লক্ষ্যস্থল দেখান হয়। পরদিন সকালে আকস্মিক হামলা চালিয়ে শেরডিল পাহাড়টি দখল করে। ভারতীয় সৈন্যদের বদলি নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল–পুরান সৈন্যদের সরিয়ে নতুন সৈন্য মোতায়েন করা হচ্ছিল। ৫ পাঞ্জাবের পাঁচজন আহত হন। নিহত হন এন-এম. নিয়াজি। সফল অভিযানের জন্য আমি ৫ পাঞ্জাবকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদেরকে নতুন এলাকার দায়িত্ব দিই।

আমি জেনারেল আখতারের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং পাল্টা হামলার সাফল্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করি। তিনি খুশি হন। আমাকে পরিস্থিতির প্রয়োজনে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেন। আমি ব্রিগেডের ব্যাটালিয়নগুলো পরিদর্শন করি এবং কিছু পরিবর্তন করি। এক জায়গায়, বিচ্ছিন্ন লড়াই বেঁধে যায়। সরাসরি অ্যান্টি ট্যাংক গান ফায়ার করে আমরা শত্রুর অবস্থান মুক্ত করি। অস্ত্রগুলো খুলে নেয়া হয় এবং জায়গা মতো বয়ে নিয়ে আবার পুনর্গঠন করা হয়।

এলাকাটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমি উড়ি দখলের সিদ্ধান্ত নিই। রাওয়ালপিন্ডির অস্ত্রাগার থেকে আমি দুটো মাউন্টেনগান পাই এবং এগুলো এমন এক আদর্শ জায়গায় স্থাপন করি যেখান থেকে উড়িতে গোলাবর্ষণ করা যায়। কিন্তু উড়িতে আক্রমণ চালানোর আগে আমাকে শিয়ালকোট যাবার নির্দেশ দেয়া হয়, যেখানে শত্রুদের হামলা শুরু হয়েছে। মেজর জেনারেল আবরার আমার ১৪ প্যারা ব্রিগেডকে তার অধীনে স্থানান্তর করার অনুরোধ জানান। আমি আজাদ কাশ্মির ত্যাগ করি, শিয়ালকোট সেক্টরে পৌঁছাই এবং জিওসি ও সাঁজোয়া ডিভিশনের কাছে রিপোর্ট করি। এভাবে ১২ ডিভিশন থেকে আমি ও সাঁজোয়া ডিভিশনে স্থানান্তরিত হই এবং জেনারেল আবরারের নেতৃত্বে বেদিয়ানা, চাবিন্দা ও জাফরওয়ালে যুদ্ধ করি। মেজর জেনারেল আখতার মালিকের অনুরোধে আমাকে ১২ ডিভিশনে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং মেজর জেনারেল অবরার হুসাইনের অনুরোধে আমাকে নেয়া হয় শিয়ালকোট সেক্টরে।

শিয়ালকোট সেক্টর

৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় আমি ডিউটির জন্য ৬ সাজোয়া ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল আবরার হুসাইন, এমবিই-এর কাছে রিপোর্ট করি। স্বাভাবিক আলাপ-আলোচনা এবং এক কাপ গরম চা পান করার পর মানচিত্রে তিনি আমাকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি রাখ বাবা বড় শাহ-এর ওপর জোরে চাপ দিয়ে বলেন যে দ্রুত এটা দখল করতে হবে।

রাখ বাবা বড় শাহ জায়গাটি ছিল গাছপালায় আচ্ছাদিত শত্রু ট্যাংক লুকিয়ে থাকার জন্য আদর্শ জায়গা। ট্যাংকগুলোতে রাতের বেলা পুনরায় জ্বালানি ভরে নেয়া হয় ও নতুন করে সরবরাহ করা হয়। এই জায়গাটা থেকে শত্রুকে বিতাড়ন করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জায়গাটা আমাদের অবস্থানের খুব কাছে। যেকোনো মূল্যে এটা দখল করতে হবে যেন এখান থেকে শত্রুরা পরবর্তী হামলা করতে না পারে।

আমাকে জানানো হয় যে বেদিয়ানা গ্রাম, যেটা শিয়ালকোট, পামরুর এবং নারোয়াল সংযোগ রাস্তার ওপর অবস্থিত, সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ গ্রামের পরের গ্রামগুলো রয়েছে ভারতীয়দের দখলে। তাদের প্রধান অবস্থান ছিল রাখ-এ। আমি ভূপালওয়ালায় যাই যেখানে আমার ব্রিগেড রয়েছে এবং অভিযানের জন্য আমি নির্দেশ দিই। পরদিন রাত দুটোর দিকে ব্যাটালিয়নগুলো তাদের নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছে। ব্যাটালিয়ন গুলো পরিদর্শনের পরে আমি ১/১ পাঞ্জাবকে এক ঘণ্টার নোটিশে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করি। বেদিয়ানা ও আশেপাশের এলাকা অনুসন্ধান করার জন্য আমি এক সেকশন সৈন্য নিয়ে রওনা দিই।

যখন আমি গ্রামে ঢুকলাম আমার ড্রাইভার আলম জান মাসুদ ও আমি দেখতে পাই যে এক ডজন ভারতীয় সৈন্য একটি ওয়ারলেস সেটের চারদিকে জড়ো হয়ে

বসে আছে। তারা মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা শুনছিল। থামলাম আমরা, জিপটা উল্টো দিকে নিয়ে বেদিয়ানা থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে একটি মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। এসকর্ট সেকশনকে নির্দেশ দেয়া হয় মন্দিরে ট্রাক থেকে নেমে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থান করার জন্য এবং ১/১ পাঞ্জাবের জন্য অপেক্ষা করার জন্য। যদি শত্রুরা এক প্লাটুন বা তার বেশি সৈন্য নিয়ে এসকর্টের ওপর হামলা চালায়, তাহলে তারা অবস্থান ত্যাগ করে নুল্লাহর ভেতর দিয়ে এসে মন্দিরে আমার সঙ্গে যোগ দেবে।

এক ঘণ্টা পর ১/১ পাঞ্জাব-এর আলফা কোম্পানি মন্দিরে এসে পৌঁছাল। তাদের প্লাটুনকে ইতোমধ্যে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থান গ্রহণকারী এসকর্ট সেকশনের সঙ্গে যোগ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়। কয়েক মিনিট পর গোলাগুলি শুরু হয়, তারপর পুরোপুরি থেমে যায়। কোম্পানি কমান্ডার মেজর জামান কায়ানিকে সামনে পাঠান হয় সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। তিনি ফিরে আসেন প্রায় ৩০ মিনিট পর। তিনি জানান যে ভারতীয়রা এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে হামলা চালিয়েছে। হামলা প্রতিহত করা হয়েছে। শত্রুরা দ্রুত পালিয়ে গেছে গ্রামের দিকে। কোম্পানি কমান্ডার বেদিয়ানা গ্রামের চারদিকে তার কোম্পানি মোতায়েন করেছেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও খনন কাজ শুরু হয়। আমার এসকর্ট তখনো এসে পৌঁছেনি। এর মধ্যে লে. কর্নেল আমির গুলিস্তান জানজুয়া (পরে ব্রিগেডিয়ার এবং গভর্নর, এন ডব্লিউ এফ পি) , সিও গাইডস ক্যাভারলি এবং তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর ফজলে হক (পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং গভর্নর, এন ডব্লিউ এফ পি) একটি জিপে আরোহণ করেন। জানজুয়া আমাকে বলেন যে ১৯ ল্যান্সার গ্রামের অপর প্রান্তের এলাকা শত্রু মুক্ত করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার রেজিমেন্ট, গাইড ক্যাভারলি তাদেরকে সাহায্য করবে যদি ভারতীয় সাজোয়া বাহিনী হামলা চালায়। এ সময়ে ট্যাংক ফায়ার শুরু হয় এবং ১৯ ল্যান্সার গাইড ক্যাভারলির কয়েকটা ট্যাংক ধ্বংস করে। আমি জেনারেল আবরারকে অবহিত করি যে বেদিয়ানা গ্রাম আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ১৪ প্যারা ব্রিগেড সৈন্যরা এ গ্রাম থেকে ভারতীয়দের তাড়িয়ে দিয়েছে। সে কারণে ১৯ ল্যান্সারের আক্রমণ থামাতে হবে। এলাকাটি ১/১ পাঞ্জাবের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে পরবর্তী আক্রমণ স্থগিত রাখা হয়।

রাখ বাবা বড় শাহ-এ আক্রমণ

১/১ পাঞ্জাবের বাকি সৈনিকরা এসে পৌঁছাল। এই ব্যাটালিয়নকে বেদিয়ানা ও মন্দিরে মোতায়েন করা হয়। লে. কর্নেল নসরুল্লাহ, সিওকে বলা হয় এলাকায় টহল দিতে। রাখ-এ আক্রমণের এইচ আওয়ার পরদিন সকাল ৯টার আগে নয়। এ সময়টাকে নির্ধারণ করা হয় শত্রু ট্যাংকগুলোকে তাদের যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থানে এগিয়ে আসতে দেবার জন্য। কামানের লক্ষ্য নির্ধারণ ও একটি কার্যকর আর্টিলারি ফায়ার সাপোর্ট পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য আর্টিলারির লে. কর্নেল আতা মুহাম্মদ (পরে ব্রিগেডিয়ার) নসরুল্লাহর সঙ্গে অবস্থান করেন। পরদিন ভোরে, আমি সাড়ে ৬টার

দিকে এলাকায় পৌঁছাই। লে. কর্নেল নসরুল্লাহ ও লে. কর্নেল আতা মুহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেদিয়ানার অবজারভেশন পোস্টে যাই। আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, বামপার্শ্ব থেকে দুটো কোম্পানি আক্রমণ চালাবে। নসরুল্লাহকে আমি নির্দেশ দিলাম দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে নুল্লাহর মধ্য দিয়ে তার তৃতীয় কোম্পানি নিয়ে অগ্রসর হবার। নুল্লাহতে অনেক ঝোপঝাড় ও বাঁক ছিল। এটা ছিল নিজেদের আড়াল করা ও শত্রুর মনোযোগ বিভক্ত করার মতো জায়গা। মনে হবে দুদিক দিয়েই তারা আক্রান্ত হচ্ছে। সকাল ৯টায় এইচ আওয়ার নির্ধারণ করা হয়।

১/১ পাঞ্জাবের দুটো কোম্পানি তাদের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর লালখানের নেতৃত্বে সূর্যোদয়ের আগে এগিয়ে যায় তাদের ফরমিং আপ প্লেস (এফ ইউ পি)-এর দিকে, সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত তাদের অবস্থান টের পাওয়া যায় নি। ব্রিগেডের তিনটি ব্যাটালিয়নের মর্টার প্লাটুন কর্নেল আতার নেতৃত্বে মধ্যভাগে অবস্থান নেয়। তার সঙ্গে ছিল একটি সংযুক্ত ফিল্ড রেজিমেন্ট। দক্ষিণ পার্শ্বে দুটো ব্যাটালিয়নের ষোলটি ট্যাংক বিধ্বংসী কামানের সমন্বয়ে একটি অ্যান্টি-ট্যাংক স্ক্রিন তৈরি করা হয়। অ্যান্টি ট্যাংক স্ক্রিন স্থাপন করা হয় মেজর মেহতাব-এর নেতৃত্বে, যিনি আর্টিলারির আরেকজন সুদক্ষ অফিসার ছিলেন। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে শত্রু ট্যাংকগুলো এগিয়ে এলে সেগুলো ধরাশায়ী হয় মেজর মেহতাবের অস্ত্রের কাছে। মর্টার ও আর্টিলারির গোলাবর্ষণ ছিল চমৎকার এবং এতে রাখ-এর ঘাসে আগুন ধরে যায়। ১/১ পাঞ্জাব আক্রমণে অংশগ্রহণ করার আগে টার্গেট যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১/১ পাঞ্জাবের দুটি কোম্পানি এফ ইউ পি থেকে রণাঙ্গনে প্রবেশ করার সময় কর্নেল আতা ও আমি দেখতে পেলাম তিনটি শত্রু ট্যাংক প্রায় ৮০০ গজ দূরে বাম পার্শ্বে এগিয়ে আসছে। বামপার্শ্ব থেকে গোলাবর্ষণ করলে আক্রমণকারী সেনাদলের ওপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলতে পারত। বামপার্শ্বে অবস্থানরত ১/১ পাঞ্জাবের চারটি ট্যাংক বিধ্বংসী কামান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি কারণ শত্রু ট্যাংকগুলো একটা ডোবায় লুকিয়ে পড়ে।

লে. কর্নেল আতা ওয়ারলেসে ১৫ ডিভিশনের কমান্ডার আর্টিলারির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আর্টিলারি ফায়ারের জন্য তাদের মাঝারি রেজিমেন্ট সহ সাহায্য চান। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ১৫ ডিভিশন আর্টিলারি শত্রুর কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে গোলাবর্ষণ শুরু করে। এ গোলাবর্ষণে শত্রুর একটি ট্যাংকে আগুন ধরে যায় এবং অন্য দুটি ট্যাংক পালিয়ে যায়।

আমাদের পদাতিক বাহিনীকে রণাঙ্গনে যেতে বলা হয় আবার আক্রমণ করার জন্য। তাদের আক্রমণ সফল হয়। শত্রুর গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও ক্ষতির পরিমাণ ছিল সামান্য। শত্রুরা অবস্থান ছেড়ে চলে যায়, ওটা দখল করে নেয় ১/১ পাঞ্জাবের দুটো কোম্পানি। নুল্লাহ থেকে অগ্রসরমান কোম্পানি তাদের সম্মুখ ভাগের শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করার পর এ দুটো কোম্পানির সঙ্গে যোগ দেয় এবং রাখ-এর ভেতরে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার তার চতুর্থ কোম্পানি ও ব্যাটালিয়ন হেড

কোয়ার্টার্সকে সামনের দিকে নিয়ে আসেন। সদ্য দখলকৃত এলাকা রক্ষায় অ্যান্টি ট্যাংক স্ক্রিনকেও এগিয়ে আনা হয়। নসরুল্লাহকে বলা হয় শত্রুদের পরিত্যক্ত অবস্থান ধ্বংস করার জন্য। সন্ধ্যার মধ্যে রাখ বাবা বড় শাহ দখল সম্পন্ন হয় এবং এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেয় ১/১ পাঞ্জাব।

আলহার-এ আক্রমণ

একদিন বিশ্রামের পর আমি আলহার গ্রামে আক্রমণের জন্য জিওসির অনুমতি চাইলাম। ১/১ পাঞ্জাব রাখ বাবা বড় শাহে অবস্থান করছিল। তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ সম্প্রসারিত করা হয়েছিল রেল লাইনের ওপারে একশ গজ সামনে। এটা ছিল একটি চমৎকার প্রতিরক্ষা বিন্যাস, কিন্তু তাদের সম্মুখ ও দক্ষিণপার্শ্ব উন্মোচিত হয়ে পড়ে। অল্প কয়েকটা মাইন ও অল্প কয়েকটা ট্যাংক বিধ্বংসী কামানের সাহায্যে তাদের পক্ষে শত্রুর সাঁজোয়া ও পদাতিক হামলা প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। তখন পর্যন্ত এ প্রচণ্ড লড়াইয়ে আমাদের সাঁজোয়া বহর ধ্বংস করার জন্য শত্রুপক্ষ তাদের সাঁজোয়া বাহিনী ব্যবহার করছিল। আমাদের সাঁজোয়া বহর ধ্বংস করার জন্য ভারতীয়দের এ কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় তারা সাঁজোয়া বাহিনীর সমর্থন নিয়ে পদাতিক হামলা শুরু করে। ১/১ পাঞ্জাবের অবস্থানে শত্রুর হামলার আশংকা ছিল। তাই প্রতিরক্ষা ব্রিগেড চালিয়ে যাবার জন্য ও তার অখণ্ডতা ধরে রাখার জন্য আমাদের জন্য আলহার গ্রাম দখল করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ গ্রামটির অবস্থান ছিল রাখ বাবা বড় শাহ থেকে প্রায় বারশো গজ দক্ষিণে।

সাঁজোয়া বাহিনীর সাহায্য ছাড়া এই সুরক্ষিত জায়গাটা দখল করা ছিল একটি দুঃসাধ্য কাজ, এতে প্রচুর প্রাণহানি ঘটতে পারত। মর্টার ও আর্টিলারির তীব্র গোলাবর্ষণে একটি সুরক্ষিত এলাকা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রচণ্ড আঘাত, ভবন ধ্বংস ও প্রতিপক্ষের অবস্থান তছনছ করার প্রয়োজন হয়। পদাতিক হামলা শুরুর আগে এ ধরনের কাজ অপরিহার্য। কর্নেল আতার সঙ্গে ফায়ার সাপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ হামলার জন্য দুটো ব্রিগেড মর্টার প্লাটুন ও দুটো আর্টিলারি রেজিমেন্ট পাওয়া যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্য রেলওয়ে স্টেশন ও তার পাকা ভবন গুলোতে হামলা চালানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

আমি লে. কর্নেল ইলাম দোস্ত, সিও বেলুচ ব্যাটালিয়ন-এর সামনে আমার পরিকল্পনা তুলে ধরি। এইচ আওয়ার নির্ধারণ করা হয় রাত ১ টায়। তাদের সাথে আক্রমণকারী কোম্পানির আর্টিলারি অফিসাররা ছিল। হামলা শুরু হয় এবং আর্টিলারি ফায়ার শুরু হয় এইচ মাইনাস ৫ থেকে এইচ প্লাস ৪-এ। রেলওয়ে স্টেশনের ওপর ফায়ার করে ফিল্ড আর্টিলারি এবং আলহারে ফায়ার করে মর্টার প্লাটুন। এইচ থেকে এইচ প্লাস হতে মর্টারগুলো রেলওয়ে স্টেশনে স্থানান্তর করা হয় এবং এইচ প্লাস ২ থেকে এইচ প্লাস ৪-এ আর্টিলারি ও মর্টারের সাহায্যে সরাসরি আলহারে আঘাত হানা হয়। দুটো অবস্থানই দখল করা হয়। পনেরটি মৃতদেহ

রেখে পালিয়ে যায় শত্রুরা। আমাদের হতাহত হয় প্রায় বার জন। আলহার দখলে আসায় ব্রিগেডের প্রতিরক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেখানে ব্রিগেডের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমঝোতামূলক সমর্থন, গভীরতা ও ধারাবাহিকতা ছিল। সৈন্যদের চমৎকার নৈপুণ্যের জন্য কমান্ডিং অফিসারকে অভিনন্দন জানানোর পর ডিভিশন হেড কোয়ার্টার্সকে গ্রাম দখলের খবর জানালাম। লে. কর্নেল ইলাম দোস্তকে *ইমতিয়াজ-ই-সনদ* পুরস্কার দেয়া হয়।

জাফরওয়ালে অভিযান

যুদ্ধের উত্তাপ চরমে পৌঁছে। আলহার দখলের পরদিন জেনারেল আবরার আমাকে ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্সে ডেকে পাঠান। তিনি আমাকে রাখ বাবা বড় শাহে ১/১ পাঞ্জাব রেখে ব্রিগেডের অপর দুটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে জাফরওয়াল যেতে বলেন। জাফরওয়ালের অবস্থান আমাদের বর্তমান অবস্থান সড়কপথে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। সোজা পথে এই দূরত্ব খুব কম। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতীয়রা জাফরওয়াল অক্ষে তাদের সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে। এ তৎপরতায় কেবল আমাদের ডিভিশনের দক্ষিণ পার্শ্বই উন্মোচিত হবে না, উপরন্তু গুজরানওয়ালা–লাহোর সড়কেও ভারতীয় সেনা হামলার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাবে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর হামলা প্রতিহত করতে জাফরওয়াল দখল করা জরুরি হয়ে ওঠে।

দুটো ব্যাটালিয়নের অভিযানের সময় নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের পর আমি প্রায় ৩টার সময় রেকি গ্রুপ নিয়ে জাফরওয়ালের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মেজর (পরে ব্রিগেডিয়ার) মাহমুদ, সবার কাছে টনি মাহমুদ নামে পরিচিত, তার অধীনস্থ ৪ এফএফ-এর একটি সেকশনসহ এসকর্ট হিসেবে আমার সঙ্গী হন। আমরা জাফরওয়ালে পৌঁছলাম রাতে। তখনো শহরে কিছু বেসামরিক লোকজন ছিল। আমি একটি হাইস্কুলে আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করি এবং স্থানীয় একটি রেকি করি। ৪ এফ এফ, যেটা আমাকে অনুসরণ করছিল, তাকে মোতায়ন করা হয় জাফরওয়ালের চারদিকে। পরদিন ভোরে এক কাপ চা পান করার পর আমি এলাকাটা অনুসন্ধান করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম এবং দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করার জন্য জায়গা খুঁজে বের করলাম। দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন একটি অস্থায়ী অবস্থানে রাত কাটায়। মেজর ইমতিয়াজ আমার সঙ্গে ছিলেন।

জাফরওয়াল ছিল প্রায় এক হাজার গজ প্রশস্ত এক শুষ্ক নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর অপর তীরে ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ গাছ ও লম্বা ঘাস। এগুলোর উপস্থিতি প্রতিরক্ষার জন্য ভালো। অবস্থান গ্রহণের জন্য দুটি শক্ত জায়গা বাছাই করা হয়। একটি জাফরওয়ালে, আরেকটি নদীর অন্য ধারে। এটা শত্রু বাহিনীকে দুভাগে ভাগ করবে। দুটি অবস্থান দখল করা ছাড়া শত্রুর পক্ষে এগিয়ে আসা সম্ভব নয়। সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের কাছে এ এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়। তাকে নদীর অন্যপারে

তার ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করার নির্দেশ দেয়া হয়।

ব্যাটালিয়ন রওনা হবার আগে মেজর টনি মাহমুদ আমাকে জানান যে নদীর অপর পারে শত্রুর ট্যাংকে চলাচল করতে দেখা গেছে। তাদের সংখ্যা প্রায় এক স্কোয়াড্রন। ওরা এত কাছে এসে পড়ায় মনে হচ্ছিল ওরা জাফরওয়ালে আমাদের উপস্থিতি টের পায়নি।

আমি জেনারেল আবরারকে আমাদের এলাকায় সামরিক ট্যাংক চলাচল সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি আমাকে বললেন যে শত্রুরা চাবিন্দা এলাকায় প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করেছে, সেখানে ভয়াবহ ট্যাংক যুদ্ধ চলছে। পদাতিক বাহিনী গোপনে তাদেরকে অনুসরণ করছে। তিনি বলেন যে জাফরওয়াল এলাকার ট্যাংকগুলো উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে। এগুলোকে থামানো নিশ্চিত করতে হবে যাতে তারা সেক্টরে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে না পারে।

আমি মেজর টনিকে বললাম আমাদের বাম পার্শ্ব রক্ষায় মোতায়েনকৃত ট্যাংক বিধ্বংসী কামানের দায়িত্ব নিতে এবং শত্রু ট্যাংকগুলোকে মোকাবিলা করতে। তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। পনের মিনিট পরে ট্যাংক বিধ্বংসী কামানের গর্জন শোনা যায়। শত্রুকে মোকাবিলা করতে আরো ট্যাংক বিধ্বংসী কামান মোতায়েন করা হয়। টনির কাছে একটি পদাতিক রাইফেল কোম্পানি ও দুটো এমজি পাঠানো হয় তার প্রতিরক্ষা ও গোলাশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। টনির দক্ষ বাহিনীর ট্যাংক বিধ্বংসী গোলাবর্ষণে শত্রু ট্যাংকগুলো পিছু হটে। এক ঘণ্টা পর আমি আবার জেনারেল আবরারের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি আমাকে বললেন যে তারা শত্রুপক্ষের একটি বার্তা মনিটর করেছেন যাতে বলা হয়েছে জাফরওয়ালে তাদের রেজিমেন্ট আক্রান্ত হয়েছে। তিনি সৈন্যদের কর্মতৎপরতায় সন্তুষ্ট এবং আমাকে বললেন জাফরওয়ালের প্রতিরক্ষা আরো সংহত করতে। দুটো ব্যাটালিয়নকে সতর্ক রাখা হয় শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায়। কিন্তু কোনো কিছু না ঘটায় তাদেরকে সরিয়ে আনা হয়। স্ক্রিন ও টহলদলকে সামনে পাঠান হয় তথ্য সংগ্রহের জন্য।

বেদিয়ানায় প্রত্যাবর্তন

প্রায় সাড়ে ৪টার দিকে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয় আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার্স ও দুটো ব্যাটালিয়ানকে বেদিয়ানা এলাকার মূল অবস্থানে সরিয়ে নিতে। আশঙ্কা করা হচ্ছিল শত্রুরা এ এলাকায় রাতে হামলা চালাবে। ডিভিশনাল কমান্ডারের কাছে রিজার্ভ সৈন্য ছিল না। তাই প্রথম লাইন প্রতিরক্ষা ভেঙে শত্রুরা সামনের দিকে এগিয়ে গেলে তা প্রতিহত করা কঠিন বলে বিবেচিত হয়। ১৪ প্যারা ব্রিগেডকে নির্দেশ দেয়া হয় বেদিয়ানায় এগিয়ে যাবার। জাফরওয়ালের অবস্থান তুলে দেয়া হয় রেকি দলের সদস্য ও সহায়তা দানকারী ব্যাটালিয়নের হাতে।

আমাদের জন্য প্রাপ্ত যানবাহনে উঠে আমরা দ্রুত রওনা হলাম এবং মূল অবস্থানে পৌঁছলাম। আমি রিপোর্ট করলাম জেনারেল আবরারের কাছে। তিনি ১৪

প্যারা ব্রিগেডকে চেয়ে ২৪ ব্রিগেডকে অব্যাহতি দিতে চাইলেন, কিন্তু ২৪ ব্রিগেড প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল তাই পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। আমি ২৪ ব্রিগেডের পেছনে ১৪ প্যারা ব্রিগেডকে মোতায়েন করার পরামর্শ দিলাম। ডিভিশনাল কমান্ডার এতে রাজি হন। ব্যাটালিয়ন গুলো যথাযথভাবে মোতায়েন করা হয়। শত্রুদের আক্রমণ কোনো উন্নতি করতে পারেনি এবং তারা ক্রমে নিঃশেষিত হয়ে যায়। শত্রুদের ট্যাংক ও পদাতিক বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আক্রমণ ব্যর্থ হবার পর শত্রুরা চলে যায় আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে।

জাফরওয়ালের যুদ্ধ

এক রাত সুন্দরভাবে কাটানোর পর সন্ধ্যায় আমাকে আবার ডেকে পাঠান জেনারেল আবরার। তিনি আমাকে বললেন, 'আমার আশঙ্কা আপনাকে আবার জাফরওয়াল দখল করতে হবে। আমি এই অক্ষরেখা সম্পর্কে এখনো শঙ্কিত। এটা দুর্বলভাবে ধরে রাখা যাবে না। রাল এবং আলহারে দুটো ব্যাটালিয়ন রেখে তৃতীয় ব্যাটালিয়ন নিয়ে জাফরওয়ালে রওনা হন।' তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন আমি এক ব্যাটালিয়ন নিয়ে জাফরওয়াল দখল করতে পারব কিনা। 'হ্যাঁ, এটা সম্ভব। এটা প্রচুর ঘরবাড়ি অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় গোলাবর্ষণের জন্য ভালো ক্ষেত্র,' তাকে বললাম আমি, এবং অনুরোধ করলাম সাজোয়া ও গোলন্দাজ সমর্থন দেবার জন্য।

তার আশির্বাদ ও সাজোয়াবাহিনীর সমর্থনের আশ্বাস পেয়ে আমি জাফরওয়ালের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। ৪-এফএফ-কে অবিলম্বে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। এটা ছিল সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শত্রুর আগে সেখানে পৌঁছান এক প্রতিযোগিতা। কয়েকদিন আগে আমরা জাফরওয়ালের যে স্কুলে অবস্থান নিয়েছিলাম সেই একই স্কুলে আমি অবস্থান নিই। ৪-এফএফ এসে পৌঁছে যায় এবং এটাকে জাফরওয়াল গ্রামে মোতায়েন করা হয়। ৪-এফএফ আগেও এখানে এসেছিল। তাই এলাকাটি চিনতে তাদের কষ্ট হয় নি। মেজর হাশেম খানের নেতৃত্বে ২২ ক্যাভালরির এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ও ফিল্ড রেজিমেন্টের একটি ব্যাটারি আমার অধীনে দেয়া হয়। ঠিক করা হয় ট্যাংকের অবস্থান। আর্টিলারির গোলাবর্ষণের জন্যও টার্গেট নির্বাচন করা হয়। আমি ভোর চারটায় বিগ্রেড হেড কোয়ার্টার্সে ফিরে এলাম। ঘুমাতে চলে গেলাম এবং ব্যাটমানকে বললাম বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া আমাকে না জাগাতে।

সকাল ৬টায় আমার বিগ্রেড মেজর, মেজর ইমতিয়াজ জেগে ওঠেন এবং আমাকে জানান যে, ৪-এফএফ শত্রুর গোলাবর্ষণের আওতায় এবং আক্রান্ত হওয়ার পথে রয়েছে। কমান্ডিং অফিসার ভীত হয়ে পড়লেন। আমি ৪-এফএফ-এর কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল লতিফের সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি আমাকে জানালেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী তার বাহিনীকে ঘেরাও করে ফেলেছে। আমি তাকে বললাম

যে, জাফরওয়ালে প্রচুর পাকা বাড়িঘর রয়েছে এবং জায়গাটি উঁচু, তাই এখানে খুব ভালোভাবে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেয়া সম্ভব এবং এখান থেকে শত্রুর ওপর দক্ষতার সঙ্গে গোলাবর্ষণও সহজতর।

আবার পনেরো মিনিট পর তিনি আমাকে ফোন করলেন এবং বললেন যে, তারা সবাই মারা পড়বে। আমি তার এ ভীতি দেখে হতাশ হলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, তার এ ধরনের ভীরু মানসিকতার প্রভাবে তার অধীনস্থ অফিসার ও সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়বে। তখন আমি তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকে ডাকতে বললাম। তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ছিলেন একজন পাঠান। নাম মেজর মোহাম্মদ হায়াত। এবং তিনি এ ব্যাটালিয়নে নতুন যোগ দিয়েছেন। আমি মেজর হায়াতকে বললাম, 'তোমার কমান্ডিং অফিসার ভেঙে পড়েছেন। তুমি কি দায়িত্ব গ্রহণ এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে?' জবাবে তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। বললেন, 'ইনশাল্লাহ, আমরা শত্রুকে পিছু হটিয়ে দেব।' আমি লে. কর্নেল লতিফকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিই। তিনি ফিরে আসতে চাইলেন কিন্তু আমি তাকে ফিরে আসার অনুমতি দিলাম না। আমি তাকে বললাম ট্রেঞ্চে বসে থাকতে এবং সৈন্যদের সামনে না যেতে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর মেজর হায়াত আমাকে ফোন করলেন। তিনি আমাকে বললেন যে, শত্রুর হামলা প্রতিহত করা হয়েছে। শত্রুরা এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক ও দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে হামলা চালায়। দুটি ট্যাংক ঘায়েল হয়। মেজর হায়াত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে আমার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আমি তাকে শত্রুদের অনুসরণ করার অনুমতি দিলাম। তবে তাকে সতর্ক করে দিলাম শত্রুর ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য।

মাত্র একজন ব্যক্তি পরিস্থিতি বদলে দেন। মেজর হায়াতের সাহস ও দৃঢ়তায় তার সৈন্যরা অনুপ্রাণিত হয়। এটা সত্য যে যুদ্ধ জয়ে বহু লোক নয়, একজনই যথেষ্ট। বীরত্বের জন্য মেজর হায়াতকে *সিতারা-ই-জুরাত* পদকে ভূষিত করা হয়। ভারি কামানের কামান্ডার মেজর দিলওয়ার ভাট্টি শত্রুর ট্যাংকগুলোর প্রতি আতংক সৃষ্টি করেন। তাকেও *সিতারা-ই-জুরাত* পুরস্কার দেয়া হয়। ফিল্ড ব্যাটারি কমান্ডার মেজর হাশেমের আওতাধীন কামানের ওপর সার্বক্ষণিক গোলাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। আমার যতদূর মনে পড়ে মেজর হাশেমকে *সিতারা-ই-সনদে* ভূষিত করা হয়েছিল। ট্যাংক বহরের স্কোয়াড্রন কমান্ডার ও তার দুজন সৈন্য পালিয়ে যায়। তবে একজন সৈন্য ফিরে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। যুদ্ধ থেমে যাবার পর এ স্কোয়াড্রন কমান্ডারের কোর্ট মার্শালে বিচার হয়।

৩/১৪ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানি আমার সঙ্গে ছিল এবং এ কোম্পানিকে জাফরওয়ালে ৪-এফএফ-এর সঙ্গে যোগদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। আমি তাদের সঙ্গে রওনা হলাম। অফিসার ও জওয়ানদের মনোবল ছিল খুবই দৃঢ়। তাদের সঙ্গে এক কাপ চা পানের পর আমি আমার ব্রিগেড সদর দপ্তরের উদ্দেশে

যাত্রা করলাম। লে. কর্নেল লতিফকে ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করতে বলা হয়, সেখান থেকে তাকে পাঠানো হয় তার রেজিমেন্টাল সেন্টারে।

যুদ্ধ স্থিত হয়ে এল। ফ্রন্ট স্থিতিশীল। ভারতীয় সেনাবাহিনী কোণঠাসা অবস্থায়। ব্রিগেডিয়ার রিয়াজুল করিমকে ব্রিগেডিয়ার ইফেন্দির স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ডিভিশনের অবস্থা তখন অত্যন্ত সংহত। এর সবকিছুই জেনারেল আবরারের দক্ষতা, ব্যক্তিগত স্পর্শ ও সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের কারণে হয়।

আমি হারানো এলাকা পুনরুদ্ধারে ভারতীয়দের ওপর হামলা করার জন্য জেনারেল আবরারের কাছে প্রস্তাব করি। এ সময় ভারতীয়দের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। রণাঙ্গনে তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তখন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো অবস্থা তাদের ছিল না। পরদিন আমরা রওনা হলাম। আমি বিস্তারিতভাবে আক্রমণ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলাম। স্থির করা হয় যে, বাম পাশ থেকে আমার ব্যক্তিগত কমান্ডে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য ওয়াদিনওয়ালা গ্রামে হামলা চালাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি ট্যাংক রেজিমেন্ট আমার সঙ্গে যোগ দেবে। তৃতীয় ব্যাটালিয়নকে অগ্রবর্তী হামলার জন্য প্রস্তুত রাখা হবে। মূল লড়াই করবে দুটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন। তাদেরকে সহায়তা দেবে একটি ট্যাংক রেজিমেন্ট। জেনারেল আবরার প্রতিশ্রুতি দেন যে, আমরা ওয়াদিনওয়ালা থেকে দু মাইল দূরে একটি গ্রামে পৌঁছালে একটি ট্যাংক রেজিমেন্টের সহায়তা নিয়ে সাজোয়া বাহিনী আমাদের দক্ষিণ পাশে শত্রুর ওপর হামলা চালাবে।

হেড কোয়ার্টার্স জেনারেল আবরার অনুমোদিত এ পরিকল্পনা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে পাঠায়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে তাতে সম্মতি দেয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের অনুমোদন লাভের পর জেনারেল আবরার সবুজ সংকেত দেন। আমি আমার ট্যাকটিক্যাল হেড কোয়ার্টার্সসহ দুটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আক্রমণ শুরু হবে। হঠাৎ নির্দেশ এল, 'অপারেশন বন্ধ করো। বসে থাকো চুপচাপ।' পাকিস্তান ও ভারত যুদ্ধ বন্ধে সম্মত হয়। যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দেয়া হলো। এভাবে থেমে গেল ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ।

জেনারেল আবরারের সৈন্যরা প্রচণ্ড গতিতে যুদ্ধ করেছে। আমার অধীনস্থ ১৪ প্যারা ব্রিগেড লড়াইকালে ১৩৪ মাইল পথ অতিক্রম করেছে এবং কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, শিয়ালকোট যুদ্ধে বিজয়ের সবটুকু কৃতিত্ব দেয়া হয় জেনারেল টিক্কাকে। এ ধরনের বিভ্রান্তি আজো আমাদের মাঝে বিরাজ করছে। জেনারেল আবরারের ৬ সাজোয়া ডিভিশন এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন পদাতিক বাহিনী বেদিয়ানা থেকে রাভি নদী পর্যন্ত বিশাল এলাকা রক্ষা করেছে। জেনারেল আবরার এবং তাঁর ব্রিগেড, ব্যাটালিয়ন ও কোম্পানি কামান্ডাররাই শিয়ালকোট সেক্টরে যুদ্ধে জিতেছে।

যুদ্ধে পদক প্রাপ্তির ঘটনাই প্রকৃত সত্য তুলে ধরছে। ১৯৬৫ সালে যুদ্ধের পর

পরিকল্পনা ও বীরত্বের জন্য জেনারেল আবরারকে *হিলাল-ই-জুরাত* খেতাব দেয়া হয়। একইভাবে ব্রিগেডিয়ার আব্দুল আলী ও আমি *হিলাল-ই-জুরাত* পুরস্কার পেয়েছিলাম যুদ্ধে অসাধারণ দক্ষতার জন্য। পক্ষান্তরে, জেনারেল টিক্কা খান অথবা তার ব্রিগেড কমান্ডারদের কেউই কোনো পদক পান নি। সত্যি কথা বলতে কী, জেনারেল টিক্কা যুদ্ধকালে তার অবস্থানের পেছনে ভারতীয় গেরিলা তৎপরতা সম্পর্কে অসত্য তথ্য দিয়েছিলেন। এজন্য তার বিরুদ্ধে শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। তবে অল্পের জন্য তিনি রেহাই পেয়ে যান। জেনারেল টিক্কা যুদ্ধের পুরোটা সময় ছায়ার পেছনে ছুটেছেন। কারণ যুদ্ধে ভারতীয় গেরিলাদের কোনো তৎপরতা ছিল না। কিন্তু টিক্কার রিপোর্টে অহেতুক ভীতি সৃষ্টি হয়।

আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে ছোট্ট একটি ঘটনার বর্ণনা দেব। যুদ্ধ বিরতির পর আমি আমার বন্ধু টিক্কা খানের অধীনস্থ একজন ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মাহমুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। একটি তাঁবুতে বসা ছিলেন তিনি। আমাকে বললেন, তাঁবু থেকে বের হয়ে যেতে। আমি এর কারণ জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, কয়েকজন অতিথি আসছেন। যেহেতু আমাদের ডিভিশন কোনো যুদ্ধ করে নি, তাই আমি তাদেরকে ৬ষ্ঠ সাজোয়া ডিভিশনের এলাকায় নিয়ে যাব এবং যুদ্ধক্ষেত্র দেখাব। তোমার সামনে আমি বিব্রত বোধ করছি, তোমরা যখন যুদ্ধ করেছ, আমরা তখন ছিলাম শিয়ালকোটে।

হিলাল-ই-জুরাত সম্মাননা

'ব্রিগেডিয়ার এ. এ. কে. নিয়াজি ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুদ্ধে একটি ফোর্সের অধিনায়কত্ব করেছেন। সাজোয়া বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট শত্রুর তীব্র হামলার মুখে তিনি তার ব্রিগেডের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করেছেন এবং অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে তাঁর এলাকা রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বীরত্ব ও অদম্য দৃঢ়তার কারণেই শত্রুর উপর্যুপরি হামলাগুলো ব্যর্থ হয়েছে। আরেক ঘটনায় তিনি এমন এক এলাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন যে এলাকার ওপর শত্রুর চাপ ছিল প্রচণ্ড। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে তিনি শুধু শত্রুর প্রচণ্ড হামলা প্রতিহতই করেননি, শত্রুকে তাঁর এলাকা ত্যাগেও বাধ্য করেছেন। তাঁর অসাধারণ সাহসকিতা, বীরত্ব এবং দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তাকে *হিলাল-ই-জুরাত* পদক দেয়া হয়েছে।'

কুচ-এর রানে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে। সেখানে টিক্কার ভূমিকা কিছুই ছিল না। তাকে শিয়ালকোটে অবস্থিত ১৫ ডিভিশনের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। তার আওতাধীন ব্রিগেডের মধ্যে ২৪ ব্রিগেডকে জেনারেল আবরারের নেতৃত্বাধীন ৬ষ্ঠ সাজোয়া ডিভিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এবং ১১৫ ব্রিগেডকে নারোয়াল এলাকায় মোতায়েন করা হয়। তৃতীয় ব্রিগেডকে মোতায়েন করা হয় শিয়ালকোটের আশপাশে। ডিভিশনাল সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় শিয়ালকোট শহরে।

সাধারণভাবে জেনারেল টিক্কা সাংবাদিক ও দর্শনার্থীদের ব্রিফ করতেন। লোকজন যেসব উপহার সামগ্রী পাঠাতো তিনি সেগুলো বিতরণ করতেন সৈন্যদের

মধ্যে। ৬ষ্ঠ সাজোয়া ডিভিশনের আওতাধীন ব্রিগেড যেসব লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল তিনি সেসব লড়াই এবং যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি বর্ণনা করতেন। এতে টিক্কার ভাবমূর্তি সম্পর্কে একটি উঁচু ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঘটনা ছিল অন্যরকম। যুদ্ধের নায়ক জেনারেল আবরার বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যান বিভ্রান্তির তোড়ে। জেনারেল টিক্কাকে বানানো হয় বীর। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে তার কোনো কৃতিত্বই নেই। তিনি নায়ক ছিলেন না, ছিলেন খলনায়ক। যুদ্ধ করেছিলেন আবরার। আর তাঁর কৃতিত্ব নিয়েছেন টিক্কা। ইতিহাস কখনো কখনো অবিচার করে। সে কখনো বামনকে বানায় দানব। আবার মহাবীরকেও সে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হয়।

যুদ্ধের পর

১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। এরপর যুদ্ধ থেকে শান্তিতে উত্তরণ ঘটে। অফিসারদের বদলি ও রদবদল শুরু হয়। আমি ১৪ প্যারা ব্রিগেডের কমান্ডেই রয়ে গেলাম। যুদ্ধ থেমে যাবার পর আজাদ কাশ্মির এবং শিয়ালকোট অপারেশনের সময় নেতৃত্ব দেয় ব্রিগেড ১। এরপর আমার বদলির আদেশ এল। আবার আমাকে কোয়েটায় স্কুল অব ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাকটিকসের কমান্ড্যান্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এ বদলিতে খুশি হলাম আমি। ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের কমান্ড্যান্ট হিসেবে আমি কিছু প্রজেক্ট শুরু করলাম। আমি চেয়েছিলাম অসমাপ্ত কাজগুলোকে সমাপ্ত করতে। স্কুল অব ইনফ্যান্ট্রি এন্ড ট্যাকটিকসে কয়েক মাস অবস্থানের পর আমাকে পদোন্নতি দিয়ে শিয়ালকোটে ৮ম ডিভিশনে বদলি করা হলো। ১৯৬৬ সালের ১৮ অক্টোবর আমি মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিনের কাছ থেকে ৮ম ডিভিশনের কমান্ড গ্রহণ করলাম। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আমি এ এলাকাতেই ছিলাম, তাই আমাকে নতুন করে এলাকার সঙ্গে পরিচিতি হতে হয় নি। তারপরও আমি আরো কিছু জানার চেষ্টা করলাম। মাঝে মাঝে আমরা কোথাও তাঁবু খাটিয়ে বেশ কিছুদিন কাটাতাম। আমি ডিভিশনের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করলাম। বিভিন্ন ইউনিটের শক্তিসামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ব্যাটালিয়নের প্রতিরক্ষামূলক কাঠামোর আওতায় প্রতিটি কোম্পানির প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সত্যিকার অর্থে আমি আমার ডিভিশনের আওতায় প্রতিটি এলাকা হেঁটে বেড়াতাম। গোলাবর্ষণের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর প্রতিটি মেশিনগান ও ট্যাংক-বিধ্বংসী কামানের অবস্থান নির্বাচন এবং এসব অবস্থান তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো তদারক করা হতো, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। কোর কমান্ডার জেনারেল আবদুল হামিদ খান প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানও প্রশংসা করতেন। ৮ম ডিভিশনের প্রতিরক্ষা অবস্থান ঠিক হলে আমাকে লাহোরে ১০ম ডিভিশনে নিয়োগ দেয়া হলো।

৮ম ডিভিশনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে আমাকে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং

যথেষ্ট ঘাম ঝরাতে হয়েছে। তারপরও আমাকে এ ডিভিশন থেকে অন্যত্র বদলি করা হয়। এ ব্যাপারে জেনারেল হামিদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান যে, ১০ম ডিভিশনে আমাকে দুটি কারণে বদলি করা হয়েছে। প্রথমত ৮ম ডিভিশনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে সাজানো হয়েছে, একইভাবে ১০ম ডিভিশনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সাজানোর জন্য কমান্ডার-ইন-চিফের ইচ্ছা এবং দ্বিতীয়ত সামরিক শাসনের দায়িত্ব পালনের জন্য। সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে করাচিতে আমার অভিজ্ঞতা ও তৎপরতা বিচার করে আমাকে লাহোরে পাঠানো হলো।

আমি মেজর জেনারেল খোদাদাদের কাছ থেকে ১৯৬৯ সালের ২২ জুন ১০ম ডিভিশনের কমান্ড গ্রহণ করলাম। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমি অপারেশনাল এলাকায় টহল দান শুরু করি এবং ১০ম ডিভিশনের প্রতিরক্ষা বিন্যাস সম্পন্ন করি। ৮ম ডিভিশনের চেয়েও এখানে এ কাজ চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়। শিয়ালকোটে যেসব ঘাটতি ও বাধা-বিপত্তি ছিল লাহোরে ১০ ডিভিশনের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘাটতি ও বিপত্তিগুলো দূর করা হলো। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেয়া হলো সৈন্য সংখ্যা ও প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের ভিত্তিতে। ১০ম ডিভিশনের বিন্যাস আমি যেভাবে রেখে এসেছিলাম, এত বছর পর তখনো সেভাবেই ছিল। অন্য কোনো জেনারেল এতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেন নি।

দুটো ডিভিশনের ফ্রন্টই ১৯৭১ সালে যুদ্ধের ধাক্কা সামলেছে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ভারতীয়রা আমাদেরকে ১০ম ডিভিশনের এলাকা বামবানওয়ালা-রাভি-বেদিয়ানা সংযোগ খাল (বিআরবি) বরাবর সৈন্য মোতায়েনে বাধ্য করে। বিআরবি এলাকার অপর পাশের সব এলাকা দখল করে নেয় ভারতীয়রা। সেখানে বলতে গেলে ভারতীয় সৈন্যরা বিনা বাধায় প্রবেশ করে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বিনা প্রতিরোধে মাইলের পর মাইল ভূখণ্ড শত্রুর হস্তগত হওয়ায় সেনাবাহিনী ও জনগণ উভয়ের মনোবলে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। আমি ১০ম ডিভিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের অতীত ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করি। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০ম ডিভিশনের প্রতিরক্ষা লাইনকে বিআরবি ডিঙিয়ে আরো সামনে এগিয়ে নেয়া হয় যাতে শত্রুকে আমাদের সীমান্তেই থামিয়ে দেয়া যায়। আমার প্রতিরক্ষা বিন্যাসে বিআরবি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যূহে পরিণত হয়। আমাদের দূরদর্শিতার জন্য শত্রুকে তাদের ভূখণ্ডের তিন মাইল ভেতরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলতে বাধ্য হতে হয়।

আরো, আমি ১০ম ডিভিশনের অবস্থানের সামনে ট্যাংক-প্রতিরোধকারী খালের পাড় বরাবর কিকার ও রাবার গাছ রোপণ করেছিলাম। এ গাছগুলো এখন ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং সৈন্যদের আত্মগোপন এবং আচ্ছাদনে প্রচুর সহায়ক হয়েছে।

অধ্যায় ৩

বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী ঘটনাগুলো

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরা ছিল ভাগ্য ও অভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের বন্ধনে বাঁধা। বিদেশি বিশেষজ্ঞরা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দিকে তাকিয়ে পাকিস্তানকে একটি অস্বাভাবিক রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।

দেশ ভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসরত অধিকাংশ হিন্দু ভারতে চলে যায়। এটা পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘটে নি। ধনী ও ক্ষমতাবান হিন্দুরা এখানে থেকে যায়। মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীদের প্রতি অনুগত। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশি হওয়ায় স্কুল-কলেজের অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন হিন্দু। এসব শিক্ষক ছাত্রদের শৈশবকালে তাদের চিন্তাধারা গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে সাম্রাজ্যবাদী, উৎপীড়ক ও শোষক হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এভাবে রোপণ করা হতো অসন্তোষের বীজ।

ধর্ম ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর কোনো বিষয়ে মিল ছিল না। ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল একটি বাধা, এতে উভয় প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। ভাষা ছিল আলাদা। রীতি-নীতি এবং আচার-আচরণও আলাদা। খাদ্যাভ্যাস ছিল ভিন্ন। পোশাক-পরিচ্ছদও একরকম ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির সংঘাত হতো। প্রত্যেকে বিশ্বাস করতো তাদের নিজেদের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, সামাজিক প্রধা ও নিয়ম-কানুনে।

পশ্চিম পাকিস্তান ছিল ভূস্বামীদের দুর্গ। যারা পরিচিত ছিলেন খান, চৌধুরী, মীর ও ওয়াধেরা হিসেবে। তারা ছিলেন খুব ক্ষমতাবান, মহাজন। কৃষকরা ছিল তাদের প্রতি পুরোপুরি অনুগত। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। সাধারণ মানুষের ওপর বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও আইনজীবীদের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য।

সময়ের ব্যবধানে দুটি অংশের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। সবচেয়ে বিস্ফোরিত বিষয় ছিল ভাষা। বাঙালিরা উর্দু ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে

মেনে নিতে অস্বীকার করে। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ ঢাকায় এক বিশাল সমাবেশে কায়েদে আযম উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন, কিন্তু বাঙালিরা ধারণা করে যে, তাদের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানায়। তারা ভাষার মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বাঙালিরা দেখতে পায় যে, রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হলে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় আরো পিছিয়ে পড়বে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা ইতোমধ্যেই সশস্ত্র বাহিনী ও সিভিল সার্ভিসে এগিয়ে গিয়েছিল। এ কারণে বাঙালিরা তাদের দাবির প্রশ্নে অনড় ভূমিকা পালন করে। তারা রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নে আন্দোলনে নামে। এভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে তাদের সংঘাত বেধে যায়। বাঙালিদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৫৪ সালে বাংলাকে দেশের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তখন এ ইস্যু নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু থেকে যায় ক্ষত। এভাবে বইতে শুরু করে ঘটনাস্রোত।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে যে, যদি জনসংখ্যানুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব মেনে নেয়া হয় তাহলে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়বে। তারা বাঙালি রাজনীতির ওপর হিন্দু প্রভাবে শংকিত হয়ে ওঠে। জনসংখ্যার কুড়ি শতাংশ যেখানে শিক্ষিত হিন্দু এবং সমাজ জীবনের সকল স্তরে যেখানে তাদের প্রভাব সেখানে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে তাদের রুখবে কে? বাঙালিরা সরকার গঠন করলে সেখানে হিন্দু স্বার্থকেই প্রাধ্যান্য দেয়া হবে। এ কারণে হিন্দু প্রভাব খর্ব করার জন্য প্যারিটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, প্যারিটি ব্যবস্থার আওতায় উভয় অংশের সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়। হিন্দু-প্রভাবিত বাঙালিদের নিষ্পেষণ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্বার্থ রক্ষায় এ ব্যবস্থা চালু করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানি গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী এবং বাঙালি খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করায় দেখা দেয় গোলযোগ। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি নেতৃত্ব আন্দোলন শুরু করেন। অধিকাংশ দল তাদের অসন্তোষ প্রকাশে একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করে। লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন-সহ কুড়ি দফা তৈরি করা হয়। কেবল প্রতিরক্ষা, অর্থ ও পররাষ্ট্র নীতি কেন্দ্রের হাতে রাখার কথা বলা হয়।

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল আইয়ুব খানকে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আইয়ুব খান নির্ধারণ করেন তার অগ্রাধিকার। তিনি মূল্যাবোধ ও আদর্শ সংরক্ষণের চেষ্টা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে একটি জাতীয় পুনর্গঠন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হাতে নেন। পাকিস্তানে যেসব সামাজিক ও

অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল সেগুলো দূর করাই ছিল তার প্রথম ও প্রধান কাজ। এ লক্ষ্য পূরণে চোরাচালান, মজুদদারি ও দুর্নীতি উচ্ছেদকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করা ছিল তার দ্বিতীয় কাজ। শিল্পায়নে আইয়ুব খানের নিরলস প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়।

১৯৬৫ সালে যুদ্ধের পর জুলফিকার আলি ভুট্টো জাতীয় পরিষদে এক বিবৃতি দেন যার ফলে হৈচৈ পড়ে যায়। তিনি বলেন যে, চীন পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করেছে। এটা কোনো সাধারণ বিবৃতি নয়, এর ফল সুদূরপ্রসারী। বাঙালিদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হলো। তাদের কাছে মনে হলো যে, যদি সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করে তাহলে সংযুক্ত পাকিস্তানের সঙ্গে বসবাস করা তাদের কাছে অর্থহীন। দ্রুত জোরদার হয়ে ওঠে তাদের এ মনোভাব। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃত্বের উদাসীনতায় পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়। তারা বুঝতে পারেন নি পানি কোন দিকে যাচ্ছে। বাঙালিরা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় সচেতন হয়ে ওঠে এবং তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ক্ষোভ অমূলক ছিল না।

ধূমায়িত হয়ে ওঠে অসন্তোষ। শেখ মুজিব তার লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা চালান। ১৯৬৬ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। শেখ মুজিব বেসামরিক আমলা ও সশস্ত্র বাহিনীর জুনিয়র অফিসারদের যোগসাজশে পূর্ব পাকিস্তানে একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভারতের আগরতলায় তাদের মধ্যে বৈঠক হয়। এজন্য এটাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র বলা হয়। মুজিব এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার করা হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মোটেও কোনো কল্প-কাহিনী ছিল না অথবা শেখ মুজিবকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোরও কোনো অভিপ্রায় ছিল না। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই ভারতীয় গোয়েন্দারা পূর্ব পাকিস্তানে তৎপরতা শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুরা তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতো। এর সত্যতা মেলে অশোক রায়নার ইনসাইড 'র' (দ্য স্টোরি অভ ইনডিয়ান'স সিক্রেট সার্ভিস, বিকাশ পাবলিশিং হাউজ, নিউ দিল্লি, ১৯৮১) নামক বইয়ে যেখানে তিনি মুজিবের এবং ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো অপারেশন (আইআইবিও)-এর মধ্যে যেসব বৈঠক হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। মি. রায়না বলেছেন যে, এম.কে. শংকর নায়ার মুজিবপন্থী গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। শংকর নায়ার পরে 'র'-এর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুজিবপন্থী গ্রুপ ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যর্থ চেষ্টা চালালে পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের কাছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা ধরা পড়ে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে মুজিব ও ভুট্টোসহ সকল প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৬৯ সালের ২৬

ফেব্রুয়ারি ও ১০ মার্চ গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই এ বৈঠকের প্রতি ভুট্টো অনমনীয়তা দেখিয়ে আসছিলেন। তিনি শুধু বৈঠকে যোগদান থেকেই বিরত থাকেন নি, এ বৈঠকে অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্যও দিয়েছিলেন। একইভাবে, মুজিব ছিলেন তার ৬-দফার প্রশ্নে আপোসহীন। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি কারো কথা শোনেন নি। আইয়ুব খান ৬-দফা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফার অর্থ হচ্ছে ফেডারেল ব্যবস্থার স্থলে কনফেডারেশন, ফলে পাকিস্তান ভেঙে যাবে। গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। মুজিবের দৃঢ় আচরণ, ভুট্টোর উদাসীনভাব ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতাই হচ্ছে এ বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ।

এ সময় জনগণ বিরোধিতা করতে থাকে সামরিক শাসনের। অসুস্থতার কারণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হয় এবং কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব মেনে না নিতে মুজিব ও অন্যান্যদের উৎসাহিত করেন। মুজিবকে তিনি আশ্বাস দেন যে, সামরিক আইন জারি করা হবে না এবং সেনাবাহিনী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে বাধা দেবে না। তিনি তার কথা রক্ষা করেছিলেন এবং আইয়ুব খানের স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন নি।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং সংবিধান স্থগিত করে ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভুট্টো—এ তিনজনই ছিলেন জাতীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট জেনারেল ইয়াহিয়া ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাধর। মুজিব ছিলেন একজন দক্ষ রাজনীতিক ও বাগ্মী, তিনি জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে তুলতে পারতেন। ভুট্টো ছিলেন আধুনিক তবে উদ্ধত। শালীন অথচ নিষ্ঠুর। ভুট্টো দরিদ্র লোকের ভাষায় কথা বলতে পারতেন। এ তিন ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে এক তীব্র দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। প্রত্যেকেই ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং একে অপরকে হটাতে তৎপর।

ইয়াহিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানে তার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি তার অনুগত জেনারেল, রাজনীতিক ও ব্যুরোক্রেটিক এলিটদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং এমন সিদ্ধান্ত নেন যার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হয়। ১৯৬৯-এর ২৮ নভেম্বর তিনি এক ইউনিট ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন এবং এক ব্যক্তির এক ভোট নীতি গ্রহণ করেন। আমরা এত বছর ধরে যা রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম ইয়াহিয়া কলমের এক খোঁচায় তা বরবাদ করে দেন। প্যারিটির মূলনীতিতে একটি ভূ-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটাকে সংবিধানের একটি অংশে পরিণত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যথাযথ

সম্মতিতেই তা করা হয়। ইয়াহিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতেও বাঙালিদের সমান প্রতিনিধিত্ব মঞ্জুর করেন। বাঙালিরা সন্তুষ্ট হয় নি। তারা তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে সমান প্রতিনিধিত্ব দাবি করে। ইয়াহিয়া যতই বাঙালিদের দিতেন তারা ততই আরো চাইতো। ইয়াহিয়া স্বায়ত্তশাসন ছাড়া সব দাবি মেনে নেন। এটাকে মুজিব নির্বাচনে কাজে লাগাল।

১৯৭০-এর ১ জানুয়ারি ইয়াহিয়া রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করার অনুমতি দেন। ১৯৭০ সালের শেষ নাগাদ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৩০ মার্চ তিনি লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) ঘোষণা করেন।

বিশাল নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়। মুজিব ও ভুট্টো দুজনে জনগণের মন জয় করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। মুজিব হয়ে ওঠেন পূর্ব পাকিস্তানের নেতা এবং ভুট্টো হন পশ্চিম পাকিস্তানের। মুজিবের শক্তি এবং ৬-দফার প্রতি তার জেদ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিষোদগার ও তাদের সমালোচনা করে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় সমস্যার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করেন তিনি।

ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে দেখা দেয় বন্যা। ১৯৭০-এর নভেম্বরে প্রলয়ংকরী সাইক্লোনে জনগণের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে। গ্রামগুলো বিধ্বস্ত হয়। ফলে গৃহহীন হয়ে পড়ে লোকজন। বহু প্রাণহানি ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসানের হেলিকপ্টার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি ত্রাণ তৎপরতা চালাতে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার ও জনশক্তি সরবরাহে ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের কাছে আকুল আবেদন জানান। দাঙ্গা, বিদ্রোহ অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে সহায়তা দান সেনাবাহিনীর একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব। মুজিবের আহ্বান এবং আহসানের অনুরোধ সত্ত্বেও জেনারেল ইয়াকুব ত্রাণ তৎপরতায় সৈন্যদের অংশগ্রহণ করতে দেন নি। যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো পরিস্থিতিতেই একজন সামরিক কমান্ডার প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানে অস্বীকৃতি জানাতে পারে না। ইয়াকুব যে মুহূর্তে ছিলেন নিশ্চল এবং ইয়াহিয়া নিয়েছিলেন দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয়, ঠিক তখন ইসলামাবাদের অনুমতি ছাড়াই মার্কিন ও ব্রিটিশ ত্রাণ দল ত্রাণ তৎপরতা চালাতে পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছে যায়। সহায়তা দানে সরকারের অক্ষমতায় বাঙালিরা ক্ষুব্ধ ও মুজিব ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন: 'বৃটিশ সেনাদের আনা হয়েছে আমাদের কবর দিতে।' দুর্গত মানবতার দুর্দশা লাঘবে ইয়াকুবের উদাসীনতা ও তার ব্যর্থতা উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে আরো বাড়িয়ে তোলে।

আমি সাহেবজাদা ইয়াকুবকে চিনি ১৯৪৯ সাল থেকে। কোয়েটায় একসঙ্গে

স্টাফ কোর্স করেছি আমরা। তিনি চাপা স্বভাবের লোক ছিলেন। ক্লাশে ও মডেল ডিসকাশনে বরাবরই নীরব থাকতেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি আত্মসমর্পণ করেন এবং যুদ্ধবন্দি হন। তাঁর সঙ্গে যারা বন্দি হন তাঁদের সবাই শিবির থেকে পালিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি পালানোর কোনো চেষ্টা করেন নি। স্টাফ কোর্সের সময়কালে তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঘোর বিরোধিতা করতেন। দ্বি-জাতি তত্ত্বকে তিনি একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন একটি সাজোয়া ডিভিশনের কমান্ডার। তবে তাঁর কমান্ডের এ সাজোয়া ডিভিশন কোনো লড়াইয়ে অংশ নেয় নি। এসব ঘটনা সত্ত্বেও তিনি তর তর করে ওপরে উঠেছেন। ইংরেজিতে বাকপটু হওয়ায় তিনি পদোন্নতি পেতেন।

১৯৬৯ সালে জেনারেল ইয়াকুবকে ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো। তিনি যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর কমান্ডের আওতাধীন সৈন্যদের সংগঠিত ও পুনর্গঠিত করেন। আর্মি ওয়ার প্ল্যান-এর মূল কথা ছিল, "পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ করা হবে পশ্চিম রণাঙ্গনে"। তিনি ছিলেন নিরাপত্তা পরিকল্পনা-এর লেখক, যার লক্ষ্য ছিল বাঙালিদের উত্থানকে দমন করা। সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে তিনি মুজিবের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং নুরুল আমিন ও মাওলানা ভাসানীর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন।

ইতোমধ্যে রাজনীতির আকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেখা দেয়। দুটো পার্টি আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপল্স পার্টি নির্বাচনী ফ্রন্টে প্রভাব বিস্তার করে। এ দুটি দলের প্রতিটিই নিজ নিজ এলাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল। অন্যান্য প্রদেশে এদের কোনো প্রভাব ছিল না। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মুজিবের প্রতি ইয়াকুব খানের ঝুঁকে পড়াটা ছিল সন্দেহজনক। তিনি নেলসনের চোখ আওয়ামী লীগের চাপের দিকে ফিরিয়ে নেন। তিনি পরাজিত হন তার ইচ্ছাশক্তির ঘাটতির কারণে ও মুজিবের কৌশলের কাছে।

নির্বাচনে মুজিব বিস্ময়কর বিজয় লাভ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয়ী হন। অন্যদিকে, ভুট্টোর পিপল্স পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টি আসন লাভ করে। ফজলুল কাদের চৌধুরী, মৌলভী ফরিদ আহমেদ ও আরো কয়েকজন পাকিস্তানপন্থী নেতা আমাকে জানিয়েছিলেন যে, সামরিক প্রশাসক ইয়াকুব খান সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করলে এবং আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে প্রতারণা করার সুযোগ না দিলে অন্যান্য দল শহরগুলোতে কমপক্ষে ৬০ থেকে ৬৫টি আসন পেত। নির্বাচনের আগে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা জরিপ চালিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলের সঙ্গে জরিপ রিপোর্টের বিশাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, কোনো দলই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হবে না। গোয়েন্দা

সংস্থার রিপোর্ট ইয়াহিয়া সরকারকে গডফাদারের ভূমিকা পালনে একটি শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যায়।

নির্বাচনের পরে পরিস্থিতি বিপজ্জনক আকার ধারণ করে। উভয় অংশে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই তীব্রতর হয়। জটিল পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে ওঠে। উভয় অংশের নেতৃবৃন্দ এগোতে থাকেন সংঘাতে পথে। উবে যায় আপোস করার ইচ্ছা এবং রাজনৈতিক নীতিবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার মানসিকতা।

বিরোধী দলীয় নেতার আসনে বসারই ইচ্ছে ভুট্টোর ছিল না। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক সংবিধান তৈরির প্রস্তাব দেন। তিনি এমন এক নেতার মতো আচরণ করতে থাকেন যেন তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। অন্যদিকে মুজিব নির্বাচনে বিজয়ের পর আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তিনি ৬-দফা প্রশ্নে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেন। ভুট্টো মুজিবের বিজয় মেনে নিতে ব্যর্থ হন। তিনি ঘোষণা করেন যে, পাঞ্জাব ও সিন্ধু হচ্ছে পাকিস্তানের ক্ষমতার দুর্গ। সুতরাং সংবিধান প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে তার দলের সহযোগিতা অপিরিহার্য।

এভাবে বিপরীত দিকে চলতে থাকে জাতির ভাগ্যের চাকা। ইয়াহিয়া মুজিবকে ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। মুজিব ফাঁকা বুলিতে বিমোহিত হন নি। ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল থাকতে চাইলেন, কিন্তু মুজিব ইয়াহিয়াকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। মুজিবের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইয়াহিয়া ভুট্টোর বাহুতে আশ্রয় নেন। তিনি ও তাঁর অনুচরেরা হাঁস শিকারের নামে ভুট্টোর নিজ জেলা লারকানায় যান। সেখানেই লারকানা ষড়যন্ত্র করা হয়।

এর মধ্যে ভারত মুজিবকে সহায়তা দিয়েই থেমে থাকে নি, পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যও সীমান্তে সেনা সমাবেশ ঘটায়। এটা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য মুজিবের প্রতি একটি স্পষ্ট সংকেত। ১৯৭১ সালের ৩০ জানুয়ারি একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পুরো ঘটনা না জেনে দুজন কাশ্মিরী ছিনতাইকারীকে স্বাগত জানাই। কাশ্মিরী ছিনতাইকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হয়। এভাবে পাকিস্তান একটি ফাঁদে পা দেয়। ভারত বিমান ছিনতাই ঘটনার অজুহাতে তার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে পাকিস্তানি বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করে। আবেগ প্রশমিত হয়ে আসে এবং একটি তদন্ত পরিচালিত হয়। তদন্তে দেখা যায় যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে ভারত পরিকল্পিতভাবে এ বিমান ছিনতাই নাটকের অবতারণা করে।

১৯৭১-এর ১১ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। পরদিন পিপিপি কর্মীরা লাহোরে আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা চালায় এবং দলের পতাকায় অগ্নিসংযোগ করে। এরপর ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। ভুট্টো এ ঘোষণা গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলেন, 'আর্মিরা কেবলমাত্র একটি দলের তৈরি করা সংবিধান অনুমোদন করতে এবং লজ্জা ফিরিয়ে আনতে ওখানে যেতে পারে না।' ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি লাহারে তার দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, সরকার মুজিবকে সমর্থন দিলে তিনি প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু করবেন। তিনি আরো বলেন যে, হয় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন হতে দিতে হবে নয়তো মুজিবকে গ্রেফতার করে বিচার করতে হবে।

১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া ইসলামাবাদে প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন। ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার ও সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল ইয়াকুবও এ বৈঠকে যোগ দেন। এ বৈঠকেই সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। মুজিব ৬-দফা প্রশ্নে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হলে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইয়াকুবকে তার বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়। বৈঠকের পর ইয়াকুব জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে জেনারেল হামিদের সঙ্গে অতিরিক্ত ব্রিগেড সরবরাহের প্রস্তাব দেন। তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় পূর্ব পাকিস্তানেই পর্যাপ্ত সৈন্য রয়েছে। যখন তিনি ঢাকা পৌঁছালেন তখন নিজের মনোভাব পরিবর্তন করেন তিনি এবং প্রতিশ্রুত ব্রিগেড পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। যখন ব্রিগেডের দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য ঢাকা এসে পৌঁছাল, তিনি আবার টেলিফোন করেন জেনারেল হামিদের কাছে এবং তাঁকে জানান যে, সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করায় মুজিব বিরক্ত হয়েছেন এবং তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য প্রেরণ বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। জেনারেল হামিদ ছিলেন শান্ত ও ঠাণ্ডা মেজাজের লোক কিন্তু তিনি মেজাজ হারালেন ও ইয়াকুবকে বললেন শক্ত হতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তৃতীয় ব্যাটালিয়নকে ঢাকা পাঠানো হলো।

আওয়ামী লীগ এসব ঘটনায় এত আতঙ্কিত হয়ে পড়ল যে, তারা ৬-দফা প্রশ্নে নমনীয় হতে সম্মত হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গভর্নর আহসান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্ত মুজিবকে অবহিত করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো বরাবরের মতো হুমকি দেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হলে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি সতর্ক করে দেন যে, তার দলের কোনো সদস্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলে তাকে হত্যা করা হবে। তিনি আরো বলেন, হয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বিলম্বিত করতে হবে নয়তো সংবিধান প্রণয়নে ১২০ দিনের সময়সীমা প্রত্যাহার করতে হবে। এটা ছিল একটা

ফাঁকা হুমকি, কারণ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আওয়ামী লীগ যে কোনো সময় সংবিধান প্রণয়ন করে নিতে পারতো। ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। অধিবেশন স্থগিতের কারণ হিসেবে পিপিপি'র জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন এবং ভারতের সৃষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়। ১১, ১৯ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ভুট্টোর সঙ্গে ইয়াহিয়ার রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত ছিল ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার চক্রান্তের একটি অংশ।

বেসামরিক মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত করা হলো। অ্যাডমিরাল আহসানকে অপসারণ করা হলো গভর্নরের পদ থেকে। সাহেবজাদা ইয়াকুব পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন—যেসব জেনারেল গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই সৈন্যদের কমান্ড থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন একমাত্র ইয়াকুব। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে মুজিব ২ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন। তৎক্ষণাৎ আওয়ামী লীগ কর্মীরা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ভাংচুর করে এবং বহু দোকানপাট লুট করে। এ বিশৃঙ্খলার সময় সশস্ত্র ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ করে। অবাঙালিদের ওপর হামলা এবং তাদের হত্যা করা হয়। সেনা ইউনিটও আক্রান্ত হয়। ইয়াহিয়া নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তিনি ১০ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি যে, আলোচনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

৪ মার্চ ১৯৭১ মুজিব অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। আওয়ামী লীগ আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সেনা কমান্ডার জেনারেল ইয়াকুব ছিলেন পুরোপুরি নীরব, ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার জন্যই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এজন্য ভুট্টো ও ইয়াহিয়া সমানভাবে দায়ী ছিলেন। তারা ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা হয়ে দাঁড়ান। ইয়াকুবের নিষ্ক্রিয়তায় বাঙালিরা হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়। ইয়াকুব অঙ্কুরেই এ বিদ্রোহ নির্মূল করতে পারতেন। তখনো বিদ্রোহ ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। বাঙালি সৈন্যরা তখনো বিদ্রোহ করেন নি। এ বিদ্রোহ ছিল খুবই সাধারণ মানুষের। শক্তি ও কৌশলের বুদ্ধিদীপ্ত সমন্বয় ঘটিয়ে ইয়াকুব নিরস্ত্র জনতার আন্দোলন পুরোপুরি নৈরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাবার আগেই থামিয়ে দিতে পারতেন। সেক্ষেত্রে মুজিব নমনীয় হতে বাধ্য হতেন।

মুজিব মার্চের শুরুতে সামরিক আইনকে অগ্রাহ্য করে একটি সমান্তরাল সরকার গঠনে তার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এক পক্ষকালের মধ্যে মুজিবের আওয়ামী লীগ এমন নৃশংস ঘটনা ঘটায় যা বর্ণনার অতীত। বগুড়ায় ১৫ হাজার লোককে ঠাণ্ডা

মাথায় হত্যা করা হয়। চট্টগ্রামে হাজার হাজার নর-নারীকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয় এবং ধর্ষণ করা হয়। সিরাজগঞ্জে একদল নারী ও শিশুকে একটি ঘরে তালা দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। এসব হামলার লক্ষবস্তু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ও বিহারীরা। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এ কর্মরত পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারদেররও হত্যা করা হয়, ধর্ষণ করা হয় তাদের স্ত্রীদের এবং উলঙ্গ হয়ে বাঙালি অফিসারদের খাদ্য পরিবেশনে বাধ্য করা হয়। অথচ দোষ দেয়া হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের। পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ ছিল একটি অপপ্রচার। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এ অপপ্রচার চালানো হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে লে. জেনারেল ইয়াকুব অ্যাডমিরাল এস.এম. আহসানের স্থলাভিষিক্ত হন ১৯৭১ সালের ১ মার্চ। চার দিনের মাথায় জেনারেল ইয়াকুব গভর্নর ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার পদে ইস্তফা দেন এবং বলেন যে, 'তিনি তার পাকিস্তানি ভাইদের হত্যা করতে পারবেন না।' ইয়াকুবের এ উক্তিতে বাঙালিরা উল্লসিত হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানিরা হয় ভীত। ইয়াকুব বাঙালিদের ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠতে দেখেছেন। কিন্তু তিনি কিছুই করেন নি। তার সিদ্ধান্তহীনতায় আওয়ামী লীগের সাহস বেড়ে যায়। তারা নৈরাজ্যের পথে ধাবিত হতে থাকে। ইয়াকুবের সমালোচনা শুধু আমিই নই; অন্যান্যরাও করেছেন। তাঁর আচরণ জেনারেল শের আলীর বইয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, 'আমি জানি নীতিগতভাবে ইয়াকুব সামরিক অভিযানে অসম্মত ছিলেন না। সত্যি এক পর্যায়ে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন এবং ইয়াহিয়া আমাকে এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার নির্দেশ দেন।'

জেনারেল শের আলী আরো লিখেছেন, 'এটা বলতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের কমান্ডার সংকটের সময় তাঁর সৈন্যদের পাশে না দাঁড়িয়ে তিনি তাদের ত্যাগ করেন এবং পদত্যাগ করে চলে আসেন।' তিনি আরো লিখেছেন, 'পদত্যাগের কারণ দেখানো হয়েছে বিবেকের তাড়না'। তিনি বলেছেন, তিনি তাঁর পাকিস্তানি ভাইদের হত্যা করার নির্দেশ পালন করতে পারেন নি। এখানে এ বিষয়টি বিচার করতে হবে যে, তিনি শুরু থেকেই নীতিগতভাবে সৈন্য ব্যবহারের বিপক্ষে ছিলেন, নাকি কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে চলে আসতেন। বিবেকের তাড়নার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হতো যদি তিনি আরো আগে পদত্যাগ করে চলে আসতেন।

পদত্যাগ করার পর করাচি যান ইয়াকুব। সেখানে তাঁকে স্টেশন হেড কোয়ার্টার্সে যুক্ত করা হয়। মেজর জেনারেল পদে পদাবনতি ঘটিয়ে তাঁকে পাঠানো হয় পেনশনে। তাঁর অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করে ইয়াহিয়া তাঁকে কোর্ট মার্শাল

করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়টিতে রাজনৈতিক রঙ চড়ানো হতে পারে বলে তাকে লঘু শাস্তি দেয়া হয়। ভুট্টোর মধ্যে ইয়াকুব দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর অভিভাবকের প্রতিচ্ছবি। ভুট্টো ক্ষমতায় এসে ইয়াকুবের লে. জেনারেল র‍্যাঙ্কই কেবল ফিরিয়ে দেন নি, তাঁকে তিনি প্রথমে ফ্রান্স ও পরে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূতও নিয়োগ করেছিলেন। সক্রিয় সার্ভিসে থাকাকালে জাতীয় অঙ্গীকার পালনে অসৈনিকসুলভ আচরণ করায় ইয়াকুব তলিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভুট্টো তাঁকে কলমের এক খোঁচায় সেখান থেকে উদ্ধার করেন। নিয়তি যদি কখনো কারো ওপর সদয় হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যে, ইয়াকুব হচ্ছেন ভাগ্যের সেই বরপুত্রদের একজন।

ইয়াকুব পদত্যাগ করার কারণ হিসেবে তার বিবেকের কথা বলেছেন। যখন হাজার হাজার মানুষ মারা গেল বন্যায়, চারদিকে ছিল আহাজারি। যখন বিহারি, পশ্চিম পাকিস্তানি ও ইপিআরে কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়েছিল তখন তিনি ছিলেন নীরব দর্শক। অফিসারদের স্ত্রীদের সম্মান যখন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল তখন তাঁর বিবেক ছিল মৃত। টিক্কা তিন ডিভিশন সৈন্যের সাহায্যে বেলুচিস্তানে তথাকথিত বিদ্রোহ দমন করেন, ইয়াকুব খান এ ঘটনার সামান্যতম প্রতিবাদও করেন নি। পূর্ব পাকিস্তানে ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডারের পদ থেকে তিনি যে বিবেকের তাড়নায় পদত্যাগ করেছেন একইভাবে বিবেকের তাড়নায় বেলুচিস্তানের ঘটনার প্রতিবাদেও তাঁর রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে ইস্তফা দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তাঁর চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আসে। বিপদমুক্ত দূরত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করেন। তার ত্রাণকর্তা ভুট্টোকে যখন ফাঁসিতে ঝুলানো হয় তখনো তিনি মুখ খোলেন নি। উপরন্ত, তিনি জিয়াউল হকের মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। জিয়াউলের মৃত্যুর পর তিনি পিপিপি সরকারে যোগ দেন এবং বেনজীরকে অপসারণ করা হলে তিনি নওয়াজ শরীফের নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রী হন। তাঁর মতো এমন অসৎ চরিত্রের লোক আর কখনো এত ওপরে উঠতে পারেন নি। একজন জেনারেল বিবেকের দোহাই দিয়ে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। সময়ের পরিবর্তনে বিবেকও পরিবর্তিত হয় যেমনটি ঘটেছে ইয়াকুবের ক্ষেত্রে।

সশস্ত্র বাহিনীর ওপর চাপ ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। আওয়ামী লীগ তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করা শুরু করে যা ছিল নিম্নরূপ :

১. সশস্ত্র বাহিনীর কাছে সব ধরনের সমর্থন প্রত্যাখ্যান করা;

২. সব ধরনের সেনা চলাচল ব্যাহত করা;

৩. সব ক্যান্টনমেন্টে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত করা;

৪. সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সব বেসামরিক কর্মচারীদের কাজ বন্ধ করা;

মুজিব ঘোষণা করেন : 'পাকিস্তান শেষ হয়ে গেছে। আপোষের আর কোনো আশা নেই। আমি তাদের ভেঙে দেব এবং বাধ্য করব নতজানু হতে।' এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। মুজিব কার্যত শাসক হয়ে যান এবং তাঁর

বাসভবন প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করা হয়।

জেনারেল টিক্কা খান ইয়াকুবের স্থলাভিষিক্ত হন ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। টিক্কা বিমানযোগে ঢাকা পৌছান এবং ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার, সামরিক আইন প্রশাসক ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাকে স্বাগত জানানো হয় নি; বিমান বন্দরে তাকে জুতার মালা উপহার দেয়া হয়। প্রধান বিচারপতি গভর্নর হিসেবে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানান। টিক্কা ছিলেন সোজাসাপ্টা, কঠোর পরিশ্রমী ও বিনীত স্বভাবের লোক। তবে ইয়াকুবের মতো তিনি মার্জিত ছিলেন না। বস্তুত অন্যান্যদের আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করার কোনো গুণ তার ছিল না। তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার অভাব ছিল। তা সত্ত্বেও তাকে ঘিরে বীরত্বের সৌধ গড়ে ওঠে।

ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর জেনারেল টিক্কা শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন। যদিও মুজিব ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিন্তু টিক্কার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন। জেনারেল টিক্কা তার অধীনস্থ সেনাদের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশকে নিরস্ত্র এবং চট্টগ্রাম নৌঘাঁটি ও লালমনিরহাট ও ঈশ্বরদিসহ সকল বিমান বন্দরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

টিক্কাকে সশস্ত্র বাঙালিদের নিরস্ত্র করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তিনি সেই নির্দেশ পালনও করেছিলেন। কিন্তু এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তিনি ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তার কথা ভুলে যান। এটাই ছিল পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুতর ভুল। এ ভুলের পরিণামে আমরা শুধু প্রাথমিক উদ্যোগেই হেরে যাই নি; কয়েকটি গ্যারিসন শহর ছাড়া গোটা প্রদেশ আমাদের হতাছাড়া হয়ে যায়।

জেনারেল টিক্কার আরেকটি ভুল পদক্ষেপ ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে সব বিদেশি সাংবাদিক, প্রতিনিধি ও টিভি ক্রুদের অত্যন্ত অপমানজনকভাবে বের করে দেয়া। এদের কাউকে কাউকে লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের লাগেজ পরীক্ষা করা হয় এবং ক্যামেরা থেকে ফিল্ম খুলে নেয়া হয়। এসব সাংবাদিক পরে ভারতে চলে যায়। এজন্য বিদেশি সংবাদ মাধ্যম আমাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনায় রঙ চড়াতে থাকে। ভারতীয় এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীরাই ছিল বিদেশি সাংবাদিকদের খবরের উৎস। বিদেশি সাংবাদিকরা অতিরঞ্জিত ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করায় পাকিস্তান ও পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর বিরাট ক্ষতি হয়। আমাদের সরকার এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। ফলে আমাদের নিজেদের লোকজন বিদেশি পত্রিকায় প্রকাশিত অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট বিশ্বাস করতে শুরু করে।

১৪ মার্চ ভুট্টো দুজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের একটি প্রস্তাব দেন, তিনি নিজে হবেন

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং মুজিব হবেন পূর্ব পাকিস্তানের। তিনি 'ওধার তুম ইধার হাম' বলতে দুটি পাকিস্তানকেই বুঝিয়েছেন। জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে যান ১৫ মার্চ। ভুট্টোও সেখানে যান। তিনজনের মধ্যে আলোচনা চলছিল, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছিল না। কারণ আওয়ামী লীগ এমন এক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যেখান থেকে তার ফেরার পথ ছিল না। মুজিব ভুট্টোর পরামর্শ অনুযায়ী ২২ মার্চ দুটি প্রদেশের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

২৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে পালন করা হয় প্রতিরোধ দিবস। মুজিবের বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশন ও সোভিয়েত কনস্যুলেটেও বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়। মুজিব কর্নেল ওসমানীকে সার্বিক অপারেশনের কমান্ডার নিযুক্ত করেন। মেজর জেনারেল (অব.) মাজেদের তত্ত্বাবধানে সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আসতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহীরা পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত হয়। হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য সাদা পোশাকে অনুপ্রবেশ করে। ভারতের সক্রিয় সহযোগিতায় সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়।

২৫ মার্চ সামরিক অভিযান চালানোর জন্য জেনারেল টিক্কা খানের হাতে ছিল শুধু মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার নেতৃত্বাধীন ১৪ তম পদাতিক ডিভিশন। এ ডিভিশনের ৪টি ব্রিগেড পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট ও ক্যাম্পে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ডিভিশন গঠিত হতো বারোটি পদাতিক ব্যাটেলিয়ন ও একটি মিশ্র কমান্ডো ব্যাটালিয়ন নিয়ে এবং অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে ৭টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ও একটি মিশ্র কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে। এসব ব্যাটালিয়নের অফিসাররা ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের। টিক্কা খানের কাছে একটি পদাতিক ডিভিশন ছাড়া আরো ছিল একটি হালকা ট্যাংক রেজিমেন্ট, ৫টি ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট, এক রেজিমেন্ট হালকা বিমান-বিধ্বংসী আর্টিলারি এবং দুটি মর্টার ব্যাটারি। এসব ইউনিটে সেনা ছিল মিশ্র। ইপিআর-এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। এর প্রায় সব সদস্যই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানি। তবে সেখানে কিছু কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারও কর্মরত ছিলেন। নৌ ও বিমান বাহিনীও ছিল। এদেরকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্থল বাহিনীর সহায়তায় ব্যবহার করা যেত।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তখনো বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করে নি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেনারেল টিক্কার পর্যাপ্ত শক্তি ছিল। প্রয়োজন ছিল যথার্থ পরিকল্পনা, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অভিযান পরিকল্পনা ও ধৈর্যের। কারণ টিক্কা কোনো

নিয়মিত সেনাবাহিনী নয়, একটি বিদ্রোহী সশস্ত্র বেসামরিক শক্তিকে মোকাবিলা করছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যরাতে জেনারেল টিক্কা আঘাত হানেন। একটি শান্তিপূর্ণ রাত পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে, চারদিকে আর্তনাদ ও অগ্নিসংযোগ। জেনারেল টিক্কা তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন যেন তিনি তার নিজের বিপথগামী লোকের সঙ্গে নয় একটি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছেন। ২৫ মার্চের সেই সামরিক অভিযানের হিংস্রতা ও নৃশংসতা বুখারায় চেঙ্গিস খান, বাগদাদে হালাকু খান এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারের নিষ্ঠুরতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

সশস্ত্র বাঙালি ইউনিট ও ব্যক্তিবর্গকে নিরস্ত্র এবং বাঙালি নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার জন্য টিক্কাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তে বেসামরিক লোকজনকে হত্যা এবং পোড়া মাটি নীতি গ্রহণ করেন। তিনি তার সেনাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আমি মাটি চাই, মানুষ নয়।' মেজর জেনারেল ফরমান ও ব্রিগেডিয়ার (পরে লে. জেনারেল) জাহানজেব আরবাব ঢাকায় তার এ নির্দেশ পালন করেন। মেজর জেনারেল রাও ফরমান তার টেবিল ডায়েরিতে লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের শ্যামল মাটি লাল করে দেয়া হবে।' বাঙালির রক্ত দিয়ে মাটি লাল করে দেয়া হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাঙালিরা গভর্নর হাউস অবরোধ করার পর তারা ফরমানের এ ডায়েরি খুঁজে পায়। বাংলাদেশ সফরকালে মুজিব ভুট্টোকে এ ডায়েরি দেখিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ভুট্টো এ ডায়েরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাকে আমি জানিয়েছিলাম যে, ভারতে থাকাকালে আমি এ বিষয়টি শুনেছি। তবে আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক বিষয়ে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

জেনারেল টিক্কা তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন থেকে সরে যাওয়া প্রায় সকল বাঙালি সশস্ত্র ব্যক্তি ও ইউনিট তাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, সাজ-সরঞ্জাম ও পরিবহন নিয়ে পালিয়ে যায় এবং মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে। তাদের সঙ্গে শিগগির ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা ও ভারতীয়রা যোগ দেয়। মুজিব ছাড়া সকল নেতৃবৃন্দ পালিয়ে যায় এবং কলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করে।

১৯৭১ সালে ২৫ ও ২৬ মার্চের মাঝরাতে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার আগে ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগের আগে তিনি টিক্কাকে বলেছিলেন, 'তাদেরকে খুঁজে বের কর।' টিক্কার নিষ্ঠুরতা দেখার জন্য ভুট্টো ঢাকায় থেকে গেলেন। ভুট্টো দেখতে পেলেন ঢাকা জ্বলছে। তিনি জনগণের আর্তচিৎকার, ট্যাংকের ঘড় ঘড় শব্দ, রকেট ও গোলাগুলির বিস্ফোরণ এবং মেশিনগানের ঠা-ঠা-ঠা আওয়াজ শুনতে পেলেন। সকালে ভুট্টো, টিক্কা, ফরমান ও আরবাবকে পিঠ

চাপড়িয়ে অভিনন্দন জানান। তিনি তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস দেন। ভুট্টো তার কথা রেখেছিলেন। টিক্কা খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। রাও ফরমান ফৌজি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং ব্রিগেডিয়ার আরবাব প্রথমে মেজর জেনারেল ও পরে লে. জেনারেল পদে উন্নীত হন। ২৬ মার্চ করাচি পৌঁছে ভুট্টো তৃপ্তির সঙ্গে ঘোষণা করেন, 'আল্লাহর রহমতে পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।

রক্তপাত ছাড়াই টিক্কা তার মিশন সম্পন্ন করতে পারতেন। রাজনীতিবিদদের হেফাজতে নেয়া অথবা বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের তাদের বাড়িঘর ও মেস থেকে গ্রেফতার করা কঠিন ছিল না। ইউনিটের অস্ত্রাগারগুলো সময়মতো অবরোধ ও দখল করে নিলে, রেলওয়ে স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড ও সেতুগুলোতে প্রহরা বসালে এবং ট্রাক, বাস ও ফেরিগুলো বন্ধ রাখলে সশস্ত্র ব্যক্তিদের অধিকাংশ ও রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করা যেত। টিক্কা এ ধরনের ব্যবস্থা নিলে যেসব সশস্ত্র ব্যক্তি পালিয়ে যায়, তাদেরকে ভারি অস্ত্র ও পরিবহন ছাড়াই পালাতে হতো; সেক্ষেত্রে তাদের সংগঠিত হতে যথেষ্ট সময় লাগতো। একইভাবে, বিদ্রোহীদের তথাকথিত শক্তঘাঁটিতে জেনারেল টিক্কার ক্ষিপ্র ও তীব্র হামলা চালানোর প্রয়োজন ছিল না। এগুলো খুব সহজেই অবরোধ করা যেত এবং এগুলোতে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ এবং বাইরে থেকে সকল বরবরাহ বন্ধ করে দেয়া যেত। বিদ্রোহীদের সহায়তা দানে বাইরে থেকে হামলার আশংকা এবং ভেতর থেকে হামলা চালানোর অবস্থা বিদ্রোহীদের ছিল না। তাদের আত্মসমর্পণ করতে হতো অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই।

অধ্যায় ৪

কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড

সামরিক অভিযান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সন্তোষজনক ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়। ইয়াকুবের অসময়োচিত পদত্যাগ এবং লক্ষ্য অর্জনে টিক্কার অদক্ষতা ছিল একটি অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়। পূর্ব পাকিস্তান গ্যারিসন থেকে টিক্কাকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমি তখন লাহোরে অবস্থিত ১০ ডিভিশনের কমান্ড দিচ্ছিলাম। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান আমাকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে ডেকে পাঠান।

পরদিন আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে পৌছি এবং সোজা জেনারেল হামিদের অফিসে ঢুকে পড়ি। তিনি আমাকে জানান যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ইস্টার্ন গ্যারিসনের কমান্ডার টিক্কা খানের সামরিক অভিযান পরিচালনায় সন্তুষ্ট নন। তিনি আমাকে আরো জানান যে, কতিপয় জেনারেলের চেয়ে আমি জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও সংকটকালে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট আমাকে ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 'আর কোনো প্রশ্ন?' আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি। আমি উত্তর দিলাম, 'একজন সৈনিকের কর্তব্য হচ্ছে নির্দেশ পালন করা। প্রশ্ন করা অথবা আপত্তি পেশ করা নয়। প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং সেনা কমান্ডার সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন।' আমি আরো বললাম যে, 'আমি প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করব, তারপর আমার ওপর এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করায় আমি ধন্যবাদ জানালাম তাঁকে। তিনি আমার সাফল্য কামনা করে বিদায় জানান।

সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে মিটিংয়ের একদিন পর ১৯৭১-এর ৪ এপ্রিল ঢাকা পৌছালাম। এ পরিবর্তনের কথা শুনে টিক্কা বোকা বনে যান। সক্রিয় অপারেশনকালে একজন কমান্ডারকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ অথবা কমান্ডে রদবদল ঘটানো সংশ্লিষ্ট কমান্ডারের জন্য খুবই অসম্মানজনক। টিক্কা কমান্ড হস্তান্তর স্থগিত রাখার জন্য সম্ভাব্য সব চেষ্টা করেন। তিনি আমাকে তাঁর অধঃস্তন কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ করারও অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনাকে একটা সুযোগ দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু সেই সুযোগ হারিয়েছেন আপনি।' ঢাকা পৌঁছানোর এক সপ্তাহ পর ১০ এপ্রিল টিক্কা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার কাছে কমান্ড হস্তান্তর করেন।

১১ এপ্রিল পুরোপুরি পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়। জেনারেল টিক্কা খান গভর্নর হন। তিনি সামরিক আইন প্রশাসকও ছিলেন। তাই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক আইনের দায়িত্ব পালন উভয়ের জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই সকল গ্রেফতার, শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতো। শফিকুর রহমান ছিলেন চিফ সেক্রেটারি, রাও ফরমান আলী গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা ও ব্রিগেডিয়ার ফকির মোহাম্মদ ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মার্শাল ল'। ব্রিগেডিয়ার জিলানি (পরে লে. জেনারেল ও গভর্নর) আমার সিওএস (চিফ অভ স্টাফ)। মেজর জেনারেল শওকত রিজা ছিলেন ৯ম ডিভিশনের নেতৃত্বে। মেজর জেনারেল খাদিম রাজার স্থলে মেজর জেনারেল রহিম ১৪ ডিভিশনের জিওসি হন। মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ ছিলেন ১৬ ডিভিশনের জিওসি। ব্রিগেডিয়ার নিসারের স্থলে মেজর জেনারেল জামশেদকে সিএএফ (সিভিল আর্মড ফোর্সেস)-এর প্রধান পদে নিযুক্তি দেয়া হয়। রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ নৌবাহিনী ও এয়ার কমোডর ইনাম বিমান বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন।

ভুট্টোর আমলে টিক্কা খান সেনাবাহিনী প্রধান হয়ে এমন একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন যে, আমি তাঁর কমান্ডে কাজ করেছি। যা মোটেও সঠিক ছিল না। আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি ছিলাম সামরিক কমান্ডার এবং কেবলমাত্র সামরিক অপারেশনের জন্য দায়ী। আমি সরাসরি সেনাবাহিনী প্রধানের অধীনে কাজ করেছি। পক্ষান্তরে টিক্কা ছিলেন গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক এবং তিনি প্রেসিডেন্টের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা দুজনে স্বাধীনভাবে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেছি।

টিক্কাকে সাহায্য করার জন্য মেজর জেনারেল মিঠাকে পাঠানো হয়, তিনি অতিরিক্ত সৈন্য চেয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে একটি বার্তা পাঠান। বার্তাটি নিচে দেয়া হলো :

'এ অপারেশন এখন রূপ নিয়েছে একটি গৃহযুদ্ধে। দূরে যাওয়া যাচ্ছে না, রেলগাড়িও ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। কোনো ফেরি অথবা নৌকা পাওয়া যাচ্ছে না। বস্তুত সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে চলাচল একটি প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ অবস্থা চলবে আরো কিছু দিন। সুতরাং সশস্ত্র বাহিনীকে সব ক্ষেত্রে নিজস্ব সামর্থ্যের ওপর চলতে হবে। এ জন্য আমি নিম্নোক্ত ইউনিট গঠন ও পাঠানোর জন্য প্রস্তাব করছি। আলফা-চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য নেভির পোর্ট অপারেটিং ব্যাটালিয়ন, ব্র্যাভো– আর্মি বা নেভি অথবা ইঞ্জিনিয়ার রিভার ট্রান্সপোর্ট ব্যাটালিয়ন ও রিভার মেরিন ব্যাটালিয়ন এবং আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিয়ারের রেল অপারেটিং ব্যাটালিয়ন। চার্লি– নেভির কার্গো ও ট্যাংকার ফ্লোটিলা। রসদ ও সৈন্য চলাচলের জন্য আরো হেলিকপ্টার অপরিহার্য।'

মিঠা খান যেসব ইউনিট গঠন ও পাঠানোর জন্য প্রস্তাব করেছিলেন সেগুলোর একটিও গঠন অথবা পাঠানো হয়নি। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানে লড়াইরত পুরনো ইউনিটগুলোর ঘাটতিও পূরণ করা হয়নি। অথবা পুরনো ইউনিটের জায়গায় নতুন ইউনিটও পাঠানো হয়নি। হাই কমান্ড শুধু আশ্বাসই দিচ্ছিল। কিন্তু তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি।

আমি যখন ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন মিঠা খানকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দেয়া হয়। টিক্কা সামরিক কমান্ডারের বাসভবন ছাড়ছিলেন না। লে. জেনারেল গুল হাসান প্রায়ই সে সময় ঢাকা অবস্থান করতেন। তিনি টিক্কাকে ফ্লাগ স্টাফ হাউস ছেড়ে দিয়ে গভর্নর হাউসে উঠতে রাজি করান।

দায়িত্ব গ্রহণ করে একটি পদ ছাড়া আমি আর কোথাও কোনো রদবদল ঘটাইনি। আমি রদবদল ঘটালাম আমার চিফ অভ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার এল-ইদ্রুসকে। যতদূর মনে পড়ে তিনি ছিলেন হায়দারাবাদ স্টেট ফোর্সের শেষ কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল ইদ্রুসের ছেলে। ব্রিগেডিয়ার এল-ইদ্রুস স্মার্ট ও মার্জিত হলেও তাকে কেন যেন বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। তাকে আমার কাছে ক্লান্ত ও অসুস্থ মনে হলো। এ জন্য আমি তার স্থলে ব্রিগেডিয়ার গোলাম জিলানি লে. জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত), পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব গভর্নর-কে নিয়োগ দান করি। তিনি ঢাকায় সামরিক আইন সদরদপ্তরে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আকবর (ডাইরেক্টর জেনারেল, ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স) আমাকে বললেন যে, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করায় অবসর গ্রহণের জন্য জিলানিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। জিলানি আমার অধীনে দু'বার কাজ করেছে। একবার আমি যখন মালিরে ৫১তম ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলাম তখন সিন্ধুতে একজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার হিসেবে এবং আবার আমি যখন লাহোরে ১০তম ডিভিশনের জিওসি তখন একজন ব্রিগেডিয়ার হিসেবে। তাকে আমি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী ও যোগ্য বলে জানতাম। তাই আমি তাকে সেনাবাহিনীতে রেখে দিতে চেয়েছিলাম। আমি তাকে ব্রিগেডিয়ার এল-ইদ্রুসের জায়গায় চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত করি।

জেনারেল টিক্কা ব্রিগেডিয়ার রহিম দুররানী, ব্রিগেডিয়ার জুলফিকার ও ব্রিগেডিয়ার খুশি মোহাম্মদ খালিদ ও লে. কর্নেল শাফকাত বালুচকে অদক্ষতা ও শত্রুর বিরুদ্ধে সাহস প্রদর্শনে ব্যর্থতার জন্য সৈন্যদের কমান্ড থেকে অপসারণ করেছিলেন। আমার নেতৃত্বকালে ১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল রহিমের সুপারিশে লুটতরাজ ও চুরির অভিযোগে ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে কমান্ড থেকে অপসারণ করা হয়। তদন্ত আদালতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন এবং সামরিক আদালতে বিচার করার জন্য তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়।

জিলানি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং আমার অধীনে তার দায়িত্ব পালনকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পন্ন করেন। তিনি বেশ কিছুদিন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করেন এবং পরে মহাপরিচালক হিসেবে আইএসআই অধিদপ্তরে

বদলি হন। ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী তার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁকে আমি আগে চিনতাম না। তবে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের ভূ-প্রকৃতি, পরিবেশ ও আবহাওয়া আমার কাছে নতুন ছিল না। আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাচি ও টেকনাফে (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান) জঙ্গল যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং বার্মা, সিঙ্গাপুর, মালয় (বর্তমানে মালয়েশিয়া) এবং ডাচ ইস্ট ইন্ডিস (বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া), ও বার্মায় যুদ্ধ করেছি। এসব দেশের ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া কম-বেশি পূর্ব পাকিস্তানের মতো। ব্রিটিশ-ভারত বিভক্তির পর আমি ঢাকায় ১/১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টও কমান্ড করেছি। আমার নামানুসারে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয় 'টাইগার রোড'। সুতরাং ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে আমি পূর্ব পাকিস্তানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলাম।

দায়িত্ব গ্রহণকালে আমি দেখতে পেলাম যে, প্রাদেশিক সরকার অকার্যকর। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও প্রশাসন ছিল জনগণ ও বাঙালি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন। বাঙালিরা ঘৃণিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের কোনোরূপ সহায়তা না করতে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা আমাদের নিজেদের দেশে অবাঞ্ছিত বিদেশি হয়ে পড়লাম। হাট-বাজার ছিল কম-বেশি বন্ধ এবং জীবন ব্যবস্থা অচল। উর্দুভাষীদের ঢাকা বিমান বন্দরে থামিয়ে মারধর করা হতো। সৈন্যদের জন্য কোনো নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল না। সারা প্রদেশেই চলছিল বিদ্রোহ।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট ও ক্যাম্পের আশপাশে যুদ্ধ করছিল এবং ক্যান্টনমেন্ট ও ক্যাম্পগুলো তাদের দুর্গে পরিণত হয়। ঢাকা ও অন্যান্য এলাকায় বিমান ছাড়া যোগাযোগের আর কোনো উপায় ছিল না। যোগাযোগের সব সুযোগগুলো বিচ্ছিন্ন অথবা অকেজো করে দেয়া হয়। বাদবাকি দেশ ছিল মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। তাদের মনোবল ছিল আকাশচুম্বী। অধিকাংশ ফেরি ও ফেরি এলাকাগুলোতে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত ও আন্তর্জাতিক সীমানার চিহ্ন ছিল না কোনো। ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা দুষ্কৃতকারীতে ছেয়ে যায়। গোয়েন্দা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং সর্বশেষ তথ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। আমাদের বিপক্ষে চলে যায় আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম। তারা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক সংবাদ প্রচার করতে থাকে। সরকার এসব অপ্রপ্রচার বন্ধের চেষ্টা করেনি। একসঙ্গে বহুসংখ্যক সৈন্য ছাড়া বাইরে বেরুনো যেত না। দু'একজন করে অথবা ক্ষুদ্র দলে বের হলেই আক্রান্ত হতে হতো। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সর্বত্র মৃত্যুর ফাঁদ। এ জন্য প্রতিটি সৈনিক ধর্মভীরু ও সৎ হয়ে ওঠে। সৈন্যদেরকে প্লাটুন (৩৬ জন সৈন্য) ও কোম্পানিতে (১২০ জন সৈন্য) তাদের নিজ নিজ অফিসারের আওতায় অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হয় এবং সেনাবাহিনী যে ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত হয় সে ধরনের কর্মকাণ্ডে কেউ লিপ্ত হওয়ার সাহস দেখাতে পারতো না। কেউ একা একা বের হওয়ার দুঃসাহস দেখালে সে জীবিত ফিরে আসতে পারতো না। এক কথায়

সামরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ে বিশৃংখলা ছিল চরমে এবং সর্বত্র বিরাজ করছিল বিভ্রান্তি।

আমাদের আগে অনেক দুঃসাধ্য সমস্যা ছিল। কোনো কিছুই মসৃণ ছিল না। বুঝতে পারলাম যে, দুটি জিনিস করতে হবে। এক. হারানো এলাকা পুনর্দখলে একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান বিজয়ের একটি পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। দুই. এটা কোনো সুশৃংখল অভিযান হবে না। এ অভিযান হবে টিকে থাকার জন্য এক নির্মম লড়াই।

আমার অধীনে তিনটি অপূর্ণাঙ্গ ও অর্ধসজ্জিত ডিভিশন ছিল। দুটি ডিভিশনকে বিমান যোগে ঢাকা পাঠানো হয়, এ জন্য তারা তাদের ট্যাংক, কামান, প্রকৌশল সামগ্রী, সাজ-সরঞ্জাম, পরিবহন এবং প্রতিরক্ষা সামগ্রী যেমন– মাইন, কাঁটাতার প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেনি। আমার কমান্ডে মোট ৪৫ হাজার সৈন্য ছিল– এদের মধ্যে ৩৪ হাজার ছিল সেনাবাহিনীর এবং অবশিষ্ট ১১ হাজার ছিল সেনাবাহিনীর বাইরের লোক, এদের মধ্যে ছিল সিএএফ, পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ ও সশস্ত্র বেসামরিক লোকজন। ৩৪ হাজার নিয়মিত সৈন্যের মধ্যে ১১ হাজার ছিল সাজোয়া, গোলন্দাজ, প্রকৌশল, সিগনাল ও সহায়তাদানকারী ইউনিটের সদস্য। মাত্র ২৩ হাজার পদাতিক সৈন্যকে এফডিএল (ফরোয়ার্ড ডিফেন্ডেড লোকালিটিজ) এর ট্রেঞ্চ ও রণাঙ্গনে পাঠানো সম্ভব ছিল। সর্বোচ্চ ৪০ হাজার লোককে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতো পারতাম আমি। আবার এদের অনেকেরই না ছিল পর্যাপ্ত অস্ত্র না ছিল নিয়মিত যুদ্ধের প্রশিক্ষণ। আমি ভারতীয়দের চোখে ধুলো দিই যে, আমার তিনটি অসম্পূর্ণ ডিভিশন নয়; বরং ৪টি পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন রয়েছে। আমাদের শক্তি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকায় ভারতীয়রা আমাদের সৈন্য সংখ্যা ১ লাখ বলে অনুমান করতো এবং তারা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সেভাবে লড়াই করার জন্য নির্দেশ দিত।

আজকের দিনে বিমান বাহিনীর সহায়তা ছাড়া কোনো সেনাবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আমাদের ছিল মাত্র এক স্কোয়াড্রন পুরনো জঙ্গীবিমান। বিমান ঘাঁটি ছিল মাত্র একটি। উল্লেখ করার মতো কোনো রাডার ব্যবস্থাও ছিল না। ৫শ' মাইল সমুদ্র উপকূল এবং তিনটি বড় নদী রক্ষায় আমার হাতে ছিল মাত্র ৪টি নেভাল গানবোট। আমার ডিভিশনগুলো অপারেশনাল এলাকা অথবা ভারতের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধ করার জন্য যথাযথভাবে সুসজ্জিত ছিল না। ট্যাংক, কামান, ট্যাংক-বিধ্বংসী গান ও বিমান-বিধ্বংসী কামানের ঘাটতি ছিল মারাত্মক।

আমাকে চার জন আর্টিলারি ব্রিগেডিয়ারের বদলে দেয়া হয়েছিল মাত্র একজন। ব্যাটালিয়নে কোনো আর্টিলারি উপদেষ্টা ছিল না। সুতরাং মাত্র একজন আর্টিলারি ব্রিগেডিয়ারকে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে আর্টিলারি সহায়তা নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন করতে হতো। শত্রুর ১৩০ মিলিমিটার কামানের পাল্লা ছিল যেখানে ৩০ হাজার গজ সেখানে আমাদের কামানের পাল্লা ছিল মাত্র ১১ হাজার। সহায়ক অস্ত্রশস্ত্রের ঘাটতি ছাড়াও আমার আরেকটি সমস্যা ছিল। আমাদের ক্ষুদ্র অস্ত্রগুলো ছিল জার্মান,

ব্রিটিশ, আমেরিকান ও চীনা। এগুলো ছিল আবার বিভিন্ন ক্যালিভারের। এ জন্য গোলাবারুদের সরবরাহ এবং এক সেক্টর থেকে আরেক সেক্টরে ইউনিটের বদলির সময় সমস্যা হতো খুব। এসব বিষয় খুব সামান্য ও তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলোর সমন্বয় সাধন খুবই জরুরি, নয়তো যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রতিকূলতায় পড়তে হয়।

আমার জন্য বরাদ্দ করা হয় তিনটি মাঝারি ট্যাংক রেজিমেন্ট ও আরেকটি হালকা ট্যাংক রেজিমেন্ট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি পেয়েছিলাম মাত্র একটি ট্যাংক রেজিমেন্ট এবং এম-২৪ লাইট চ্যাফে ট্যাংকসহ এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক। এগুলো ছিল কোরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত ট্যাংক। ১৯৪৪ সালে এ ট্যাংক যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামানো হয়। এতে ৭৫ মিলিমিটার ব্যাসের একটি কামান বসানো থাকে। এসব ট্যাংক ভারতের আধুনিক ট্যাংকের বিরুদ্ধে অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ট্যাংকে ফ্যান বেল্টের বদলে ছিল দড়ি এবং আরো কিছু ট্যাংক ছিল যেগুলোকে অন্যান্য ট্যাংক দিয়ে টেনে টেনে স্টার্ট করাতে হতো। আমার জন্য ৪টি মাঝারি ও একটি ভারী গোলন্দাজ রেজিমেন্ট বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু আমার একটিও ভারী অথবা মাঝারি কামান ছিল না। আমার জন্য যতগুলো ফিল্ড গানের অনুমোদন দেয়া হয় তার মধ্যে পেয়েছিলাম বড়জোর অর্ধেক।

সৈন্যদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা ছিল আরেকটি বড় সমস্যা। জলবায়ু ছিল আর্দ্র, এ ধরনের জলবায়ুতে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজনের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। পূর্ব পাকিস্তানের আর্দ্র জলবায়ুর কারণে সৈন্যদের পায়ে ঘা ও ছত্রাক দেখা দেয়। হাসপাতাল ছিল খুবই কম। এছাড়া, ওষুধ ও ডাক্তার বিশেষ করে বিশেষজ্ঞের অভাব ছিল প্রকট। সামরিক সরঞ্জাম ও চিকিৎসা সামগ্রীর অভাবে মেডিকেল ইউনিটগুলো কাজের উপযোগী ছিল না। সন্তোষজনক ব্যবস্থা ছিল না হতাহতদের সরিয়ে আনার। অনেকেই পথে মারা যেত নয়তো পঙ্গু হয়ে যেত যথাযথ চিকিৎসা না পেয়ে। আহত সৈন্যদের ড্রেসিং করার অথবা তাদের মরফিন ইনজেকশন দেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। আমার সৈন্যরা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শুষ্ক অঞ্চলের লোক। তাদের অনেকেই জীবনে বড় নদী দেখেনি। কোমর পানির চেয়ে বেশি পানিতে কিভাবে সাঁতার দিয়ে পাড়ি দিতে হয় তাও তারা জানতো না। পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি পাঁচ থেকে ছয় মাইলের মধ্যে অন্তত একটি নদী অথবা খাল। বড় বড় নদীগুলো আমাদের কাছে সমুদ্র বলে মনে হতো। অপারেশনকালে সাঁতার, দাঁড় টানা ও ডুব দেয়া শেখানো হতো। এ কারণে বর্ষাকালে প্রদেশব্যাপী সৈন্য চলাচল ব্যাহত হয়।

যুদ্ধ-বহির্ভূত কিছু উপদ্রব ছিল যেগুলো যুদ্ধ সংক্রান্ত ভীতির চেয়েও ছিল বিপজ্জনক। এগুলোর মধ্যে ছিল মশা ও ম্যালেরিয়া, মাছি, ছারপোকা, জোঁক এবং আরো অনেক প্রাণী। বর্ষাকাল কয়েক মাস স্থায়ী হয়। তখন গ্রামাঞ্চল পানিতে ডুবে যায়। গাড়ির বদলে নৌকা। এসব ঘটনা সৈন্যদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

এমন একটি প্রতিকূল পরিবেশে আমাকে প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে বাংলাদেশ সরকার গঠনে বাঙালিদের প্রচেষ্টা নস্যাৎ এবং ভারতীয় আগ্রাসন হলে সে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আমাকে প্রদেশে এক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য ভাঙা মাস্তুল সম্বলিত একটি প্রাচীনকালের জাহাজ দেয়া হয়েছিল। আমার গন্তব্য নির্ধারণে কোনো বাতিঘর ছিল না। আমার মিশন ও দায়িত্বের কোনো লিখিত দিক-নির্দেশনাও আমাকে দেয়া হয়নি। ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী তারই বই *'সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ : বিফোর এন্ড আফটার'*-তে লিখেছেন, 'জেনারেল ইয়াহিয়া ও তার উপদেষ্টারা পুরো বিষয়টিকে এত হালকাভাবে দেখেছেন যে, তারা লে. জেনারেল নিয়াজিকে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দানের প্রয়োজন বোধ করেননি। আমি নিশ্চিত যে, তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবেই বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। কারণ ইয়াহিয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পতন বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাই তিনি এ ঘটনার দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে না নিয়ে লে. জেনারেল নিয়াজির কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন।'

আমাদের ঘাটতি, সমস্যা ও বাধা-বিপত্তি যেমন ছিল তেমনি কিছু সুবিধাও ছিল। সৈন্য পরিচালনায় আমার ছিল ব্যাপক অভিজ্ঞতা। আমার অধীনস্থ সৈন্যরা ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৈন্য। আমরা ছিলাম নিয়মিত বাহিনীর সৈন্য। এছাড়া আমাদের সামরিক ঐতিহ্য ও পটভূমি ছিল। আমার অধীনস্থ অধিকাংশ ইউনিট পাকিস্তানের প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আবার কিছু কিছু ইউনিট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও লড়াই করেছে। আমার সিনিয়র অফিসারগণ বিশেষ করে জেনারেলগণ পাকিস্তানের প্রতিটি যুদ্ধে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। শান্তি ও যুদ্ধকালে তাঁদের সৈন্য পরিচালনায় ছিল বিস্তর অভিজ্ঞতা। আমি লে. কর্নেল থেকে ওপরের দিকে প্রতিটি অফিসার এবং অনেক জুনিয়র কমিশন্ড ও নন-কমিশন্ড সিনিয়র অফিসারদের চিনতাম।

ব্রিটিশরা আমাদের প্রতিপক্ষ বাঙালিদের কখনো একটি যোদ্ধা জাতি হিসেবে বিবেচনা করেনি। তাদের কোনো সামরিক ঐতিহ্য, পটভূমি অথবা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না। তাদেরকে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিশেষ করে লড়াকু ইউনিটে তালিকাভুক্ত করা হতো না। তারা কোনো সুসংবদ্ধ টিম ছিল না, তারা ছিল বিভিন্ন ইউনিট, গ্রুপ বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি মাত্র। তাদের কমান্ডার কর্নেল ওসমানী সে ধরনের লোক ছিলেন না যিনি তার অধঃস্তনদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারেন। তিনি ছিলেন মূলত রয়াল ইন্ডিয়ান আর্মি সার্ভিস কোরের লোক এবং ব্রিটিশ-ভারত বিভক্তির পর তিনি পদাতিক বাহিনীতে বদলি হন। অফিসের কাজকর্মে তার অভিজ্ঞতা ছিল, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনায় তার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সার্ভিসে তিনি ছিলেন আমার সিনিয়র। রাওয়ালপিন্ডিতে যখনি তিনি আমাকে টেলিফোন করতেন তখনি বলতেন, 'টাইগার, সিনিয়র টাইগার

বলছি।' কারণ তিনি ছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিনিয়র অফিসার যাঁর ব্যাজ ছিল টাইগার। আমার সুশৃংখল ও অভিজ্ঞ সৈন্যদের বিরুদ্ধে কর্নেল ওসমানী ও বাঙালিদের লড়াই করে টিকে থাকার সম্ভাবনা ছিল খুবই সামান্য।

আমি আশাবাদী ছিলাম যে, বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি এবং ভারতও তাদেরকে দৈহিক, অস্ত্রগত ও আর্থিক সহায়তা এবং রাশিয়া তাদেরকে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেয়া সত্ত্বেও আমরা সফল হব। ভারতীয়রা তখনো ইউনিট অথবা ফরমেশনের আকারে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না। বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতীয় অফিসার ও অন্যান্য পর্যায়ের লোকজনের উপস্থিতি ছিল। যেমন–সেতু ও রাস্তাঘাট ধ্বংস ইত্যাদি এবং বাঙালিদের শক্তি ও নৈতিক মনোবল বৃদ্ধিসহ কয়েকটি। ভারত সরকার জয়লাভের ব্যাপারে ১শ' ভাগ নিশ্চিত না হয়ে অথবা যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া বিশৃঙ্খলভাবে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ অথবা প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছানোর পর আমি এলাকা এবং বিরাজিত পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কমান্ড গ্রহণকালে আমি যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে জ্ঞাত ছিলাম। তাই ডিভিশনের কমান্ডারদের কাছে নতুন করে নির্দেশ পাঠাতে আমাকে বেগ পেতে হয়নি। প্রতিটি লড়াইয়ের আগে, লড়াই চলাকালে এবং লড়াই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শন অব্যাহত রাখি। সারাক্ষণ আমাকে টেলিফোন অথবা ওয়ারলেসে ব্যস্ত থাকতে হতো। টেলিফোনের কাজে নিয়োজিত ছিল বাঙালিরা। তাই তা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। ওয়ারলেস একটি ভালো সংযোগ কিন্তু এটা ব্যক্তিগত যোগাযোগের বিকল্প নয়। আমার পরিদর্শন টনিকের মতো কাজ করতো এবং সকল স্তরের সৈন্যরা অভিনন্দন জানাতো। আমি শুধু ইউনিট অথবা ফরমেশনের সদর দপ্তরই নয়, সৈন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অগ্রবর্তী এলাকাও পরিদর্শন করেছি।

যুদ্ধের পরিকল্পনা আমি করতাম, এ ব্যাপারে আমি ডিভিশন ও অন্যান্য ইউনিটের কমান্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করতাম। তবে সার্বিক কৌশলগত পরিকল্পনা ও টেকনিক্যাল সিদ্ধান্ত ছিল আমার।

অধ্যায় ৫

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সৈন্য মোতায়েন

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের তিন দিক ভারত দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণ-পূর্বে একটি ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে রয়েছে বার্মা সীমান্ত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এটা হচ্ছে একটি ভাটি এলাকা। এখানে অসংখ্য নদ-নদী ও খাল রয়েছে। তিনটি বড় নদী—মেঘনা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র বর্ষাকালে পানিতে ভরে গিয়ে সমুদ্রের রূপ ধারণ করে। এসব নদী পূর্ব পাকিস্তানে চলাচলের পথে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভৈরব ও পাকশি—এ দুটি হচ্ছে গোটা অঞ্চলের দুটি বড় সেতু। সড়ক ও সেতুর স্বল্পতার কারণে চলাচলের জন্য নৌকা ও ফেরি ব্যবহার করতে হয়। নৌকা ও ফেরিতে চলাচলের জন্য সময় লাগে বেশি এবং এগুলোতে হামলা করাও সহজ। নদী পথের এ বাধা অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিমানে পাড়ি দেয়া অথবা ছত্রী সেনা নামানো। ১৯৭১ সালে ভারতীয়রা তাই করেছিল।

এ অঞ্চলের আবহাওয়া হচ্ছে আর্দ্র ও উষ্ণ। বর্ষাকাল হচ্ছে দীর্ঘ এবং সে সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং এ অঞ্চলের আবহাওয়ায় যারা অভ্যস্ত নয় তাদের কাছে তা অসহ্য। এটা তাদের শক্তি ক্ষয় করে। শুষ্ক অঞ্চলের লোকের কাছে আর্দ্র জলবায়ু বিপজ্জনক। অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো ম্যালেরিয়া। এছাড়া, আর্দ্র আবহাওয়ায় রয়েছে জোঁক ও অন্যান্য নোংরা পোকামাকড়ের উপদ্রব। এগুলো ঠিকমতো রোধ করতে না পারলে যুদ্ধের চেয়েও বেশি সৈন্য মারা যেতে পারে।

প্রধান নদীগুলো সমগ্র দেশকে চারটি পৃথক ভূখণ্ডে বিভক্ত করে রেখেছে।

রংপুর-রাজশাহী সেক্টর : পাকশির কাছে একটিমাত্র রেল সেতু রয়েছে যা কুষ্টিয়া-খুলনা অঞ্চলকে দক্ষিণের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে মাত্র একটি বড় রাস্তা। ঢাকা সেক্টরের সঙ্গে সংযোগ সাধনে যমুনা নদীতে কোনো সেতু নেই। ঠাকুরগাঁয়ে হালকা বিমান অবতরণ উপযোগী একটি ছোট্ট বিমান ক্ষেত্র রয়েছে।

কুষ্টিয়া-খুলনা সেক্টর : এ অঞ্চলে দুটি বড় রাস্তা রয়েছে। একটি রাস্তা কুষ্টিয়া থেকে চলে গেছে খুলনা এবং আরেকটি গেছে বেনাপোল থেকে ভারত সীমান্তবর্তী যশোর-ঝিনাইদহ-ফরিদপুর পর্যন্ত। এ অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রচুর নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে। এ জন্য এখানে সোজাসুজি চলাচল করা কঠিন। যশোরে একটি ভালো বিমান ক্ষেত্র ও চালনায় একটি সমুদ্র বন্দরও রয়েছে।

সিলেট-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সেক্টর : চট্টগ্রাম হচ্ছে একটি সামুদ্রিক বন্দর। মেঘনা নদী এ অঞ্চলকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তবে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রামের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। ভৈরব বাজারে রেলওয়ের একমাত্র সেতু ঢাকার সঙ্গে প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের সংযোগ রক্ষা করছে। কোথাও কোথাও এ রেল লাইন আগরতলা সীমান্ত স্পর্শ করেছে। চট্টগ্রাম ও সিলেটের মধ্যেও সরাসরি সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। পথে প্রচুর নদী থাকায় চলাচল মন্থর ও দুষ্কর। চট্টগ্রামে একটি বিমান ক্ষেত্র রয়েছে। তবে শুধুমাত্র হালকা বিমান ওঠানামা করতে পারে।

ঢাকা সেক্টর : এটা হচ্ছে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। এ অঞ্চলের পশ্চিমে রয়েছে যমুনা নদী এবং পূর্বদিকে মেঘনা। ময়মনসিংহ থেকে একটি রাস্তা সোজা ঢাকা এসেছে। এটা হচ্ছে ভারত সীমান্ত থেকে ঢাকা পর্যন্ত সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ বিপজ্জনক রুট। ব্রহ্মপুত্র নদ হচ্ছে এ অঞ্চলের প্রধান প্রতিবন্ধকতা। মাঝে মধ্যে ছোট-ছোট নদীও রয়েছে। ঢাকায় একটি বৃহত্তম বিমান ক্ষেত্র রয়েছে। এফ-৮৬ জঙ্গীবিমান ওড়ার জন্য এ বিমান ক্ষেত্র উপযোগী।

গোটা প্রদেশের অভ্যন্তরে সড়ক যোগাযোগ মোটামুটি ভালো। কিন্তু নদ-নদীর প্রতিবন্ধকতার জন্য এক সেক্টর থেকে আরেক সেক্টরে সৈন্য চলাচল দুঃসাধ্য।

যোগাযোগ

সামরিক অভিযানে যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ : রেল যোগাযোগ সীমিত। পাকা রাস্তা কম ও উঁচু। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্বের অদ্বিতীয়; নদীপথ, রেলপথ ও সড়ক পথ। বিশ্বের আর কোথাও এমন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পাকা রাস্তাগুলো কমপক্ষে পনের থেকে কুড়ি ফুট উঁচু। এসব রাস্তার নিচে কৃষি জমি। জমিতে কোথাও শাক-সবজি, কোথাও ধান-পাট, কোথাও বা জলাবদ্ধতা। কোথাও কোথাও জমিতে চার থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত পানি। এ জন্য পানি নিষ্কাশন করে কাদা মাটিতে পরিখা খনন করতে হতো। কোনো রকমে পরিখা খনন করা হলে দেখা যেত বৃষ্টির পানিতে এগুলো তলিয়ে গেছে। ভৈরব সেতু ঢাকা বিভাগকে চট্টগ্রাম বিভাগের সঙ্গে এবং পাকশি সেতু খুলনা বিভাগকে রাজশাহী বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করেছে। কিন্তু রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সঙ্গে ঢাকা বিভাগের

কোনো সংযোগ সেতু নেই। সুতরাং রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকা বিভাগের মধ্যে সব ধরনের চলাচলের মাধ্যম হচ্ছে নৌযান অথবা আকাশপথ। ফেরি দিয়ে নদী পারাপার হতে হয়।

একটি ছোট্ট উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে প্রদেশে চলাচল কত কঠিন। ঢাকা থেকে যশোর যেতে হলে প্রথমে যেতে হয় নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে অথবা সড়ক পথে। পরে নারায়ণগঞ্জ থেকে খুলনা অথবা গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত স্টিমারে এবং সেখান থেকে যশোর পর্যন্ত ব্রড-গেজ রেলপথে। ঢাকা থেকে যশোরের দূরত্ব ৭৫ মাইল। এটুকু পথ যেতে সময় লাগে দুদিন। তিনবার যানবাহন পরিবর্তন করতে হয়। একইভাবে সিলেট থেকে যশোর যেতেও তিন থেকে চারবার যানবাহন পাল্টাতে হয়, কখনো সড়কপথে, কখনো দুধরনের রেলপথে আবার স্টিমারে।

বিদ্রোহ দমন অভিযানে সৈন্য মোতায়েন

যখন আমি ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করি, তখন বিরাজমান পরিস্থিতি আমাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেনানায়ক ফিল্ড মার্শাল ফচের একটি উক্তি মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেছিলেন, 'আমার কেন্দ্রভাগ ভেঙে পড়ছে। আমার দক্ষিণ পাশেরও পতন ঘটেছে তবু পরিস্থিতি চমৎকার। আমি অবশ্যই হামলা করব।' আমি নিজে যে বলি, 'আমার কেন্দ্রভাগ বিধ্বস্ত। আমার উভয় পাশের পতন ঘটেছে। পরিস্থিতি ভালো হওয়ার লক্ষণ নেই। আমাকে এ অবস্থায়ও হামলা চালাতে হবে।' তাই করেছিলাম আমি। ত্বরিৎগতিতে আমি হামলা চালাই এবং আল্লাহ্‌র রহমতে যুদ্ধের প্রথম রাউন্ডে পূর্ণ সফলতা অর্জন করি। প্রশিক্ষণ ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সব ফরমেশনে দুটি চিঠি পাঠাই। চিঠি দুটি ৩ ও ৪ পরিশিষ্টে দেয়া হলো।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছিল তিন দিক থেকে ভারত পরিবেষ্টিত। সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৩ হাজার মাইল (২৫০০ মাইল স্থল ও ৫শ' মাইল সমুদ্র)। এ সীমান্ত অভিন্ন রেখায় অথবা অর্ধবৃত্তাকার অবস্থায় নেই। তবে সীমান্ত প্রদেশটিকে কম-বেশি একটি পূর্ণ বৃত্তে রূপ দিয়েছে। বড় বড় নদীগুলো মাঝ বরাবর প্রবাহিত হওয়ায় দেশটি ৪টি অংশে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এ জন্য অব্যাহত প্রতিরক্ষা লাইন রক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

টিক্কার সৈন্য মোতায়েন আমি অক্ষুণ্ন রাখি। আমি গেরিলাদের উচ্ছেদ করার সংকল্প গ্রহণ করি। এ জন্য আমার সামনে দুটি পথ খোলা ছিল :

ক. সীমান্তের দিকে গেরিলাদের ঠেলে দেয়া এবং চূড়ান্তভাবে তাদের ধ্বংস করা অথবা ভারতের অভ্যন্তরে ঠেলে দেয়া। এতে সময় লাগতে পারে এবং জান-মালের প্রচুর ক্ষতিও হতে পারে। আমাকে লড়াই করতে হবে গেরিলাদের সুবিধাজনক অবস্থানে যেখানে তারা পুনরায় শক্তি বৃদ্ধি এবং সুযোগ মতো প্রত্যাহারের সুবিধা ভোগ করছে এবং তাদের এ সুবিধা শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তান
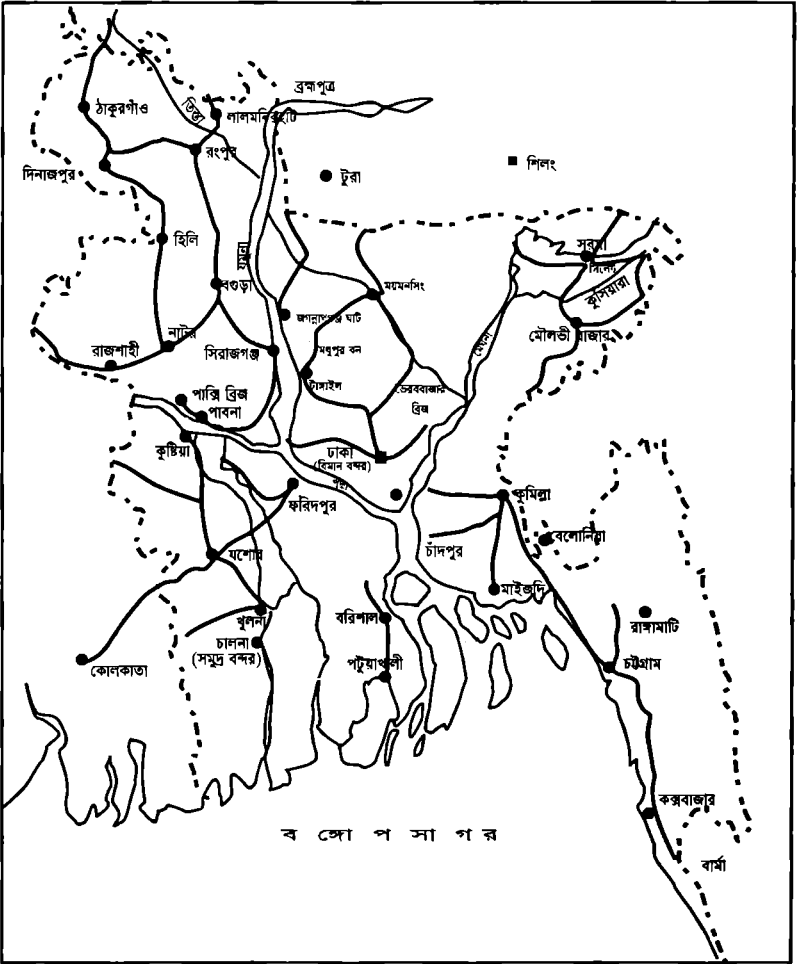
খ. উভয় পাশের ও পেছনের অবস্থানের চিন্তা বাদ দিয়ে সীমান্তের দিকে বিরাট বহর নিয়ে অগ্রসর হওয়া এবং গেরিলাদের পুনরায় শক্তি বৃদ্ধি ও প্রত্যাহারের রুট বন্ধ করে দেয়া। আমাদের ক্ষিপ্র অভিযান ও উপর্যুপরি হামলায় আমরা বিস্ময় উৎপাদন করব এবং এভাবে গেরিলাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করব। এ প্রক্রিয়ায় গেরিলারা তাদের অবস্থান ত্যাগে বাধ্য হবে এবং নিরাপত্তার জন্য ভারতের দিকে পালাবে।

আমি দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

জেনারেল টিক্কার সৈন্য মোতায়েন পদ্ধতি ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক। আক্রমণ অভিযানে নামার আগে গ্রুপিং এবং সৈন্য মোতায়েনে কিছুটা পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন ছিল। আমি বিস্ময় সৃষ্টি এবং শত্রুর আক্রমণ করার ক্ষমতা ধ্বংস করতে চেয়েছিলাম। সুতরাং দ্রুত সীমান্তে পৌঁছানোর জন্য গতি ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই আমি সামান্য পরিবর্তন ঘটাই। ফরমেশনগুলোকে নতুন দায়িত্ব দিই এবং ক্ষিপ্র অভিযানের জন্য তাদের প্রস্তুত হতে বলি। আমি স্রেফ তাদেরকে বললাম, 'সর্বোচ্চ গতিতে সংক্ষিপ্ততম সময়ে সীমান্তে পৌঁছে যাও।'

আমি নিচের চারটি পর্যায়ে পালনীয় নির্দেশ জারি করি :

পর্যায় ১ : সীমান্তবর্তী সকল বড় শহর মুক্ত করা এবং অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের রুটগুলো বন্ধ করে দেয়া। চট্টগ্রাম ঘাঁটি মুক্ত করা এবং এটাকে আর্টিলারি ও মর্টারের গোলাবর্ষণ থেকে নিরাপদ রাখা।

পর্যায় ২ : প্রয়োজনীয় নদী, সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা খুলে দেয়া।

পর্যায় ৩ : মুক্তিবাহিনীর কব্জা থেকে অভ্যন্তরীণ সকল শহর ও উপকূলীয় এলাকা উদ্ধার করা।

পর্যায় ৪ : সারা প্রদেশে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা এবং বিদ্রোহী/ অনুপ্রবেশকারীদের নির্মূল করা।

অন্তত ১৯৭১ সালের ১৫ মে'র মধ্যে এসব কাজ সম্পন্ন করতে হবে। গতি ও উপর্যুপরি হামলার জন্য পুরস্কার প্রদানের ওপর জোর দেয়া হয়।

সৈন্যদল এবং দায়িত্ব

মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ্‌র আওতাধীন ১৬ ডিভিশনকে রাজশাহী সিভিল ডিভিশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া এ ডিভিশনের ওপর দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী ধরে রাখার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। ভারতীয় ক্যান্টনমেন্ট কাছে থাকায় এবং এলাকাটি ট্যাংক চলাচলের জন্য উপযোগী হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র ট্যাংক রেজিমেন্টটি দেয়া হয় এই ডিভিশনকে।

মেজর জেনারেল শওকত রিজার নেতৃত্বাধীন ৯ম ডিভিশনকে ঢাকা ও খুলনা বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় এবং একটি বিমান বন্দর থাকায় ঢাকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার উত্তরাংশে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তবে মধুপুর জঙ্গল ও টাঙ্গাইল শহরের আশপাশে আত্মগোপন করার মতো ভালো অবস্থান ছিল। শক্তি দিয়ে ময়মনসিংহকে রক্ষা করতে হবে। রাজশাহী বিভাগের পর পরবর্তী অগ্রাধিকার দেয়া হয় খুলনা বিভাগের ওপর। যশোরকেও শক্তি দিয়ে ধরে রাখতে হবে। ফরিদপুরের ওপর ঢাকা ও যশোরের নিরাপত্তা নির্ভর করছে বলে এটাকে ধরে রাখতে হবে।

জলাবদ্ধ এলাকা চালনা, বরিশাল ও সুন্দরবনের দায়িত্ব দেয়া হয় সিএএফ'র ওপর।

মেজর জেনারেল আবদুর রহিম খানের নেতৃত্বাধীন ১৪ ডিভিশনকে চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামকে ধরে রাখতে হবে। চট্টগ্রাম ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রামে কমান্ডো মোতায়েন করা হয়।

ডিভিশনের এলাকা এবং দায়িত্ব বণ্টনের পর এগুলো পরিদর্শনে যাই আমি। এরপর আমি আমার বিস্তারিত পরিকল্পনা, পরবর্তী গ্রুপিং এবং ফরমেশনের নতুন সীমানা বণ্টনের কাজ শুরু করি।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, যেখানে জনগণ আপনার বিপক্ষে এবং আপনার শত্রুর প্রতি সহানুভূতিশীল এমন একটি বৈরি ভূখণ্ডে কোনো শক্তি টিকতে পারে না। বিশ্বাসঘাতকরা শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করায় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও সাহসিকতা সত্ত্বেও জাতির মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। আমাদেরকে ভেতর ও বাইরের উভয় শক্তিকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। টিক্কা খানের নিষ্ঠুর সামরিক অভিযানের পর স্থানীয় জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং একটি বৈরি ভূখণ্ডে আমরা বিদেশিদের মতো হয়ে যাই। বাঙালিরা আমাদেরকে 'দখলদার বাহিনী' বলতো। মুক্তিবাহিনী শুধু স্থানীয় জনগণ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নয়, ভারতের গোটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কাঠামো এবং রুশ উপদেষ্টাদের সহযোগিতাও পেত।

যদিও প্রতিপক্ষ সংখ্যায় ছিল বেশি এবং তারা ছিল স্থানীয় আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত ও রণাঙ্গনের সঙ্গে পরিচিত এবং আক্রমণ করার সামর্থ্যের অধিকারী তবু আমরা রেকর্ড সময়ে সাফল্যের সঙ্গে প্রথম পর্যায় ও দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন করি। ১৯৭১ সালে এপ্রিলের শেষ নাগাদ আমরা সব সীমান্ত শহর ও বিওপি দখল, অনুপ্রবেশের রুট বন্ধ এবং পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পুনরুদ্ধার করি। মে মাসের শুরুতে চট্টগ্রাম, খুলনা ও চালনার সমুদ্র রুট ও নদীগুলো মুক্ত করি এবং এসব বন্দরে নৌযান ও জাহাজ চলাচল পুনরায় শুরু হয়। প্রদেশে রেলযোগাযোগও পুনরুদ্ধার করা হয়।

১৯৭১ সালের ১৩ মে আমি রাওয়ালপিন্ডিতে একটি বার্তা পাঠাই যেখানে আমি সর্বশেষ পরিস্থিতি, বিদ্রোহী তৎপরতার ধরন, ভারতীয় হস্তক্ষেপের বিস্তৃতি, সীমান্তের পরিবর্তন এবং বিভিন্ন ফরমেশনের ওপর ন্যস্ত এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিই। শহর এলাকায় পরাজিত হয়ে বিদ্রোহীরা প্রত্যন্ত এলাকায় পিছু হটে অথবা সীমান্তের ওপারে চলে যায়। প্রায় ৩০ হাজার বিদ্রোহী নিহত অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

নতুন বিন্যাসে সৈন্য মোতায়েন করা হয় যা নিম্নরূপ :

মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ-এর নেতৃত্বাধীন তিনটি ব্রিগেড ও একটি সাজোয়া রেজিমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত ১৬ ডিভিশনকে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়।

মেজর জেনারেল এম. এইচ. আনসারীর নেতৃত্বাধীন দুটি ব্রিগেডের সমন্বয়ে গঠিত ৯ম ডিভিশনকে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, ভোলা দ্বীপ, পটুয়াখালী, খুলনা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়। পাকশি সেতুও ঐ ডিভিশনের ওপর অর্পন করা হয়।

পানিবদ্ধ এলাকা চালনা, বরিশাল ও সুন্দরবনের দায়িত্ব সিএএফ'র ওপরই ন্যস্ত রাখা হয়।

মেজর জেনারেল রহিম খানের নেতৃত্বাধীন তিনটি ব্রিগেডের সমন্বয়ে গঠিত ১৪ ডিভিশনের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয় ময়মনসিংহ, সিলেট এবং কুমিল্লা পর্যন্ত এবং আরো অন্তর্ভুক্ত করা হয় ফেনী নদী, নোয়াখালি ও ঢাকাকে। এছাড়া, ১৪ ডিভিশনের ওপর ভৈরব সেতুর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

একটি স্বতন্ত্র ব্রিগেড ও ইস্টার্ন কমান্ডের অধীনস্থ কমান্ডোদের ওপর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

নতুন করে সৈন্য বিন্যাসে নিচের পরিবর্তন ঘটানো হয় :

যুদ্ধের চাপে নিস্তেজ ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ায় মেজর জেনারেল শওকত রিজাকে ৯ ডিভিশনের কমান্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। পদোন্নতি দেয়া হয় ব্রিগেডিয়ার এম. এইচ. আনসারীকে এবং তাকে ৯ ডিভিশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই ডিভিশনের মূল কাজ ছিল ঢাকা ও খুলনার সিভিল ডিভিশনের প্রতিরক্ষা। এক ব্রিগেড বাদে এ ডিভিশনকে শুধুমাত্র খুলনা বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়।

চট্টগ্রাম সিভিল ডিভিশনের দায়িত্ব দেয়া হয় ১৪ ডিভিশনকে। এ এলাকা এত বড় ছিল যে, একটি ডিভিশনের পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে ওঠে। তাই এ এলাকাকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়। ফেনী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে এ ডিভিশনের আওতা থেকে বাদ দেয়া হয় এবং তাদের ওপর ফেনীর উত্তরে একটি সংযুক্ত এলাকার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৬ ডিভিশনের এলাকায় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।

এ সৈন্য বিন্যাস এবং এলাকা পুনর্গঠন রণকৌশলের দিক থেকে আরো কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। ফরমেশন কমান্ডারদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে বলা হয়। ভবিষ্যৎ কাজের মধ্যে ছিল যোগাযোগের উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি। শক্ত ঘাঁটির ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা ব্যূহ এবং অবস্থানে গোলাবারুদ

ও রেশনের মজুদ গড়ে তুলতেও নির্দেশ দেয়া হয়।

১৯৭১ সালের মে মাসের শেষদিকে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে, বিরাট ক্ষতি হয় তাদের জানমালের। বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙে যায়। তারা দুর্গম এলাকায় অথবা ভারতের মাটিতে নিরাপদ ঘাঁটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এ পরিস্থিতিতে ভারত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে বিদ্রোহীদের মনোবল চাঙ্গা করার পদক্ষেপ নেয়। ভারতীয়রা সীমান্তের কাছে আমাদের অবস্থানে সরাসরি হামলা করে এবং সীমান্তের ওপার থেকে গোলাবর্ষণ করে বিদ্রোহীদের তৎপরতায় সমর্থন যোগাতে থাকে। কিন্তু হতোদ্যম বিদ্রোহীরা আমাদের সৈন্যদের সামনে দাঁড়াতেই পারছিল না। তারা ভয়ে পালিয়ে যেত নয়তো ভারতে আশ্রয় নিত।

এসব অভিযানকালে প্রায় ৪০ হাজার রাইফেল, ১০টি ভারি মেশিনগানসহ ৬৫টি মেশিনগান, ১৪০টি হালকা মেশিনগান, ৩১টি মর্টার, ১২টি রিকয়েললেস রাইফেল ও প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ আমাদের হাতে আটক হয়। আমাদের ঝড়োগতিতে সামরিক অভিযান চালানোর ফলে শত্রুদের এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র খোয়া যায় এবং তাদের এত প্রাণহানি ঘটে। যে গতিতে এসব সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয় গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাসে সে ধরনের নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রচণ্ড গতিতে হামলা চালানোর ফলেই শত্রুরা ভেঙে পড়ে। তারা যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং আত্মরক্ষার জন্য এদিক-সেদিক ছুটে যায়। এ সময় তারা প্রচুর গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিবহন ফেলে রেখে যায়। তারা সংগঠিত উপায়ে নয় বরং চরম বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পিছু হটে। স্থানীয় জনগণের সক্রিয় সমর্থন এবং ভারতীয়দের সহযোগিতা দান সত্ত্বেও দু'মাসেরও কম সময়ে বিদ্রোহীরা তাদের নিজেদের এলাকায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

এ অভিযানকে সঠিকভাবে বলা যেতে পারে 'বজ্র অভিযান'। আমি এসব অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট পাঠাই এবং ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেয়া মুক্তিবাহিনীর ওপর হামলা চালাতে ভারতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করি। জেনারেল হামিদ আমাকে টেলিফোনে বললেন, 'প্রেসিডেন্ট ও আমি উভয়ে আপনার বিস্ময়কর সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত। তবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করবেন না। আমি শিগগির আপনার সঙ্গে আপনার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করব।' ব্যস এটুকুই।

সীমান্ত বন্ধ এবং যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় আমাদের দ্রুত অভিযান পাল্টে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর হিসাব। ভারতীয়রা ধারণা করেছিল যে, মুক্তিবাহিনী প্রদেশের ভেতরে বড় বড় শহর ও ক্যান্টনমেন্টের আশপাশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ব্যস্ত রাখবে এবং আমাদের সরবরাহে ঘাটতি ও অনিয়মের দরুন কয়েক মাসেই তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে। জেনারেল

টিক্কা কমান্ডে থাকলে অথবা তার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি কাজ করলে ভারতীয় কৌশলবিদদের এ সহজ সমীকরণ সফল হতো। ভারতীয়রা হিসাব করেছিল যে, একজন গেরিলা একজন করে পাকিস্তানি সৈন্য হত্যা করতে পারলে কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তান গ্যারিসন ফাঁকা হয়ে যাবে।

মেজর জেনারেল ফজল মুকিম খান (অব.) তাঁর *পাকিস্তান'স ক্রাইসিস ইন লিডার শিপ* বইয়ে লিখেছেন যে, 'বিদ্রোহী বাহিনী ভারতে পিছু হটে এবং মনোবল হারিয়ে ফেলে। তাদের মধ্যে বিশৃংখলাও চরমে পৌঁছে। পিছু হটে যাবার পথে তারা রাস্তাঘাট, নৌযান ও পরিবহন ধ্বংস করেছে। যেগুলো তারা ভারতে নিয়ে যেতে পারেনি সেগুলো হয় তারা ধ্বংস করেছে নয়তো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।'

'সশস্ত্র বাহিনী দ্রুতগতিতে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। অভিযানে তারা যে ক্ষিপ্রগতির পরিচয় দিয়েছে তাতে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই বিস্মিত হয়েছে। তাদের এ্যাকশন সেসময় ভারতকে পূর্ব পাকিস্তানে দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে বিরত রেখেছে। তাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা তারা অর্জন করেছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব ছিল সরকারের।'

ফজল মুকিম তার বইয়ের ১২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

'সেপ্টেম্বরে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে মোটামুটি শান্তি ছিল এবং মনে হচ্ছিল প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসছে। এর কারণ হচ্ছে বর্ষকালে মুক্তিবাহিনীর বহুল প্রচারিত অভিযান ব্যর্থ হয়। ভারতে বিদ্রোহীদের ক্যাম্পে বিদ্রোহের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। মুক্তিবাহিনী নিঃশেষ হয়ে যাবার মতো এবং আত্মসমর্পণ করার মতো অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল বলেও জানা গেছে। কিন্তু এ পরিস্থিতির কোনো রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করা হয়নি।'

মেজর জেনারেল শওকত রিজা (অব.) তার *'দ্য পাকিস্তান আর্মি : ১৯৬৬-৭১'* বইয়ে লিখেছেন :

'পাকিস্তান সেনাবাহিনী বহু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ৮ সপ্তাহে প্রায় সব শহরে সরকারি কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। বিদ্রোহ দৃশ্যত নির্মূল হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা নাজুক অবস্থায় পৌঁছে। কতিপয় বাঙালি নেতা রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করছিলেন। এ ধরনের একটি সমাধানের জন্য সেটাই ছিল সঠিক সময়। কিন্তু আমরা এ সুযোগ হাতছাড়া করি। এরপর পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে।'

'প্রায় সব শহরে সরকারি কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করা হয়। বিদ্রোহীরা নিহত কিংবা গ্রেফতার হয় অথবা পালিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আত্মগোপন করে অথবা ভারতে পালিয়ে যায়। বাঙালি পুলিশ ও আমলারা ধীরে ধীরে তাদের কাজে ফিরে আসেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে থাকেন।'

মেজর জেনারেল খুশবন্ত সিং তার *দ্য ইনডিয়ান আর্মি আফটার ইনডিপেনডেন্স* বইয়ের ৪৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

'সীমান্তের ভেতর ও বাইরে থেকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবল চাপের মুখে পড়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ৪২ হাজার নিয়মিত সৈন্যের পাকিস্তান বাহিনীকে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী একটি বিদ্রোহ মোকাবেলা করতে হয়েছে। তারা প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হলেও তাদেরকে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ দমন অভিযানে বহু মূল্য দিতে হয়েছে। প্রাণহানির সংখ্যা অনেক। ২৩৭ জন অফিসার, ১৩৬ জন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও ৩,৫৫৯ জন সৈন্য নিহত হয়েছে।'

যখন জেনারেল আবদুল হামিদ খান ১৯৭১ সালের জুনে আমাদের দেখতে এলেন আমি তাকে জানাই যে, আমরা অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে বিরাট নৈতিক, রাজনৈতিক ও কৌশলগত বিজয় অর্জন করেছি। আমাদের মনোবল উঁচু। পক্ষান্তরে, বাঙালিদের নিচু। বাঙালিরা রয়েছে দৌড়ের ওপর। এতে ভারতীয়রা হাত গুটিয়ে নিচ্ছে এবং রুশরা বিস্মিত হয়ে গেছে। আমার সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, ভারতীয়রা মর্ম জ্বালায় ভুগছে। আমি আরো বললাম যে, সময় থাকতে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে। ভারতীয় ভূখণ্ডে বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে হামলা করে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে এবং এভাবে বিদ্রোহীদের ভবিষ্যতে সহায়তা দানে ভারতকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে হবে। আমার কথা মতো কাজ করা হলে লাখ লাখ ভারতীয়কে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে হতো। সে ক্ষেত্রে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা তছনছ হয়ে যেত এবং সরকারি অফিস ও অন্যান্য জায়গায় লোকজন আশ্রয় নিত। এভাবে ভারতের বেসামরিক প্রশাসনের জন্য অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি হতো এবং ভারতীয় সৈন্যদের যে কোনো অভিযান বাধাগ্রস্ত হতো। তখন পর্যন্ত আমরা আমাদের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে লড়াই করছিলাম এবং বৈষয়িকভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছিলাম। কিন্তু ভারত সরকার যদি নিজেদের জনগণকে দুর্ভোগের মধ্যে দেখতে পেত এবং তাদের সম্পদের হানি ঘটতো তাহলে তারা তাদের আগ্রাসী মনোভাবে বিরতি দিতে বাধ্য হতো। উপরন্তু, মুক্তিবাহিনীর সংগঠিত প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে যেত। ফলে তাদের মনোবলে চিড় ধরতো এবং বিশৃংখল হয়ে পড়তো।

ভারতীয় সেনাবাহিনী সে মুহূর্তে আমাদের অপ্রত্যাশিত হামলা মোকাবিলায় মোটেও প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ইতোমধ্যে ভারতীয়রা সংঘটিত হয়ে যায় এবং আমার অগ্রাভিযান মোকাবিলার মতো অবস্থায় পৌঁছে যায়। আমাকে অনুমতি দেয়া হলে আমি গেরিলা ক্যাম্প ধ্বংসের মাধ্যমে তাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন, গেরিলাদেরকে ভারতের গভীর অভ্যন্তরে বিতাড়িত এবং সীমান্তে মোতায়েন ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিতে পারতাম। সামনেই ছিল বর্ষাকাল। তাই আমরা এ উদ্যোগ নিলে সে সময় ভারতীয়রা তাদের ভারী অস্ত্র ও বিমান বাহিনী ব্যবহার করে আমাদেরকে আমাদের অবস্থান থেকে হটাতে পারতো না। এ সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্যারিসন এগিয়ে এলে আমরা সফল হতাম।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল যে, আমার ডিভিশনগুলোতে ট্যাংক ও কামানের

ঘাটতি পূরণ এবং আমাকে এক স্কোয়াড্রন আধুনিক জঙ্গীবিমান ও বিমান-বিধ্বংসী সরঞ্জাম এবং একটি পদাতিক ব্রিগেড দেয়া হলে আমি আগরতলা ও আসামের এক বিরাট অংশ দখল করে নেব এবং পশ্চিমবঙ্গে উপর্যুপরি চাপ সৃষ্টি করব। আমরা হুগলি নদীর ওপর সেতু এবং জাহাজ ও নৌযান ধ্বংস করে কলকাতার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেব এবং বেসামরিক লোকজনের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি জিরো ফাইটার যেভাবে কলকাতায় বোমা ফেলেছিল সেভাবে এ শহরে একবার বিমান হামলা হলে কলকাতা জনশূন্য হয়ে পড়বে।

আমার তৃতীয় প্রস্তাব ছিল : আমার ঘাটতি পূরণ করতে হবে, আমাকে আরো দুটি ডিভিশন, কয়েকটি জঙ্গীবিমান ও কয়েকটি বিমান-বিধ্বংসী কামান দিতে হবে (পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ক্ষুণ্ণ না করে আমার এ দাবি সহজে পূরণ করা যেত) এবং আমাকে এগুলো সরবরাহ করা হলে আমি ভারতের মাটিতে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নয়; গোটা পাকিস্তানের লড়াই চালাতে পারব। আমাদের পাঁচ ডিভিশনের বিপরীতে ভারতকে অন্তত ১৫ ডিভিশন সৈন্য এবং তাদের নৌ ও বিমান বাহিনীর এক বিরাট অংশ মোতায়েন করতে হবে। একইসঙ্গে ভারতকে চীন সীমান্তে কয়েক ডিভিশন এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য আরো কয়েক ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন রাখতে হবে। এভাবে ভারত পশ্চিম রণাঙ্গনে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং আমাদের জন্য কাশ্মীর ও গুরুদাসপুর মুক্ত করা কোনো সমস্যা হবে না। পশ্চিম রণাঙ্গণে ভারত শক্তিশালী হলে পূর্ব রণাঙ্গনে সে দুর্বল হয়ে পড়বে। দুটি ফ্রন্টে তাদর শক্তিতে ভারসাম্য থাকবে না। মিজো মুক্তিবাহিনীর নেতা লাল ডেঙ্গা, আসামে নাগা মুক্তিবাহিনীর নেতা এ. জেড. ফিজো ও পশ্চিমবঙ্গের নক্সাল আন্দোলনের নেতা চারু মজুমদারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে। তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে এবং ভারতের মাটিতে লড়াই শুরু করে দিতে পারলে আমাদের নিজেদের বাঙালিরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। এটা হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি সুযোগ। আমাদেরকে এ সুযোগ কাজে লাগতে হবে। নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ভারতে প্রবেশ করা যৌক্তিক। কারণ তারা আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে এবং আমাদের ভূখণ্ডে লড়াই চালাচ্ছে।

জেনারেল হামিদ বলেন যে, আমার প্রস্তাবের অর্থ হচ্ছে ভারতের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। আমি তাঁর সঙ্গে একমত হলাম এবং বললাম যে, আমরা তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করলেই তারা শান্তির পথে আসতে বাধ্য হবে। ভারত পাকিস্তান সৃষ্টি মেনে নেয়নি। পাকিস্তান ও মুসলমান বাঙালি অথবা অবাঙালি কারো প্রতিই তার সহানভূতি নেই। ভারত তার সুবিধামতো যে কোনো সময় কোনো কারণ ও হুঁশিয়ারি ছাড়াই আমাদের আক্রমণ করবে। ১৯৪৭ সাল থেকে ভারত কখনো শান্তি চায়নি। ইতোমধ্যে সে ৭ বার আমাদের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং বর্তমানে সে পূর্ব পাকিস্তানে পরোক্ষ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, আমাদেরকে এখনি হামলা করতে হবে। তাহলে মুখে তারা অহিংসতার যে বাণী প্রচার করে বাস্তবে তাই করতে বাধ্য হবে।

ধৈর্যের সঙ্গে আমার যুক্তি শুনে জেনারেল হামিদ উত্তরে বলেন, 'নিয়াজি আপনার প্রস্তাব সুন্দর, যুক্তি সঠিক এবং এগুলো বিবেচনার দাবি রাখে। আমি আপনার সহায়তায় সৈন্য ও সমরাস্ত্র পাঠাতে পারি এবং আমরা পূর্ব রণাঙ্গনে পাকিস্তানের লড়াই করতে পারি। ভারতের মাটিতে এ যুদ্ধ নিয়ে যেতে অথবা কোনো রকম ঝামেলা ছাড়া আপনার শেষ প্রস্তাব রক্ষা করতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু আমাদের সরকার ভারতের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত নয়। আমরা যেভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি সেভাবেই সরকার যুদ্ধ করার পক্ষে। আপনি এ যুদ্ধে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছেন। এখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনার কাজ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে বাংলাদেশ সরকার গঠন করার সুযোগ না দেয়া। আপনি এটুকু করতে পারলেই আমরা আপনার ও আপনার অধীনস্থ সৈন্যদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকব। আপনি ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ অথবা ভারতে হামলার জন্য কোনো সৈন্য পাঠাবেন না। শুধু তাই নয়, আপনি ভারতীয় ভূখণ্ডে গোলাবর্ষণও করবেন না। আপনি কেবল বৈরি শক্তিকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশে বাধা দেবেন এবং তাদের উৎখাত করবেন।'

তখন আমি বললাম, বাঙালিরা কি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রস্তুত? তিনি বললেন, 'টাইগার, আপনি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য মাথা ঘামাবেন না। বিষয়গুলো খুবই জটিল।'

'ঠিক আছে স্যার'।

ভারতে প্রবেশ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই এবং ভারতের ভূখণ্ডে যুদ্ধকে বিস্তৃত করার আমার স্বপ্ন ও চিন্তাধারা এভাবেই সেখানে শেষ হয়ে যায়।

মেজর জেনারেল খুশবন্ত সিং তার *'দ্য লিবারেশন অব বাংলাদেশ'* বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

'১৯৭১ সালের মে মাসের শেষদিকে গেরিলাদের হটিয়ে দিতে এবং ভারতে তাদের ঘাঁটি ধ্বংসে পূর্বাঞ্চলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার যৌক্তিক সুযোগ ইয়াহিয়া খানের ছিল এবং তিনি পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের ওপর হামলা করে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু করতে পারতেন। ভারতের জন্য সময়টা ছিল তখন খুবই নাজুক। কারণ ভারতের রিজার্ভ ফরমেশনগুলো ছিল পশ্চাৎভূমিতে। এছাড়া সামরিক সরঞ্জামের মারাত্মক ঘাটতি ছিল এবং সৈন্য ও জনগণ তাৎক্ষণিক একটি যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। ইয়াহিয়া তখন যুদ্ধ শুরু করলে বর্ষা আসার আগেই তিনি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারতেন।'

ভারতীয় ফরমেশনগুলো যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তাই নয়; ভারত তখনো রাশিয়ার সঙ্গে কোনো প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করেনি। সে সময় ইয়াহিয়া আঘাত হানলে পাকিস্তান অখণ্ড থাকতো এবং ভারতের চরম শিক্ষা হতো। অজেয় হয়ে থাকতে পারতো পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

অধ্যায় ৬

মুক্তিবাহিনী ও আমাদের বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী

মুক্তি বাহিনী

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সামরিক অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় সব পূর্ব পাকিস্তানি পুলিশ, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, আনসার, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর কয়েকটি নিয়মিত ইউনিটের পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এসব লোক নেতৃত্বসহ মুক্তিবাহিনীর নিউক্লিয়াস গঠন করে।

২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর বিদ্রোহী বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬২ হাজার। ভারতীয় ও রুশরা পর্যায়ক্রমে আরো ১ লাখ ২৫ হাজার বেসামরিক লোককে প্রশিক্ষণ দেয়। এভাবে মুক্তিবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৭ হাজার ৫শ'। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫০ হাজার লোক মুক্তিযোদ্ধাদের ছদ্মবেশে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এছাড়া, হাজার হাজার সশস্ত্র বাঙালি সহায়তা দেয় মুক্তিবাহিনীকে। ২১ নভেম্বর ভারত পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালানোর আগ পর্যন্ত ৮ মাস আমরা পূর্ব পাকিস্তানে এ বিশাল বাহিনীকে কোণঠাসা করে রেখেছিলাম। ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে আগ্রাসন চালালে মুক্তিবাহিনী তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনগুলো রাজনৈতিক সংকটকালে গোপনে তাদের জঙ্গি গ্রুপগুলোকে সংগঠিত এবং তাদেরকে হালকা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়। ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও প্রাক্তন সৈন্যরা বিপুল সংখ্যায় এসব সংগঠনে যোগদান করেন। তারা বিদ্রোহী নেতৃত্বের নিউক্লিয়াস গঠন করেন। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল এসব লোক একত্রিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনী নামে একটি পৃথক বাহিনী গঠন করে। ১৪ এপ্রিল কর্নেল এমএজি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণ

১৯৭১ সালের মে নাগাদ পঞ্চাশ শতাংশ বিদ্রোহীকে নিরস্ত্র করা হয়। বাকিরা তাদের পূর্ব পরিকল্পিত নিরাপদ ঘাঁটিতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ভারতীয়রা সীমান্ত বরাবর ৫৯টি ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। এসব ক্যাম্পে বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিত করা হতো। তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে ছিল উদ্বুদ্ধকরণ ও আদর্শিক দীক্ষা দান। মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দানে ভারতীয়রা একজন মেজর জেনারেলকে নিযুক্ত করে। এসব ক্যাম্পে যেসব মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল অস্ত্র চালনা। তবে কমান্ডো প্রশিক্ষণ এবং বিস্ফোরক, মাইন, গ্রেনেড প্রভৃতি ব্যবহারের ওপরও গুরুত্ব দেয়া হতো। প্রশিক্ষণার্থীদের বোঝানো এবং অপপ্রচার চালানোর জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে এমএনএ ও এমপিএ এবং অধ্যাপকদের নিয়ে যাওয়া হয়। তারা গেরিলাদের নিয়োগ করছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে এভাবে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা গড়ে ওঠে।

নদী যোগাযোগ বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ভারতীয়রা পানির নিচে প্রশিক্ষণ দানের ওপর বিশেষ মনোযোগ দেয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা সম্ভাব্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাথমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করত। এরপর তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠানো হতো। প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় ৩শ' বিদ্রোহীকে আগরতলা থেকে কোচিনে পাঠানো হয়। জানা গেছে যে, প্রায় ৩শ' ডুবুরিকে পশ্চিমবঙ্গে ভাগিরথী নদীর তীরে পলাশীতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ভারতী নৌবাহিনী ও পাকিস্তান নেভির কয়েকজন স্বপক্ষত্যাগী প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে।

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় :

বিজ্ঞানে স্নাতক : তাদেরকে দেয়া হয় দু'মাসের কারিগরি প্রশিক্ষণ।

স্নাতক ডিগ্রির নিচে : তাদেরকে হালকা অস্ত্র, মর্টার, রকেট লাঞ্চার ও গ্রেনেড ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মানচিত্র পঠন এবং কমান্ডো কৌশলও শিক্ষা দেয়া হয় তাদের।

ম্যাট্রিকের নিচে : তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অন্তর্ঘাতক হিসেবে। তাদের বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক, মাইন ও গ্রেনেড ব্যবহার এবং সেতু, কালভার্ট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা উড়িয়ে দেয়ার প্রশিক্ষণও দেয়া হয়।

লক্ষ্ণৌ ও দেরাদুনে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ কেন্দ্রে আর্টিলারি ও সিগনাল প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আরো জানা গেছে যে, ৮ জন রুশ বিশেষজ্ঞের একটি দল ভারতে বিদ্রোহীদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বিদ্রোহীদের অভ্যন্তরে একটি কমান্ড কাঠামো প্রতিষ্ঠায় নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে স্পেশাল অফিসার কমিশন প্রদান করা হয়। ভারতীয়

সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে এসব তরুণ অফিসারকে তিন মাসের একটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জানা গেছে যে, দেরাদুনে ভারতীয় সামরিক একাডেমিতে এ ধরনের প্রায় ৬শ' তরুণ অফিসারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সংগঠন

বিদ্রোহীদেরকে সাধারণত মুক্তিযোদ্ধা সংক্ষেপে বলা হতো এফএফ। তাদেরকে নিয়মিত ইউনিটে সংগঠিত করা হতো। প্রতিটি ইউনিট ৫শ' সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এসব ইউনিট স্বাধীন বাংলা রেজিমেন্ট (এসবিআর) হিসেবে পরিচিত ছিল। বিদ্রোহী ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর এবং কিছু বিদ্রোহী ছাত্রদের ব্যাটালিয়নে পুনর্গঠিত করা হয়। এটা জানা গেছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী তুরায় বিদ্রোহীদের দুটি ব্রিগেড গঠন করেছিল। প্রতিটি ব্রিগেডে সদস্য ছিল প্রায় ৩ হাজার। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদেরকে সংগঠিত, প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত করে। মহিলাদের সংগঠিত করার কথাও জানা গেছে। কিন্তু তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্যের কথা জানা যায়নি। বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচারে তাদের কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত হয়।

গোটা প্রদেশকে ভাগ করা হয় ৮টি সেক্টরে। এসব সেক্টরের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের দায়িত্ব ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বা বিএসএফ'র ওপর দেয়া হয়। পরে ভারতীয় সেনাবাহিনী এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রতিটি বাঙালি ব্রিগেডের সার্বিক কমান্ডের দায়িত্ব অর্পন করা হয় ভারতের নিয়মিত সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ারের ওপর। ব্রিগেডিয়ার শাহ বেইগ সিং ও ব্রিগেডিয়ার জগজিৎ সিং আগরতলা ও তুরায় অবস্থিত বাঙালি ব্রিগেডগুলোর সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন।

বিদ্রোহীরা তুফান বাহিনী ও বিমান বাহিনী নামে আরো দুটি বাহিনী গঠন করে। জানা গেছে যে, ভারতীয়রা রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বেতাই এলাকায় বিদ্রোহীদের জন্য একটি বিমান ক্ষেত্র নির্মাণ করেছিল। বাংলাদেশের পতাকা সম্বলিত দুটি বিমান সীমান্তের কাছাকাছি দেখা গেছে। পাকিস্তান এয়ার ফোর্স অকেজো হয়ে গেলে এ দুটি বিমান তৎপরতা শুরু করে।

শক্তি

জুনের শেষ দিকে প্রায় ৩০ হাজার বিদ্রোহীকে তড়িঘড়ি করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাদেরকে হালকা অস্ত্র, গ্রেনেড, রকেট লাঞ্চার ও বিস্ফোরক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। নভেম্বরের শেষ নাগাদ আমরা জানতে পারি যে, ইতোমধ্যে ৭০ হাজার বিদ্রোহীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে আরো ৩০ হাজার লোককে দেয়া হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক বিদ্রোহী ক্যাম্প ত্যাগ করে ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসে। তারা তাদের বাড়ি-ঘরে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করতে থাকে। ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের দিকে অগ্রাভিযান শুরু করলে তারা মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ
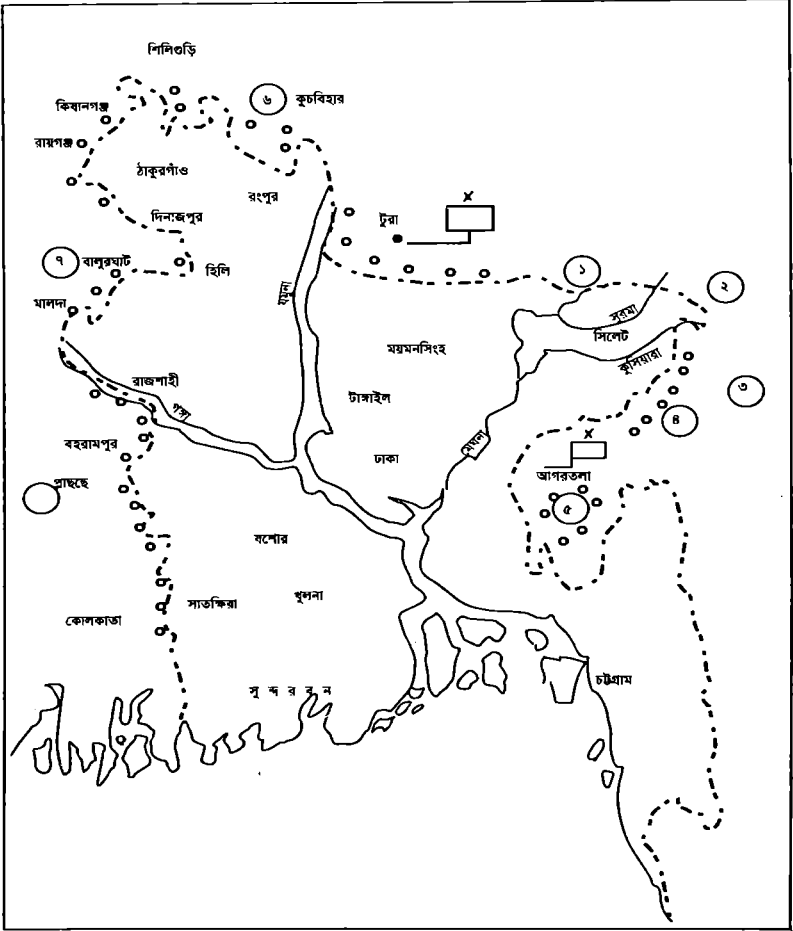
দেয়।

অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম

ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের সেকেলে অস্ত্র দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সজ্জিত করে। তবে আধুনিক কিছু অস্ত্রও দেয়া হয়। এছাড়া, মুক্তিবাহিনী তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিভিন্ন বিদেশি সূত্র যেমন- ইসরাইল, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বেলজিয়াম ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং হংকংয়ের মতো দূরপ্রাচ্যের বাজার থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের সৈন্যরা বিদ্রোহী ডুবুরিদের কাছ থেকে রাশিয়ায় তৈরি লিমপেট মাইন উদ্ধার করে। বিদ্রোহীদের কাছ থেকে কিছু মার্কিন অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়। চট্টগ্রামে একটি মার্কিন ৫৭ এমএম রিকয়েল্‌লেস রাইফেল্‌ উদ্ধার করা হয়।

ইতিপূর্বে চুয়াডাঙ্গা থেকে আরো দুটি মার্কিন রিকয়েললেস রাইফেল (আরআর) উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে যে, ভারতের পরামর্শে বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দ ২৫ লাখ ডলার মূল্যের বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রসহ ভারী অস্ত্র ক্রয়ের জন্য জাপানে ইসরাইলী কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ইসরাইল দু'মাসের মধ্যে ২০ লাখ ডলার মূল্যের ভারী অস্ত্র বাংলাদেশে সরবরাহে সম্মত হয়।

যোগাযোগ

ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের পুরনো মজুদ থেকে বিদ্রোহীদের কয়েকটি ওয়্যারলেস সেট ও অন্যান্য যোগাযোগ সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। গেরিলা তৎপরতার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে বিদ্রোহীরা জাপানে তৈরি কয়েকটি নতুন বহনযোগ্য বেতার যন্ত্রও ব্যবহার করেছিল। তবে তারা যোগাযোগ সরঞ্জাম বিশেষ করে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের ব্যাপারে পুরোপুরি ভারতের ওপর ছিল নির্ভরশীল।

নতুন গেরিলা কৌশল

ক) গেরিলাদের অনুপ্রবেশ : ভারতীয় সৈন্যদের তীব্র গোলাবর্ষণের আড়ালে সর্বদা গেরিলাদের অনুপ্রবেশ ঘটত। গেরিলারা 'রাইফেল গ্রুপ' 'বিস্ফোরক গ্রুপ' নামে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অনুপ্রবেশ করত। রাইফেল গ্রুপ বিস্ফোরক গ্রুপের অনুপ্রবেশ আড়াল এবং আগাম হুঁশিয়ারি ও প্রতিরক্ষা প্রদানে এ গ্রুপের আগে আগে এগিয়ে আসত। এছাড়া, রাইফেল গ্রুপ সৈন্যদের ব্যস্ত রাখার দায়িত্ব পালন করত। এ ফাঁকে বিস্ফোরক গ্রুপ তাদের মিশন সম্পন্ন করে নিরাপদে সরে যেত। প্রতিটি গ্রুপের জন্য স্থানীয় অপারেশন এলাকার অভিজ্ঞ গাইড ছিল।

খ) গেরিলা তৎপরতা : প্রতিটি থানা এলাকাকে একটি সাব-সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং প্রতিটি সাব-সেক্টরকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। একটি ভাগে মাত্র গেরিলা তৎপরতা চালানো হতো এবং বাকি তিনটি ভাগকে আশ্রয় কেন্দ্র ও গোপন আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। দেশের ভেতরে গেরিলা তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিদ্রোহী ছাত্রদের পাঠানো হতো। অন্যদিকে নিয়মিত বাহিনী, প্রাক্তন এবিআর ও ইপিআরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন করা হতো। বিদ্রোহীরা অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়ার লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগে সরকারি কর্মকর্তা, কৃষক ও শ্রমিকদেরকে কাজে যোগদান থেকে বিরক্ত রাখত।

অক্টোবরের শেষ নাগাদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর আওতায় বিদ্রোহীরা তাদের প্রশিক্ষণ প্রায় সম্পন্ন করে ফেলে এবং তারা সুসজ্জিত হয়। কয়েকটি কমান্ড

কাঠামোর ব্যবস্থা থাকায় তারা ভালোভাবে সংগঠিত হয়। তখন পর্যন্ত তারা অপ্রচলিত ও সীমিত লড়াই করার মতো অবস্থায় ছিল। তাদের মূল দুর্বলতা নিহিত ছিল লজিস্টিক ও ফায়ার সাপোর্টে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় এ ঘাটতি অনেকখানি পূরণ হয়। বিদ্রোহীদেরকে সীমান্ত চৌকি (বিওপি) দখলে পাঠানো হয় এবং সীমান্তের বাইরে থেকে তাদেরকে আর্টিলারি ফায়ার সাপোর্ট দেয়া হয়।

অত্যন্ত শিক্ষিত ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে বিদ্রোহীদের মূল অংশ গঠিত হয়। সময়ের ব্যবধান এবং ভারতীয়দের সক্রিয় সমর্থনে বেড়ে যায় তাদের মনোবল। ভারতীয় সাহায্যে মুক্তিবাহিনী দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। মুক্তিবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য একটি শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হিসেবে প্রমাণিত হয়। এ কারণে ভারত তাদেরকে যুদ্ধের সব ক্ষেত্রে মূল্যবান সহযোগিতা প্রদান করে।

গ) ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি সমর্থন : বাঙালি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য একটি বিরাট সুবিধা। এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়। বাঙালি জনগণ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মূল্যবান গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে। বাঙালিদের কাছ থেকে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা না পেলে ভারতীয়দেরকে টহল দল পাঠিয়ে এবং প্রচুর রক্তের বিনিময়ে গোয়েন্দা তথ্য পেতে হতো। মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে শ্রম ও বস্তুগত সহযোগিতা দিয়েছে এবং তারা তাদেরকে আমাদের অবস্থান চিনিয়ে দিয়েছে। তারা আমাদের সৈন্য চলাচল সম্পর্কে শত্রুকে আগাম তথ্য সরবরাহ করেছে এবং আমাদের ওপর হামলা চালাতে তাদের সাহায্য করেছে। স্থানীয় লোকজনের সক্রিয় সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনায় ভারতীয় কমান্ডাররা তাদের অপারেশন এলাকা পরিদর্শন এবং তাদের ওপর আবদ্ধ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। স্থানীয়রা সেতু, কালভার্ট ও সড়ক নির্মাণে শ্রম দেয়। তারা ভারতীয় সৈন্য পারাপারে দেশি নৌকা, ইঞ্জিনচালিত নৌকা, গরুর গাড়ি, সাইকেল, রিক্সা এমনকি কুলি পর্যন্ত সরবরাহ করে। তারা শত্রুর গতি ও চলাচল বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়।

'লিবারেশন ওয়ার'-এ ভারতীয় লেখক বলেছেন যে 'সমগ্র জনগণ পক্ষে থাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দেশব্যাপী অভিযান চালাতে অথবা পাকিস্তানি সৈন্যদের সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য পেতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি।' স্থানীয় জনগণের সহায়তা না পেলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সীমান্তে যুদ্ধ করতে হতো। ভারতীয় ও রুশরা সহায়তা না দিলে বাঙালিরা কখনো কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস পেত না। বাঙালি ও রুশরা সহযোগিতা না দিলে ভারতীয়রা কখনো সীমান্ত অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখাতে পারতো না। আমাকে মার-খাওয়া ও পিছু-হটা গেরিলাদের পশ্চাদ্ধাবনে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলে এসব ঘটনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত, বাঙালিরা একটি উচিৎ শিক্ষা পেত

এবং পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারতো।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথমদিকে বিদ্রোহীদের সাফল্য সম্পর্কে ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে অতিরঞ্জিত ও বানোয়াট কাহিনী প্রচার করা হতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ভারতীয় প্রচার মাধ্যম মুক্তিবাহিনীর সফলতাকে খাটো করার চেষ্টা করে। এটা ছিল মুক্তিবাহিনীর ভূমিকাকে তুচ্ছ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে গৌরবান্বিত করা এবং ভারতীয় সৈন্যদেরকে কৃতিত্বের সকল ভাগ দেয়ার একটি প্রচেষ্টা। মুক্তিবাহিনীর ছদ্মবেশে ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ভারত সরকার কখনো তা স্বীকার করতো না। তবে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এবং কয়েকটি সেতু ধ্বংসের ঘটনায় ভারতীয় সৈন্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রমাণিত হয়। আমি ভারতে যুদ্ধবন্দি হিসেবে থাকাকালে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এসব ঘটনা পড়েছি। এছাড়া কিছু বই-পুস্তকেও ভারতীয় সৈন্যদের অনুপ্রবেশের বিবরণ ছাপা হয়। আমি সেগুলোও পড়েছি। কিছু কিছু ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অনুগত পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর হামলা, অন্তর্ঘাতমূলক কাজ, মাইন পোঁতা প্রভৃতিতে মুক্তিবাহিনীর ছদ্মাবরণে ভারতের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদের বিশাল অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন।

পাকিস্তানের ভাঙনে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি ও ম্যাকিয়াভেলীয় কৌশল অবলম্বনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য দিয়েছেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই। মোরারজি দেশাই স্বীকার করেছেন যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ছিল মিসেস গান্ধীর ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিত। তিনি আরো বলেছেন যে, মিসেস গান্ধী মুক্তিবাহিনীর ছদ্মবেশে সাদা পোশাকে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছিল এবং ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লড়াইয়ে ৫ হাজার ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে। দেশাই আরো বলেছেন, অধিকাংশ মুক্তিবাহিনী ছিল মূলত ভারতীয় সৈন্য। এ জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিফ অভ স্টাফ জেনারেল মানেকশ প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়ে বলতে বাধ্য হন, 'এটা হতে পারে না। এভাবে ভারতীয় সৈন্যদের মরতে দেয়া যায় না। আপনি হয় তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনুন নয়তো পাকিস্তানের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধে তাদের লড়াই করতে দিন।'

বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী

পূর্ব পাকিস্তান বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী (ইপকাফ)

মার্চে সামরিক অভিযানের পর ইপকাফ গঠন করা হয়। এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের অবাঙালিদের নিয়ে মূলত এ

বাহিনী গঠন করা হয়। তাদের অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ সুবিধার মারাত্মক ঘাটতি ছিল। তারা সীমান্তে বিওপি প্রহরায় প্রয়োজনীয় কাজের যোগান দেয় এবং মারাত্মক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। তারা ভেতরেও কয়েকটি অবস্থানে শক্তি বৃদ্ধি করে। যেখানে তারা সেনাবাহিনীর সহযোগিতা পেয়েছে সেখানে তারা বেশ দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। কিন্তু যেখানে তারা সেরকম সহযোগিতা পায়নি সেখানে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম আঘাতেই তারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করেছে।

ভাল্‌নারেল পয়েন্ট ফোর্স (ভিপিএফ)

৩ হাজার সদস্য নিয়ে গঠিত এ বাহিনীর কাজ ছিল গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও রেল সেতু, গ্যাস ও বিদ্যুৎ স্থাপনা, যোগাযোগ কেন্দ্র প্রভৃতি রক্ষা করা। এ বাহিনীতে ছিল ২২টি কোম্পানি। এর মধ্যে ৮টি কোম্পানি গঠিত হয় প্রাক্তন সৈনিকদের নিয়ে। এদেরকে নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে মোতায়েন করা হয়। বাকি ১৪টি কোম্পানি গঠিত হয় প্রশিক্ষণবিহীন লোকজন নিয়ে। এ কারণে এদের প্রশিক্ষণে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। ফলে এদের মোতায়েন করতে বিলম্ব ঘটে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ তাদেরকে মোতায়েন করা যাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল।

শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (আইএসএফ)

এ বাহিনীর গঠন ও শক্তি ছিল অনেকটা ভিপিএফ-এর মতো। পশ্চিম পাকিস্তানি লোকজনকে নিয়ে এ বাহিনী গঠন করা হয়। তাদেরকে মিলকারখানা ও শিল্পাঞ্চলের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। এ বাহিনীর ২২টি কোম্পানির মধ্যে ৮টি গঠিত হয় প্রাক্তন সৈন্যদের নিয়ে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে পৌঁছানো মাত্র আমরা তাদেরকে মোতায়েন করতে পারতাম। বাদবাকিরা ছিল প্রশিক্ষণবিহীন। তাদের প্রশিক্ষণেও একইভাবে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। তাই তাদেরকে সরাসরি সার্ভিসে পাঠানো যায়নি। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ তাদেরকে সার্ভিসে পাঠানো যাবে বলে আশা করা হচ্ছিল।

ইপকাফ বিশেষ বাহিনী

সর্বোচ্চ ১০ হাজার সদস্য নিয়ে একটি বিশেষ ইপকাফ বাহিনী গঠন করা হয়। এ বাহিনীর লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ইপকাফের শক্তি বৃদ্ধি করা। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় এ বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন করা সম্ভব হয়নি।

পুলিশ

প্রদেশে পুলিশ বাহিনীর মোট শক্তি ছিল সাড়ে ১৬ হাজার। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান

পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ১১ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশের আরো ৫ হাজার সদস্য নিয়ে নয়া পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়।

পুরনো পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ : পুরনো পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর সদস্য নিয়ে মূলত এ বাহিনী গঠন করা হয়। পুলিশ বাহিনীর এসব সদস্য ২৫ মার্চের সামরিক অভিযান প্রত্যক্ষ করেছিল। সামরিক অভিযানের শুরুতে ব্যাপকভাবে দল ত্যাগ করায় পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর বাদবাকি অংশ হতোদ্যম ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে তাদেরকে নিরস্ত্র করতে হয়। তবে পরে নতুন নিয়োগ এবং পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর কিছু সদস্যকে বদলি করে এদের সঙ্গে একত্রিত করা হয় এবং এ বাহিনীকে শক্তিশালী করা হয়। তাদেরকে মফস্বল এলাকায় থানা রক্ষায় মোতায়েন করা হয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াইয়ে তারা সাধারণত নিষ্ক্রিয় থাকত এবং দ্বিধাগ্রস্ত হতো। বস্তুতপক্ষে, তারা ছিল অকার্যকর এবং তারা প্রশাসন অথবা সেনাবাহিনীর কোনো কাজেই আসেনি। তারা ছিল অবিশ্বস্ত এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা আনুগত্য পরিবর্তন করত। তাদের কারো কারো সঙ্গে বিদ্রোহীদের যোগাযোগ ছিল। সময় সুযোগ মতো তারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করত।

নতুন পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ : ব্যাপকভাবে দলত্যাগ ও পলায়নের ফলে পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীতে ঘাটতি দেখা দেয়। এ ঘাটতি পূরণে এ বাহিনীতে নতুন করে সাড়ে ১১ হাজার সদস্যকে নিয়োগ দিতে হয়। এ নতুন বাহিনী বিদ্রোহীদের মোকাবিলা এবং থানায় তাদের হামলা রোধে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। সন্তোষজনক কার্যকলাপের জন্য তাদের কারো কারো দ্রুত পদোন্নতি ঘটে। এ বাহিনী যথেষ্টভাবে অস্ত্রসজ্জিত না হওয়ায় তারা তাদের চেয়ে উন্নততর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অধিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিদ্রোহীদের সামনে দাঁড়াতে পারত না।

পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ : পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বিশেষ করে মফস্বল এলাকায় কর্মরত পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশের ৫ হাজার সদস্যের একটি দলকে প্রদেশে নিয়ে আসা হয়। গোটা পূর্ব পাকিস্তানে এদের ছড়িয়ে দেয়া হয়। তারা শুরুতেই যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করে এবং থানায় বিদ্রোহীদের হামলা মোকাবিলায় অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দেয়।

মুজাহিদ

নিয়মিত বাহিনীর সঙ্গে কয়েকটি মুজাহিদ ব্যাটালিয়ন ও স্বতন্ত্র মুজাহিদ কোম্পানিকে অপারেশনাল ডিউটিতে মোতায়েন করা হয়। তাদের কমান্ডাররা ১৯৭১ সালের নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছতে শুরু করে। এদের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের

অভাব ছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে মিলিটারি অপারেশন ও ইনফ্যান্ট্রি ডাইরেক্টরেটের নজরেও বিষয়টি ছিল। কিন্তু তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার জন্য তারা কিছু করতে পারেনি। মুজাহিদ বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই ছিল স্থানীয়। তবে তাদের খুব কম সদস্যই ক্যাম্প ত্যাগ করেছে।

রাজাকার

একটি সংগঠিত রাজাকার বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দীর্ঘদিন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে বিবেচনাধীন ছিল। এদের নিয়োগ আগে থেকে শুরু হলেও ১৯৭১ সালের আগস্টে রাজাকার বাহিনী গঠনের অনুমোদন দেয়া হয়। একটি পৃথক রাজাকার ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সমগ্র কাঠামো একটি পরিপূর্ণ রূপ নিতে থাকে। আল-বদর ও আল-শামস নামে আরো দুটি পৃথক বাহিনী গঠন করা হয়। স্কুল-মাদ্রাসায় শিক্ষালাভকারীদের আল-বদর বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়। তাদের স্পেশাল অপারেশনের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আল-শামসকে সেতু, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অন্যান্য এলাকা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়।

সেনাবাহিনী যেখানে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কাজে লাগাতে পারবে বলে ধারণা করে সেসব এলাকায় রাজাকারদের মোতায়েন করা হয়। পূর্ণাঙ্গভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হওয়ায় স্থানীয় প্রভাবের কারণে তাদের মধ্যে দলত্যাগের মনোভাব জেগে ওঠে। ১৯৭১ সালের অক্টোবর তাদের স্বপক্ষত্যাগের ঘটনা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পায়। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যেসব এলাকায় ডানপন্থী দলগুলোর শক্তি ও স্থানীয় প্রভাব ছিল সেসব এলাকায় নিয়োজিত রাজাকাররা অত্যন্ত সহায়ক বলে বিবেচিত হয়েছে। বিদ্রোহীরা তাদের ও তাদের পরিবারের ওপর নির্যাতন চালিয়ে এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছে। রাজাকারদের প্রশিক্ষণের খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রতিকূলতার জন্য ইস্টার্ন কমান্ড তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে স্পেশাল ট্রেনিং টিম পাঠানোর জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

রাজাকার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। প্রদেশের প্রায় সব জেলাতে তাদের মোতায়েন করা হয়। এরা তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৭০ শতাংশ অর্জন করেছিল। রাজাকার প্লাটুন ও কোম্পানি কমান্ডারদের প্রশিক্ষণ দানে ব্যাটল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ বাহিনীকে একটি কার্যকর কমান্ড কাঠামো প্রদানে প্রায় ৬০ জন তরুণ অফিসারকে রাজাকার গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য বাছাই করা হয়।

রাজাকারদের অস্ত্র

যুদ্ধ ক্ষেত্রে যারা ছিলেন এবং যাদের সঙ্গে রাজাকার ছিল তাদের প্রত্যেকেরই অভিমত ছিল যে, রাজাকার বাহিনীকে একটি সত্যিকার বাহিনী হিসেবে গড়ে

তোলার লক্ষ্যে তাদেরকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে। রাজাকারদের যেসব অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল, বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল সেগুলোর চেয়ে অনেক উন্নত। প্রতিটি রাজাকার প্লাটুনকে একটি করে হালকা মেশিনগান ও একটি স্টেনগান দিতে হলে আমাদের কমপক্ষে ২৫০০টি হালকা মেশিনগান ও সমপরিমাণ স্টেনগানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে মাত্র ২৭৫টি এলএমজি ও ৩৯০টি স্টেনগান দিতে পেরেছিলাম। এতে রাজাকারদের মনোবল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের এ মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। রাজাকাররা ধারণা করতে শুরু করে যে, তাদেরকে বিশ্বাস করতে না পারায় আমরা তাদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছি না। ভারতীয় অপপ্রচার এবং স্থানীয় নেতিবাচক প্রভাবে তাদের এ ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়। তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশ ও অবাঙালি অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে রাজাকারদের মিশ্রিত করা হয়।

অধ্যায় ৭

যুদ্ধপরিকল্পনা

যুদ্ধের শিল্পকর্মের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে বর্তমান কালে যুদ্ধ আরো জটিল ও ধ্বংসাত্মক। আধুনিক যুদ্ধ হচ্ছে বিলম্বিত সময়ের জন্য পরপর সংযুক্ত সংগ্রাম। যুদ্ধ করাই সশস্ত্র বাহিনীর একমাত্র কাজ নয়। সেনাবাহিনী হচ্ছে বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের একটি মাধ্যম। যুদ্ধ শুরু ও বন্ধের চাবিকাঠি থাকে সরকারের হাতে। গণতান্ত্রিক সরকারগুলো সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে তাদের ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃততর করেছে। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে বন্দুকের নল হচ্ছে সরকারের একটি অন্যতম হাতিয়ার।

আমার ওপর দায়িত্ব ছিল, 'গেরিলাদের উচ্ছেদ কর। শত্রুদেরকে প্রদেশের কোনো ভূখণ্ড দখল করে নিতে দিও না যাতে সেটাকে তারা বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা দিতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানকে বহিঃশত্রুর আগ্রাসন থেকে রক্ষা কর।' আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয় মৌখিকভাবে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাকে লিখিতভাবে অভিযান পরিচালনার দিক-নির্দেশনা দেয় নি।

লে. জেনারেল টিক্কা খান ছিলেন সামরিক আইন প্রশাসক এবং আমি ছিলাম ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার। আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন। যদিও কিছু ওভার ল্যাপিং ছিল। আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই আমি মৌখিক নির্দেশনা সত্ত্বেও কাজে নেমে পড়ি এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে গেরিলাদের উচ্ছেদ ও দ্রুত সময়ের মধ্যে সীমান্ত পুনরুদ্ধার এবং প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করি। টিক্কা খান আমার মিটিং-এ আসতে থাকেন। আমি তাকে বিনয় ও কৌশলের সঙ্গে মিটিংয়ে যোগদান থেকে বিরত থাকতে বলি। কারণ আমাদের কাজ দেখার এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আলাদা সদর দপ্তর ছিল।

তখন সরকার প্রেসিডেন্ট হাউসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সঙ্গে ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া, হামিদ, পীরজাদা, ওমর ও জেনারেল মিঠা। তারা রাষ্ট্র ও পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করছিলেন।জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে চিফ অভ জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসান ছিলেন পকিল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে। কিন্তু তিনি তাঁর

ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে জেনারেল ওসমানীর অধীনে ভারতীয় সৈন্যরা ব্যাপকভাবে মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং এতে রুশ গেরিলাবিশেষজ্ঞরা সহায়তা দিচ্ছে– একথা পুরোপুরি জানার পরও জেনারেল গুল হাসান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা অথবা বিদ্রোহ দমনে কখনো কোনো অপারেশনাল নির্দেশনা দেন নি।

আমার কাছে যে সীমিত সম্পদ ছিল তাই দিয়েই আমাকে পরিকল্পনা করতে হয়েছে। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও ডিভিশন ও কোরের কোনো কামান ও ট্যাংক পাঠানো হয় নি। আমাকে গোলাগুলি ছাড়া আর কোনো বস্তুর সহায়তা দেয়া হয়নি। আমার সৈন্যদের পায়ে পচন ও ছত্রাক দেখা দেয়। অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ বলতে গেলে ছিল না। এ পরিস্থিতিতে আমি আমার চিফ অভ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকীকে এমজিও লে. জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের কাছে পাঠাই। যিনি একজন বাঙালি ছিলেন। জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন তাঁকে গালিগালাজ করেন এবং সহায়তা দিতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানান। এরপর ব্রিগেডিয়ার বাকির সিজিএস জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন নি। সুতরাং আমাদেরকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র এমনকি শার্ট, ট্রাউজার ও বুট ছাড়াই চলতে হয়। সৈন্যদেরকে খালি পায়ে ও বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ছাড়াই যুদ্ধ করতে হয়েছে।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে আমার চিফ অভ স্টাফ বাকির সিদ্দিকী জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে জেনারেল হামিদের সঙ্গে দেখা করতে যান। সে সময় জেনারেল হামিদ আবারো নির্দেশ দেন যে, বিদ্রোহীদের কোনো ভূখণ্ড দখল করতে দেয়া যাবে না। আমি পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে ভারতীয় সমরসজ্জার খবর পাচ্ছিলাম। আরো শোনা যাচ্ছিল যে, ৪টি বিগ্রেডের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনীকে একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী হিসেবে পুনর্গঠিত করা হয়েছে এবং জেনারেল ওসমানীর অধীনে রণাঙ্গনকে ৮টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে বৈঠককালে শত্রুর হুমকি নিয়ে আলোচনা করা হয়। চীন সীমান্ত থেকে নতুন করে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার এবং জেনারেল রায়নার অধীনে দ্বিতীয় কোরের কলকাতার কাছে কৃষ্ণনগরে অবস্থান গ্রহণের নিশ্চিত খবর পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছিল যে, ১৯৭১ সালের অক্টোবর নাগাদ ভারত তার সমরসজ্জা সম্পন্ন করে ফেলবে। শত্রুর হুমকি সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণা করা হয়:

- চতুর্থ কোরের অধীনে লে. জেনারেল সগত তিনটি ডিভিশন ও মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড সিলেট, ভৈরব বাজার ও চাঁদপুরের দিকে এগিয়ে আসবে (লে. জেনারেল সগত সিং)।
- ৩৩ তম কোরের নেতৃত্বাধীন (লে. জেনারেল থাপন) দু'টি ডিভিশন

এবং আরো সৈন্য পঞ্চগড়, রংপুর ও হিলি সেক্টরে প্রবেশ করবে।

- নবগঠিত দ্বিতীয় কোরের (লে. জেনারেল রায়না) দুটি ডিভিশন কৃষ্ণনগর থেকে যশোর-খুলনা সেক্টরে প্রবেশ করবে এবং ঢাকা দখলে এগিয়ে আসবে।
- তুরা থেকে ময়মনসিংহের দিকে একটি ভারতীয় পদাতিক ব্রিগেড ও মুক্তিবাহিনীর আরেকটি ব্রিগেড এগিয়ে আসবে।

আমরা আরো জানতে পারলাম যে, বিরাট গোলন্দাজ বহর এবং সেতু নির্মাণ সামগ্রীসহ প্রায় ১৯টি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নও মোতায়েন করা হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী কারিয়ানগঞ্জ (সিলেটের বিপরীত দিকে) থেকে চট্টগ্রামের কাছাকাছি আইজল পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত বরাবর সড়ক নির্মাণ করছে। ধারণা করা হচ্ছিল যে, এসব সড়ক নির্মাণ শেষ হবে অক্টোবরের মধ্যে।

এসব হুমকির প্রেক্ষিতে আমাকে নতুন করে পরিকল্পনা সাজাতে হয়। মেজর জেনারেল জামশেদ ও রহিম, এয়ার কমোডর হক (যিনি ঢাকায় ছিলেন) ও আমার চিফ অভ স্টাফ বিগ্রেডিয়ার বাকির সিদ্দিকীর সঙ্গে আলোচনা করার পর কয়েকটি এডহক ফরমেশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

স্থির করা হয় যে, মুজাহিদ, রাজাকার, স্কাউট ও রেঞ্জারদের সীমান্ত চৌকি (বিওপি) রক্ষায় মোতায়েন করা হবে। এছাড়া তারা যোগাযোগ ব্যবস্থাও রক্ষা করবে। নিয়মিত সৈন্যদের অধিকাংশকে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের জন্য ঘাঁটি ও দুর্গে মোতায়েন করা হবে। বিওপির আশপাশের প্রধান সংযোগ সড়কগুলো নিয়মিত সৈন্য অথবা সিএএফ রক্ষা করবে এবং নিয়মিত বাহিনীর অফিসার ও জেসিওদের নেতৃত্বে সিএএফ সীমান্তের বাদবাকি অঞ্চল রক্ষা করবে।

কমান্ডাররা যুদ্ধকালে এমন কিছু পরিস্থিতির মুখোমুখি হন যা তাদের কাম্য নয়। কখনো কখনো তারা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন এবং প্রতিকূল ও চরম বৈরি পরিস্থিতিতেও তাদের পড়তে হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাদের চমৎকার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। আমার অবস্থা তখনো ততটা খারাপ ছিল না। কিছু বিষয় আমাদের অনুকূলে ছিল এবং এগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হতে পারতাম। ফিল্ড মার্শাল রোমেল বলেছেন, "শত্রুর কোনো পরিকল্পনাই টেকে না। কোনো কমান্ডারের পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এমন এক সময় আসবে যখন তাকে দ্বন্দ্ব যোদ্ধার মতো নিজের চোখ, কান ও অনুভূতির সাহায্যে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।"

সীমিত সম্পদ এবং ক্ষুদ্র, ক্লান্ত ও অসজ্জিত একটি বাহিনী থাকা সত্ত্বেও আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করার বেশ কয়েকটি সুযোগ তখনো

আমাদের সামনে খোলা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কাছে আমি ছিলাম জিম্মি। আমার হাত-পা ছিল বাধা। আমার এ অসহায়ত্ব শত্রুর অগোচরে ছিল না। সুতরাং আমাকে আমার ঘাটতি, দুর্বলতা ও কর্মপন্থা আড়াল করার জন্য ছল-চাতুরি, কৌশল ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়। আমি কৌশলগত চাতুর্যের মাধ্যমে শত্রুকে আমাদের শক্তি ও সৈন্যমোতায়েন সম্পর্কে ধাঁধায় ফেলে দেই। আমার জন্য সবচেয়ে ভালো হতো যদি আমি বিধ্বস্ত মুক্তিবাহিনীকে তাড়া করতে করতে ভারতে ঢুকে যেতে পারতাম এবং তাদের পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ না দিতাম। কিন্তু আমি অসহায় ছিলাম এমন একটি রাজনৈতিক মিশনের কাছে যেখানে আমার দায়িত্ব ছিল শুধু বাংলাদেশ সরকার গঠনে মুক্তিবাহিনীকে বাধা দেয়া। ভারতে ঢুকে মুক্তিবাহিনীর ওপর হামলা না করার সিদ্ধান্ত ছিল একটি মারাত্মক কৌশলগত ভুল। এ ভুলের জন্য পরবর্তীতে আমাদেরকে চড়া মাশুল দিতে হয়েছে।

যুদ্ধ এগিয়ে চললে নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এজন্য যে সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করে তাকে এ পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। হাই কমান্ডের কাজ হচ্ছে লক্ষ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করা এবং এ লক্ষ্য অর্জনে কমান্ডারের কাজে কোনোক্রমেই হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু হাই কমান্ড অবিচার করেছে আমার প্রতি। তারা আমাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর করুণার ওপর ছেড়ে দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করার সুযোগ দিতে আমাকে জবাব দেয়ার জন্য বসে থাকতে হয়। আমি ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর হামলার জন্য প্রহর গুণতে থাকি। সতর্ক থাকা এবং সম্ভাব্য পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকা ছাড়া আমার করণীয় কিছু ছিল না। যুদ্ধকালে এর চেয়ে বিরক্তিকর ও পীড়াদায়ক ঘটনা আর কিছু হতে পারে না।

প্রতিরক্ষার ধারণা

বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট একটি প্রতিরক্ষা ধারণা গ্রহণ করা হয়। এমনভাবে স্তরগুলো বিন্যাস করা হয় যাতে একটি আরেকটিকে সহায়তা দিতে পারে। প্রতিরক্ষা ধারণায় উল্লেখ করা হয় যে, মূল বাহিনীর ওপর আক্রমণ এবং এলাকার গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশের আগে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে এবং তাদের সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধন করতে হবে। ঘাঁটি ও সুরক্ষিত অবস্থানের ভিত্তিতে একটি অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরিবিশিষ্ট ৭-এ এই ধারণার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

প্রতিরক্ষার ধরন

পর্যবেক্ষণ ফাড়ি

কৌশলগত ও অন্যান্যবিবেচনায় যতটুকু সম্ভব ততটুকু অগ্রবর্তী এলাকায় পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা করা হবে। চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করা এবং প্রতিরক্ষায় শত্রুর প্রথম ধাক্কা সামলানোর দায়িত্ব পালন এবং শত্রুর অগ্রাভিযানে বাধা দেয় এবং

তাদেরকে সতর্ক করে দেয়াই ছিল পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। প্রধান সংযোগ সড়কগুলোতে অবস্থিত পর্যবেক্ষণ ফাঁড়িগুলো সুরক্ষিত করা হবে এবং এগুলোতে নিয়মিত সৈন্য অথবা সিএএফ মোতায়েন করতে হবে। ভূখণ্ডের অভ্যন্তরেও প্রধান প্রধান রুটে বিকল্প অবস্থান তৈরি করতে হবে।

শক্ত অবস্থান

পরবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলতে হবে ছোট ছোট শহর, যোগাযোগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র অথবা অন্যান্য স্থান–যেমন কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে এমন সব জায়গা, যে কোনো রাস্তা প্রভৃতিতে। এগুলো হবে প্রতিরক্ষার মূল স্তম্ভ এবং এখানে শত্রুর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের সর্বোচ্চ শক্তি ক্ষয় করতে হবে। এ প্রতিরক্ষা লাইন হতে হবে সুরক্ষিত এবং গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ থাকতে হবে।

দুর্গ

এ পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপে ছিল ধারাবাহিক দুর্গ গঠন। দুর্গগুলো হতে হবে বড় বড় শহর ও প্রধান প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্রে। এ প্রতিরক্ষা ব্যূহ হতে হবে দুর্ভেদ্য এবং অবস্থানগুলো হতে সুরক্ষিত এবং এগুলোতে অস্ত্রশস্ত্রের প্রচুর মজুদ থাকতে হবে। সৈন্যদেরকে সেখানে জীবিত অথবা মৃত অবস্থান করতে হবে।

প্রতিরক্ষা পরিচালনা

প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় একটি অগ্রবর্তী ব্যূহ গঠনের বিষয় বিবেচনা করা হয়। পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয় যে, সৈন্যদেরকে পর্যায়ক্রমে সীমান্ত থেকে দুর্গগুলোতে প্রত্যাহার করা হবে এবং দুর্গগুলোতেই হবে চূড়ান্ত লড়াই। এখানে শত্রুকে থামিয়ে রাখতে হবে যাতে ওয়েস্টার্ন গ্যারিসন তাদের মিশন অর্জনে পর্যাপ্ত সময় পায়। 'পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ করা হবে পশ্চিম রণাঙ্গনে' এটাই ছিল প্রতিরক্ষার মূল নীতি। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের ফলাফলের ওপর শুধু ইস্টার্ন গ্যারিসন ও পূর্ব পাকিস্তান নয়; গোটা পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ভরশীল ছিল। এ যুদ্ধ করার কথা ছিল জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বাধীন রিজার্ভ বাহিনীর।

আমার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য মুজাহিদ ও সিএএফ-এর সমন্বয়ে ইউনিটগুলোকে পুনর্গঠন করা হয়। অগ্রবর্তী পদাতিক বাহিনীর উভয় পার্শ্ব ও পেছন দিক রক্ষায় ইঞ্জিনিয়ারিং বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। একইভাবে, পদাতিক বাহিনীকে সহায়তা দানে গোলন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

মাইন ও তাদের ঘাটতি থাকায় পুঞ্জি (বাঁশের তীক্ষ্ণ শলা) পোঁতা হয়। বিশাল এলাকায় পুঞ্জি পোঁতা হয়। শত্রুর ট্যাংক ও যানবাহন চলাচল ব্যাহত করার জন্য কৃত্রিম বন্যা ঘটানো হয় ব্যাপক এলাকায়।

পরিকল্পনা সংশোধন

নিম্নলিখিত উপায়ে পরিকল্পনা পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৭১ সালের অক্টোবর নাগাদ তা সম্পন্ন হয়।

ইতোপূর্বে ঢাকায় অবস্থানরত ১৪ ডিভিশনকে ময়মনসিংহ-সিলেট-চট্টগ্রাম সেক্টরের দায়িত্বে দেয়া হয়। ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা গঙ্গা নদীর পূর্ব দিকের অঞ্চল নিয়ে এ সেক্টর গঠন করা হয়। এ সেক্টরকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয় :

(১) ১৪ ডিভিশন (১০ ব্যাটালিয়ন) কে মেঘনা নদীর গোটা পূর্বাঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়।

(২) বিগ্রেডিয়ার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে সিলেট এলাকায় মোতায়েনকৃত একটি ব্যাটালিয়ন ও সিএএফ-এর সমন্বয়ে একটি নয়া এডহক ২০২তম ব্রিগেড গঠন করা হয়। ব্রিগেডিয়ার রানার নেতৃত্বে ৩১৩ তম ব্রিগেডকে মৌলভীবাজার অঞ্চলের দায়িত্ব দেয়া হয়।

(৩) ইতোপূর্বে ময়মনসিংহে মোতায়েনকৃত ২৭তম ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ) এক্স-ময়মনসিংহ (দুটি ব্যাটালিয়ন) কে আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রক্ষায় মোতায়েন করা হয়।

(৪) ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর হোসেন আরিফের নেতৃত্বে ১৭তম ব্রিগেডকে কুমিল্লা-ময়মনামতি এলাকায় মোতায়েন করা হয়।

১৬ ডিভিশন : এ ডিভিশনের ১০টি ব্যাটালিয়নে কোনো পরিবর্তন আনা হয় নি। ১৬ ডিভিশনের এলাকা ছিল রংপুর-বগুড়া-রাজশাহী সেক্টর।

৯ ডিভিশন এক ব্রিগেড কম (৭ ব্যাটালিয়ন) : যশোর-কুষ্টিয়া-ফরিদপুর সেক্টর।

খুলনা সেক্টরের জন্য ইপকাফ-এর সমন্বয়ে কর্নেল ফজল হামিদের নেতৃত্বে একটি নয়া এডহক ৩১৪ তম ব্রিগেড গঠন করা হয়।

একটি ব্যাটালিয়ন, দুটি কোম্পানি, স্থানীয় গ্যারিসনের সৈন্য ও নৌ সেনাদের সম্বনয়ে চট্টগ্রামে বিগ্রেডিয়ার আতা মালিকের নেতৃত্বে একটি নয়া এডহক ৯১তম স্বতন্ত্র ব্রিগেড সৃষ্টি করা হয়।

ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজীর নেতৃত্বে ৫৩ তম ব্রিগেডকে ঢাকা রক্ষায় মোতায়েন করা হয়।

ইপকাফ-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জামশেদের নেতৃত্বে একটি নতুন এডহক ৩৬ তম ব্রিগেডকেও ঢাকা রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। বিগ্রেডিয়ার কাদির নিয়াজির নেতৃত্বে ৯৩ তম ব্রিগেডকে ময়মনসিংহ রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। দু'টি ব্যাটালিয়ন ও সিএএফ-এর সমন্বয়ে এই নতুন এডহক ব্রিগেড গঠন করা হয়।

মেজর জেনারেল রহিম খানের নেতৃত্বে ৩৯তম এডহক ডিভিশনকে চাঁদপুর রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। এ ডিভিশন মাত্র ৫৩তম ব্রিগেড নিয়ে গঠিত হয়।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এ ডিভিশনকে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন হিসেবে গঠনে প্রয়োজনীয় সৈন্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তারা এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।

প্রতিটি ব্রিগেডের সঙ্গে একটি ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট থাকার কথা ছিল। কিন্তু আমরা ঘাটতির কারণে কোনো ব্রিগেডে ফিল্ড আর্টিলারি পাঠাতে পারি নি। নির্দিষ্ট এলাকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আনুপাতিক হারে আর্টিলারি বণ্টন করা হয়।

এডহক ফরমেশন প্রকৃত ফরমেশনের মতো ছিল না। এডহক ফরমেশনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্টাফ, অফিসার ও যানবাহনের অভাব ছিল। কমান্ড হেড কোয়ার্টার্স এবং বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার্স ও কমিউনিকেশন লাইনে বিদ্যমান সম্পদ অনুযায়ী যোগাযোগ সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়। কমান্ড ও কন্ট্রোলের জন্য এগুলো যথেষ্ট ভালো ছিল। সৈন্যরা তাদের এলাকায় অফিসারদের পরিদর্শনে যেতে দেখতে পেত। যুদ্ধকালে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধিতে অফিসারদের এ ধরনের পরিদর্শন খুবই সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। সৈন্যদের গতিবিধিতে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে শত্রুদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

১৯৭১ সালের মার্চে প্রণীত আমাদের অপারেশন পরিকল্পনায় যেসব বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয় সেগুলো হলো: অগ্রবর্তী আত্মরক্ষামূলক অবস্থান এবং শত্রুদের সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধন; একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শত্রুকে আটকে রেখে নির্দিষ্ট দুর্গ ও সুরক্ষিত অবস্থানে পিছু হটে আসা; দুর্গগুলোর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লে সৈন্যদেরকে ঢাকা অভিমুখী সকল রাস্তা বন্ধ করার জন্য চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা ব্যুহে পিছু হটে আসতে হবে। ময়মনসিংহ থেকে চতুর্দশ ডিভিশন ও ৯৩ তম এডহক ব্রিগেড এবং খুলনা থেকে ৩১৪ (ক) ব্রিগেডকে ঢাকা এলাকায় পিছু হটতে হবে।

গোয়েন্দা তথ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন সত্ত্বেও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাকে কোনো লিখিত দিকনির্দেশনা দেয় নি। বৈরি পরিস্থিতি এবং ভারতীয় আগ্রসন ও বিদ্রোহ মোকাবেলায় সম্পদের ঘাটতি থাকায় আমাকে আমার পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হয়। দেশের ভেতরে দুর্গ ও সুরক্ষিত অবস্থানের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দুর্গ ও সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলো শত্রুর অবাধ চলাচলে বাধা দেবে, তাদেরকে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে ব্যস্ত রাখবে এবং এভাবে তাদের ক্ষতিসাধন করবে।

পূর্ব পাকিস্তান বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী (ইফকাফ) বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ায় স্থানীয় রাজাকারদের (সাবেক বিহারি ও অনুগত পূর্ব পাকিস্তানি) সীমান্ত চৌকি প্রহরায় নিয়োজিত করা হয় এবং তারা নিয়মিত সেনাবাহিনীর প্রহরাধীন দুর্গ ও সুরক্ষিত ঘাঁটিতে পিছু হটে আসে। রাজাকারদের অফিসার ছিল নিয়মিত সেনাবাহিনীর।

তারা খুব প্রশংশনীয় ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গেও প্রচণ্ড লড়াই করেছে তারা।

আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট পাই। রিপোর্টে বলা হয় যে, আগ্রাসী মনোভাব সত্ত্বেও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না। তবে সে বিদ্রোহীদের সমর্থন দান এবং কিছু ভূখণ্ড দখলে নেয়ার লক্ষে সীমিত পর্যায়ে হামলা চালাতে পারে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। আমরা স্থানীয়ভাবে গঠিত বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে সীমান্ত বন্ধ করে দিতে সক্ষম হই।

ঢাকা ছিল মেরুদণ্ড। নদী ও খাল-বিল এবং প্রধান-প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্রের ভিত্তিতে ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোতে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলা হয় যাতে ঢাকা অভিমুখী শত্রুর যে কোনো অগ্রাভিযান ব্যাহত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রু নদী পারাপারে হেলিকপ্টারে সৈন্য পরিবহন অথবা ছত্রী সেনা নামানোর চেষ্টা করতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও আইএসআই ভারতের হেলিকপ্টারে সৈন্য পরিবহনের সম্ভাবনা অথবা সামার্থ্য সম্পর্কে আমাদেরকে কখনো অবহিত করে নি। ফরমেশন কমান্ডারদের বৈঠকে ঢাকা প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং তা চূড়ান্ত করা হয়। আমি এ বৈঠকে আমার সেকেন্ড ম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মেজর জেনারেল জামশেদ এবং সহায়ক বাহিনীর কমান্ডারদের নিয়ে যোগদান করি। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে চিফ অভ স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ আমাদেরকে দেখতে আসেন। পরিকল্পনায় এসব পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়। একই মাসে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স 'অর্ডার অব ব্যাটল' ইস্যু করে। এতে পরিবর্তনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিরাজিত পরিস্থিতির আলোকে আমার পরিকল্পনা কার্যকর ও অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বলে প্রমাণিত হয়। এ পরিকল্পনা বিভিন্ন মিশন বিশেষ করে রাজনৈতিক দিক নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রণয়ন করা হয়। রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা ছিল সকল বিবেচনার উর্ধ্বে এবং আমার পক্ষে তা অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। আমি ছিলাম পাকিস্তানের সার্বিক পরিকল্পনার কেবলমাত্র একটি অংশ বাস্তবায়নের দায়িত্বে। পক্ষান্তরে পুরো বিষয় কৌশলগত পর্যায় থেকে দেখার দায়িত্ব ছিল হাই কমান্ডের। তাদের উচিত ছিল গোটা পরিস্থিতির জটিলতা অনুধাবন করা এবং ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা। সার্বিক পরিকল্পনা থেকে যে কোনো বিচ্যুতি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অসংখ্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং গোটা পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মোতায়েন একজন কমান্ডারের তার ওপর অর্পিত মিশন সফল করে তুলতে নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু আমার ওপর অর্পিত মিশন বাস্তবায়নে এমন স্বাধীনতা আমাকে দেয়া হয় নি।

প্রতারণা

প্রতারণা হচ্ছে এমন এক জিনিস যা শত্রু প্রত্যাশা করে না এবং যার জন্য সে প্রস্তুত নয়। এটা শত্রুকে চমকে দেবে এবং নৈতিকভাবে তাকে দুর্বল করে তুলবে। প্রতারণা থেকে সৃষ্টি হয় চমকের। চমক হচ্ছে এমন এক লবণ যা যুদ্ধের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। এটা হচ্ছে যুদ্ধের নীতি। একজন কমান্ডার সর্বদাই তার অভিপ্রায় সম্পর্কে শত্রুকে বিভ্রান্ত করেন। বিশেষ করে যেখানে সৈন্যবল কম এবং শত্রুর অস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও সম্পদের ব্যাপক ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান সেখানে একজন কমান্ডারকে তার ঘাটতি আড়াল করার জন্য ফাঁদ পাততে ও ধাপ্পা দিতে হয় এবং কৃত্রিম তৎপরতা ও ছলাকলার আশ্রয় নিতে হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, প্ররোচণামূলক তৎপরতায় প্রতিপক্ষের কমান্ডার বিভ্রান্ত হবেন।তার মতামত প্রভাবিত হবে এবং তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে আমরা শত্রুকে ধোকা দিতে হিমশিম খেয়েছি। কারণ আমাদের গোয়েন্দা ব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়েছিল। ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদল হিসেবে আমাদের সৈন্য ও সমরাস্ত্রের ঘাটতি পূরণে আমাদেরকে উন্নত প্রশিক্ষণ, দক্ষ নেতৃত্ব, কঠোর শৃঙ্খলা, সাহস ও বিভিন্ন অপ্রচলিত ধারণার ওপর ভরসা করতে হয়েছে। তহবিল ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব কাটিয়ে উঠতে আমাদেরকে ব্যাপকভাবে কৃচ্ছতা সাধন করতে হয়েছে এবং একইসময়ে আমাদের শক্তি সম্পর্কে শত্রুকে ধোকা দিতে হয়েছে। শত্রুকে ধোকা দেয়ার জন্য স্থানীয় বাঙালিদের সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। সৌভাগ্যবশত আমি কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং আমার কয়েকজন পুরনো সহকর্মী পেয়ে যাই। তারা পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখতে চেয়েছিলেন এবং আমাকে এ কঠিন দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করতে সম্মত হন। শত্রুকে ধোকা দেয়ার জন্য আমি কোথাও সৈন্যদের পরিদর্শন করতে গেলে ঢাকায় অবস্থানরত পূর্ব পাকিস্তান বেসামরিক বাহিনী (ইপকাফ)-এর কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম। প্রত্যেকেই জেনারেল জামশেদকে চতুর্থ ডিভিশনের ডিভিশনাল কমান্ডার হিসেবে ধারণা করত।

আমার অফিসে টেবিলের ওপর পুরু কাপড়ে মোড়া চারটি পতাকা ছিল। এসব ছোট পতাকার বাঁশের দণ্ড বেরিয়ে থাকত এবং গণনা করা যেত। একইভাবে আমার অফিসে মোটা কাপড়ে আবৃত মানচিত্র ছিল।এসব মানচিত্রে সেনাবাহিনীর চারটি ডিভিশনের সীমারেখাও দেখা যেত। যেসব বাঙালি অফিসার ও বেসামারিক লোকজন আমাদের সহায়তা করত তাদেরকে দেখানোর জন্যই এমন করা হতো। এতে তারা নিশ্চিত হতো যে, পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের চারটি ডিভিশন রয়েছে। এভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৪টি ডিভিশনের শক্তি হিসাবের মধ্যে রেখে আগ্রসান চালায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন সিনিয়র কমান্ডারের স্বীকারোক্তি থেকে আমাদের প্রতারণাপূর্ণ পরিকল্পনার কার্যকারিতা প্রমাণ পাওয়া গেছে। যুদ্ধ বিরতির পর তাদের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। তখন তারা আমাদের পরিকল্পনার সাফল্য স্বীকার করেন। মেজর জেনারেল সুখবন্ত সিং তার

শিলিগুড়ি
৩৪
২৩
রংপুর
২০
বালুরঘাট
হিলি
২০৫
বগুড়া
১৬
রাজশাহী
নাটোর
৩৪
পাবনা
পলাশি
কুষ্টিয়া
২
কৃষ্ণনগর
ইন্ডিয়া
পূর্ব কমান্ড
বারাকপুর
কলকাতা
ঝিনেদাহ
১০৭
যশোর
খুলনা
৩১৪ (এ)
পূর্ব কমান্ড
ফরিদপুর
ঢাকা
৩৬ (এ)
৫৩
ময়মনসিংহ
সিলেট
মৌলভিবাজার
২৭
আগরতলা
আখাউড়া
কুমিল্লা
চাঁদপুর
২৩
চট্টগ্রাম
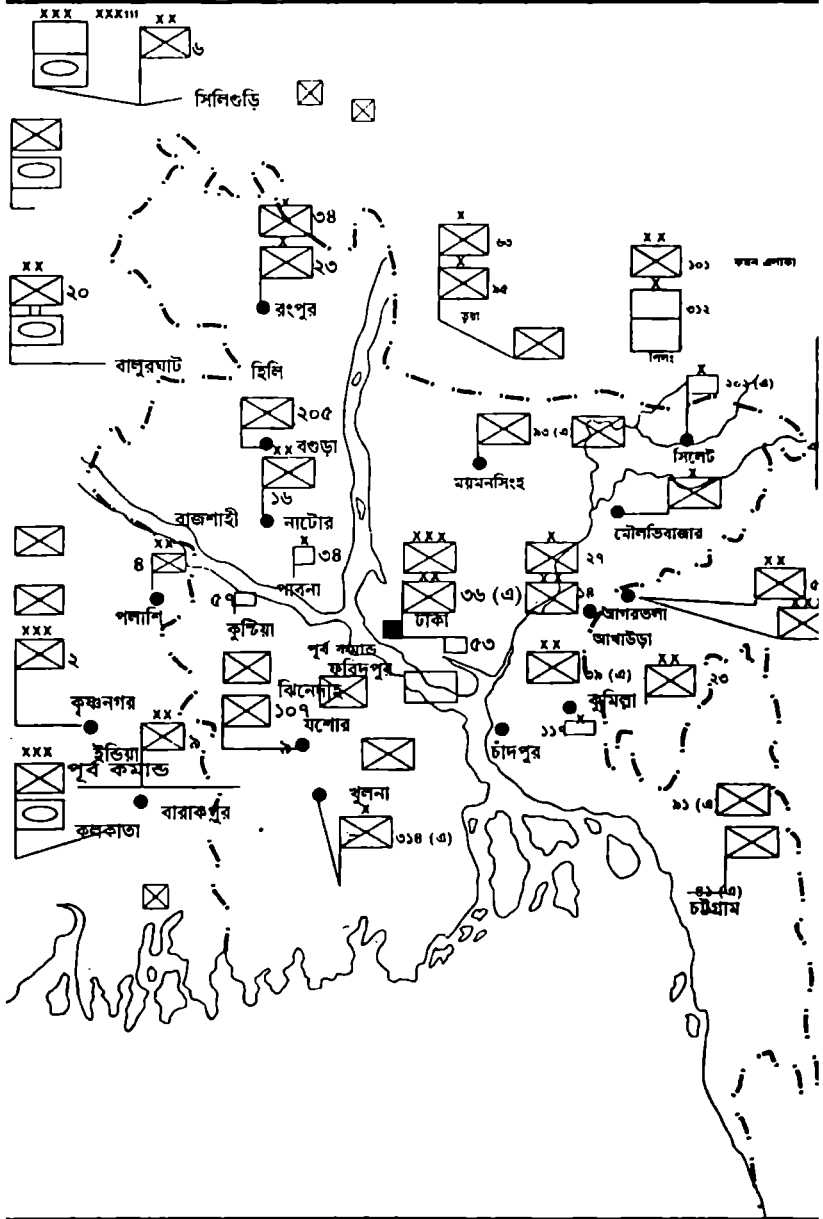
'দ্য লিবারেশন অভ বাংলাদেশ' নামক পুস্তকে পাকিস্তান ইস্টার্ন গ্যারিসনের শক্তি ৪ ডিভিশন বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, ভারতীয় গোয়েন্দারা আমাদের শক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছিল। তারা ধারণা করেছিল যে, ঢাকাতেই পুরো এক ডিভিশন সৈন্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঢাকায় ছিল মাত্র একটি ব্রিগেড। মেজর জেনারেল জামশেদের নেতৃত্বে এ ব্রিগেড গঠন করা হয়। ৩৬ তম এ এডহক ব্রিগেডে ছিল দুটি ব্যাটালিয়ন। ভারতীয়রা ভেবেছিল যে, ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন রয়েছে। তাই তারা ঢাকা অভিমুখী উত্তরাঞ্চলে সকল রুট বিপদমুক্ত দেখেও দ্রুত রাজধানীতে পৌঁছানোর চেষ্টা অথবা আগ্রহ দেখায় নি।

ব্রিগেডিয়ার শাহ বেগ (পরে মেজর জেনারেল) যুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পর তিনি একদিন আমার কাছে আসেন এবং নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি তার সন্দেহ নিরসনের জন্য জানতে চান, পূর্ব পাকিস্তানে আমার সৈন্য সংখ্যা কত ছিল। 'আপনাদের সেখানে কত ডিভিশন সৈন্য ছিল, স্যার,' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। আমি জবাব দিলাম, 'তিন ডিভিশন।' 'আপনাদের কি ৪ডিভিশন সৈন্য ছিল না? জেনারেল জামশেদের কি দায়িত্ব ছিল?'– বিস্ময়ে তিনি জানতে চাইলেন। আমি তাকে জানালাম যে, 'জেনারেল জামশেদ ছিলেন ইপকাফের কমান্ডার এবং তিনি আমার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।' 'ইপকাফ কি কোনো ব্রিগেডিয়ারের কমান্ডে ছিল না?' তিনি জানতে চাইলেন। আমি বললাম, 'আপনি ঠিক বলেছেন, ইপকাফের নেতৃত্বে একজন ব্রিগেডিয়ারই ছিলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার নিসার ইপকাফ থেকে বদলি হলে আমি জেনারেল জামশেদকে তার স্থলাভিষিক্ত করি। জেনারেল জামশেদ আমাদের চতুর্থ ডিভিশন কমান্ড করতেন। এটি ছিল একটি এডহক ডিভিশন এবং সৈন্য ছিল মাত্র দুই দুই ব্যাটালিয়ন।' আমার কথা শুনে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে যান। তাই আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই এবং বলি, 'আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন শিখ।' 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন আমি একজন শিখ। কিন্তু আপনাদের শক্তি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য ঢাকা আসার আগে আমাকে চুল ও দাঁড়ি কেটে ফেলতে হয়। বাঙালিরা আমাকে ঢাকা নিয়ে আসে। তখন আমার পরনে ছিল বাঙালিদের মতো পোশাক। আমি দুদিন অবস্থান করি এবং রিক্সায় ঘুরে বেড়াই। তবে আমি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশ করি নি।' আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কী দেখতে পেলেন?' তিনি বললেন, 'ব্যাপক সামরিক তৎপরতা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে, ঢাকা সৈন্যে বোঝাই। বাঙালিরা আমার সঙ্গে বেরুতে চাইত না। তারা ক্যান্টনমেন্ট অথবা সামরিক অবস্থানে ঢুকতে ভয় পেত। এজন্য আমি ঢাকায় সৈন্যদের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি নি।' আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কবে ঢাকা গিয়েছিলেন?' তিনি বললেন, '১৯৭১ সালের নভেম্বরের শুরুতে।'

ব্রিগেডিয়ার ক্লার (পরে মেজর জোনারেল) ময়মনসিংহ সেক্টরে একটি ভারতীয় বিগ্রেডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পর তিনি আমার কাছে এসেছিলেন এবং ব্রিগেডিয়ার শাহ বেগ যে ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন তিনিও একই ধরনের প্রশ্ন করেন। আমি বললাম, 'আমি জানতে চাই, আপনাদের পর্যাপ্ত সৈন্য ও সম্পদ, বিমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রচুর ট্যাংক ও সাজোয়া যান ছিল এবং আপনারা মুক্তিবাহিনী ও স্থানীয় জনগণের সমর্থনও পেয়েছিলেন। এক কথায় আপনাদের কোনো ঘাটতি ছিল না বরং সবকিছুতেই ছিল প্রাচুর্য। আপনারা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর কমপক্ষে অর্ধেক সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা কোনো দিক থেকে ঢাকা এগিয়ে গেলেন না কেন? ঢাকা অভিমুখী সকল রুট বিশেষ করে উত্তরর দিক থেকে আগত রাস্তা শুরু থেকেই ছিল বিপদমুক্ত। আপনারা সিলেট ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে আমার সৈন্যদের পেছনে সৈন্য নামিয়েছিলেন। এরপর টাঙ্গাইলে আপনাদের প্যারা ব্রিগেড অবতরণ করে। ঢাকা সেক্টরে দুটি জায়গায় হেলিকপ্টারে করে আপনারা মেঘনা নদীর এপারে সৈন্য নামিয়েছিলেন। কিন্তু আপনারা তাৎপর্যপূর্ণ কোনো সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। আপনারা ব্রিগেডিয়ার কাদিরের ব্রিগেডকে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা এবং সাদউল্লাহর ব্রিগেডকে আশুগঞ্জ থেকে ভৈরব প্রত্যাহারে বাধা দিতে পারেন নি। আপনারা কাউকে বন্দি অথবা কোনো এলাকায় কোনো সিদ্ধান্ত আঁকড়ে ধরতে পারেন নি। আপনাদের সম্পদের তুলনায় আপনাদের সাফল্য খুবই নগণ্য। সবকিছু আপনাদের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও সীমান্তের কাছে সমগ্র ফ্রন্টে আপনারা বিপাকে পড়ে যান এবং আপনারা সেখানে তিন সপ্তাহ অবস্থান করেন। ঢাকা সেক্টরে পরিস্থিতি এমন গুলিয়ে যায় যে, আপনাদের সেনা কমান্ডারকে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়। আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া না হলে মার্কিনীরা ভিয়েতনামে এবং ফ্রান্স আলেজরিয়ায় যে পরিণতি ভোগ করেছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও পূর্ব পাকিস্তানে অনুরূপ পরিণতি ভোগ করতে হতো।'

ক্লার বললেন, 'আপনাকে সত্য বলতে কি, আমাদের সিনিয়র অফিসাররা ছিলেন খুবই সতর্ক কারণ আমরা ১৯৭১ সালের জুলাই থেকেই আপনার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করছিলাম। পাকিস্তানি সৈন্যরা যে যুদ্ধ করেছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা শুধু সাহসী নয় বরং শক্তিশালী এবং তারা তাদের পেশায় সুনিপুণ এবং লড়াই করার যোগ্যতা তাদের ছিল। তারা বরবাররই তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অগ্রাভিযানে আমাদেরকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিই হচ্ছে আমাদের সতর্ক অগ্রাভিযানের মূল কারণ। ঢাকা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল যে, এখানে লড়াই হবে কঠিন। ঢাকাকে বলা হতো বাঘের গর্ত। কামালপুর ও জামালপুর আক্রমণে আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল। এ দুটি স্থানে আপনার সৈন্যরা

তাদের অবস্থান ধরে রাখার তীব্র লড়াই করেছে এবং আমাদেরকে ঢাকা অভিযানে বাধা দিয়েছে। ঢাকা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্নায়ুকেন্দ্র। এছাড়া ঢাকায় ছিল আপনার সদর দপ্তর। তাহলে আমরা কিভাবে ভাবতে পারি যে, সেখানে লড়াই করা সহজ হবে? একই সময়ে আমাদের মনে এই ধারণাও ছিল যে, ঢাকা সেক্টরে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন রয়েছে এবং ঢাকার প্রতিরক্ষায় এ ডিভিশনের সৈন্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। আপনার সম্পর্কে আমাদের সকল অফিসারদের একটি উঁচু ধারণা ছিল। তারা আপনাকে একজন ফাইটিং জেনারেল হিসেবে মনে করতেন। ঢাকার প্রতিরক্ষা আপনার ব্যক্তিগত কমান্ডের আওতায় থাকায় তারা যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়া আপনার প্রতিরক্ষা লাইনে হামলা করতে চান নি।'

ভারতের চতুর্থ কোর কমান্ডার লে. জেনারেল সগত সিংও এ সত্য স্বীকার করেছেন, তবে ভিন্নভাবে। তিনি জানতে চাইলেন, 'ঢাকা দুর্গে আপনাদের কি পরিমাণ শক্তি ছিল?' আমি তাকে বললাম যে, আমার ৩০ হাজার সৈন্যমোতায়েন ছিল এবং আরো কিছু মোতায়েন করার প্রক্রিয়া চলছিল। এছাড়া, আমার আরো ২ হাজার যোদ্ধা ছিল। এরা ছিল অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য ও পুলিশ বাহিনীর লোক। এদেরকে আমরা নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। বহু পশ্চিম পাকিস্তানি ও বেসামরিক বিহারিও আমাদের সঙ্গে যোগদান করেছিল। আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করার জন্য শপথ নিয়েছিলাম। ভৈরব বাজারে মোতায়েন ব্রিগেড এবং নারায়ণগঞ্জে মোতায়েন ৩৬ এডহক ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার্সে অবস্থানরত সৈন্যদেরকে এ হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। প্রতিটি অফিসারের একজন করে ব্যাটম্যান ছিল এবং এই এলাকায় বহু অফিসার ছিলেন।

মোটের ওপর, ঢাকা ছিল সৈন্যে পরিপূর্ণ। অফিসারদের মধ্যে ছিলেন তিনজন মেজর জেনারেল, একজন এয়ার কমোডর, দু'জন পুলিশের আইজি, আট জন ব্রিগেডিয়ার, কয়েকজন কর্নেল ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল। বস্তুতপক্ষে, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে একই সময়ে তিনটি দুর্গ যথা– ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ভৈরব বাজারের মোকাবিলা করতে হতো। এতে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর গোটা চতুর্থ কোরের প্রয়োজন হতো। নারায়ণগঞ্জের অবস্থান এবং আমাদের পার্শ্বভূমির প্রতিবন্ধকতার কারণে ঢাকা পৌছান অথবা অবরোধ করা যেত না। ভারতীয়রা একমাত্র উত্তর দিক থেকে ঢাকায় হামলা করতে পারত। সেক্ষেত্রেও ভৈরব সেতু ছিল তাদের পেছনে। এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী ফাঁদে পড়ে যেত। তারা উভয় সংকটে পড়তো। হাজার হাজার লোককে অস্ত্রসজ্জিত করার জন্য আমার কাছে তখনো প্রচুর অস্ত্র ছিল।

জেনারেল সগত সিং বললেন, 'আমি জানতাম যে, ঢাকা ছিল ভালোভাবে সুরক্ষিত এবং ময়মনসিংহ ব্রিগেডের ঢাকা, আশুগঞ্জ ব্রিগেডের ভৈরব বাজার ও

৩৯তম ডিভিশনের সদরদপ্তর ও এ ডিভিশনের কিছু সৈন্য নারায়ণগঞ্জে স্থানান্তরিত হওয়ায় ঢাকা দুর্গের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এতে আপনার সৈন্য চলাচলও বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতির প্রকৃতি না জানায় মেঘনা নদীর এপারে হেলিকপ্টার থেকে সৈন্য নামানো সত্ত্বেও আমাদের তৎপরতা ছিল মূলত উত্তরাঞ্চলীয় অংশে সীমাবদ্ধ। জেনারেল অরোরা ঢাকা দখলে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে ঢাকা দখলের আগে আমাদের যথাযথভাবে রেকি চালাতে হবে। এজন্য আমাদের আকাশ পথে ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ছবি তোলার প্রয়োজন। ঢাকা আক্রমণে যথাযথ পরিকল্পনা ও বিশাল বাহিনীর প্রয়োজন হবে। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মাধ্যমে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ দুর্বল করে দিতে হবে। গোলাবর্ষণের জন্য আমাদের মাঝারি ও ভারি কামান এবং বিমান থেকে বোমাবর্ষণের প্রয়োজন হবে। মাঝারি ও ভারি কামান ও ট্যাংক ছাড়া তড়িঘড়ি করে এগিয়ে যাওয়া হবে আমাদের জন্য আত্মঘাতী। সুতরাং আমি প্রস্তুতি ও আমার সৈন্য সমাবেশের জন্য সাত দিন সময় চাই। আগরতলায় আমার হেলিকপ্টার ছিল। কিন্তু ভৈরব বাজারের অবস্থানের কারণে আমাদেরকে সেখান থেকে দূরে সৈন্য নামাতে হয়। ভৈরব বাজার আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকায় আমরা ট্যাংক ও কামান আনতে পারি নি। সাত দিনের মধ্যে ঢাকায় আঘাত হানার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ এসে পৌঁছবে কিনা সে ব্যাপারেও আমার সন্দেহ ছিল। ভৈরব বাজার ও নারায়ণগঞ্জের অবস্থান আমাদের অভিযানকে অধিক কঠিন করে তোলে।'

ঊর্ধ্বতন ভারতীয় অফিসারদের আলাপ-আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের শক্তি সম্পর্কে ধোঁকা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য আমাদের পাতা ফাঁদ ছিল যথার্থ। তারা ভেবেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে আমার তিনটি নয়; চার ডিভিশন সৈন্য রয়েছে। তারা বিশ্বাস করত যে, প্রতিটি বিভাগে অন্তত একটি করে ডিভিশন মোতায়েন রয়েছে। সুতরাং তারা আমার চার ডিভিশন সৈন্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরি করে। এ পরিমাণ সৈন্য আছে ভেবেই তারা শুরুতে ঢাকা দখলের উদ্যোগ নেয় নি। তবে তারা আমার প্রকৃত ক্ষমতা জানতে পারলে তাই করতো। একই কারণ কুষ্টিয়ায় প্রচুর সৈন্য হতাহত হওয়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনী ফরিদপুরে এগিয়ে আসে নি।

আমাদের এসব প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা কয়েকজন ভারতীয় জেনারেল বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সৈন্যের কমান্ডার জেনারেল অরোরার জন্য মারাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ সকল সুবিধা, অনুকূল পরিস্থিতি ও পর্যাপ্ত স্থানীয় সহায়তা সত্ত্বেও তিন হাজার মাইলব্যাপী সীমান্তে ন' মাসে তিনি কিছুই অর্জন করতে পারেননি।

যুদ্ধের ইতিহাসে জেনারেল অরোরা যতটুকু সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশে যুদ্ধ

করেছেন তা সত্যি এক বিরল ঘটনা। প্রতিপক্ষের তুলনায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সুবিধা ছিল অন্তত দশ গুণ বেশি। আমাদের জঙ্গীবিমান, বিমান-বিধ্বংসী কামান, দূরপাল্লার আর্টিলারি ও ট্যাংকের ঘাটতি ছিল বিরাট। পক্ষান্তরে, জেনারেল অরোরার কোথাও কোনো ঘাটতি ছিল না। বিমান শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তিনি বিমানের ছত্রছায়া, বিমানে করে সৈন্য পরিবহন, নদী পারাপারে বিমান সুবিধা ও আকাশ পথে অব্যাহত সরবরাহ সুবিধা ভোগ করেন। সমুদ্র ও নদীতে ছিল তাঁর অবাধ কর্তৃত্ব। আমাদের পেছনে ও উভয় দিকে বিনা বাধায় তাঁর সেন্যরা উপকূল বরবার ও নদীর তীরে অবতরণ করেছে। প্রতিটি সেক্টরে তার কয়েক ব্রিগেড ট্যাংকগুলো ছিল উভচর। পক্ষান্তরে, আমাদের ট্যাংকের গোলা ভারতীয় ট্যাংকের বিরুদ্ধে অকার্যকর প্রমাণিত হয়। তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দূরপাল্লার কামান ছিল। এসব দূরপাল্লার কামানের বিরুদ্ধে আমাদের স্বল্পপাল্লার কামানগুলোকে অনবরত গোলাবর্ষণ করতে হতো। এতে আমাদের পদাতিক বাহিনীকে সমর্থনদানের সামর্থ্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ভারতীয়রা মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণদান এবং তাদের সংগঠনে রুশ বিশেষজ্ঞদের সহায়তাও পেয়েছিল। রুশরা যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয়দের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালনায় সহায়তা দিত। এছাড়া হাজার হাজার বাঙালি ও ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তি মুক্তিবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতো। এসব সুবিধা সত্ত্বেও জেনারেল অরোরা সামরিকভাবে বিজয়ী হতে পারেননি। আমাদেরকে রাজনৈতিক পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল এবং এটা করেছিলেন ভুট্টো। যুদ্ধ থেমে যাবার মাত্র কয়েক মাস পর অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত না করে জেনারেল আরোরাকে অবসরে পাঠানো হয়।

পরিদর্শন

আমি অপারেশনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করি এবং এ পরিকল্পনা সার্বক্ষণিকভাবে পর্যালোচনা করা হতো। এ সময়ে পাকিস্তানের বহু প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ সফরে গিয়েছিলেন। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ আমার জন্য সহায়ক হয়েছে। লাহোরে সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালেও আমাকে রাজনীতিবিদদের সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতিকদের সফর ছিল সত্যি উৎসাহব্যঞ্জক। গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে মাওলানা মুফতী মাহমুদের গভীর অন্তঃদৃষ্টিতে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হই। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, শক্তিপ্রয়োগ নিষ্ফল হবে এবং গণ আন্দোলন বেশিদিন দমন করে রাখা যাবে না। তিনি আরো বলেছিলেন যে, স্বাভাবিক অবস্থা অনেকখানি ফিরে এসেছে। তাই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার এবং একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তি খুঁজে বের করার এটাই মোক্ষম সময়। এ সমস্যা হচ্ছে মূলত রাজনৈতিক। মুজিব একতরফাভাবে স্বাধীনতা অথবা

যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার হচ্ছে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার যার সাহায্যে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। কারণ তারাও পাকিস্তানি এবং লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বঞ্চনার ফলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানিরা ভাবছে যে, তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাই তারা স্বাধীনতা চাইবে। তিনি আরো বলেছিলেন, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং ইয়াহিয়া ও ভুট্টো পাকিস্তান টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী নন। কত সত্য কথাই না তিনি বলেছিলেন।

অন্যান্য নিয়মিত দর্শনার্থীদের মধ্যে রয়েছেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পিকার ফজলুল কাদের চৌধুরী, জনাব আবদুস সবুর খান, জনাব সিরাজুল হক এবং মৌলভি ফরিদ আহমদ। তারা ছিলেন খুবই অনুগত পাকিস্তানি। তারা দেশকে ভালোবাসতেন এবং দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং অবিলম্বে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, মুক্তিবাহিনী মৌলভি ফরিদ আহমেদকে হত্যা করে। এছাড়া আরো বহু পূর্ব পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ নিহত হন। চট্টগ্রাম থেকে পালানোর চেষ্টাকালে ফজলুল কাদের চৌধুরী ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দি হন। সিরাজুল হক ছিলেন ডা. মালিকের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য। তিনি কপাল গুণে বেঁচে যান। বিহারিরা ছিল শেষদিন পর্যন্ত অনুগত। এজন্য তাদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে রাওয়ালপিন্ডি থেকে ফিরে এসে ব্রিগেডিয়ার বাকির আমাকে জানান যে, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানাতে পেরেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের মোতায়েন সেনাবাহিনীকে বলির পাঁঠা বানানোর জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং জান্তা পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে গুজব ছিল যে, লারকানায় ইয়াহিয়া ও ভুট্টো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এসব কথা বিস্তারিত জানা সম্ভব হয় নি। আরো বলা হয় যে, তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে এম. এম. আহমেদকে নির্দেশ দিয়েছেন।

চিফ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ অক্টোবরে সফরে গেলে ব্রিগেডিয়ার বাকিরের কাছ থেকে আমি যা শুনেছি তা তাঁকে জানাই, কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। মনে হচ্ছিল যে, তিনি সত্য কথা বলছিলেন না। পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, গুজব কত সত্য ছিল।

গভর্নর পদে পরিবর্তন

যখন ডা. মালিক জেনারেল টিক্কা খানের কাছ থেকে গর্ভনরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন প্রেসিডেন্ট ডাকলেন আমাকে এবং বললেন যে গভর্নরের কথা আমাকে মানতে হবে।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে আমি ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে আমার দায়িত্বে অতিরিক্ত সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করি। সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই পরিবর্তিত হতে থাকে। একজন বেসামরিক গভর্নর ও মন্ত্রিসভার নিয়োগকে রাজনৈতিক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জনসমর্থন না থাকায় মন্ত্রিগণ অক্ষম হিসেবে প্রমাণিত হন এবং তাদের নিয়োগে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় নি। তারা সেনা প্রহরা ও হেলিকপ্টার ছাড়া চলাফেরা করতে পারতেন না। কোনো উর্দুভাষীকে মন্ত্রিসভায় না নেয়ায় উর্দুভাষীরাও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। জনগণের তখন বেসামরিক প্রশাসনের প্রতি কোনো আস্থা ছিল না। প্রশাসনের নিম্নস্তর সরকারের প্রতি সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে একটি বাধা হয়ে দেখা দেয়।

উপ-নির্বাচন

উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় সামান্য রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তবে এ রাজনৈতিক তৎপরতা ডানপন্থী ও কিছু অনুগত বাঙালিদের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ ছিল। রাজনৈতিক তৎপরতা কয়েকটি নির্দিষ্ট গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর কারণ হচ্ছে, যেসব দল তখন মাঠ দখলের চেষ্টা করছিল তারা আগে সাধারণ নির্বাচনে গুরুতর বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। তাছাড়া, বিদ্রোহ শুরু হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ ছিল। উপ-নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করায় পিপিপি, জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধ হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো সারা পাকিস্তানের নেতা হওয়ার জন্য ৬৫টি আসন চান। কিন্তু স্থানীয় সমস্যার জন্য তাকে দেয়া হয় মাত্র ২২টি আসন।

আমরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে সতর্ক করে দেই যে, উপ-নির্বাচনকালে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দিতে পারে। বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের ওপর হামলা ও তাদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে জানানো হয়, যে, পূর্ব পাকিস্তানে ১০ হাজার সৈন্য পাঠানো না হলে নির্বাচনে নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না কারণ সৈন্যদেরকে বিদ্রোহ দমন অভিযানে পুরোপুরি নিয়োগ করা হয়েছিল।

সাধারণ ক্ষমা

মে থেকেই আমি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পরামর্শ দিচ্ছিলাম। পরিস্থিতির ক্রমাগত উন্নতি ঘটনায় শোনা যাচ্ছিল, যে এ মুহূর্তে একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো প্রয়োজন। তাই আমি জেনারেল হামিদের মে মাসে সফরকালে তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করি। আমার ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশ বাস্তবায়নে যথেষ্ট দেরি হয়ে যায়। সাধারণ ক্ষমার যে ঘোষণা দেয়া হয় তা ছিল আংশিক। এজন্য এতে ইপ্সিত ফলাফল অর্জিত হয় নি। ভারত শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে বাধা দেয়। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে মাত্র ২৪০ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করে।

গোয়েন্দা সংস্থা

১৯৭১-এর মার্চ পর্যন্ত মূলত বাঙালিদের নিয়েই গোয়েন্দা সংস্থা গঠিত হয়েছিল। সামরিক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সব গোয়েন্দা সংস্থা ভেঙে পড়ে এবং তারা আওয়ামী লীগের অনুকূলের স্বপক্ষত্যাগ করে। আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে এমন কোনো গোয়েন্দা সংস্থা গঠনে আমরা সফল হতে পারি নি। কিছু চেষ্টা চলছিল। ভাষাগত অসুবিধা ও স্থানীয় জনগণের বৈরিতার কারণে এ চেষ্টা সফল হয় নি। ডিআইবি ও এসআইবি'র মতো স্থানীয় বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আমাদের কোনো কাজে আসে নি। পত্র-পত্রিকায় যা প্রকাশিত হতো অথবা আমাদের প্রচারণায় অংশ হিসেবে যা প্রকাশ করা হতো তারা সেগুলোই আওড়াত। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের বিরুদ্ধে ভারতের অতিরিক্ত ৩ থেকে ৪ ডিভিশন সৈন্যের সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারে নি। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে মিলিটারি ডাইরেক্টরেটে সংরক্ষিত নথিপত্রে এ সংক্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে। যুদ্ধকালে আমাদেরকে ভারতীয় হেলিকপ্টার গানশিপের হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আইএসআই কিংবা সামরিক গোয়েন্দা অধিদপ্তর আমাদেরকে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে নি। তাই আমরা ৮ ডিভিশন ভারতীয় সৈন্যের হামলা হবে বলে যে ধারণা করেছিলাম সে ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকি। ভারতীয় বাহিনী আমাদের সব খবরই পেয়ে যেত। কারণ মুক্তিবাহিনী ও বৈরি জনগণ আমাদের সম্পর্কে সর্বশেষ গোয়েন্দা তথ্য তাদের সরবরাহ করত।

আমাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক ও কাঠামোর অভাবে আমরা শত্রুদের নাগালের বাইরে আমাদের কোনো তথ্য গোপন রাখতে অথবা শত্রুদের সম্পর্কে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারতাম না। সুতরাং আমাদের পরিকল্পনা, দুর্বলতা ও শক্তি সম্পর্কে তথ্য গোপন রাখতে আমাদেরকে পরিকল্পিত উপায়ে ধোকা, প্রতারণা ও ধাপ্পার আশ্রয় নিতে হতো। আমরা শেষদিন পর্যন্ত আমাদের শক্তি, দুর্বলতা ও ঘাটতি

সম্পর্কে শত্রুকে ধোকা দিতে সক্ষম হই এবং শত্রু আমাদের অতিরঞ্জিত শক্তির ভিত্তিতে তাদের আগ্রাসী পরিকল্পনা তৈরি করে।

চীনা প্রভাব

ভুট্টো চীন সফর করেন ১৯৭১-এর নভেম্বরের প্রথম দিকে একটি সামরিক-রাজনৈতিক প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে এবং ৭ নভেম্বর চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চীনের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতকে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন যে, চীন সরকার পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় পাকিস্তান সরকারের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন দেবে।

চীনের এ ঘোষণা ভারতীয় পরিকল্পনাবিদদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। 'পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে একটি আঁতাতের সম্ভাবনা মাথায় রেখেই ভারতীয়রা তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এভাবে সময় ও সংখ্যা উভয় নিরিখে চীনের বিরুদ্ধে মোতায়েন অতিরিক্ত ফরমেশনগুলো বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়' (ইন্ডিয়ান ওয়্যারস সিন্‌স ইনডেপেনডেন্স : মেজর জেনারেল খুসবন্ত সিং, ডেপুটি ডিরেক্টর, মিলিটারি অপারেশন, ভারত)।

ভূট্টোর চীন সফরকালে ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর ষড়যন্ত্র করা হয়। চিফ অব জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসান, এয়ার মার্শাল রহিম খান ও আরো কয়েকজন ছিলেন এ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা।

জেনারেল হামিদের সঙ্গে আমার আলোচনাকালে আমি জোর দিয়ে বলি যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা উচিত হবে না। কারণ আমরা ভারতের সঙ্গে সীমিত লড়াই করতে চাই। ভারতও বিশ্বের কাছে আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না বলে সীমিত যুদ্ধই চায়। যুদ্ধে চীনের সম্ভাব্য হুমকির ব্যাপারে ভারত উদ্বিগ্ন। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা কোনো উল্লেখযোগ্য ভূখণ্ড হারাই নি। আমাদেরকে অবহিত করা ছাড়াই পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে। ভারতীয় বিমান বাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আমাদের চলাচল ও বিমানসহায়তা বিধ্বস্ত করে দেয়। ভারতীয় নৌবাহিনী নৌ অবরোধ আরোপ করে। ফলে আমরা কেন্দ্র (পশ্চিম পাকিস্তান) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। রুশরা প্রকাশ্যে যুদ্ধে ভারতের পক্ষে যোগদান করে।

আমি জেনারেল হামিদকে জানাই যে, আমরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। সমুদ্র ও আকাশ পথ অবরোধ করা হলে আমরা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ব। তখন তিনি আমাকে জানান যে, আমাকে বিচ্ছিন্ন অথবা পরিত্যক্ত হতে হবে না। কেন্দ্র আমাকে পরিচালনা করবে এবং 'ঘোরা পথ'

(চীন ও তিব্বতের ওপর দিয়ে)-এর মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখবে। ভারতীয়রা অবরোধ আরোপ করার পর আমি জেনারেল হামিদের সঙ্গে 'ঘোরা পথ' ব্যবহারের প্রসঙ্গে উত্থাপন করি। তিনি বললেন, 'দুঃখিত নিয়াজি। আমরা ঐ রুট ব্যবহার করতে পারছি না। আপনাকে এখন নিজের ওপর নির্ভর করতে হবে। আপনার যা আছে তাই নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে—আপনার মঙ্গল হোক।' এভাবে আমি যুদ্ধের মাঝপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।

আমাকে পরাজিত করার পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম রণাঙ্গনে অপ্রয়োজনীয়, অনাহূত ও নির্বোধ যুদ্ধ শুরু করা হয় এবং আমাকে পরিত্যাগ করা হয়। তাদের অশুভ উদ্দেশ্য জেনেও আমি বাইরের সাহায্য ছাড়াই ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমার সৈন্যদের প্রস্তুত করি। অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষিত যুদ্ধে রূপ নেয়। তবে এতে ইচ্ছাকৃতভাবে তের দিন দেরি করা হয়। পূর্বাঞ্চলীয় গ্যারিসনকে পরিত্যাগ করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এ বিলম্ব করা হয়। এতে রুশদের সাহায্য নিয়ে ভারতীয়রা সর্বাত্মক হামলা চালানোর জন্য সময় পায় অনেক।

অধ্যায় ৮

যুদ্ধের মেঘ

যুদ্ধের প্রাক্কালে আমার সৈন্যরা তাদের অবস্থান গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে মেজর জেনারেল ফজল মুকিম তার *পাকিস্তান'স ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ* নামক বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি অনেক ক্ষেত্রে ইস্টার্ন কমান্ড সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন এবং সত্য গোপন রাখতে পারেননি। সে সময় সৈন্য সমাবেশ তিনি নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন :

"পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। ১৪ পদাতিক ডিভিশন স্থায়ীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন ছিল। এ ডিভিশনকে সামরিক অভিযান শুরু হবার আগে প্রায় দু'বছর অব্যাহত সামরিক আইনের দায়িত্ব পালনের চাপ সহ্য করতে হয়েছে। পরবর্তীতে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান এবং আওয়ামী লীগের বিরূপ প্রচারণায় এ ডিভিশনকে চড়া মাশুল দিতে হয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে ৯ম ও ১৬তম পদাতিক ডিভিশনের সঙ্গে এ ডিভিশনকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। এ লড়াইয়ের জন্য সৈন্যদের না ছিল প্রশিক্ষণ না ছিল প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র। এটা ছিল এমন এক অদ্ভুত লড়াই যেজন্য সৈন্যরা মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। শত্রুকে চিহ্নিত করারও সম্ভব ছিল না। তাদের সহযোগিতায় কারা কারা আছে তাও বোঝা যাচ্ছিল না। শত্রুরাও মানছিল না যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম-কানুন। বস্তুতপক্ষে, এটা ছিল সাধারণ যুদ্ধের চেয়েও বাজে।

সৈন্যদেরকে ভারতীয় সৈন্য ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে অবিরাম আটমাস লড়াই করতে হয়েছে। মাঝে মধ্যে শান্ত অবস্থা বিরাজ করত তবে তা বেশি দিন স্থায়ী হতো না। সেপ্টেম্বর থেকে ভারতীয় আর্টিলারি ও মর্টারের গোলাবর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং সীমান্তে তাদের হামলা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। স্থানে স্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে প্লাটুন ও সেকশন আকারে মোতায়েন করা হয়। স্বস্তির কোনো আশা ছিল না। সৈন্যরা বিশ্রাম নিতে পারে নি এক মুহূর্তের জন্য। যে সৈন্যটি এপ্রিলে ট্রেঞ্চে প্রবেশ করেছিল, মরে গিয়ে না থাকলে সে সৈন্যটি নভেম্বর পর্যন্ত সেখানেই ছিল। সরবরাহ ছিল খুবই নগণ্য। কোনো নিরাপত্তা ছিল না। কারণ বেসামরিক সরকারের প্রতিটি স্তরে ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সর্বত্র শত্রুর অনুচর ছিল। সর্বোচ্চ গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তার গোপন রাখা যেত

না। এসব কারণে সৈন্যদের ওপর সার্বক্ষণিক প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়।মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতায় যুদ্ধ ছাড়াই সৈন্যরা হতাহত হতে থাকে। এতে তাদের মনোবলে চিড় ধরে। পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন সশস্ত্র বাহিনীর ওপর ন্যস্ত জটিল দায়িত্ব সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ উপলব্ধি করতে পারে নি। তাদেরকে অবহিত করার জন্য কোনো পদক্ষেপও নেয়া হয় নি। সৈন্যরা কী ধরনের দায়িত্ব পালন করেছে এবং কি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, তা বোঝানোর জন্য সাম্প্রতিক কালের দু'একটি গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের গেরিলা যুদ্ধের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে, ১৯৬০ সালে আলজেরিয়ায় গেরিলা যুদ্ধের কথা আলোচনা করা যাক। আলজেরিয়া হচ্ছে একটি সাবেক ফরাসি উপনিবেশ, ফ্রান্স থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪শ' মাইল। সে সময় আলজেরিয়ার জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি এবং ফ্রান্সের ৫ কোটি। আলজেরিয়ার ১ কোটি লোকের মধ্যে ১০ লাখ ছিল ফরাসি যারা তাদের মাতৃভূমির প্রতি ছিল অনুগত। ফরাসি সামরিক বাহিনী আলজেরিয়াকে পুরোপুরি ঘেরাও করে রেখেছিল। সে অঞ্চলে ফ্রান্সের প্রায় ১০ লাখ সৈন্য ছিল। মিসর, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন আলজেরীয় গেরিলাদের সমর্থন দিত। কিন্তু এসব দেশ ছিল আলজেরিয়া থেকে অনেক দূরে। তারা আলজেরিয়ার ভেতর থেকে নৈতিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা দিতে পারে নি। দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে উত্তর ভিয়েতনাম। বিশ্বের শীর্ষ সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ কোটি। অন্যদিকে, উত্তর ভিয়েতনামের জনসংখ্যা ছিল দেড় কোটি। উত্তর ভিয়েতনামের ২০ লাখ গেরিলা ১০ লাখ মার্কিন সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমান্ত হচ্ছে মাত্র ১শ' মাইল। মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী বাহিনীর উত্তর ভিয়েতনামকে ঘেরাও করে রেখেছিল। তাদের রণসম্ভার ও গোলাগুলির কোনো অভাব ছিল না।

অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি যাদের অধিকাংশই পর্যায়ক্রমে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ২ হাজার মাইলব্যাপী সীমান্ত রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমুদ্র পথে দূরত্ব হচ্ছে ৩ হাজার মাইল। পূর্ব পাকিস্তানে তিন ডিভিশন পদাতিক সৈন্য মোতায়েন ছিল। তাও আবার ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া। তাদের শক্তি বৃদ্ধির অথবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কোনো সুযোগ ছিল না। কয়েকজন বিদেশি বিশেষজ্ঞ সে সময় বলেছিলেন যে, বিদ্রোহ দমন অভিযানের পাকিস্তানের আড়াই থেকে তিন লাখ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যের প্রয়োজন। এছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আর্থ-রাজনৈতিক প্রচারণা চালানোরও প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানের চেয়ে কমপক্ষে ৫ গুণ বড় ভারত পূর্ব পাকিস্তানি গেরিলাদের বস্তুগত, প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও জনবল দিয়ে সাহায্য করছে। আলজেরিয়া ও ভিয়েতনামে যে ধরনের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রচারণা চালানো হয়েছে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকার সে ধরনের প্রচারনা চালিয়ে সৈন্যদের উৎসাহ যোগায় নি। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানও পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর পেছনে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। পর্বত প্রমাণ এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সৈন্যরা তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন এবং পুরোপুরিভাবে ভারত-সমর্থিত মুক্তিবাহিনীর সব অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাদের সফলতার কোনো রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করা হয় নি। সৈন্যদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জটিলতা বিবেচনায় তাদের সাফল্য একটি অলৌকিক ঘটনা।

ভারতের অব্যাহত ও ক্রমাগত চাপে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছিল সীমান্তে। সে সময় এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছিল যে, যুদ্ধ শুরু হলে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং তাদের কাছে কোনো সাহায্য আসবে না। তাদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বৈরি জনগণের করুণার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে। অফিসারও সৈন্যদের মধ্যে গৃহকাতরতা দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার একটি আতংক জোরদার হয়ে ওঠে। দুঃস্বপ্নময় মাসগুলোতে প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খান একবারের জন্যও পূর্ব পাকিস্তান সফরে যান নি। সেনাবাহিনী প্রধান ও অন্যান্য উর্ধ্বতন অফিসারগণও খুব একটা সফরে যেতেন না। এতে দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্যরা পূর্ব পাকিস্তান সফরে না যাওয়ায় ভারতীয় প্রচারণার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। পশ্চিম পাকিস্তানি লোকজনসহ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রত্যাশা করতেন যে, প্রেসিডেন্ট এসে স্বচক্ষে পরিস্থিতি দেখে যাবেন। প্রেসিডেন্ট সফরে না যাওয়ায় কানাঘুষা, গুজব ও ফিসফাস শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ বলতে লাগল যে, তিনি সফরে আসতে খুবই ভয় পাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করত যে তিনি আমোদ-ফূর্তিতে এত ব্যস্ত যে, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা নিয়ে ভাববার তাঁর ফুরসত নেই। তবে সৈন্যরা তাদের কমান্ডার-ইন-চিফকে তাদের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল। সৈন্যরা বলল যে তিনি লাহোর ও শিয়ালকোট সীমান্তে সফরে যেতে পারলে পূর্ব পাকিস্তানেও আসতে পারেন। ভারতীয়রা প্রচারণা চালাচ্ছিল যে, সৈন্যরা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর দয়ার কাছে জিম্মি। প্রেসিডেন্টের কাঙ্ক্ষিত সফর ভারতের এ প্রচারণা নস্যাৎ করে দিতে পারত। ১৯৭১ সালে মার্চে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট তাঁর সৈন্যদের দেখার জন্য একবারও পূর্ব পাকিস্তানে যান নি। সামরিক ইতিহাসে এমন নজির খুব কমই আছে যেখানে একটি চরম বৈরি পরিবেশ যুদ্ধরত একটি বাহিনীকে তাদের সেনাপতি নয় মাস দেখতে যান নি। সৈন্যরা সেকেন্ড-ইন-কমান্ড সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদকে দেখতে পেয়েছে মাত্র দু'বার। একবার আগস্টে এবং আরেকবার অক্টোবরে। একটি পরিকল্পিত বিদ্রোহ দমনে সফল হওয়ার পরও তারা হয়ে ওঠে একটি বিস্মৃত সেনাবাহিনী। তারা তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে এবং পরে তারা আট মাস ধরে এমন সব ব্যর্থ তৎপরতায় জড়িত রয়েছে যার কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। তারপরও তারা মাটি কামড়ে লড়াই করেছে এবং এতে তারা ক্লান্তির চরম মাত্রায় পৌঁছে যায়। এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করেছে। পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন তিন ডিভিশন সৈন্যের মনোবল ছিল দৃশ্যত উঁচু। কিন্তু তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভারী অস্ত্র ও লজিস্টিক সমর্থন ছিল না। বিমান বাহিনীর অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে ছিল মাত্র এক স্কোয়াড্রেন বিমান। আট মাসে বিভিন্ন অপারেশনে এক স্কোয়াড্রন বিমান থেকেও কিছু বিমান খোয়া যায়। এ বিমান বাহিনী কোনোমতেই বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট ছিল না। নৌবাহিনীতে গানবোট ছিল ৪টি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান পর্যন্ত সমুদ্র সীমা পাহারা দেয়া তো দূরের কথা, পূর্ব পাকিস্তানের নদ-নদীগুলো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও এদের ছিল না। ভারতের ব্যাপক সামরিক অভিযানের আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠে। সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে কৌশলগত ও লজিস্টিকভাবে এক অসাধ্য কাজের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সহায়তা না এলে অথবা পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী কার্যকর ও ত্বরিত ভূমিকা পালন না করলে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল বজায় রাখা হবে এক দুরূহ সমস্যা। পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন সশস্ত্র বাহিনী এক সর্বাত্মক আগ্রাসন মোকাবেলা করছে।'

(পাকিস্তান'স ক্রাইসিস অভ লিডারশিপ, মেজর জেনারেল ফজল মুকিম)

সামরিক বিশেষজ্ঞ ডেভিড লোশাকের মতে, বিদ্রোহ দমনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আড়াই লাখ সৈন্যের প্রয়োজন ছিল। অন্যান্য বিদেশি বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী ও পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ দমন অভিযানে পাকিস্তানের আড়াই থেকে তিন লাখ সৈন্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার অধীনে ছিল মাত্র ৪৫ হাজার নিয়মিত ও আধাসামরিক সৈন্য। এ সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়েও আমি দু'মাসের কম সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে গেরিলাদের উচ্ছেদ করতে সফল হই। আমার সৈন্যদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ছিল না এবং কাজ করতে পারছিল না প্রাদেশিক সরকারও।

আমি জেনারেল হামিদকে জানাই যে, আমাদের প্রতি বাঙালিরা বৈরি হওয়ায় পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গেছে। সুতরাং আমার মিশনও পরিবর্তন করা উচিত এবং আমাকে প্রয়োজানবোধে আমার পরিকল্পনা পরিবর্তনের অনুমতি দেয়া উচিত। শত্রুর হাতে কোনো ভূখণ্ডের পতন হতে দেয়া যাবে না। এবং সীমান্ত বন্ধ করে দিতে হবে বলে যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তাতে কোনো কৌশলগত বিবেচনা স্থান পায় নি। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে এ রকম একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। মিশন পরিবর্তন করা হলে আমি আরো স্বাধীন ও নমনীয়ভাবে আমার দায়িত্ব পালন করতে পারতাম। কিন্তু জেনারেল হামিদ রাজি হন নি। তিনি ভারতে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি ও রসদ ধ্বংসে আমাকে অতিরিক্ত সৈন্য ও সম্পদ দিতে অস্বীকার করেন।

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সার্বিক ধারণা

পাকিস্তান সৃষ্টির সময় থেকেই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে সশস্ত্র বাহিনীর বৃহদাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে মোতায়েন রাখা হতো। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে রাখা হতো ডিভিশন আকৃতির একটি বাহিনী। "পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নির্ভর করে পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর"– এটাই ছিল প্রতিরক্ষা নীতি। এটা আরো সহজবোধ্য ভাষায় বলতে গেলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের মীমাংসা হবে পশ্চিম পাকিস্তান ফ্রন্টে। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের গ্যারিসনকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সর্বোচ্চ সংখ্যক ভারতীয় সৈন্যকে ব্যস্ত এবং তাদেরকে এ ফ্রন্টে আটকে রাখতে হবে। আমি আবার বলছি– একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। অর্থাৎ পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত। ঢাকায় আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দানের দিন পর্যন্ত এটাই ছিল আমাদের সামরিক কৌশলের ভিত্তি। পরিশিষ্ট ১৪-তে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া আছে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে উপস্থাপন

শত্রুর অতীতও সম্ভাব্য তৎপরতা, মুজাহিদ, ইপকাফ ও অন্যান্য বাহিনীসহ সৈন্য মোতায়েন এবং বৈদিশক হুমকি মোকাবেলা ও বিদ্রোহ দমনে আমার গৃহীত

ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ব্রিফিং দানের জন্য আমি আমার চিফ অভ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী ও আমার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জেনারেল জামশেদকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে পাঠাই। আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে জানাই যে :

> "বিদ্রোহ দমনে সফল হওয়ায় আমি আশংকা করছি যে, পূর্ব পাকিস্তানে শুষ্ক মওসুম শুরু এবং চীনা গিরিপথগুলো অবরুদ্ধ হয়ে এলে ভারত আমাদের বিরুদ্ধে হামলা করবে। সম্প্রতি মুক্তিবাহিনী ও গেরিলাদের অস্বাভাবিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের সীমান্ত বরাবর ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের খবর পাওয়া গেছে। যুদ্ধ আসন্ন বলে মনে হচ্ছে। নভেম্বর অথবা ডিসেম্বরের মধ্যে শত্রুর সমরসজ্জা সম্পন্ন হওয়া মাত্রই যুদ্ধ শুরু হতে পারে।
>
> বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে লড়াই করার মতো অনুকূল অবস্থা আমাদের নেই। গেরিলা তৎপরতা চলছে আমাদের বিরুদ্ধে এবং গেরিলারা সেতু, কালভার্ট, সড়ক ও রেললাইন ধ্বংস করছে এবং স্থানীয় লোকজনের অধিকাংশ আমাদের প্রতি বৈরি। বেসামরিক প্রশাসন একটি প্রতীকী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় রাজাকার ও মুজাহিদরা যেখানে যেখানে সক্রিয় কেবলমাত্র সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। মিল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন পুনরুদ্ধার করেছে। কিন্তু হুমকি দেয়া হচ্ছে তাদেরকে। বড় বড় শহরগুলোতে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম শুরু হয়েছে। কিন্তু গেরিলা হামলায় জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতি সৃষ্টি হয়েছে।"

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের অভিষেকের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির জন্য আমি সুপারিশ করেছিলাম। আমার এ সুপারিশ গ্রহণ করা হলে আগ্রাসী শক্তিকে মোকাবেলায় আমার কাজ সহজ হতো। কিন্তু এবার আমাকে পশ্চাৎভাগ ও সম্মুখভাগ থেকে লড়াই করতে হবে।

শত্রুর সামর্থ্য

আমি আশা করেছিলাম যে, এগার অথবা বার ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য এবং চারটি স্বতন্ত্র বিগ্রেড, একটি সাজোয়া ব্রিগেড ও ৩৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ হামলায় অংশ নেবে। আমি আরো হিসাব করেছিলাম, চীনা হুমকি মোকাবিলায় ভারত চীন সীমান্তে ৪-৫ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করে বাকি সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। চীন সীমান্তে মোতায়েন সৈন্যরা মূলত রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সকল গিরিপথ বরফাচ্ছাদিত হয়ে পড়ায় চীনা সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রমে সক্ষম হবে না। তাই ভারত ১২ ডিভিশনের বেশি সৈন্য পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধে নামাতে পারে।

নিম্নোক্ত ঘটনাবলী শত্রুর আগ্রাসী অভিপ্রায়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছিল। সেগুলো হচ্ছে :

ক. ১৯৭১ সালে রুশ-ভারত সামরিক চুক্তির ফলে ভারতের অনুকূলে

কৌশলগত সামরিক ভারসাম্যের সূচনা হয়। রাশিয়া সামরিক উপদেষ্টা ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহে সহযোগিতার মাধ্যমে চীনা হুমকি মোকাবেলা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

খ. পূর্ব পাকিস্তানের স্থল সীমান্তকে পুরোপুরি ঘেরাও করার জন্য ২০ তম মাউন্টেন ডিভিশনকে নামানো হয় এবং চতুর্থ ও ৬ষ্ঠ মাউন্টেন ডিভিশনকে অগ্রবর্তী অবস্থানে মোতায়েন করা হয়।

গ. কোরের মধ্যে সেনা ও কমান্ড ইঞ্জিনিয়ার সম্পদ বন্টন।

ঘ. রেল লাইনের সংস্কার এবং রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ। ত্রিপুরা অঞ্চলে এসব কাজ চলছিল।

ঙ. সীমান্ত বরাবর আগ্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি।

চ. জনমত গঠনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর।

অনুমান

মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা এবং ভারতীয়দের পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত অনুমানগুলো পেশ করা হয় :

ক. এইচ-১

(১) অভ্যন্তরে বিদ্রোহী তৎপরতা জোরদার।

(ক) যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত।

(খ) অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য।

(গ) নির্বাচন এবং বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বাধা।

(২) ভূখণ্ড দখল এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

ইস্টার্ন সেক্টরে অগ্রাধিকার :

(ক) সব সেক্টরে ভারতীয় পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তা নিয়ে বিদ্রোহীদের সর্বাত্মক হামলা।

(খ) ভারতীয় সৈন্যদের পূর্ণ সমর্থনে সীমান্তে হামলা এবং আমাদের একটির পর একটি বিওপি দখল।

(গ) চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-সিলেট সীমান্ত বরাবর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে দুর্বল স্পটে হামলা এবং যতটুকু সম্ভব ততটুকু ভেতরে প্রবেশ।

(ঘ) বাংলাদেশ ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠা।

(৩) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি।

খ. এইচ-২ (সবচেয়ে বিপজ্জনক)

(১) পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় হামলা।
(২) এইচ-১, ইতোমধ্যে এগিয়ে চলছে।

গ. এইচ-৩
(১) এইচ-১ এক মাসের জন্য অথবা অনুরূপ।
(২) স্পষ্ট ফলাফল পাওয়া না গেলে এইচ-২ এর দিকে এগিয়ে যাবে।

আমরা এ সুপারিশে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে সুস্পষ্টরূপে জানাই যে, পাকিস্তানের পক্ষে যে কোনো হামলা চালানোর জন্য সর্বোত্তম সময় ছিল অক্টোবর অথবা মে-এর আগে এবং তা হতে হবে অবশ্যই মার্চের পর।

সার্বিক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতির আলোকে আমরা সুপারিশ করি যে, ভারতের বিরুদ্ধে সফলভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আমাদের সামনে তিনটি উপায় খোলা রয়েছে :

ক. সৈন্যদেরকে লড়াইয়ের অবস্থানে প্রত্যাহার করা
এতে প্রকৃত সীমান্ত পরিত্যাগ করতে হবে এবং আশপাশের কতিপয় এলাকা অরক্ষিত অথবা কোনো রকমে ধরে রাখতে হবে। ভারতের নিয়মিত বাহিনীর সরাসরি সমর্থন নিয়ে বিদ্রোহীরা এ ধরনের এলাকায় ও ক্ষুদ্র পোস্টগুলোতে হামলা চালাবে। এ ধরনের কয়েকটি এলাকা দখল করে বিদ্রোহী ও ভারতীয়রা বাংলাদেশ হিসেবে দাবি করতে পারে। শত্রুরা বড় ধরনের লড়াই ও রক্তপাত ছাড়াই তাদের মিশন সফল করবে। আমাদের সকল শ্রম, কঠিন লড়াই, আত্মত্যাগ ও বিস্ময়কর সাফল্য বিফলে যাবে এবং পাকিস্তানের ভাঙন নিশ্চিত হয়ে উঠবে।

খ. সীমান্ত শক্তভাবে ধরে রাখা
এটা আমাদেরকে শক্তি যোগাবে এবং সফল হলে আমাদেরকে কোনো ভূমি হারাতে হবে না। কিন্তু এলাকার বিশালত্ব এবং সৈন্য, গোলাবারুদ ও গতিশীলতার অভাবে এটা কৌশলগতভাবে উপযুক্ত নয়। আমার হাতে খুব সামান্য ভূখণ্ড থাকবে। কোনো রিজার্ভ, কোনো গতিশীলতা অথবা সচলতা

থাকবে না এবং তৎপরতার সুযোগ থাকবে সীমিত। পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা ও ঝুঁকি রয়েছে। এতে অহেতুক প্রাণহানি ঘটবে। বিদ্রোহী ও ভারতীয়রা আমাদের ক্ষতি করার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে, আমরা ভারতীয় ভূখণ্ডে গোলাগুলি ও হামলা করার অবস্থানে থাকব। ফলে ভারতীয়রা তাদের ট্যাংক ও কামানের মজুদ রক্ষায় সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হবে। এতে আমি আমার অবস্থান ধরে রাখার সুযোগ পাব এবং নিজেদের শরণার্থীদের নিয়ে ভারতীয়রা হাবুডুবু খাবে।

গ. পর্যাপ্ত অতিরিক্ত সৈন্য রাখা

অগ্রবর্তী অবস্থান ও অভ্যন্তরে শক্তিশালী হওয়ার জন্য ঘাটতিগুলো পূরণ করতে হবে। নিয়মিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি অঘোষিত যুদ্ধে দক্ষতার সঙ্গে লড়াই এবং দেশের অভ্যন্তরে লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের নির্মূল করতে হবে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তৃতীয় প্রস্তাবে সম্মত হয়। কারণ তাদের অভিমত ছিল যে, প্রথম দুই উপায় বা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে শত্রু তার মিশন হাসিলে চমৎকার অবস্থানে পৌঁছে যাবে এবং পুরো পরিস্থিতি আমাদের বিপক্ষে চলে যাবে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আরো অভিমত প্রকাশ করে যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে উভয়পক্ষের সৈন্য সংখ্যার একটি অনুকূল অনুপাত সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড না হারিয়ে পূর্ব রণাঙ্গনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভারতীয় সৈন্যকে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় ফ্রন্ট থেকেই চূড়ান্ত হামলা করা হবে। আমরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের এ অভিমত মেনে নিই এবং সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিই যে, ভারতীয় হামলা মোকাবিলা এবং ভারতীয়দের জন্য কষ্টকর অবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানো এবং আমাদের ঘাটতিগুলো পূরণ করা খুবই জরুরি। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এতে সম্মত হয়।

আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল :

(১) মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করা : প্রদেশের অধিকাংশ লোক "বাংলাদেশকে" অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করত। এজন্য আমরা বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য ঢাকাভিত্তিক একটি কেন্দ্রীয় মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বোর্ড গঠনের প্রস্তাব দেই। এ ধরনের একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালানোর জন্য সার্বক্ষণিক ব্যাপক প্রচেষ্টা এবং উৎসর্গীকৃত একদল লোকের প্রয়োজন ছিল।

(২) দেশ ও জনগণের নৈতিক মনোবলের স্বার্থে দীর্ঘস্থায়ী একটি অনিশ্চিত অবস্থা কাম্য নয়। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

(৩) ভারতীয় গোলাবর্ষণের প্রতিশোধ গ্রহণে আগরতলা বিমান ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করতে হবে।

(৪) বেসামরিক প্রশাসনকে জোরদার এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বেসামরিক প্রশাসনকে আরো সমর্থন যোগাতে হবে।

(৫) পূর্ব পাকিস্তানে আরো নতুন সৈন্য নিয়োগের মাধ্যমে আমাদের সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে।

(৬) পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো যুদ্ধ শুরু করা যাবে না।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফিরে এসে মেজর জেনারেল জামশেদ ও ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী আমাকে নিম্নোক্ত ব্রিফিং করেন :

(ক) জেনারেল হামিদ খান নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদেরকে অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থান এবং প্রদেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

(খ) অতিরিক্ত সৈন্য ও আর্টিলারি প্রেরণে আমাদের অনুরোধ আংশিকভাবে রক্ষা করা হয়েছে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স অবিলম্বে ৮ ব্যাটালিয়ন পদাতিক ও এক ব্যাটালিয়ন ইঞ্জিনিয়ার পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

(গ) ভারত ঈদের দিনে পূর্ব পাকিস্তানে হামলা করতে পারে।

(ঘ) আমাদের রাজনৈতিক মিশন অপরিবর্তিত থাকবে।

ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান

চিফ অভ জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লে. জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি আমাকে তা অবহিত করেন।

আমি ব্রিগেডিয়ার মমতাজ আলীর নেতৃত্বাধীন ১১১তম ব্রিগেড ও আরো ১০টি ব্যাটালিয়ন পাঠানোর এবং কামান ও ট্যাংকে আমার ঘাটতি পূরণের অনুরোধ করি। এ অনুরোধ নিয়ে ব্রিগেডিয়ার বাকির জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। জেনারেল হাসান ১১১তম ব্রিগেড, ১০টি ব্যাটালিয়ন ও আরো কয়েকটি সহায়ক ইউনিট পাঠাতে সম্মত হন। আলোচনাকালে দুপুরে খাবারের সময় হয়ে যায়। তাই দুপুরের পর আবার আলোচনা শুরু হওয়ার কথা ছিল। ব্রিগেডিয়ার বাকির লাঞ্চে যান এবং তখন তার এক বন্ধু আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে জানতে চান। ব্রিগেডিয়ার বাকিরের ওই বন্ধু জানান যে, তাকে ১১১তম ব্রিগেড দেয়া হবে না।

কারণ এ ব্রিগেডটি অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে রেখে দেয়া হয়েছে এবং ব্রিগেড কমান্ডার সিজিএস জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গেই অবস্থান করছেন।

বিকেলে যখন আলোচনা শুরু হয়। তখন তাঁকে জানানো হয় যে, ১১১তম ব্রিগেড পাঠানো হবে না। মাত্র আট ব্যাটালিয়ন সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে পাঠান হবে। তাকে ঢাকা ফিরে আসার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং জানানো হয় যে, এই মাত্র পাওয়া এক খবরে জানা গেছে, ১৯৭১-এর ২১ নভেম্বর ঈদের দিনে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে হামলা করবে। মাত্র দুটি ব্যাটালিয়ন আমাদের কাছে পৌঁছে। ইউনিটের বাকিরা আর কোনোদিনই এসে পৌঁছায় নি। দৃশ্যত জেনারেল গুল হাসান একটি অভ্যুত্থান ঘাটানোর জন্য আমাদের প্রতারিত করেছিলেন। তিনি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়াকে বাধ্য করতে চেয়েছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার বাকির যে বৈঠকে জেনারেল হাসানের সঙ্গে আমার সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করছিলেন সে বৈঠকে নৌবাহিনী প্রধান উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু করা যাবে না বলে আমি যে সুপারিশ করেছিলাম ব্রিগেডিয়ার বাকিরের মুখ থেকে তা শোনা মাত্রই নৌবাহিনী প্রধান মন্তব্য করেন যে, সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেবেন। জেনারেল হামিদ তখন তড়িঘড়ি করে তাকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক ত্যাগ করেন।

ব্রিফিঙের পর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ মন দিলাম। প্রথমেই ভাবতে শুরু করলাম চাঁদপুরের কথা। ১৪তম ডিভিশনকে চাঁদপুর রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। সে সামর্থ্য তাদের ছিল। কিন্তু তারা চাঁদপুর রক্ষায় ব্যর্থ হয়। তাই আমি মেজর জেনারেল এম. রহিম খানের নেতৃত্বে ৩৯ এডহক ডিভিশন গঠন করি। মার্শাল ল' সদর দপ্তর ও ৫৩ ব্রিগেডের কিছু সৈন্য নিয়ে এ ডিভিশন গঠন করা হয়। ৫৩ ব্রিগেড ছিল একটি কমান্ড রিজার্ভ এবং ঢাকার প্রতিরক্ষাই ছিল এর মূল কাজ। কিন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আরো ৮টি ব্যাটালিয়ন পাঠানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করে এ ব্রিগেডকে চৌদ্দগ্রাম-লাকসাম পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুত ব্যাটালিয়ন এসে না পৌঁছানোতে অন্যান্য ডিভিশন কাটছাট করে কিছু সৈন্য ঢাকায় এনে মোতায়েন করি। যে দু'টি অতিরিক্ত ব্যাটালিয়ন এসে পৌঁছেছিল সে দুটি ব্যাটালিয়নকে যশোর সেক্টরে ৯ ডিভিশনের ঘাটতি পূরণে পাঠানো হয়। আরো ৬টি ব্যাটালিয়ন এসে পৌঁছানোর কথা ছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ ৬টি ব্যাটালিয়নকে ঢাকায় মোতায়েন করা হবে। চাঁদপুরের কাছে একটি দ্বীপে ৩৯ ডিভিশনের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। ৩৯ তম ডিভিশন গঠন করায় ১৪ তম ডিভিশনের ওপর চাপ কমে যায়। ফলে এ দুটি ডিভিশনের দায়িত্ব পুনরায় বন্টন করা হয়। ১৪ তম ডিভিশন (৭ ব্যাটালিয়ন) কে মেঘনা নদীসহ সিলেট থেকে কসবা পর্যন্ত এবং ৩৯ তম ডিভিশন (৪টি

ব্যাটালিয়ন)কে কসবা থেকে ফেনী পর্যন্ত এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়।

জিওসি ইস্টার্ন কমান্ড লে. জেনারেল অরোরা পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে ৩ কোর সৈন্য ও একটি কমিউনিকেশন জোন মোতায়েন করেন। লে. জেনারেল সগত সিংয়ের নেতৃত্বে একটি কোর চট্টগ্রাম সেক্টরে সিলেটের বিপরীত দিকে, মেজর-জেনারেল জি.এস. গিলের নেতৃত্বে ১০১ তম কমিউনিকেশন জোনকে ময়মনসিংহ সেক্টরের বিপরীতে। ৩৩ তম কোরকে লে. জেনারেল থাপনের কমান্ডে রাজশাহী সেক্টরের বিপরীতে ও লে. জেনারেল রায়নার নেতৃত্বে দ্বিতীয় কোরকে যশোর সেক্টরের বিরুদ্ধে মোতায়েন করা হয়।

তুলনামূলক শক্তি

যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় উভয়পক্ষের তুলনামূলক শক্তি ছিল নিম্নরূপ :

সিলেট-চট্টগ্রাম সেক্টর

পাকিস্তান

১১টি ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে ১৪ ও ৩৯ ডিভিশন। ৯১ ও ৫৩ ব্রিগেড (একটি ডিভিশন সাধারণত ৯ ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে গঠিত হয়)।

ভারত

৮, ২৩ ও ৫৭ ডিভিশন, তিনটি সাঁজোয়া স্কোয়াড্রন, মুক্তিবাহিনী ব্রিগেড, মুক্তিবাহিনীর ৮টি সেক্টর ও একটি ডিশিনের শক্তিসম্পন্ন কিলোফোর্স সমন্বয়ে ৪র্থ কোর। ভারতের ৮ম ডিভিশনে ৬টি ব্রিগেড ছিল। আবার প্রতিটি ব্রিগেডে সৈন্য ছিল ৮ ব্যাটালিয়ন (তিনটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে সাধারণত একটি ব্রিগেড গঠিত হয়।)

ঢাকা-ময়মনসিংহ সেক্টর

পাকিস্তান

৯৩ ও ৩১৪ ব্রিগেডের সমন্বয়ে ৩৬ ডিভিশন।

ভারত

১০১ কমিউনিকেশন জোন, ৯৫ স্বতন্ত্র ব্রিগেড, ৬৩ পদাতিক ব্রিগেড, একটি মুক্তিবাহিনী ব্রিগেড ও একটি প্যারো ব্রিগেড। ১১ ডিসেম্বর এ প্যারা ব্রিগেডকে টাঙ্গাইল নামানো হয়।

যশোর সেক্টর

পাকিস্তান

দুটি ব্রিগেডের সমন্বয়ে গঠিত ৯ ডিভিশন এবং একটি স্বতন্ত্র সাজোয়া স্কোয়াড্রন (৮টি ট্যাংক)। ২৫ নভেম্বরে এ সেক্টরে আরো ২টি ব্যাটালিয়ন পাঠানো হয়।

ভারত

৪ ও ৯ ডিভিশনের সমন্বয়ে ২য় কোর, একটি স্বতন্ত্র ব্রিগেড ও দুটি সাজোয়া রেজিমেন্ট।

রাজশাহী সেক্টর

পাকিস্তান

১৬ ডিভিশন ও ২৯ ক্যাভালরি। আইএসএফ ও ভিপি ফোর্সসহ ইপকাফ-১৮ হাজার। রাজাকার (প্রশিক্ষণবিহীন, সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত, ৩০৩ ও ১২ বোরের রাইফেল ও বন্দুক সজ্জিত) ৬০ থেকে ৭০ হাজার।

ভারত

২০ ও ৬ মাউন্টের ডিভিশনের সমন্বয়ে ৩৩ কোর, একটি স্বতন্ত্র ব্রিগেড, একটি মুক্তিবাহিনী ব্রিগেড, দুটি সাজোয়া রেজিমেন্ট। (২০তম ডিভিশনে ৪টি নিয়মিত ব্রিগেড ছিল।)

পদাতিক হিসেবে মোতায়েন ৩৯টি বিএসফ এফ ব্যাটালিয়ন, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ-২৫,০০০ হাজার। মুক্তিবাহিনী-সুপ্রশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ৩,৫০,০০০-এর বেশি, আরো ৪টি ব্রিগেড।

অন্যান্য

পাকিস্তান

পাকিস্তান এয়ার ফোর্স এফ-৮৬-এর এক স্কোয়াড্রন,—৬ ডিসেম্বর অকেজো, একটি বিমানঘাঁটি, ৪টি গানবোট।

ভারত

ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স-১৭ স্কোয়াড্রন, এসইউ-৭ ও মিগ-২১;
৫টি বিমানঘাঁটি ও বিমানবাহী রণতরী *বিক্রম*।
ভারতীয় নৌবাহী স্কোয়াড্রন এবং *বিক্রম*।

শত্রুর কয়েকটি ডিভিশন গঠিত হয়েছিল তিন ব্রিগেডের চেয়ে বেশি সৈন্য নিয়ে এবং কয়েকটি ব্রিগেডে ছিল তিন ব্যাটালিয়নের বেশি সৈন্য। তাদের ৮ মাউন্টেন ডিভিশনে ছিল ৬টি ব্রিগেড এবং ২০ মাউন্টেন ডিভিশনে ছিল ৪টি ব্রিগেড ও মুক্তিবাহিনীর আরো একটি ব্রিগেড। সিলেট এলাকায় একটি ব্রিগেডে ৭ ব্যাটালিয়ন সৈন্য ছিল। শত্রুরা ১২ ডিভিশন শক্তি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালায়।

মেজর জেনারেল ডি. কে. পালিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন :

> "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীসহ নিয়োজিত সৈন্য সংখ্যা এক মিলিয়নের এক তৃতীয়াংশ ছাড়িয়ে যায়। উত্তরাঞ্চলে তিব্বত সীমান্ত মোতায়েন আরো ১ লাখ সৈন্যও এ হিসাবের মধ্যে ছিল। সুতরাং সব মিলিয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের আওতায় ভারতের সৈন্য ছিল প্রায় অর্ধ মিলিয়ন এ হিসাবের মধ্যে নৌ ও বিমান বাহিনীকে ধরা হয় নি।
>
> সামরিক ইতিহাসে একজন লে. জেনারেল এত বড় বিশাল বাহিনীকে কখনো নেতৃত্ব দেন নি অথবা এমন একটি কৌশলগত দায়িত্বের বোঝা বহন করেন নি।"
>
> *– দ্য লাইটনিং ক্যাম্পেইন, পৃষ্ঠা-১০৫*

ভারতীয় ও আমাদের মধ্যে সৈন্য মোতায়েনের অনুপাত দাঁড়ায় দশ : এক। এছাড়া, ভারতীয়রা স্থানীয় বৈরী জনগণের সমর্থনও পেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানিরা ছিল আমাদের বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানিদের কোনো আগ্রহ ছিল না। জেনারেল মানেকশ'র মতে, পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য মোতায়েনের অনুপাত ছিল ৪ : ১ (তার হিসেবের মধ্যে নৌ ও বিমান বাহিনী এবং বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি)। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার হিসেবে উভয়পক্ষের সৈন্য সংখ্যার অনুপাত ৬ : ১ বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয়রা ছিল আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ড পূর্ব পাকিস্তানে যে ধরনের প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিল আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে আর কোনো সেনাবাহিনী তেমন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় নি। বিজয়ী হতে হলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে শক্তির অনুপাত হতে হবে ৩ : ১। কৌশলগত বিজয়ের জন্য এ ধরনের অনুপাত অপরিহার্য। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অপ্রতিহত শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও তারা রণাঙ্গনে ক্ষুদ্র, ক্লান্ত অথচ সাহসী পাকিস্তান ইস্টার্ন গ্যারিসনকে পরাজিত করতে পারে নি। এটা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, সামরিকভাবেও অসম্ভব।

ঈদের দিনের প্রাক্কালে পরিস্থিতি (২১ নভেম্বর)

আমাদের সৈন্যরা তখন রণাঙ্গনে অবস্থান গ্রহণ করছিল এবং স্থানীয় রাজাকাররা মুক্তিবানীকে উৎখাত করার চেষ্টা করছিল। নিয়মিত সৈন্যরা রাজাকারদের শক্তি

বৃদ্ধি করছিল এবং উভয়ে ভারতীয় সৈন্যদের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী ভূরুঙ্গামারি, কামালপুর, আটগ্রাম, চাঁদপুর, বিলোনিয়া, বেনাপোল ও হিলিতে হামলা চালায়।

বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত অধিকাংশ সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় এবং রাজাকার ও মুজাহিদরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। রিজার্ভ সৈন্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রিজার্ভ বাহিনী পাঠানো হয় নি। তাই আমরা নতুন করে রিজার্ভ বাহিনী গঠন করি। একটি বৈরি পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আমাদের সৈন্য ও অফিসাররা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ডিভিশনগুলোতে ট্যাংক রেজিমেন্ট ও দূরপাল্লার কামান ছিল না। এছাড়া ইউনিটের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ঘাটতি ও ভারসাম্যহীনতা ছিল মারাত্মক। হেড কোয়ার্টার্স একটি ভারী ও দু'টি মাঝারি আর্টিলারি রেজিমেন্ট ও একটি ট্যাংক রেজিমেন্ট পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয় নি। দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী মোটেও সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল না। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স মুক্তিবাহিনীর দখল থেকে কয়েকটি এলাকা উদ্ধার অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। আমাদের তখনো রাজনৈতিক মিশন ছিল যে, মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যদের বাংলাদেশের কোনো ভূখণ্ড দখল করতে দেয়া যাবে না। তাই আমাদেরকে সীমান্তে ও অভ্যন্তরে উভয় ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়েছে।

যে কটি ব্যাটালিয়ন পাঠানোর কথা ছিল সেগুলোর মধ্যে প্রথম ব্যাটালিয়নও ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত পৌছতে পারে নি। ৮টি ব্যাটালিয়নের স্থলে মাত্র ২টি ব্যাটালিয়ন পাঠানো হয়। আমাকে একথা বলা হয় নি যে, অন্যান্য ব্যাটালিয়নগুলো পাঠানো হবে না। এটা ছিল জেনারেল গুল হাসানের আকেরটি নিষ্ঠুর কৌতুক। শত্রু হামলা করার জন্য উদ্যত হয়। আমরা চাঁদপুরে আরেকটি এডহক ডিভিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেই এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

সৈন্যদের লড়াই, শত্রুদের অগ্রাভিযান বিলম্বিতকরণ, শত্রুদের সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধন এবং পূর্ব নির্ধারিত ঘাঁটি ও দুর্গে পিছু হটে আসার লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ পরিকল্পনা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাংকারগুলো না ছিল কংক্রিটের তৈরি, না ছিল এদের চারদিকে মাইন পোঁতা। শুধু তাই নয়, এগুলো রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আর্টিলারি ফায়ারের ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এ ধরনের সমস্যা ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে এ নাজুক পরিস্থিতির জন্য যেসব কারণ দায়ী সেগুলো হচ্ছে :

- গভর্নরের কার্য নির্বাহ ছাড়া প্রতিরক্ষা খাতে কোনো টাকা বরাদ্দ করা হয় নি। গভর্নরের জন্য যে ফান্ড দেয়া হতো তাও ছিল খুব সামান্য। এ তহবিল সরবরাহও পরবর্তীতে মার্কিন আপত্তিতে বন্ধ করে দেয়া হয়।
- মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ রোধে ইতোমধ্যেই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে অধিকাংশ মাইন ফুরিয়ে যায়। যা অবশিষ্ট ছিল তার পরিমাণও ছিল খুবই সামান্য। এসব মাইন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে খুব একটা কাজে আসে নি। পশ্চিম পাকিস্তানের শত্রুর অগ্রাভিযান রোধে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে । কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সেরকম প্রতিবন্ধকতা না থাকায় শত্রু ধেয়ে আসতে থাকে।
- শত্রুর হামলা ধ্বংস করতে আর্টিলারি অপরিহার্য। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিটি প্রতিরক্ষা অবস্থানে যেখানে কয়েক ডজন আর্টিলারি ছিল সেখানে আমাদের ছিল গড়ে মাত্র কয়েকটি।
- অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থাও ছিল একইরকম। আমাদেরকে পুরান এম-২৪ মডেলের হালকা ট্যাংক দেয়া হয়। এগুলো চালানো ছিল খুবই কঠিন। ফ্যান বেল্টের পরিবর্তে দড়ি ব্যবহার করতে হতো। একটি ট্যাংক দিয়ে টেনে আরেকটি ট্যাংক স্টার্ট করতে হতো। আমরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে এ সমস্যার কথা অবহিত করেছিলাম।
- হাত দিয়ে কেউ শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে পারে না। আমাদের ট্যাংক-বিধ্বংসী কামানের ঘাটতি ছিল ৫০ শতাংশ। শত্রু বহরকে ঠেকিয়ে রাখার অথবা ধ্বংস করার জন্য আমাদের মাঝারি অথবা ভারি কামান ছিল না। আবার কয়েকটি মর্টার ও ট্যাংক-বিধ্বংসী কামানে নিশানা ঠিক করার যন্ত্রও ছিল না।
- কোনো পর্যাপ্ত বিমান সহায়তা ছিল না।
- সর্বোপরি, জনগণ ছিল বিরোধী।
- একটি যুদ্ধ পরিচালনা ও যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে পর্যাপ্ত গোয়েন্দাগিরির ওপর। ভারতীয় সেনাবাহিনী স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে আমাদের সব অবস্থান এমনটি শেষ ব্যাংকারটি পর্যন্ত চিনে ফেলতো। তাদের জুনিয়র অফিসারদেরকে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান চিনিয়ে দেয়া হতো। গোয়েন্দা তথ্যের জন্য ভারতীয়দের বেগ পেতে হয় নি। স্থানীয়রা সহায়তা না দিলে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে ভারতীয়দের প্রচুর সময় ও রক্ত দিতে হতো। কিন্তু তাদের কোনো মূল্য দিতে হয় নি। তাদেরকে আমাদের অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হতো।
- সৈন্যদেরকে স্বস্তি ও বিশ্রাম ছাড়া অবিরাম আট মাস লড়াই করতে হয়েছে। সবকিছুতেই তাদের ঘাটতি ছিল। এজন্য তাদেরকে কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়েছে।

১৯৭১-এর আগস্টে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একদল সিনিয়র আর্মি চিকিৎসক আসেন। তারা সবকিছু ঘুরে দেখেন এবং অফিসার ও জওয়ানদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সফর শেষে তারা একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এ রিপোর্টে বলা হয় যে, সৈন্যরা যুদ্ধের চূড়ান্ত ক্লান্তিকর অবস্থায় পৌঁছেছে এবং তারা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত নয়। এসব সৈন্য প্রত্যাহার এবং তাদেরকে ছুটিতে পাঠানোর সুপারিশ করা হয়। সৈন্যদেরকে প্রত্যাহার অথবা ছুটিতে যেতে না দেয়ায় তাদেরকে রণাঙ্গনে থেকে যেতে হয় এবং যুদ্ধ করতে হয়। আমি তাদের মনোবল ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য তাদেরকে জেহাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে একটি অভিযান শুরু করি। ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের মিশনে সফল হই এবং ১৯৭১-এর নভেম্বর নাগাদ সৈন্যরা জেহাদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং আমরণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। তখন একমাত্র মন্ত্র ছিল– 'হয় বাঁচ না হয় মর।'

গোলাগুলির মাঝে যারা সময় ব্যয় করেছেন অন্তত কয়েকমাস কাটিয়েছেন কেবল তারাই বুঝতে পারবেন যুদ্ধে অবসন্নতা বলতে কী বুঝায়। এতে মনোবল ভেঙে যায়। জন কেয়ি তার *'দ্য ফেস অব ব্যাটল'* নামক বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ইতিহাসে বহু খ্যাতনামা জেনারেল যুদ্ধের দখল ও চাপ সইতে না পেরে রণাঙ্গন ত্যাগ করেছেন। ওয়াটারলুতে যুদ্ধের পর ওয়েলিংটন প্রচুর কান্নাকাটি করেছিলেন। ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট যুদ্ধকালে উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে শৈল্য চিকিৎসককে তার শরীর কেটে রক্ত বের করতে দিতেন; রোমেল পেটের পীড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এজন্য সংকটকাল দু'বার তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে ফেরত আসতে হয়েছিল। গুদেরিয়ান রাশিয়ার বাইরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নেন। মারাত্মকভাবে স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ায় ১৯৪৫ সালে রিজওয়েকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দেয়া হয়।

আমার ঘাটতি, প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হাই কমান্ড আমার প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ করে। এতে তখন এটাই মনে হচ্ছিল যে, আমাকে কোরবানির খাসি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আমার সৈন্যদেরকে দেখা হচ্ছে ব্যয়যোগ্য পণ্য হিসেব। একটি বিরাট শক্তিশালী শত্রুর প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও আমি শেষদিন পর্যন্ত লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত ছিলাম এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সক্ষম ছিলাম। একইভাবে আমার কোনো অফিসার ও জওয়ানও যুদ্ধের প্রচণ্ড চাপ ও ধাক্কায় ভেঙে পড়ে নি। উপরন্তু, তারা বাঘের মতো লড়াই করেছে যা খুবই প্রশংসাযোগ্য।

পূর্ব রণাঙ্গনে আমরা যেসব সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছি পশ্চিম রণাঙ্গনে অনুরূপ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা ছিল না। আমাদের মতো পরিস্থিতিতে কখনো কোনো বাহিনীকে পড়তে হয় নি। এটা মাথায় রেখে পূর্ব পাকিস্তানে আমার

সৈন্যদের দক্ষতার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের সৈন্যদের দক্ষতা তুলনা করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটি বৈরি জনগণের মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েন সৈন্যরা অত্যন্ত সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে লড়াই করেছে। সর্বাত্মক যুদ্ধে মাত্র ১৪ দিনের লড়াইয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যে পরিমাণ ভূখণ্ড খোয়া গেছে, সেই তুলনায় ৯ মাসের একটানা বিদ্রোহ এবং ভারতের সঙ্গে ২৬ দিনের লড়াইয়ের পূর্ব রণাঙ্গনে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ভূখণ্ড খুবই সামান্য। লড়াইয়ে আমাদের এ সাফল্য সত্ত্বেও আমাদরেকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া হয়। আমরা ভারতে দু'বছর যুদ্ধবন্দি হিসেবে ছিলাম। এজন্য আমাদেরকে হাজারো প্রশ্ন করা হয়। অন্যদিকে, পশ্চিম রণাঙ্গনে অনূকূল পরিবেশে যুদ্ধ করে যারা সাড়ে ৫ হাজার বর্গমাইলের বেশি ভূখণ্ড হারিয়েছে তাদেরকে পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

> "ভৌগোলিক কারণে ডিভিশনাল অপারেশনের ওপর জেনারেল নিয়াজির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাধাগ্রস্ত হয়। একই কারণে ডিভিশনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহায়তাদানও বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি ব্যাটালিয়নগুলো তাদের কোম্পানিগুলোর কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধন করতে পারে নি। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিদ্রোহের ফলে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানও ধরে রাখা দৃশ্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রতিটি জায়গায় শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধরত সৈন্যরা নিজেদেরকে অরক্ষিত দেখতে পায়। তাদের পশ্চাৎভাগ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সৈন্যরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরের সময় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। ১৯৭১-এর নভেম্বর নাগাদ আমাদের অধিকাংশ সৈন্য জীবিত ছিল এবং চরম বৈরি পরিবেশে তারা ৯ মাস যুদ্ধ করেছে। এ ৯ মাস তারা দিন ও রাতে রাস্তা দিয়ে চলাচল করেছে। এসময় তারা মাইন বিস্ফোরণে মুখোমুখি হয়েছে এবং যখন-তখন আক্রান্ত হয়েছে। তাদের একমাত্র রক্ষাকবচ ছিল তাদের ত্বরিত পাল্টা হামলা। নভেম্বর পর্যন্ত অধিকাংশ সৈন্য পানিবদ্ধ বাংকারে কাটিয়েছে, তাদের পায়ে পচন ধরছে, তাদের গায়ের চামড়ায় ফোসকা পড়েছে, অজানা আশঙ্কায় তাদের মন ছিল ভারাক্রান্ত।"
>
> *(জেনারেল শওকত রিজা, দ্য পাকিস্তান আর্মি ১৯৬৬-৭১)*

আমাকে ভারতীয় আগ্রাসন মোকাবেলা করতে হয়েছে এমন একদল সৈন্য নিয়ে যারা শুধু ক্লান্ত ও অবসন্নই ছিল না, তাদের পা ফুলে গিয়েছিল, পায়ে বুট ছিল না, বুকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটও ছিল না। আমার সৈন্যদেরকে প্রয়োজনীয় বুট ও কাপড় সরবরাহ করা হয়নি। আমরা ছিলাম প্রতিপক্ষের তুলনায় সংখ্যায় খুবই নগণ্য। ট্যাংক ও কামান ছিল আমাদের সামান্য। অন্যদিকে, ভারতীয় সৈন্যরা ছিল তরতাজা, তারা তাদের সুবিধাজনক ঘাঁটি থেকে হামলা চালাত। কখন এবং কোথায় হামলা চালানো হবে সে সিদ্ধান্ত ছিল তাদের হাতে। আমাদের করণীয় ছিল শুধু শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করা। ভারতীয়দের শক্তি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় বাঙালিদের সহায়তায় যারা যুদ্ধ করছিল তাদের 'স্বাধীনতার যুদ্ধ'।

অধ্যায় ৯

আক্রমণ

ভারতীয়রা সীমান্তে হামলা ও আর্টিলারি ফায়ার বৃদ্ধি করে। ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তাদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। ইয়াহিয়া সরকারের ত্রুটিপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতি এবং অপপ্রচাররোধে ব্যর্থতার কারণে পাকিস্তান কূটনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারতীয় অপপ্রচার এত সুসংগঠিত এবং এত কার্যকর ছিল যে, এতে শুধু বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতি আন্তর্জাতিক সহানুভূতিই বৃদ্ধি পায় নি বরং ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ এবং লাখ লাখ শরণার্থীদের দেশত্যাগ সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও সাজানো কাহিনীও মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে।

আক্রমণের সময়টি ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত অনুকূলে। নভেম্বরে শেষ হয় বর্ষা এবং ভ্রাম্যমান অপারেশনের জন্য ভূমি হয় উপযুক্ত। সময়টি আরো অনুকূল ছিল এ কারণে যে, তখন চীনের পক্ষ থেকে কোনো হুমকি ছিল না—কারণ শীতকাল শুরু হওয়ায় বরফ পড়তে শুরু করে এবং এতে চীন-ভারত সীমান্তের গিরিপথগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য এরুটে চীনা সৈন্যদের ভারতে প্রবেশ সম্ভব ছিল না। ভারতীয় সেনাবাহিনী হামলার তারিখ নির্ধারণের আগে বর্ষা ও চীনের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের বিষয়টি বিবেচনায় এনেছিল।

শত্রুর প্রস্তুতি সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছিলাম আমরা এবং পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের ওপারে তাদের সৈন্য সমাবেশের প্রতি নজর রাখছিলাম। এ পরিস্থিতিতে আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকি নি। আমরা আমাদের সৈন্য মোতায়েন এবং আমাদের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য ও অবস্থান শক্তিশালী করছিলাম। ১৯৭১-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ আমাদের সৈন্য পুনঃমোতায়েন, পুনর্গঠন এবং প্রতিরক্ষা অবস্থানে গোলাবারুদের মজুদ গড়ে তোলার কাজ শেষ হয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে ভারতের আসন্ন হামলা সম্পর্কে খবর পাওয়ার পর সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়। আমরা প্রার্থনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম এবং ২০/২১ নভেম্বরের রাতে জেগে ছিলাম যেটা ছিল ঈদের রাত।

যুদ্ধের তারিখ

পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের খোলাখুলি যুদ্ধ নিয়ে আমার আলোচনা করার আগে কখন সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সে ব্যাপারে একটি ভুল ধারণা সংশোধন করা প্রয়োজন।

১৯৭১-এর মার্চ থেকেই আমাদের ভূখণ্ডে ভারতের চোরাগুপ্তা হামলা এবং গেরিলা তৎপরতা শুরু হয় এবং এতে উভয়পক্ষে জানমালের প্রচুর ক্ষতি হয়। উভয়পক্ষ বরাবরই আর্টিলারি ব্যবহার করছিল এবং ১৯৭১-এর নভেম্বরের গোড়ার দিকে ট্যাংক ও জঙ্গীবিমান অংশগ্রহণ করে। এখানে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে, আমরা তখন এসব অস্ত্র ব্যবহার করছিলাম আমাদের ভূখণ্ডে আমাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা কৌশল অনুযায়ী এবং ভারতীয় হামলাকারীদের উচ্ছেদ অথবা আমাদের এলাকায় তাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে। অন্যদিকে, ভারতীয়রা এসব অস্ত্র ব্যবহার করছিল তাদের নিজেদের এবং আমাদের উভয় ভূখণ্ড থেকে। আগস্টের শেষ থেকে নভেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি সেক্টরে প্রায়ই কয়েক ব্যাটালিয়ন অথবা ব্রিগেড আকারের শক্তি নিয়ে হামলা করতো। ১৯৭১-এর ২০/২১ নভেম্বরের রাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী সব দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে হামলা করে। এ হামলায় ভারতীয় ট্যাংক ও আর্টিলারি অংশগ্রহণ করে। তবে ভারতের অধিকাংশ হামলাই প্রতিহত করা হয়। ভারতীয়রা তাদের হামলাকে একটি লাইটনিং ক্যাম্পেইন, হিসেবে প্রমাণ করার স্বার্থে তাকে সীমিত যুদ্ধ অথবা সীমান্ত সংঘর্ষ হিসেবে প্রচার করতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের ভূখণ্ডে ভারতীয় হামলা অথবা বিদ্রোহ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানে খুব একটা লেখালেখি হয় নি। একইভাবে জনগণকে একথা জানানো হয় নি যে, ১৯৭১-এর ২১ নভেম্বর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কিছু লেখক ৩ ডিসেম্বরের সঙ্গে যুদ্ধের তারিখ গুলিয়ে ফেলছেন। পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে সত্যিকারভাবে কী ঘটেছিল সেব্যাপারে জনগণকে জানানোর তাগিদ বোধ করে নি।

১৯৭১ সালে ৩ ডিসেম্বর পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক ও ঘোষিত যুদ্ধ শুরু হলে পর্ব রণাঙ্গনে আমাদের ৪ হাজার সৈন্য নিহত এবং প্রায় সমপরিমাণ আহত হয়। [illegible] থেকে নভেম্বর পর্যন্ত আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে এক হাজার নয়শো আহত সৈন্যকে পাঠিয়েছিলাম। ৩ ডিসেম্বরের আগে আমরা ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে ১২টি ট্যাংক ও তিনটি জঙ্গী বিমান হারাই। দুটি *হিলাল-ই-জুরাত*, ১০টি *সিতারা-ই-জুরাত*, ১২টি *তামগা-ই-জুরাত* এবং আরো কিছু পদক প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয় এবং পদকগুলো দেয়াও হয়। এসব বীরত্বসূচক পদক প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই কোথাও না কোথাও যুদ্ধ করতে হয়েছে। এসব পদক ১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বরের আগে দেয়া হয়। ১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বীরত্বপূর্ণ পদকের জন্য আরেকটি তালিকা জমা দেয়া হয়। কিন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এসব বীরত্বপূর্ণ পদক প্রদান করে নি। আমরা যুদ্ধ

ক্যাম্পের ভারতীয় জেল থেকে ফেরার পর এসে দেখতে পাই যে, এ তালিকাটি উধাও হয়ে গেছে। ধন্যবাদ গুল হাসানকে।

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হামলা
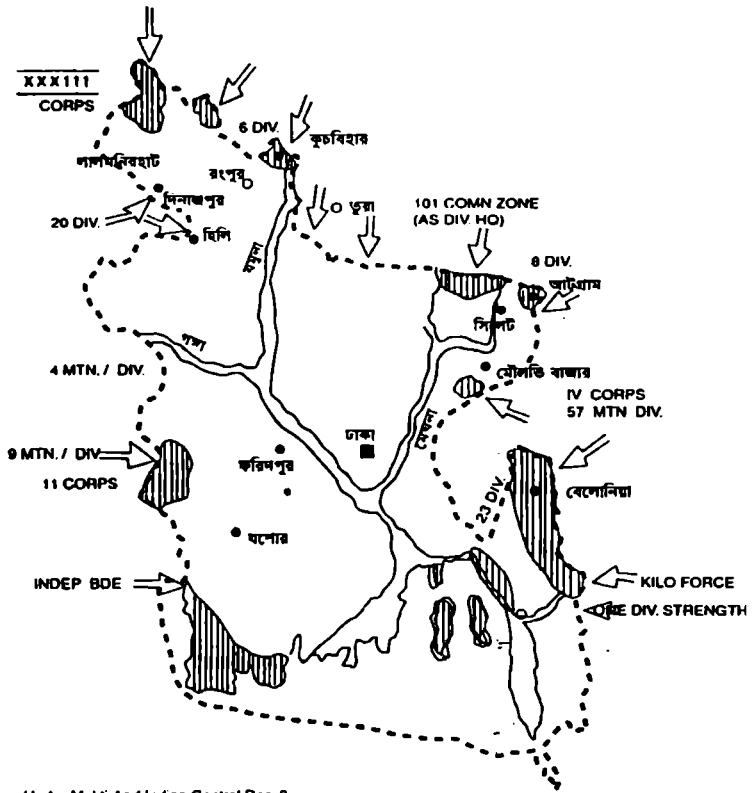
জেনারেল ইয়াহিয়া বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের যে কোনো অংশের ওপর হামলার প্রতিশোধ নেয়া হবে। কিন্তু ভারতীয়দের স্বার্থে এবং ভুট্টোর পরামর্শে ১৯৭১-এর ২১ নভেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালানো সত্ত্বেও তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ নেন নি। তার বদলে তিনি বলেছিলেন, "পাকিস্তানের জন্য আমি কী করতে পারি? আমি শুধু পারি প্রার্থনা করতে।" এবং এ পর্যন্ত তিনি করেছিলেন। আমাদের সার্বিক পরিকল্পনা অনুযায়ী জেনারেল ইয়াহিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ নিলে অথবা তৎক্ষণাৎ নিরাপত্তা পরিষদকে ভারতীয় আগ্রাসন সম্পর্কে অবহিত করলে ভারতীয়রা ২১ নভেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার তারিখকে ৩ ডিসেম্বর হিসেবে উল্লেখ করে বিভ্রান্ত করার অবস্থানে থাকতে পারতো না। এবং এটাকে দু'সপ্তাহের একটি ক্যাম্পেইন হিসেবেও আখ্যায়িত করার সুযোগ পেত না।

"১৯৭১-এর নভেম্বরের প্রথম তিন সপ্তাহে ভারতীয় সামরিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় ইউনিটগুলো পূর্ব পাকিস্তানে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে তৎক্ষণাৎ ভারতীয় ভূখণ্ডে ফিরে যেত। ২১ নভেম্বর রাতের পর এ কৌশলে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তা হলো, ভারতীয় সৈন্যরা আর ফিরে যায় নি। ২১ নভেম্বর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকটি ডিভিশন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে সাজোয়া ও বিমান বাহিনীর সমর্থন নিয়ে সকল দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সকল গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চলে একযোগে সামরিক হামলা শুরু করে।"

(আর. সিমন এবং এল.ই.রোজ : ওয়্যার অ্যান্ড সিজেশন : পাকিস্তান, ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ক্রিয়েশন অভ বাংলাদেশ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-২১৩)

ভারতের কৌশল সম্পর্কে ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাগণ তাদের বই-পুস্তকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এসব সামরিক কর্মকর্তা ১৯৭১ সালে বিভিন্ন কমান্ডিং পদে ছিলেন। তারা স্বীকার করেছেন যে, ২১ নভেম্বর তাদের ইউনিটগুলো মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। তাদের একজন বলেন, 'ভারত ২২ নভেম্বরকে হামলার ডি-ডে হিসাবে নির্ধারণ করেছিল। ঈদের জন্য তারা তারিখ একদিন এগিয়ে ২১ নভেম্বর নিয়ে আসে। ভেবেছিল যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা ঈদের আনন্দে ব্যস্ত থাকবে এবং এভাবে অসতর্ক হয়ে পড়বে।'

(মেজর জেনারেল লক্ষণ সিং, ইন্ডিয়ান সোর্ড স্ট্রাইকস ইন ইস্ট পাকিস্তান, বিকাশ, নিউদিল্লি, ১৯৮০)

তাছাড়া আমার চিফ অভ স্টাফ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সিজিএস তাকে জানান যে, ঈদের দিনে ভারত পূর্ব

পাকিস্তানে হামলা চালাবে। একথা জানিয়ে তিনি তাকে ঢাকা ছুটে যেতে বলেন।

একটি প্রতিবেশী দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সীমান্তের প্রতি কোনোরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর সীমান্ত অতিক্রম করে এবং সব দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালায়। পদাতিক বাহিনী এবং ট্যাংক প্রবেশ করার আগ মুহূর্তে পেছনে মোতায়েন গোলন্দাজ বাহিনী সীমান্ত বরাবর মূল টার্গেটগুলোতে প্রায় ৪ ঘণ্টা একটানা গোলাবর্ষণ করে। ভারতীয়রা বিরাট আড়ম্বর শক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে পুর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। এসময় ট্যাংক, মর্টার ও ভারী কামান থেকে মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল। মেশিনগান থেকে ঠা-ঠা করে অফুরন্ত গুলি ফুটছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে জঙ্গীবিমান চক্কর দিচ্ছিল এবং ছোট-বড় সব ধরনের অস্ত্র একসঙ্গে গর্জন করছিল। পক্ষান্তরে, পদাতিক সৈন্য ছাড়া আমাদের আর কোনো সহায় ছিল না। আমাদের পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রগুলোর ওপর কয়েক ঘণ্টা ধরে বোমাবর্ষণ করা হয়। যে কয়েকটি ফিল্ড আর্টিলারি ছিল সেগুলোও নিস্তার পাচ্ছিল না। তবে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য। আমাদের সৈন্য ও অফিসাররা ছিলেন যুদ্ধে অভিজ্ঞ। ট্যাংকের ঘড় ঘড় শব্দ, হাজার হাজার যান-বাহনের চিৎকার, জঙ্গীবিমানের কানফাটা আওয়াজ এবং অগণিত অস্ত্র থেকে গোলাগুলিতে রণাঙ্গন কেঁপে ওঠে। ভারতীয় পদাতিক বাহিনী প্রবেশ করার আগে আমাদের সৈন্যদের ভীত-সন্ত্রস্ত ও তাক লাগিয়ে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। তবে ভারতীয়দের এ শক্তি প্রদর্শন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভাঙতে অথবা আমাদের সৈন্যদের মনোবলে চিড় ধরাতে ব্যর্থ হয়। দক্ষ নেতৃত্ব না থাকায় এ তথাকথিত 'ব্লিৎসক্রিগ' ও 'পরিকল্পিত ছত্রছায়া" দারুণভাবে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় বাহিনীতে আমাদের মতো দক্ষ জেনারেল ছিল না। তাই তাদের 'ব্লিৎসক্রিগ' আমাদের স্ক্রিন পজিশনের কাছাকাছি আসা মাত্রই সীমান্তে মুখ থুবড়ে পড়ে। তাদের অসংখ্য বহরের গতিরোধ করা হয় এবং একটি বহর থেকে আরেকটি বহরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় এবং ঢাকা থেকে বহু দূরে এদের আটকে ফেলা হয়।

ভারত পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের স্থায়িত্ব এবং প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হওয়ার তারিখ সম্পর্কে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। যুদ্ধের মোট স্থায়িত্বকাল হচ্ছে নয় মাস—এর মধ্যে আট মাস হচ্ছে বিদ্রোহ ও সীমান্ত সংঘর্ষ এবং বাকি ২৬ দিন হচ্ছে সর্বাত্মক যুদ্ধ, দু' সপ্তাহ নয়।

আক্রমণ

১৬ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ জানান যে, ভারতীয়রা পূর্ণ শক্তি নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং তাদের পূর্ণাঙ্গ হামলা চলছে। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি কীভাবে জানলেন যে এটি পূর্ণাঙ্গ হামলা এবং

ভারতীয়রা এতদিন যে ধরনের হামলা চালিয়ে এসেছে এটি সে ধরনের হামলা নয়? নজর বললেন যে, অগ্রবর্তী অবস্থানে তিনি নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন। তিনি বললেন, "প্রচুর গোলাগুলি চলছে। এটা যেন লাহোরে হর্স শোতে আমাদের আতশবাজির মতো। গোটা সীমান্ত জুড়েই প্রতিটি ফ্রন্টে ভারতীয়দের তৎপরতা শুরু হয়েছে। এটা কোনো একটি নির্দিষ্ট সেক্টরে সীমাবদ্ধ নয়।"

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোনো নির্দিষ্ট রুট অথবা সেক্টর বরাবর কোনো বহর এগিয়ে আসার খবর পাওয়া গেছে কিনা?"

তিনি আমার প্রশ্নের না সুচক জবাব দেন। "মনে হচ্ছে তারা বুঝতে পেরেছে যে, এঁটে উঠতে পারবে না তারা। প্রধান প্রধান রুটে আমাদের চৌকিগুলো তাদেরকে শক্ত জবাব দিচ্ছে এবং শত্রুর প্রচুর ক্ষতিসাধন করছে। স্যার, ভারতীয়দের চরিত্র হচ্ছে যুদ্ধের চেয়ে কোলাহল বেশি— বর্ষণের চেয়ে গর্জন বেশি।"

অন্যান্য সেক্টর থেকেও খবর পাওয়া যাচ্ছিল যে, ভারতীয়রা সবদিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সর্বাত্মক হামলা শুরু করেছে। ভারতীয়রা ঢাকার মতো গভীর অভ্যন্তরের লক্ষ্যবস্তুতে নয়, কেবলমাত্র সীমান্তের আট থেকে দশ মাইলের মধ্যে তাদের জঙ্গিবিমান ব্যবহার করে। তাদের নৌবাহিনীও আমাদের বন্দর অথবা সমুদ্র অবরোধে এগিয়ে আসে নি। তারা এমন করছিল আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে নয়। কারণ তারা কখনো আন্তর্জাতিক মতামতের তোয়াক্কা করে নি বরং একটা ভুল ধারণা থেকেই তারা এমন করছিল। ভারতীয়রা ধারণা করতো যে, পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ড সীমান্তের কাছে একটি সরু রেড লাইনে ছড়িয়ে রয়েছে এবং তারা আকস্মিক হামলায় তা গুঁড়িয়ে দিতে পারবে। ভারতীয় কৌশলবিদগণ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আরেকটি ভুল করে। তাদের এ ভুল ছিল প্রথমটির চেয়ে বড়। ১৯৭১-এর এপ্রিলে তারা প্রথম ভুল করে। ভারতীয়রা তখন ভেবেছিল যে, আমি আমার পূর্বসূরি টিক্কার মতো বড় বড় শহর ও ক্যান্টনমেন্টের আশপাশে লড়াই করব এবং একটি ক্ষুদ্র, অর্ধসজ্জিত ও অবরুদ্ধ বাহিনী নিয়ে অগ্রাভিযান শুরু করার সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু আমি তাদের ধারণা ভেঙে দিয়ে হামলা শুরু করি এবং দু'মাসেরও কম সময়ের ভেতর এক ত্বরিত অভিযানে পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে গেরিলাদের উচ্ছেদ করি। দ্বিতীয় বার আমরা ভারতীয়দের বোকা বানাই। সেটা ছিল আমাদের সৈন্য মোতায়েন সম্পর্কে। আমি ভারতীয়দের এটা বুঝতে দেই যে, আমার মিশনের প্রকৃতি অনুযায়ী আমাকে আমার সকল সৈন্য সীমান্তে মোতায়েন করতে হয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে আমার হাতে কোনো সৈন্য নেই। মানচিত্রে আমরা দেখাই যে, সকল সৈন্য একটি সরু রেখায় সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্তে মোতায়েন সৈন্যদের অবস্থান বড় করে বৃত্ত এঁকে দেখানো হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সীমান্তে খুব

সামান্য সৈন্যই ছিল, অধিকাংশ সৈন্য মোতায়েন করা হয় সীমান্ত থেকে অনেক দূরে। আমরা মানচিত্রে সৈন্য মোতায়েন যেভাবে চিহ্নিত করে দেখিয়েছিলাম তাতে ভারতীয় এবং আমাদের হাই কমান্ড উভয়েই সন্তুষ্ট হয়েছিল। আমাদের হাই কমান্ডের অভিপ্রায় ছিল ভারতীয় ও বাঙালিদের চেয়েও জঘন্য। আমার হাই কমান্ড আমাকে ভারতের প্রথম হামলায়ই ধরাশায়ী দেখতে চেয়েছিল। এজন্য আমাকে ভূখণ্ড না হারানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

এ নির্দেশপালনে সীমান্ত বন্ধ এবং সীমান্ত বরাবর সৈন্য মোতায়েন করা অপরিহার্য ছিল। আমাকে ভারতীয়দের সহজ শিকারে পরিণত করার জন্যই এরকম নির্দেশ দেয়া হয়। আমি আমার পরিকল্পনায় সামান্য সমন্বয় করি। তবে আমি সৈন্য সমাবেশ করা পরিত্যাগ করি না। আমাকে পরাজিত করার জন্য ভারতীয়দের যথেষ্ট সময় ও সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে ইয়াহিয়া আমাদের সার্বিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু অথবা ভারতীয় হামলার বিষয়টি জাতিসংঘে নিয়ে যায় নি। পূর্ব পাকিস্তানকে সরকারবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু করা হয় নি এবং বিষয়টি তৎক্ষণাৎ জাতিসংঘে নিয়ে যাওয়া হয় নি। আমি পরাজিত হলেই পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর পরিকল্পনা সফল হতো।

অতঃপর নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা হয়ে যায় ইয়াহিয়ার অংশগ্রহণ। ১৯৭১-এর ২১ নভেম্বর আমি আমার সৈন্যদের কাছে নিম্নোক্ত বার্তা পাঠাই:

'বিদ্রোহ, চোরাগুপ্তা হামলা, ক্ষয়ক্ষতি সাধন ও পরোক্ষ যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনে পূর্ব পাকিস্তান গ্যারিসনকে বিকল এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মিশন ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয়রা ২০/২১ নবেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে হামলা করেছে। পাকিস্তানের বীর সৈন্যরা গোটা ফ্রন্ট বরাবর তাদের হামলা প্রতিহত করেছে। তাদেরকে তাদের থাবা বিস্তার করার সুযোগ দেয়া যাবে না। আল-বদর ও আল-শামস যোদ্ধাদের ভারতের গভীর অভ্যন্তরে লক্ষ্যবস্তুতে পাঠাও। ভারতীয়দের ট্যাংক সংরক্ষণাগার, গান এরিয়া ও তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় হামলার জন্য স্থানীয় গেরিলা ও নিজস্ব কমান্ডোদের ব্যবহার কর। রাতে তাদের ভীতি প্রদর্শন কর। তাদের যান্ত্রিক পরিবহন (এমটি), ট্যাংক ও জঙ্গিবিমানের কোনো অভাব নেই। পেট্রোলেরও ঘাটতি নেই কোনো। তাদেরকে ভ্রাম্যমান যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দিও না। নদী, খাল-বিল, হ্রদ ও হাওরগুলোকে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার কর এবং যান্ত্রিক পরিবহনকে রাস্তায় উঠতে বাধ্য করার জন্য কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি কর এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের অধিকাংশ সৈন্যকে নির্ধারিত পথ ধরে চলতে বাধ্য কর। তোমাদের মঙ্গল হোক। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।”

সব দিক থেকে হামলা চালিয়ে জায়গায় জায়গায় আমাদের অবস্থান ঘেরাও এবং পরিশেষে ঢাকা দখল করাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় হামলার মূল লক্ষ্য। তারা তিনটি কোর ও ডিভিশনাল সদর দপ্তর হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী একটি কমিউনিকেশন জোন নিয়ে আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ডিভিশনের শক্তিসম্পন্ন কিলো ফোর্স ব্যবহার করা হয়। তারা ১৭ স্কোয়াড্রন আধুনিক জঙ্গিবিমান ব্যবহার করে। এছাড়া ১২৫টি হেলিকপ্টারও তারা ব্যবহার করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের চারদিকে তাদের বিমানঘাঁটি ছিল। তাদের নৌবাহিনীতে ছিল ১২টি বৃহদাকার যুদ্ধ জাহাজ ও 'বিক্রম" নামে একটি বিমানবাহী রণতরী। এ রণতরীটি একটি ভ্রাম্যমান বিমানঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যেত।

২১ নভেম্বর আমার চিফ অভ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে ভাইস চিফ অভ জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল কোরেশীর কাছে টেলিফোন করেন এবং ভারতীয় হামলা সম্পর্কে একটি লিখিত সংকেত পাঠান। আমি চিফ অভ জেনারেল স্টাফ জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে কথা কথা বলার চেষ্টা করি। কিন্তু তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হই। তিনি ঈদ উদযাপনের জন্য লাহোর চলে গিয়েছিলেন। ২১ নভেম্বর ভারত পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালাবে, একথা ভালোভাবে অবগত হয়েও তিনি লাহোর যান। আমি এরপর চিফ অভ স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। তাকেও পাওয়া যায় নি। পরে জানতে পেরেছি যে, জেনারেল হামিদ ও প্রেসিডেন্ট পাখি শিকারের জন্য শিয়ালকোট গিয়েছিলেঁন। কিন্তু বলা হয়েছিল যে,তারা সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে গিয়েছেন। কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের সি-ইন-সি ঈদের দিনে সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন না। সেনাবাহিনীর এ তিন শীর্ষ কর্মকর্তার এ নিষ্ঠুর আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীতে এবং পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। ঢাকা যখন পুড়ছিল তারা তখন সম্রাট নিরোর মতো বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। তাদের কার্যকলাপে আমি মোটেও হতাশ হই নি। কারণ আমি তাদের দুরভিসন্ধি আঁচ করতে পেরেছিলাম। আমার চিফ অভ স্টাফ আমাকে আগেই জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান ও আমাদের পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিষয়টিকে জাতিসংঘ অথবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া অথবা একটি যুদ্ধবিরতিতে পৌছানো অথবা কোনো রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌছানোর জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুট্টো কারো তরফেই কোনো প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নি।

"পশ্চিম রণাঙ্গনে হামলা শুরু না করে ইয়াহিয়া খান ইস্টার্ন গ্যারিসনের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব করে তোলেন...

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের হামলাই সম্ভবত

একমাত্র নজির যেখানে জাতিসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্রের ওপর আরেকটি সদস্য রাষ্ট্রের সশস্ত্র আগ্রাসন সত্ত্বেও আক্রান্ত দেশটি তৎক্ষণাৎ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করে নি।"

(ফজল মুকিম : পাকিস্তান'স ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ, ন্যাশনাল বুক ফাউন্ডেশন, ইসলামাবাদ, ১৯৭৩)

ভারতীয়রা তাদের রুশ প্রভুদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা এক সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান এবং ১২ দিনে ঢাকা দখল করবে এবং এ প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তান গ্যারিসন ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু শুরুতেই তাদের হামলা প্রতিহত করা হয়। ২১ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩ দিন ভারতীয় বাহিনীকে সীমান্তে ঠেকিয়ে রাখা হয়। এ লজ্জা ঢাকা দেয়ার জন্য ভারতীয়রা ২১ নভেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার তারিখ অস্বীকার করছে এবং বলছে যে, ৩ ডিসেম্বর হচ্ছে দু'দেশের মধ্যে প্রকাশ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার দিন।

ভারতের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা

ভারতীয়দের ইচ্ছা, তাদের পরিকল্পনা ও আনুষঙ্গিক প্রচেষ্টা তখন ছিল পুরোপুরি পরিষ্কার। তারা নিম্নলিখিত পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল :

যশোর সেক্টর : ঢাকা দখলে সদ্য গঠিত ভারতীয় দ্বিতীয় কোরে (কমান্ডার লে. জেনারেল রায়না) ছিল ৪ মাউন্টেন ডিভিশন, ৯ পদাতিক ডিভিশন; ৫০ (১) প্যারা ব্রিগেড গ্রুপ; দুটি ট্যাংক রেজিমেন্ট ও ৫টি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন।

বগুড়া সেক্টর : রংপুর-বগুড়া দখল এবং সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকা পৌছার লক্ষ্যে ৩৩ কোরে (কমান্ডার লে. জেনারেল থাপন) ছিল ৪৭১তম ইঞ্জিনিয়ার্স ব্রিগেড, ২০ মাউন্টেন ডিভিশন; ৬ মাউন্টেন ডিভিশন; ৩৪০(১) ব্রিগেড গ্রুপ; ৩৩ কর্পস আর্টিলারি ব্রিগেড; ৬৯ ক্যাভালরি (পিটি-৭৬), ৭২ সাজোয়া রেজিমেন্ট (টি-৫৫); ১০ বিএসএফ ব্যাটালিয়ন।

ময়মনসিংহ সেক্টর : ভারতীয়রা ৫টি স্বতন্ত্র ব্রিগেড নিয়ে এ সেক্টরে প্রবেশ করে। কিন্তু পরে ৬৩ ব্রিগেড এনে এ সেক্টরে শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার শাহ বেইগের নেতৃত্বে মুক্তি বাহিনীর একটি ব্রিগেডও এ সেক্টরে তৎপরতা চালাচ্ছিল। সমগ্র সেক্টর ছিল ১০১ কমিউনিকেশন জোনের কমান্ডে। সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল জি.এস. গিল এক মাইন বিস্ফোরণে একটি পা হারান। এরপর এক্স-২ ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল নাগরা তার স্থলাভিষিক্ত হন। আমরা ঢাকায় থেকেই এ ডিভিশনের গোটা স্টাফকে এ সেক্টরের অপারেশন পরিচালনা করতে দেখেছি।

সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও লাকসাম সেক্টর : এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন ভারতের চতুর্থ কোরের কমান্ডার লে. জেনারেল সগত সিং। চতুর্থ কোরে ছিল ৮, ২৩ ও ৫৭ ডিভিশন। এছাড়া, এতে ছিল মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড, ৪৭১ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড, বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন ও ১৭টি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন। চতুর্থ কোরকে ইস্টার্ন সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তুরা-ময়মনসিংহ থেকে অন্যান্য সহায়ক বাহিনী নিয়ে ঢাকা দখল করাও ছিল এ কোরের কাজ। ৬টি ব্রিগেডকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ভৈরবাজার-দাউদকান্দি-ঢাকা এলাকা-২৩ ডিভিশনকে লাকসাম; চাঁদপুর-ফেনী-চট্টগ্রাম অঞ্চল; এবং একটি ডিভিশনের শক্তি সম্পন্ন একটি বিশেষ বাহিনী (কিলো) কে রাঙ্গমাটি—কাপ্তাই ও উত্তর-পশ্চিম চট্টগ্রাম দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৯৭১-এর ২১ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের অভিযান

সৈন্য মোতায়েনে পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং সর্বাত্মক যুদ্ধের আগে ভারতীয় হামলাকালে এ সৈন্য মোতায়েন কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। আর্টিলারি ও মর্টারের সমর্থনে ভারতীয়রা হামলা চালাচ্ছিল। বিদ্রোহীরা পেছন থেকে আমাদের মূল অবস্থানে হামলা করছিল এবং শত্রুদেরকে গোয়েন্দা তথ্য দিচ্ছিল। শোনা গেছে যে, বিদ্রোহীরা দিকনির্দেশনা দিয়ে তাদেরকে আমাদের অবস্থান পর্যন্ত নিয়ে আসে এবং তারা তাদেরকে রাস্তাঘাট দেখিয়ে দেয়। আমাদের প্রতিটি অবস্থানই ছিল ভারতীয়দের চেনা। আট মাসের অব্যাহত লড়াইয়ে ক্লান্তি, অফিসার ও সাজ-সরঞ্জামে ঘাটতি এবং হতাহতদের অপসারণে প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আমার নগণ্য সৈন্যদল বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে। আমি সব ক'টি ফরমেশন ও ইউনিট সফর করি এবং এতে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, ঐ আট মাসে প্রেসিডেন্ট ও সি-ইন-সি, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, অ্যাডজুট্যান্ট-জেনারেল, কোয়ার্টার মাস্টার-জেনারেল অথবা মাস্টার-জেনারেল অর্ডন্যান্স কেউই আমাদের দেখতে আসেন নি। চিফ অভ স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ ও সিজিএস লে. জেনারেল গুল হাসান পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের সময় ইস্টার্ন কমান্ড পরিদর্শন করা দূরে থাকুক, আমাদের একবার টেলিফোন করার প্রয়োজনও অনুভব করেন নি। এতে আমরা দমে যাই নি। আমার সৈন্যরা ভারতীয়দের আমাদের পবিত্র ভূমির এক খণ্ড মাটিও দখল করে নিতে দেয় নি।

উপরে বর্ণিত সময়টা ছিল মূলত সীমান্ত লড়াইয়ের। যুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয়রা (তাদের নিয়মিত সৈন্য এবং বিএসএফ) মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় সীমান্তে হামলা শুরু করে। স্থলবাহিনীকে সহায়তাদানে চোরাগুপ্তা বিমান হামলা শুরু হয়। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ধরনটা ছিল এরকম যে, ট্যাংক ও কামানের সমর্থনের ভারতীয়রা একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে হামলা করবে এবং মুক্তিবাহিনী একই অবস্থানে হয় প্রবেশ করবে নয়তো এড়িয়ে গিয়ে পেছন দিকে এ

অবস্থান অবরোধ করবে যাতে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহার অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাধারণত ব্যাটালিয়ন অথবা ব্রিগেড পর্যায়ে এসব হামলা হতো। এগুলোতে অন্তত ৮টি করে ট্যাংক থাকত। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র হিলি। এখানে একটি পুরো রেজিমেন্ট হামলায় অংশগ্রহণ করে। ভারতীয়রা এক একটি অবস্থানে হামলা করে তা দখল করার চেষ্টা করত এবং সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ নিত। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ অবস্থা চলছিল। এরপর হামলার ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বিমান ও নৌবাহিনী পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে নামে। আমরা তখনো তাদেরকে আটকে রেখেছিলাম সীমান্তে। ভারতীয়রা বিমান বাহিনীর ছত্রছায়া না পেলে অথবা আমি আমার কোটাা অনুযায়ী ট্যাংক, দূরপাল্লার কামান ও বিমান বিধ্বংসী আর্টিলারি পেলে আমাকে কখনো সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে হতো না। আমি শত্রুদেরকে সেখানেই আটকে রাখতে পারতাম।

ভারতীয়দের কৌশল ছিল আমাদের নিয়মিত সৈন্যদের ওপর হামলা করা এবং তাদেরকে ঢাকা প্রত্যাহারের বাধা দেয়া। যত দ্রুত সম্ভব একটি বড় শহর দখল এবং এ শহরকে বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করা এবং এটাকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজেদেরকে ত্রাণকর্তা হিসেবে জাহির করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। যশোর থেকে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহারের পর তারা তাই করেছে। ৩০ ঘণ্টা পর তারা যশোর দখল করে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর একটি যৌথ কমান্ড প্রতিষ্ঠা করে ।

তারা আমাদের সৈন্যদের হত্যা এবং যানবাহন, গাড়ির ইঞ্জিন, রেললাইন, নৌকা ও ফেরি ধ্বংস করে। আমাদের যোগাযোগ কাঠামো ও যানবাহন ধ্বংসে মুক্তিবাহিনী তাদের সহযোগিতা করে। সত্যি বলতে কি, তারা আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা ধ্বংসে সফল হয়। তবে শেষদিন পর্যন্তও পশ্চাদ্ভাগ ও ঢাকায় আমাদের কিছুটা চলাচলের সুযোগ ছিল।

উভয়পক্ষে হামলায় এয়ারফোর্স অংশ নেয়। ৮টি ভারতীয় ন্যাট ও মিগ-২১ আমাদের তিনটি এফ-৮৬-এর ওপর হামলা চালায়। ২৩ নভেম্বর যশোরে ভারতের একটি বিপরীতে আমাদের দুটি বিমান খোয়া যায়। সর্বাধিনায়ক হিসেবে প্রেসিডেন্ট এক বার্তায় আমাদের তৎপরতার প্রশংসা করেন এবং অভিনন্দন জানান।

১৯৭১-এর ২৯ নবেম্বরের মধ্যে আমরা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলি এবং তাদের অগ্রাভিয়ান স্তব্ধ হয়ে যায়। তাদের প্রচুর প্রাণহানি ঘটে।

১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩ দিনের যুদ্ধে ভারতীয়দের সকল সুবিধা সত্ত্বেও তারা বিজয়ী হতে পারে নি। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে ৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ দিনের যুদ্ধে তারা হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী ভূখণ্ড দখল করে নেয় এবং শিয়ালকোট ও ওয়াজিরাবাদে হুমকি সৃষ্টি করে। ভারতীয় নৌবাহিনী করাচি পোতাশ্রয় ও পোর্ট কাসিমে প্রাধান্য বিস্তার করে। এ সময় আমাদের নৌবাহিনী অদৃশ্য হয়ে যায়। ভারতীয় বিমান বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের আকাশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু পাকিস্তান বিমান বাহিনী কোথাও কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি। এ পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিকূল পরস্থিতির কারণে

প্রেসিডেন্ট আমাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। আমি অস্বীকৃতি জানালে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদ ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষায় আমাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থান
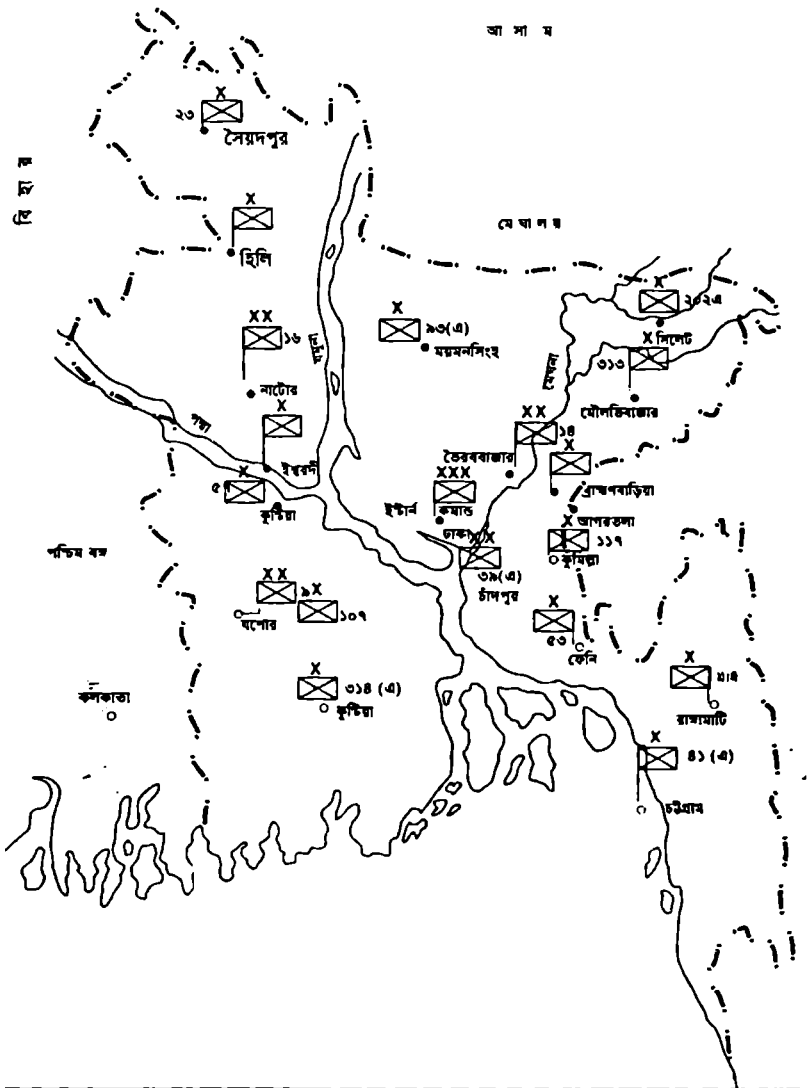
পরিদর্শন

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমি সবচেয়ে নাজুক এলাকাগুলো সফর করি। সেগুলো হচ্ছে :

২৫ নভেম্বর আমি যশোরে ডিভিশন ও ব্রিগেড কমান্ডারদের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করি এবং নির্দেশ দেই যে, যে কোনো মূল্যে সকল ঘাঁটি রক্ষা করতে হবে এবং অনুমতি ছাড়া অথবা ৭৫ শতাংশ হতাহত হওয়ার আগে সৈন্য প্রত্যাহার করা যাবে না। সদর দপ্তরে ফেরার পর আমি আমার চিফ অভ স্টাফকে এ ব্যাপারে একটি লিখিত সংকেত পাঠানোর নির্দেশ দেই। নভেম্বরের শেষদিকে দর্শনা থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দানের জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়। কয়েকটি ট্যাংক নিয়ে মুক্তিবাহিনীর একটি প্লাটুন এ অবস্থান পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলে আমাকে এ অনুরোধ জানানো হয়। আমি ৯ ডিভিশনের জিওসি ও ৫৭ ব্রিগেডের কমান্ডারকে যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ দর্শনা ধরে রাখার এবং পরে পরবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যূহে পিছু হটার নির্দেশ দেই, কিন্তু ২ ডিসেম্বর দর্শনার পতন ঘটে।

২৬ নভেম্বর আমি ১৬ ডিভিশনের জিওসির সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য নাটোর পরিদর্শন করি। পঞ্চগড়ে ২৩ ব্রিগেড যেভাবে লড়াই করছিল আমি তাতে সন্তুষ্ট হতে পারি নি। এজন্য জিওসি ব্রিগেড কমান্ডারকে কমান্ড থেকে অব্যাহতি দেন। আমি হিলিতে ২০৫ ব্রিগেডের অপারেশনে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলাম। হিলির দক্ষিণে ১০৭ ব্রিগেড মোতায়েন সম্পূর্ণ করায় সন্তুষ্ট হই আমি। সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের আশেপাশে মোতায়েন ১৪ ডিভিশনে আমার সফরের ফলে তাদের অবস্থানে কিছুটা সমন্বয় করা হয়। এসব অবস্থান যেভাবে লড়াই করছিল আমি তাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হই।

সি-ইন-সি হিসেবে প্রেসিডেন্টকে আমাদের লড়াইয়ের প্রশংসা করতে হয়। ১৯৭১-এর ২৯ নভেম্বর তিনি এক বার্তায় বলেন :

সি-ইন-সি'র পক্ষ থেকে কমান্ডারের জন্য : পূর্ব পাকিস্তানে শত্রুর সর্বশেষ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনার কমান্ডের সকল সৈন্য ও আপনার বীরত্বপূর্ণ তৎপরতায় আমি অত্যন্ত মুগ্ধ। সমগ্র জাতি আপনার জন্য গর্বিত এবং আপনার প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। শত্রুর অশুভ অভিপ্রায় নস্যাতে আমাদের সৈন্যদের সাহসী ভূমিকা সকল দেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করেছে। শত্রুর মনোবল চূর্ণ এবং আমাদের পবিত্র ভূমি থেকে তাদের পুরোপুরি নির্মূল না করা পর্যন্ত আপনাদের মহৎ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে আছেন।

৩০ নভেম্বর ১৯৭১ আমি জবাব দিলাম :

"সি-ইন-সি'র প্রতি ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডারের পক্ষ থেকে : আমাদের জাতীয় জীবনের এ ক্রান্তিকালে আপনাকে পুনরায় আশ্বাস দিচ্ছি এবং নতুন করে শপথ দিচ্ছি। আমাদের ওপর ন্যস্ত অগাধ বিশ্বাসকে আমরা ইনশাল্লাহ পুরোপুরি সম্মান

করব এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষায় কোনো ত্যাগই আমাদের কাছে বড় বলে বিবেচিত হবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে আমরা ভারতের প্রাথমিক হামলা নস্যাৎ করে দিয়েছি। আল্লাহ চান তো, আমরা ইসলামের সর্বোচ্চ ত্যাগের আদর্শে অবিশ্বাসীদের অসৎ উদ্দেশ্য চূড়ান্তভাবে নস্যাৎ করে দিতে যুদ্ধকে ভারতের মাটিতে নিয়ে যাব। দোয়া করুন এবং বিশ্বাস করুন যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরাই বিজয়ী হব ইনশাল্লাহ।"

২১ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা ভারতীয়দের সীমান্তে ঠেকিয়ে রাখি এবং পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতে কমান্ডো ও গেরিলা তৎপরতা চালাই। কিন্তু ৩ ডিসেম্বর এ পরিস্থিতি দ্রুত ভিন্ন দিকে মোড় দেয় নেয়। সেদিন আমাদের প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে অবহিত না করে পশ্চিম রণাঙ্গনে বিলম্বিত, উদ্দেশ্যবিহীন ও অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ শুরু করেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু করতে যথেষ্ট বিলম্ব করা হয়। বিলম্বে যুদ্ধ শুরু করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যে ভারতের পক্ষে যুদ্ধে নামার সুযোগ পেয়ে যায়। এর ফলাফল হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক। আমি খুব সততার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, ভারতীয়রা তাদের পাকিস্তানি অনুচরদের মাধ্যমে জেনারেল ইয়াহিয়াকে এ ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্ত করেছিলেন।

আমরা ভারতীয়দেরকে সীমান্তে থামিয়ে দিতে সফল হই। আমাদের ঘাঁটি ও দুর্গে অবস্থানরত কোম্পানি, ব্যাটালিয়ন ও ব্রিগেডগুলোকে আমরা পূর্ণগঠিত করি এবং ভারতীয় ভূখণ্ডে গোলাবর্ষণ করতে থাকি। এছাড়া, আমরা ভূখণ্ডের ভেতরেও লড়াই চালাতে থাকি। আমাদের চলাচলের যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং আমরা আমাদের পছন্দসই টার্গেটে হামলা এবং আমাদের নিজেদের ভূখণ্ডে সড়ক অবরোধে সক্ষম ছিলাম। আমরা ভারতীয়দের জন্য বিস্তর ঝামেলা সৃষ্টি করছিলাম। ইয়াহিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু না করলে ভারতীয়দের জন্য এ ঝামেলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত। আমাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজনে এ হামলা করা হয়ে থাকলে তা করা উচিত ছিল ২১, ২২ অথবা বড়জোড় ২৩ নবেম্বর। তবে এ হামলা এমন এক সময় করা হয় যখন তা ভারতীয়দের জন্য সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়।

কমান্ড রিজার্ভের অপারেশন

৫৩ ব্রিগেড ছিল কমান্ড রিজার্ভ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে এটাকে চাঁদপুর-লাকসাম সেক্টরে পাঠানো হয়। নভেম্বরে আমাকে ৮টি ব্যাটালিয়ন দেয়ার কথা ছিল। এ ব্যাটালিয়নগুলো পাঠানো হলে আমার শক্তি বেড়ে যেত। ১৭ অক্টোবর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদ আমার কাছে একটি বার্তা পাঠান। এ বার্তায় তিনি বলেন :

'বিদ্রোহী তৎপরতা সম্পর্কে আপনার ধারণা এখানে প্রাপ্ত রিপোর্টের আলোকে সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। রিজার্ভের সাহায্যে বিদ্রোহ নির্মূলের পাশাপাশি ভারতের বিরুদ্ধে আপনার লড়াইয়ের একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আপনার কমান্ড রিজার্ভ ও প্রাপ্ত অন্যান্য রিজার্ভকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হবে। আপনার অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ বিবেচনাধীন রয়েছে।'

এটা পরিষ্কার যে, আমি কমান্ড রিভান্ডের গুরুত্বের কথা ভুলে যাই নি। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিশ্রুত ব্যাটালিয়ন না পাঠিয়ে আমার সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণা করেছে। তাই রিজার্ভ পুনর্গঠনের চেষ্টা করি এবং খুলনায় কর্নেল হামিদের নেতৃত্বাধীন এডহক ব্রিগেডকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনি। ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে চতুর্দশ ডিভিশনের একটি ব্যাটালিয়ন এবং সাবেক ৯ম ডিভিশনের কিছু সৈন্যও ঢাকায় পৌঁছে যায়। জেনারেল রহিমের এডহক ডিভিশনকে ঢাকা প্রত্যাহার করা হয় এবং নারায়ণগঞ্জে মোতায়েন করা হয়। ৯৩ এডহক ব্রিগেডকে ঢাকা তলব করা হয় এবং মিরপুর এলাকার বিপরীত দিকে তারা অবস্থান গ্রহণ করে। আমি ঢাকার প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলাম এবং লড়াই করার জন্য সরকারি কোয়ার্টারগুলোতে অবস্থান গ্রহণ করি।

অঘোষিত যুদ্ধের পক্ষে ছিলাম আমি। কারণ এ যুদ্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। তখন ভারতীয় বিমান বাহিনী আমাদের গভীর অভ্যন্তরে লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করতে আসে নি। ভারতীয় নৌবাহিনীও সমুদ্র অবরোধ অথবা নদী বন্দর কিংবা সমুদ্র উপকূলে হামলা চালাচ্ছিল না। এমনকি তারা আমাদের নদীতেও প্রবেশ করেনি। পিআইএ ফ্লাইট পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চলাচল করছিল এবং ডাক ও কিছু অফিসার আসা-যাওয়া করতে পারছিলেন। মারাত্মক আহত ও রুগ্নদের পশ্চিম পাকিস্তানে অপসারণ সম্ভব হচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরেরও কিছু কিছু বিমান চলাচল সম্ভব ছিল। নদী ও সড়ক পথেও যাতায়াত করা যেত। উদাহরণস্বরূপ, ২৫ নভেম্বর আমি যশোর যাই এবং ৯ ডিভিশনের একটি সেক্টরে যুদ্ধ তৎপরতা প্রত্যক্ষ করি। ২৬ নভেম্বর আমি ১৬ ডিভিশনের এলাকায় যাই এবং লে. কর্নেল মমতাজকে সঙ্গে নিয়ে হিলি সেক্টর পরিদর্শন করি। লে. কর্নেল মমতাজকে লে. কর্নেল আব্বাসীর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ৪ এফএফ-এর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল আব্বাস আহত হয় এবং আগের দিন তাকে সরিয়ে আনা হয়। ৩ ডিসেম্বর আমি ময়মনসিংহ সেক্টরে যাই এবং ব্রিগেডিয়ার কাদির নিয়াজির নেতৃত্বাধীন ৯৩ এডহক ব্রিগেড পরিদর্শন করি। একইভাবে সমুদ্রপথও নিরাপদ ছিল। কারণ তখনো ভারতীয় নৌবাহিনী সমুদ্রপথ অবরোধ করে নি। এজন্য জাহাজ চলাচলে কোনো বাধা ছিল না।

ভারতীয় এলাকায় গোলাবর্ষণের সুবিধাও আমার ছিল। তখন পর্যন্ত আমরা ভারতীয় এলাকায় গোলাবর্ষণ করছিলাম এবং কমান্ডো ও গেরিলা হামলা

চালাচ্ছিলাম। আমাদের এসব তৎপরতা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। ভারতীয়দের গোলাবারুদও অস্ত্রশস্ত্রের মুজদ ছিল তাদের নিজেদের ভূখণ্ডে। এগুলোর ওপর আমাদের হামলার আশংকায় আশপাশের বেসামরিক লোকজন ভারতীয় সীমান্ত থেকে ভেতরের দিকে সরে যাচ্ছিল। এতে শরণার্থী সমস্যা দেখা দেয়। তখনো রুশরা প্রকাশ্যে যুদ্ধে যোগ দেয় নি। কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে অসময়ে ও দূরদর্শিতাপূর্ণ লড়াই শুরু হওয়ায় আমরা এতদিন যে সুবিধা কাজে লাগাচ্ছিলাম তা হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এখন যা কিছু ঘটবে তা শুধু আমাদের ভূখণ্ডেই ঘটবে।

২১ নভেম্বর ভারত যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তার অবসান ঘটে। অঘোষিত যুদ্ধকালে আমরা তিন সপ্তাহ ভারতীয়দের সীমান্তে আটকিয়ে রেখেছিলাম। ইয়াহিয়া খান পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু না করলে আমরা ভারতীয়দের সেখানে ঠেকিয়ে রাখতে পারতাম। অবশেষে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয় এবং তা পূর্ব পাকিস্তানের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

সীমান্তে অবস্থানরত বাঙালিরা দলে দলে ভারতীয়দের সঙ্গে যোগদান করে। ভারতীয় নৌবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সমুদ্র যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারা আমাদের নদীতে প্রবেশ করে। আমাদের উভয় পার্শ্বে ও পেছনে সৈন্য নামায়। আমাদের নৌকা ও ফেরির ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে এবং সমুদ্র উপকূল ও নদীর তীরে আমাদের অবস্থানে হামলা করে। আমাদের ৪টি গানবোট ভারতীয় যুদ্ধজাহাজে সামনে দাঁড়াতেই পারছিল না। ভারতীয় বিমান বাহিনী কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের চলাচল বিপর্যস্ত করে দেয়। ৬ ডিসেম্বর আমাদের একমাত্র বিমান ঘাঁটি ঢাকা বিমান বন্দরও বিধ্বস্ত হয় এবং আমাদের এক স্কোয়াড্রন জঙ্গি বিমান অকেজো হয়ে যায়। আমাদের অধিকাংশ সেতু, ফেরি, ফেরিঘাট, রেললাইন, রেলইঞ্জিন ও তেল মজুদ ধ্বংস হয় এবং আমাদের অবস্থান ও চলাচলের ওপর অবিরাম বিমান হামলা চলতে থাকে। ভারতীয় বিমান হামলায় আমাদের যেসব প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম তখনো ধ্বংস হয় নি বাঙালিরা সেগুলোও ধ্বংস করে। রুশরা ময়মনসিংহ সেক্টরে আমার সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে। আমি আগেই কম-বেশি বিচ্ছিন্ন ও অবরুদ্ধ ছিলাম। কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আমি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই এবং পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দিনের বেলা চলাফেরা করার অর্থই ছিল হয়তো প্রাণহানি নয়তো সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি।

পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের বিস্তার

১৯৭১ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু না করতে পরামর্শ দিয়েছিলাম আমরা এবং আরো বলেছিলাম যে, যেখানে মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় ভারত আমাদের বিরদ্ধে সীমিত লড়াই করছে সেখানে সে

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পারে না। কিন্তু আমাদের এসব পরামর্শ ও নিষেধ উপেক্ষা করে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু করা হয়। আমরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, ভারতের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধের পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ। ১৯৭১-এর ২১ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধে আমাদের ধারণাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। এ সময়ের যুদ্ধে শত্রু উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয় এবং ভারতীয় সৈন্যরা আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণে বাধ্য হয়। সকল ফ্রন্টে ভারতীয় সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখা হয়।

১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বর আমি সেনাবাহিনী প্রধানের কাছ থেকে একটি বার্তা পাই। বার্তায় আমাকে বলা হয়, “পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সর্বাত্মক হামলার আশঙ্কা থাকায় আপনাকে বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে সৈন্য মোতায়েন করতে হবে এবং নতুন নতুন অবস্থান দখলের প্রচেষ্টা চালানোর সময় কৌশলগত, রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব রয়েছে এমন সব এলাকাকে বিবেচনায় আনতে হবে।” একই দিন আমার কাছে আরেকটি বার্তা পাঠানো হয়। এতে বলা হয় যে, ভারত কাশ্মীর ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে। আমি ১৯৭১-এর ২১ নভেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়া অবস্থান দখলে নির্দেশ জারি করেছিলাম। সেনাবাহিনী প্রধানের নির্দেশও ফরমেশন কমান্ডারদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

১৩ দিন পর সেনাবাহিনী প্রধান কৌশলগত, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কেন নতুন করে সৈন্য মোতায়েনের নির্দেশ জারি করলেন, আমি তার কারণ বুঝতে পারি নি। কারণ ১৯৭১-এর ২১ নভেম্বর থেকে ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ে ইতোমধ্যেই আমাদের সৈন্য মোতায়েন করা ছিল। সেনাবাহিনী প্রধান নিজেও এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। মাত্র দু'সপ্তাহ আগে তিনি আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা ও সৈন্য মোতায়েন অনুমোদন দিয়েছিলেন। এছাড়া, ২৯ নভেম্বর আমাদের তৎপরতার প্রশংসা করে সি-ইন-সি একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাদেরকে জানিয়েছিল যে, ভারত পশ্চিম পাকিস্তানে হামলা করেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, আমরাই পশ্চিম রণাঙ্গনে লড়াই শুরু করেছিলাম। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাদেরকে এ ভুল সংবাদ কেন পরিবেশন করেছিল, আমি তাও বুঝতে ব্যর্থ হই। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কি কয়েকদিন আগে একজন কুরিয়ারের মারফত পশ্চিম রণাঙ্গনে তাদের পরিকল্পিত হামলা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করতে পারত না? অথবা তারা কি একজন কর্মকর্তাকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠাতে ভয় পাচ্ছিলেন? এতে কি তাদের পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যেত? অথবা ক্ষমতায় থাকার তাদের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হতো?

১৯৭১-এর ৫ ডিসেম্বর সেনাবাহিনী প্রধান নিম্নোক্ত বার্তা পাঠান :

"শত্রু আপনার বিরুদ্ধে চাপ জোরদার করেছে এবং তারা সম্ভবত এ চাপ সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাবে। শত্রু শিগগির পূর্ব পাকিস্তান দখলের চেষ্টা চালাবে এবং এরপর অধিকাংশ সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মোতায়েনের জন্য সেখানে তাদের স্থানান্তর করবে। এটা কোনোমতেই হতে দেয়া যাবে না। সামান্য ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হলে ছেড়ে দেবেন। তবে শত্রুর অধিকাংশ সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যস্ত রাখার জন্য আপনাকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সৈন্য মোতায়েন অব্যাহত রাখতে হবে। খুব শিগগির চীনের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আপনার মঙ্গল কামনা করি এবং এ ধরনের প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখেও আপনার চমৎকার নৈপুণ্য বজায় রাখুন।"

ওপরের বার্তা থেকে এটা স্পষ্ট যে : পশ্চিম রণাঙ্গনে বিজয়ের ফয়সালা করার জন্য আমাদেরকে পূর্ব রণাঙ্গনে অধিকাংশ ভারতীয় সৈন্যকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখতে হবে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সুযোগ না দিতে আমাদেরকে ইতিপূর্বে যে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল, সেনাবাহিনীর প্রধানের বার্তায়ও একই দিকনির্দেশনা ছিল। আমাদের কৌশলগত ধারণা থেকে ভাবছিলাম যে, ৫ ডিসেম্বরের পর যে কোনো সময় চূড়ান্ত লড়াই শুরু হবে এবং সেনাবাহিনী প্রধান অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, কোনোক্রমেই সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে না। এতে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক নির্দেশনার আওতায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদেরকে তখনো লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমার ওপর ন্যস্ত নতুন মিশন সম্পন্ন করার কাজ আত্মসমর্পণের নির্দেশ দানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এগিয়ে চলছিল।

হাই কমান্ডের যদি এই পরিকল্পনাই ছিল যে, ভারতের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের তরফ থেকে বড় ধরনের হামলা ছাড়াই ইস্টার্ন কমান্ডকে শত্রুদেরকে অনির্দিষ্টকাল আটকিয়ে রাখতে হবে তাহলে ৩ডিসেম্বর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করা ছিল হাই কমান্ডের সবচেয়ে বড় ভুল। পশ্চিম রণাঙ্গনে তারা যদি যুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনা করে থাকে এবং এ পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে এককভাবে তারাই দায়ী। ইস্টার্ন কমান্ডকে বাদ দিয়ে ভারতের সঙ্গে আমাদের শক্তির সর্বোত্তম ভারসাম্য ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে পদাতিক বাহিনীতে ছিল সমতা। এছাড়া, ভারতের সাজোয়া ডিভিশন যেখানে ছিল তিনটি সেখানে পাকিস্তানের ছিল পাঁচটি। এজন্য আমি অবশ্যই বলব যে পাকিস্তানের জয়ের সম্ভাবনা ছিল পুরোপুরি। আমাদের কখনো ভারতের সঙ্গে শক্তিতে এমন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল

না এবং আমি মনে করি না যে, আমরা সেই জায়গায় কখনো যেতে পারব। হাইকমান্ডের বোকামি ও সিদ্ধান্তহীনতা এবং রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে পরিকল্পিত আঘাত হানতে জেনারেল টিক্কার ব্যর্থতার দরুন শক্তির ভারসাম্য শত্রুর অনুকূলে চলে যায়। কৌশলগত ধারণা অনুযায়ী, পশ্চিম রণাঙ্গনে এ হামলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর থেকে চাপ কমানো এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে অধিকৃত ভূখণ্ডের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের হারানো ভূখণ্ড ফিরে পেতে দর কষাকষি করার কথা ছিল।

হাই কমান্ডের নিষ্ক্রিয়তা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তান রক্ষায় তাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। চীন তৎপরতার উদ্ধৃতিতে আমরা ধারণা করতে থাকি যে, চীনের সহায়তায় পশ্চিম রণাঙ্গনে সর্বাত্মক যুদ্ধ চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করবে। পূর্ব রণাঙ্গনে শত্রুর অধিক সৈন্যকে ব্যস্ত রাখা এবং চীনা সহায়তার মানে ছিল যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের সুনির্বাচিত, সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত অবস্থান থেকে চূড়ান্ত লড়াই শুরু হবে এবং এতে আমাদের ভাগ্যের ফয়সালা হবে। আমরা শত্রু বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার জন্য বেশ কটি হামলা চালাই এবং তাদেরকে এক মেরু থেকে আরেক মেরুতে স্থানান্তরে বাধ্য করি। আমরা তাদের চলাচল ব্যাহত করি এবং কয়েকটি রুটে তাদের প্রাধান্যকে ১:২ অথবা ১:৩ অনুপাতে নামিয়ে আনি। দেশের ভেতরে আমাদের সর্বশেষ লড়াইয়ের অবস্থানগুলোতে যেসব সড়ক ও মহাসড়ক এসে মিলিত হয়েছে সেগুলোতে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকি। আমাদের কমান্ডো তৎপরতা এবং অন্যান্য অভিযান এবং আমাদের ধারাবাহিক প্রত্যাহারের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যক ভারতীয় সৈন্যদের ব্যস্ত রাখায় সফল হই। সক্ষম হই শত্রুদেরকে আমাদের সুবিধাজনক অবস্থানের কাছাকাছি নিয়ে আসতে। বস্তুত, আমরা শত্রুর ৬ মাউন্টেন ডিভিশনকে ঠেকিয়ে রাখি। তারা এ ডিভিশনকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল।

১৯৭১-এর ৪ ডিসেম্বর আমরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে একটি সংকেত পাই। এতে আমাদেরকে ফেনির উত্তর-পূর্বদিকে সীমান্ত চৌকি পুনরায় দখল করার নির্দেশ দেয়া হয়। দৃশ্যত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাদেরকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। পক্ষান্তরে, আমি সুরক্ষিত ঘাঁটিতে আমার অবস্থান সংহত করে তুলি। ৬ ডিসেম্বর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে আমার কৌশলগত ধারণা সম্পর্কে আমি একটি বার্তা পাঠাই এবং শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়াই করার সংকল্প প্রকাশ করি।

"এক : ৩ ডিসেম্বর থেকে শত্রু সর্বাত্মক লড়াই শুরু করেছে এবং পূর্ব রণাঙ্গনের সকল ফ্রন্টে শত্রুর হামলা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪টি পূর্ণাঙ্গ ট্যাংক রেজিমেন্টের সমর্থনে শত্রুর ৮ ডিভিশন সৈন্য এ হামলায় অংশ নিচ্ছে। এদের সঙ্গে আরো রয়েছে ৩৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এবং ৬০ থেকে ৭০ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

বিদ্রোহী। বিমান বাহিনীর ছত্রছায়ায় শত্রুরা হামলা চালাচ্ছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মাধ্যমসহ সকল উপায়-উপকরণের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে সড়ক/সেতু/ফেরি/নৌকা প্রভৃতি। স্থানীয় জনগণও আমাদের বিপক্ষে। অভাবে শক্তিবৃদ্ধি, ঘাটতি পূরণ অথবা অবস্থানের পুনর্বিন্যাস কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রামের সঙ্গেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে যোগাযোগ। এতে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার আরো অবনতি ঘটবে। ভারতীয় নৌবাহিনী চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। এছাড়া, তারা সব নদীও অবরোধ করার চেষ্টা করছে। রংপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লাকসাম, চাঁদপুর ও যশোরের ওপরও প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি হয়ে উঠতে পারে আরো জটিল।

দুই : নিজেদের সৈন্যরা গত নয় মাস ধরেই সক্রিয় লড়াইয়ে জড়িত রয়েছে এবং তারা আরো তীব্র লড়াইয়ের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কার্যত তাদের কোনো স্বস্তি অথবা বিশ্রাম নেই। বিগত ১৭ দিনের তীব্র লড়াইয়ে সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জাম উভয় ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেদের ট্যাংক, কামান ও বিমানের ছত্রছায়া না থাকায় পরিস্থিতির ঘটেছে অবনতি। অস্ত্রসহ রাজাকারদের স্বপক্ষ ত্যাগের ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজেদের সৈন্যরা শত্রুদের ক্ষতি করেছে অনেক এবং সম্ভাব্য সর্বাধিক শত্রু সৈন্য হত্যা করেছে। স্থল হামলায় প্রতিটি সফলতার জন্য শত্রুকে প্রচুর মূল্য দিয়ে হয়েছে।

তিন : এ কমান্ডের আওতায় ফরমেশনগুলোর বর্তমান তৎপরতা পূর্ব পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা লাইনে পৌঁছেছে।

দুর্গ অথবা সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ : শত্রুরা নীতিবিবর্জিত উপায়সহ সকল ধরনের পন্থা অবলম্বন করবে। আমরা শেষ রক্তবিন্দু ও শেষ বুলেট থাকা পর্যন্ত লড়াই করব।"

সিজিএস ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এক সংকেতের মাধ্যমে সুরক্ষিত দুর্গে সৈন্য প্রত্যাহারে আমার কৌশলগত ধারণা অনুমোদন করেন।

উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধের শুরু থেকে যে কৌশলগত ধারণা গ্রহণ করা হয় এবং ইস্টার্ন কমান্ডের ফরমেশনে যা অনুসরণ করা হতো জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। এ কৌশলগত ধারণার লক্ষ্য ছিল শত্রুর সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধন, সর্বাধিক সংখ্যক শত্রু সৈন্যকে যুদ্ধে জড়িত করা, সময় নেয়া ও প্রত্যাহার করা এবং সুরক্ষিত দুর্গ ও অবস্থানে আশ্রয় নিয়ে যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ লড়াই করা।

৮ ডিসেম্বর আমি সিজিএস এর কাছ থেকে জি-০৯১২ নম্বর আরেকটি সংকেত পাই। এতে বলা হয়, "তৎপরতা শুরু হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর প্রেরিত জি-০৯০৭ সংকেত অনুযায়ী আপনি লড়াই অব্যাহত রাখুন।" 'তৎপরতা' বলতে মূলত

চীনাদের তৎপরতার কথাই বোঝানো হয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাকে ধোকা দিচ্ছিল। কারণ চীনারা তখনো কোনো যোগাযোগ করে নি অথবা সংকেত দেয় নি। ৬ ডিসেম্বর আমি যে বার্তা পাঠিয়েছিলাম তাতে শেষ রক্তবিন্দু ও শেষ বুলেট অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত লড়াই করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলাম। চিফ অভ জেনারেল স্টাফ আমার কৌশলগত ধারণা অনুমোদন করেছিলেন। এরপর আমার সঙ্গে কেন এ প্রতারণা করা হলো?

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ৬ ডিসেম্বরের পর ইস্টার্ন ফ্রন্টে লড়াইয়ে ভারতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ ভারতীয় সেনাবাহিনী সকল সুবিধা ভোগ করছিল। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। তারা ছিল অধিকতর সুসজ্জিত এবং আকাশ ও সমুদ্র পথে তাদের ছিল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত পর্যন্ত চমৎকার সরবরাহ লাইন প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের নদ-নদী ও সড়ক-মহাসড়কে তাদের অবাধ বিচরণ ছিল। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাদের সরবরাহও ছিল অপর্যাপ্ত। পাকিস্তানিদেরকে স্থানীয় বৈরি জনগণেরও মোকাবেলা করতে হয়েছে। অন্যদিকে, মুক্তিবাহিনী ও আওয়ামী লীগ ভারতীয়দের সহায়তা দিয়েছে। ভারতীয়দের স্থানীয় গোয়েন্দা নেটওয়ার্কও ছিল চমৎকার। এগুলো পাকিস্তানিদের ওপর জয়লাভে ভারতীয়দের যথেষ্ট সহায়ক হয়। উপরন্তু, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিকাংশ ইউনিট অন্তত ৬ মাস বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে জটিল লড়াইয়ে জড়িত ছিল। এতে তারা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।"

(আর. সিসন ও এল. ই. রোজ-পৃষ্ঠা ২১৪)

অধ্যায় ১০

সেক্টর ভিত্তিক যুদ্ধ

রাজশাহী, রংপুর, হিলি, বগুড়া

এ সেক্টরের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল ১৬ ডিভিশন যার সদর দপ্তর ছিল নাটোরে। ২৩, ১০৭ ও ২০৫ ব্রিগেড নিয়ে গঠিত এ ডিভিশনের কমান্ডার ছিলেন মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ্। ব্রিগেডিয়ার সাঈদ আখতার আনসারীর নেতৃত্বাধীন ২৩ ব্রিগেড দিনাজপুর-রংপুরের প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী ছিল। পরে অদক্ষতার জন্য আনসারীকে ২৩ ব্রিগেডের কমান্ড থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ডিভিশনাল কমান্ডার তার সামরিক অপারেশন পরিচালনায় পুরোপুরি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় ঢাকার লজিস্টিক এরিয়া কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার শফিকে। ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল হুসেইন ২০৫ ব্রিগেড কমান্ড করতেন, যিনি হিলির প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। শত্রুর ক্ষতিসাধন করার পর তাকে পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বগুড়ায় প্রত্যাহার করা হয়। থার্ড ব্রিগেড ১০৭-এর নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার নাঈম। এ ব্রিগেড অভ্যন্তরে মোতায়েন ছিল এবং পানিটোলা, নবাবগঞ্জ ও ঈশ্বরদীতে এ ব্রিগেডের এক ব্যাটালিয়ন করে সৈন্য মোতায়েন ছিল।

মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ্র বিপরীতে ছিলেন ভারতের ৩৩ কোর কমান্ডার লে. জেনারেল থাপন। তার কমান্ডের অধীনে ছিল ২০ মাউন্টেন ডিভিশন, ৬ মাউন্টেন ডিভিশন, ৩৪০(১) ব্রিগেড গ্রুপ, ৪৭১ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড, ৩৩ আর্টিলারি ব্রিগেড, ৬৪ ক্যাভালরি (পিটি-৭৬) ও ৭২ সাজোয়া রেজিমেন্ট (টি-৫৫)। এছাড়া, তার অধীনে মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড এবং কয়েক ব্যাটালিয়ন বিএসএফ ছিল।

৬ মাউন্টেন ডিভিশন আমাদের ২৩ ব্রিগেডের এলাকায় অগ্রসর হয় ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর। ভারতীয়রা রংপুরের উত্তরে লালমনিরহাট দখলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। তবে তাদের প্রতিটি প্রয়াস অত্যন্ত সফলভাবে প্রতিহত করা হয়। ২৫ নভেম্বর তাদের হামলা নস্যাৎ করে দেয়া হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী

উত্তর-পশ্চিমে তিস্তা সেতু ধ্বংস করে দেয়। এ সেতুটি ছিল রংপুর অভিমুখী প্রধান সড়কের ওপর। আমাদের সৈন্যরা ধীর-স্থিরভাবে লড়াই করে। এতে অগ্রগামী শত্রু বাহিনীর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়। আমাদের সৈন্যরা পরিকল্পনা অনুযায়ী পেছনে হটে আসে এবং রংপুর দুর্গ দখল করে। শত্রুর অগ্রযাত্রা থেমে যায় এবং তাদের প্রথম পদক্ষেপ চূর্ণ হয়ে যায়। প্রাণান্ত চেষ্টা করেও শত্রুরা অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি এবং শেষ দিন পর্যন্ত তারা আমাদের অবস্থান ঘেরাও করতে পারেনি।

ভারতের ৭১ ব্রিগেড দিনাজপুরের দিকে এগোয়। বীরগঞ্জে তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া হয়। কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনে ব্যর্থ হয়ে শত্রু দিনাজপুর ও অন্যান্য অবস্থানের মাঝে সড়ক অবরোধের প্রচেষ্টা চালায়। আমাদের সরবরাহ লাইন উন্মুক্ত থাকায় এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর ভারতীয়রা আমাদের অবস্থান ঘেরাও করার লক্ষ্যে দিনাজপুরের দক্ষিণে ৯ মাউন্টেন ব্রিগেডকে নিয়োজিত করে। এ উদ্যোগ কোনো স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয় এবং আমাদের অবস্থানগুলো অক্ষত থেকে যায়। প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদের মনোবল তখনো উঁচু ছিল। ব্রিগেডিয়ার শফি স্থানীয় সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার এবং রণক্ষেত্রের সুবিধা কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার ব্রিগেডকে পরিচালনা করেন। তিনি ভারতীয় সৈন্যদেরকে তার প্রতিরক্ষা ব্যূহের সামনে যুদ্ধে লিপ্ত রাখেন এবং লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সেখানেই আটকে রাখেন। ব্রিগেডিয়ার শফিকে আমিই ২৩ ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম। এ ব্রিগেডের দায়িত্ব ছিল দিনাজপুর-রংপুর ধরে রাখা এবং ভারতীয় সৈন্যদেরকে সামনে অগ্রসর হতে না দেয়া।

ব্রিগেডিয়ার আনসারী যেসময় ২৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন সেসময় প্রাথমিক সাফল্যে ভারতীয়রা দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। ভারতীয় নেতৃত্ব ভেবেছিল যে, এ সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় বিএসএফ পাকিস্তানি সৈন্যদের মোকাবেলা করতে পারবে। তাই তারা ৬ ডিভিশনকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রিগেডিয়ার শফি কমান্ড গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। তাদের আক্রমণাত্মক অবস্থান আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে রূপ নেয়। ব্রিগেডিয়ার শফি শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা, অস্ত্র মজুদ ও তাদের সদরদপ্তরে দুঃসাহসী হামলা চালান এবং শত্রুর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেন। অগ্রগতি না হওয়ায় ভারতীয়রা ৬ ডিভিশন স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের অদম্য স্পৃহার সামনে মাথানত করতে বাধ্য হয় ভারতীয় সৈন্যরা। ভারতীয় সৈন্যরাই যেখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের মোকাবেলা করতে পারেনি সেখানে বিএসএফ ও মুক্তিবাহিনীর মোকাবেলা করার প্রশ্নই আসে না।

২৩ ব্রিগেডকে অনেক কঠিন কাজ করতে হয়েছে। একদিকে, তাদেরকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং অন্যদিকে অনুগত পাকিস্তানিদেরও রক্ষা করতে হয়েছে।

বিদ্রোহিরা সংখ্যালঘু বিহারিদের হত্যা করতে শুরু করে। তাই এসব নিরীহ লোকজনকে রক্ষার দায়িত্ব এ ব্রিগেডের ওপর ন্যস্ত হয়। এ ব্রিগেডকে হিলির দক্ষিণে ২০৫ বিগ্রেডের উভয় পার্শ্ব রক্ষার এবং বগুড়া ও ঢাকা অভিমুখী সড়ক অবরোধে ব্যবহার করা হচ্ছিল। হিলিতে তখন চলছিল প্রচণ্ড লড়াই। তাই আমি ২৩ ব্রিগেডকে দিনাজপুর-রংপুর সেক্টর থেকে প্রত্যাহার করে হিলির দক্ষিণে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সরাসরি নির্দেশে (৫ ডিসেম্বর প্রেরিত সংকেত) আমাকে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হয়। ভারতের ৬ মাউন্টেইন ডিভিশনকে এখানে ব্যস্ত রাখার জন্যই এ নির্দেশ দেয়া হয়। নয়তো এ ডিভিশনকে পশ্চিম রণাঙ্গনে স্থানান্তর করা হতো। পশ্চিম রণাঙ্গনের অনুকূল পরিস্থিতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করার জন্য আমরা এ নির্দেশ মেনে নিই। পশ্চিমে পাকিস্তানি অভিযানের সাফল্যের স্বার্থে আমি আমার কৌশলগত পরিকল্পনা উৎসর্গ করি।

২০৫ ব্রিগেড গ্রুপের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল হুসেইন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হিলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি নোয়াপাড়া রেললাইন, বাসুদপুরা চেকপোস্ট ও রেলওয়ে স্টেশনে পর্যবেক্ষণ চৌকি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব পাকিস্তান অভিমুখী সকল পথ রক্ষায় অভ্যন্তরেও কয়েকটি সুরক্ষিত অবস্থান গড়ে তোলা হয়। ৪ এফএফ ও ১৩ এফএফ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা এসব অবস্থান অত্যন্ত কার্যকরভাবে রক্ষা করছিল। একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট, একটি মর্টার ব্যাটারি, এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক এবং পর্যবেক্ষণ গ্রুপের সদস্য ও একটি সাপোর্ট ব্যাটালিয়নও সহায়তা দিচ্ছিল। এ আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের গভীরতা ছিল দু' হাজার পাঁচশ গজ।

হিলির যুদ্ধ ছিল ১৯৭১ এর সর্বোত্তম যুদ্ধ। সাহসী পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারতের ৩৩ কোরের অধিকাংশ সৈন্যকে এখানে আটকে রাখে, ভারতের এ কোরকে ট্যাংক ও জঙ্গি বিমান সহায়তা দিচ্ছিল। হিলি এলাকাটি হচ্ছে সমতল, অনেকটা পাঞ্জাবের মতো। মাটি শক্ত। এতে সৈন্য ও ভারি সামরিক যানবাহন চলাচল সহজতর। ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল হুসাইনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতের অনবরত ও উপর্যুপরি হামলার বিরুদ্ধে অজেয় বলে প্রমাণিত হয়। তার অবস্থান পাশ কাটিয়ে যাবার ভারতীয় প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। ভারতীয়রা আমাদের অবস্থান দখল করার জন্য একেকবার একেকটি কৌশল অবলম্বন করতে থাকে, কিন্তু তাদের প্রতিটি কৌশলই ব্যর্থ হয়।

ভারতের ২০ মাউন্টেন ডিভিশনকে মোতায়েন করা হয় বালুরঘাটে। এটি আমাদের অবস্থানে হামলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। মুক্তিবাহিনী আমাদের প্রতিটি অবস্থানের বিস্তারিত বিবরণ ভারতীয়দের সরবরাহ করে। অস্ত্রের অবস্থানগুলোও

চিহ্নিত করা হয়। হিলি হচ্ছে হিলি-গাইবান্ধা মেরুর প্রবেশদ্বার– এখান থেকেই বগুড়া ও ঢাকা অভিমুখী সড়ক এগিয়ে গেছে। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনী হিলিতে উপর্যুপরি হামলা চালাতে থাকে। তবে তাদের প্রতিটি হামলাই ব্যর্থ হয়েছে। হিলি একটি দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যূহে পরিণত হয়। আশপাশের গ্রামগুলোকেও এ ব্যূহের আওতায় নিয়ে আসা হয়। খাল, পুকুর ও জলাভূমিগুলোর পূর্ণ ব্যবহার করা হয়। শত্রু পক্ষের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও তাদের গোলাবর্ষণ প্রতিহত করার জন্য সুরক্ষিত ট্রেঞ্চ খনন করা হয়। একটির সঙ্গে আরেকটি ট্রেনের আন্তঃ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রেঞ্চগুলোয় মাঝারি মেশিনগান ও রিকয়েললেস রাইফেল বসানো হয়।

এলাকা থেকে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ২৪ নভেম্বর ভারতীয়রা এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে মোরাপাড়া এ হামলা করে। শত্রুরা আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসা মাত্র আমাদের সুরক্ষিত অবস্থানগুলো থেকে একযোগে সবগুলো মেশিনগান গর্জে ওঠে। আমাদের মেশিনগান, আর্টিলারি ও মর্টারের গোলাবর্ষণ এবং জলাভূমি ও কাঁটাতারের বাধার মুখে তাদের এগিয়ে আসার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভারতীয়রা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। শত্রুদের মাত্র কয়েক প্লাটুন সৈন্য গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়। সে গ্রামে হাতাহাতি লড়াই হয়। আরো কয়েক ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য এ গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে আসে। সৈন্যদের দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মুখে শত্রুরা এ গ্রাম থেকে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং এভাবে এখানে ভারতীয় হামলা ব্যর্থ হয়।

ভারতীয়রা এক ব্রিগেড সৈন্য নিয়ে হিলিতে হামলা করেছে বলে যে দাবি করেছে তা অযৌক্তিক। এটা হচ্ছে তাদের অভিযানের ব্যর্থতা আড়াল করার একটি ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। তারা যদি শুধুমাত্র এক ব্রিগেড সৈন্য ব্যবহার করে থাকে, তাহলে তাদের ২০ ডিভিশনের অন্যান্য ব্রিগেডগুলো হিলির আশপাশে দশ দিন কি করে কাটিয়েছে? একটি পাকিস্তানি ব্রিগেড ভারতের একটি ডিভিশনকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে। ভারতের এ ডিভিশন গোলন্দাজ বাহিনী ও জঙ্গিবিমানের ছত্রছায়া নিয়েও মার খেয়েছে। ২০ মাউন্টেন ডিভিশনে ছিল পাঁচটি পদাতিক ব্রিগেড, একটি ট্যাংক ব্রিগেড, প্রায় অর্ধ ডজন বিএসএফ ব্যাটালিয়ন ও মুক্তিবাহিনী। এছাড়া, এ ডিভিশনকে ডিভিশনাল ও কোর আর্টিলারিও সমর্থন দিয়েছে। আকাশে ছিল ভারতীয়দের পূর্ণ কর্তৃত্ব। কোনো পাকিস্তানি বিমান ভারতীয়দের চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। অন্যদিকে, প্রতিদিন অন্তত কয়েকবার আমাদের অবস্থানে ভারতের বিমান হামলা হয়েছে। ভারতীয় জেনারেল সুখবন্ত সিং স্বীকার করেছেন যে, লে. জেনারেল থাপনের নেতৃত্বাধীন পাঁচটি ব্রিগেড হিলি দুর্গ অবরোধে অংশগ্রহণ করেছিল।
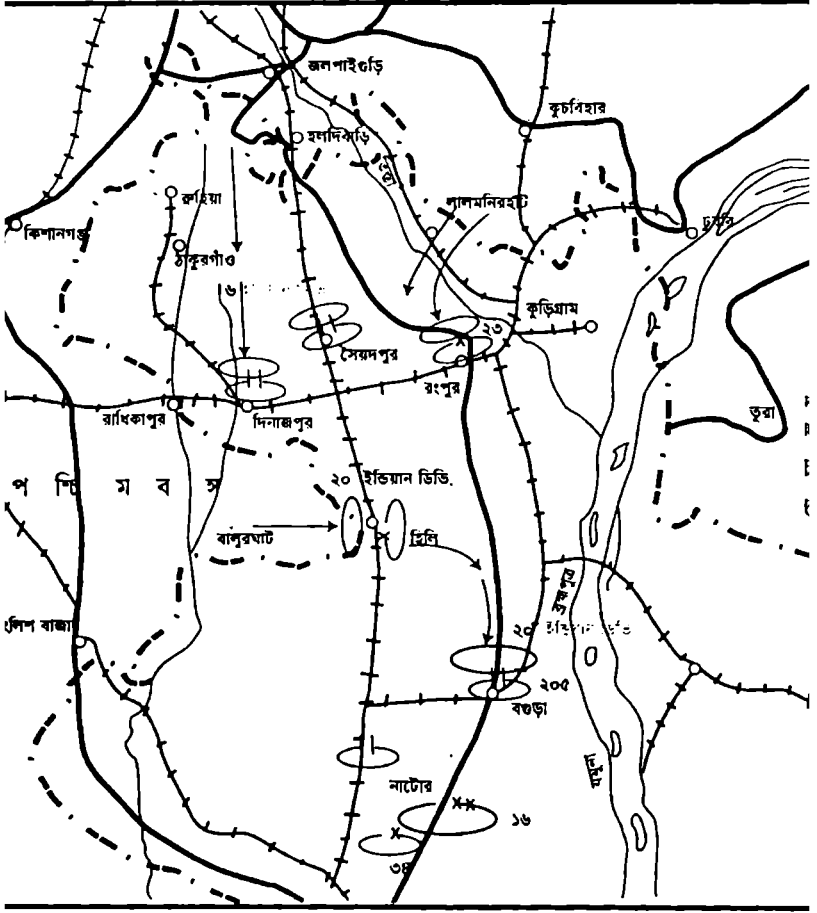
ভারতীয়রা তাদের প্রথম হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। চার জন অফিসার মারা যায় ও তিন জন আহত হয়। এছাড়া, দু'জন নন-কমিশন্ড অফিসার ও ৬১ জন অন্য র‍্যাংকের সৈন্য মারা যায় এবং ৮৫ জন আহত হয়। বালুরঘাটের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয়রা কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। মুক্তিবাহিনী ও স্থানীয় জনগণ শত্রু কমান্ডারকে হিলিতে পাকিস্তানি সৈন্য, তাদের অস্ত্রশস্ত্র, অবস্থান ও চলাচল সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেছিল।

'সমগ্র বাংলাদেশে হিলিই হচ্ছে একমাত্র দুর্গ যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের অবস্থান চূর্ণ করে দেয়ার জন্য মরণপণ লড়াই করেছে। এখানে পাকিস্তানি দুর্গে ভারতীয় হামলা নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হয়। ভারতীয়দের পূর্বেকার

কৌশল ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। কিন্তু হিলি অপারেশনে ব্যর্থতার পর তারা তাদের এ কৌশল পরিবর্তন করেন। এরপর ভারতীয়রা পাকিস্তানি অবস্থানে হামলা করার পরিবর্তে পাকিস্তানি অবস্থান এড়িয়ে যেতে থাকে। আল-আমিনীয় ধারণা যা এতদিন পুরনো প্রজন্মের জেনারেলদের মগজে বদ্ধমূল ছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটে।'[১]

মেজর জেনারেল লক্ষণ সিং, ভারতের ২০ ডিভিশনের কমান্ডার, করতোয়া থেকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি ৬৬ ও ২০২ মাউন্টেন ব্রিগেড নিয়ে হামলা করেন উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে। তিনি সংযোগ সাধন অথবা চরকাই-হিলি দখল কোনোটাই করতে পারেননি। আমাদের সৈন্যরা তার নেতৃত্বাধীন ৩৪০ ও ১৬৫ মাউন্টেন ব্রিগেডকে এত ব্যতিব্যস্ত করে তোলে যে, এ দুটি ব্রিগেড না পারছিল পুনরায় সংগঠিত হতে অথবা না পারছিল পিছু হটতে। এ ভারতীয় ভ্রাম্যমাণ বহর আমাদের পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা বগুড়া থেকে বের হতে পারেনি।

২০২ মাউন্টেন ব্রিগেডকে পাঠানো হয় হামলা জোরদার করার জন্য। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা এ ব্রিগেডের ওপর এত তীব্র হামলা চালায় যে, এতে শুধু তাদের অগ্রযাত্রাই ব্যাহত হয়নি, বরং তাদের পিছু হটার পথও বন্ধ হয়ে যায়। ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের সকল ব্রিগেড তাদের অপারেশনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে পায়ের নিচে এক টুকরো নিরাপদ জায়গা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালায়। আমাদের মাত্র একটি কোম্পানি ভাদুরিতে ভারতীয় এ ডিভিশনের হামলা প্রতিহত করে। এ কোম্পানির হামলায় শত্রুদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তাদের অগ্রযাত্রা ব্যর্থ হয়ে যায়। ভাদুরিতে ভয়াবহতম যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানিদের দৃঢ়তা ও কঠিন সংকল্পের জন্যই এ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। জনশক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্থানীয় জনগণের নিরংকুশ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সৈন্য ও অফিসাররা পাকিস্তানি সৈন্য ও অফিসারদের সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে ১১ ডিসেম্বর আমাদের সৈন্যদের প্রত্যাহার এবং আমাদের অবস্থান ছেড়ে দিতে হয়।

জেনারেল সুখবন্ত সিং তার *'লিবারেশন অভ বাংলাদেশ'* বইয়ে মজার বিশ্লেষণ দিয়েছেন :

'থাপন (ভারতীয় কোর কমান্ডার) কি কোনো ভূখণ্ড দখল করতে পেরেছেন? যুদ্ধ বিরতিকালে তিনি আত্রাই নদীর পূর্ব দিকের সকল ভূখণ্ড, বালুঘাটের উত্তরাংশ এবং কটিদেশের এক উল্লেখযোগ্য ভূমি দখল করেছেন। কিন্তু দিনাজপুর, সৈয়দপুর, রংপুর, রাজশাহী ও নাটোরের মতো সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল তার নাগালের বাইরে এবং এসব শহরে তখনো পাকিস্তানিদের অব্যাহত প্রতিরোধ গড়ে তোলার সামর্থ্য ছিল।

এ অভিযান কি প্রতিপক্ষ বাহিনীর মনোবল ও সামর্থ্য বিকল করে দেয়ার মতো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে? দৃশ্যত না। কুড়ি হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাধিক সৈন্য যুদ্ধবিরতির পর থাপনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। লড়াইয়ে যেসব অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস অথবা দখল করা হয়েছে তার পরিমাণও ছিল নগন্য। এতে পাকিস্তানি সৈন্যের কমান্ডারের সামরিক সামর্থ্য কোনোক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উত্তর-পশ্চিম সেক্টরে লড়াই নিয়াজির পতনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি।

কেন এমন হলো? জেনারেল থাপনের কমান্ডার (লে. জেনারেল অরোরা) তার ওপর যে অনির্ধারিত দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, সেখানেই এ ব্যর্থতার কারণ নিহিত রয়েছে। এসব দায়িত্বের মধ্যে ছিল ৮ দিনের মধ্যে ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও হিলি দখল এবং হিলি-গাইবান্ধা কটিদেশ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া এবং এরপর পরিস্থিতি অনুযায়ী রংপুর অথবা বগুড়ায় মিলিত হওয়া।

পাকিস্তানের ১৬ ডিভিশনের পুরোটা অথবা এর বড় অংশকে ঢাকা প্রত্যাহারে বাধা দেয়া কি সেনা কমান্ডারের ইচ্ছে ছিল? তখন প্রথমেই ফুলছড়ি, সিরাজগঞ্জ ও বেড়াঘাটের ফেরি দখল করার পরিকল্পনা করা হয় শুধুমাত্র যে অংশটা ওয়েস্ট লাইনের উত্তরে পড়েছে সেটুকু বাদ দিয়ে। সেনা কমান্ডার কি চেয়েছিলেন যে, থাপন যমুনা অতিক্রম করে ঢাকা অভিমুখে এগিয়ে যাক? অবশ্যই প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এসব চিন্তা করা হয়নি কিন্তু মনে হচ্ছে এ ক্ষেত্রে তার অন্য কোনো চিন্তা ছিল।

১২ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত তখন ঢাকার অবস্থা খুব নাজুক ছিল, তখন সেনা কমান্ডার কয়েকটি ভারী ট্যাংক ও মাঝারি ট্যাংকসহ একটি ব্রিগেডকে নদীর অপর পাড়ে পাঠানোর জন্য প্রাণান্ত অথচ ব্যর্থ চেষ্টা করেন। জেনারেল থাপনের সৈন্যরা ফুলছড়ি ফেরিঘাট দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু স্থল ও বিমান হামলায় এ ফেরিঘাট মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সিরাজগঞ্জ ও বেড়াঘাট ব্যবহার নিরাপদ ছিল না। এ দুটি ঘাট ছিল বগুড়া থেকে অনেক দূরে। এগুলো দখল করা কোরের দায়িত্বের মধ্যে ছিল না।

এটা দেখা যাচ্ছে যে, সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ধারণা সঠিক খাতে পরিচালিত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, থাপনের সেক্টর থেকে ঢাকার প্রতি একটি সমন্বিত হুমকি সৃষ্টির লক্ষ্যে হার্ডিঞ্জ ব্রিজে ২য় কোরের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ নিশ্চিত করার কোনো প্রচেষ্টা এ পরিকল্পনায় নেই। সে সময় থাপনের সেক্টর থেকে ঢাকার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করার প্রচুর সুযোগ ছিল। বাইরের সামরিক ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের আগে যুদ্ধ শেষ এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের শিগগির আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য একটি আঁটসাঁট সময় নির্ধারণের গুরুত্বের ওপরও সেনা কমান্ডার কখনো জোর দেননি। মনে হচ্ছে, তিনি দুটি বিষয়ে দোদুল্যমানতায় ভুগছিলেন। একটি

হচ্ছে, তার সৈনদের সাফল্য সম্পর্কে তিনি কী প্রত্যাশা করছিলেন এবং আরেকটি হচ্ছে, সাফল্য অর্জনে তাদের সামর্থ্য সম্পর্কে তার মূল্যায়ন। ফলে তিনি তাঁর যুদ্ধের লক্ষমাত্রা নির্ধারণে ব্যর্থ হন। তাঁর অধঃস্তন কমান্ডার ও তাদের অধীনস্থ সৈন্যরা সার্বিক লক্ষমাত্রায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ছাড়াই এক লক্ষ্য থেকে আরেক লক্ষ্যে ছুটোছুটি করেছেন।

৭ ডিসেম্বরের পরে থাপন তার সেক্টরে মোতায়েনকৃত প্রায় ৬ ব্রিগেড সৈন্যের পুরো ক্ষমতাকে লড়াইয়ে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। এর মধ্যে মাত্র একটি ব্রিগেড আক্রমণাত্মক অবস্থানে ছিল এবং বাদবাকি ৫টি ব্রিগেড পাকিস্তানি দুর্গ অবরোধে সময় কাটিয়েছে।'[২]

হিলি দুর্গ দখলে ভারতীয় সৈন্যদের অক্ষমতা হচ্ছে এ প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে পাকিস্তানি সৈন্যদের মৌলিক শক্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জনবল, অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জামে একচেটিয়া শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিমান বাহিনীর কার্যকর সহায়তা সত্ত্বেও এ দুর্গের শক্তি এবং দুর্গ রক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদের কাছে ভারতীয়রা হেরে গেছে। ১৬ ডিভিশনের কমান্ডারের নির্দেশে ১১ ডিসেম্বর অগ্রগামী শত্রুদের হামলা থেকে বগুড়া রক্ষার প্রয়োজনে হিলি দুর্গে মোতায়েন সৈন্যরা শত্রুর অবরোধ ভেঙে বগুড়া পৌঁছে। ৩৩ ভারতীয় কোর দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ায় আমাদের দুর্গ দখলে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধবিরতি নাগাদ সবগুলো দুর্গ তখনো শত্রুর হামলা মোকাবিলা করছিল। যারাই আমাদের সীমানায় প্রবেশ করেছে তাদেরকেই বেয়নেট দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পাল্টা হামলা চালিয়ে হারানো অবস্থানগুলো পুনর্দখল করা হয়।

মেজর জেনারেল (অব:) ফজল মুকিম বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন : '৯ ডিসেম্বর দিনের চতুর্থ দফা হামলায় হিলির পতন ঘটে। অফিসার ও সৈন্যরা এত ক্লান্ত ছিল যে, তারা হাঁটতেও পারছিল না।'[৩] হিলির পতন ৯ ডিসেম্বর ঘটেনি। ১৬ ডিভিশনের জিওসির স্পষ্ট নির্দেশে ১১ ডিসেম্বর সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। শত্রুর হাতে কোনো এলাকার পতন ঘটা এবং একটি সার্বিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কোনো একটি অংশের প্রতিরক্ষায় অন্য কোনো অংশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। আমরা সৈন্য প্রত্যাহার করার পর ১১ ডিসেম্বর ভারতীয়রা হিলি দুর্গ দখল করে, ৯ ডিসেম্বর নয়।

'৩২ বালুচ রেজিমেন্টের সঙ্গে সংযুক্ত মেজর শহীদের নেতৃত্বাধীন ২৩ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানি এসব অপারেশনকালে বস্তুতপক্ষে নির্মূল হয়ে যায়। যে ক'জন জীবিত ছিল তারাও বন্দি হয়। এ সময় হাবিলদার হুকাম দাদ এক বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন ... ২৩ পাঞ্জাবের কোম্পানি কমান্ডার মেজর সাজিদ ছিলেন মূল সড়কের পূর্বাংশে। দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে আসা শত্রুদের হাতে বন্দি হন তিনি। সাজিদের নেতৃত্বাধীন কোম্পানির হাবিলদার হুকাম দাদ উত্তর ও দক্ষিণে

সংযোগ সাধনে শত্রুর তিনটি হামলা ব্যর্থ করে দেন। ভারতীয় মেজর তার হাতে বন্দি মেজর সাজিদকে হাবিলদার হুকামকে হামলা বন্ধের নির্দেশ দিতে বলেন। সাজিদ এ নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানালে একটি ভারতীয় সৈন্যদল হুকাম দাদের অবস্থানে হামলা চালায়। তার অবস্থানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় হুকাম হামলাকারী সৈন্যদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন। এতে তিনজন শত্রু সেনা নিহত হয়। অন্যান্যরা পিছু হটে যায় হামাগুড়ি দিয়ে। আরো উত্তেজিত হয়ে ভারতীয় সেই মেজর পাকিস্তানি মেজর সাজিদের বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে হুকাম দাদকে হামলা বন্ধের নির্দেশ দিতে চাপ দিতে থাকে। মেজর সাজিদ চিৎকার করে হুকাম দাদকে নির্দেশ দেন হামলা বন্ধ করতে। জবাবে সে বলল, সাহেব, মনে হচ্ছে আপনার গুলি ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনো আমার কাছে দুটি ম্যাগাজিন আছে। চিন্তা করবেন না, আমার যথেষ্ট বুলেট আছে।'[৪]

এটা হলো সেই সেক্টর সেখানে মাপারা এলাকায় সাহসিকতার জন্য ৪ এফএফ-এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর আকরামকে মরণোত্তর নিশান-ই-হায়দার উপাধি দেয়া হয়। ২০৫ ব্রিগেড অত্যন্ত চমৎকারভাবে লড়াই করেছে। ৪ এফএফ-এর লে. কর্নেল আব্বাসী আহত হন এবং তাকে সরিয়ে নেয়া হয়। হিলির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকায় আমি ৪ এফএফ-এ একজন ভালো কমান্ডিং অফিসার নিয়োগ না করে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। তাই আমি ১৯৭১-এর ২৬ নভেম্বর এ এলাকা সফরকালে আমার জেনারেল স্টাফ অফিসার লে. কর্নেল মমতাজকে সঙ্গে নিয়ে যাই। সেখানে তিনি চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তাজাম্মালের অনুপস্থিতিতে ব্রিগেড কমান্ডারের দায়িত্বও পালন করেন। তার অসাধারণ বীরত্বের জন্য তাকে *সিতারা-ই-জুরাত* পদকে ভূষিত করা হয়। কর্নেল মমতাজ শত্রুর ৪টি ব্রিগেড, মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড এবং শত্রুর আরো একটি সাজোয়া ব্রিগেডের বিরুদ্ধে হিলিতে লড়াই করেছেন এবং উনিশ দিন একটানা বিমান হামলার মাঝেও তিনি তাঁর অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হন।

জেনারেল লক্ষ্মণ সিংয়ের পর্যাপ্তের চেয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্য, গোলাবারুদ ও অনুকূল পরিস্থিতি ছিল এবং এতে তার ভালো করার কথা ছিল, কিন্তু যুদ্ধে তিনি হাল ছেড়ে দেন এবং একজন নীরব দর্শকে পরিণত হন। তিনি যুদ্ধের নাড়ি না বুঝে একের পর এক হামলা চালিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন গতানুগতিক ধাঁচের এক জেনারেল যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সশরীরে না গিয়ে, যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি না বুঝে শোনা কথার ওপর হেড কোয়ার্টার্সে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যুদ্ধ পরিচালনা করেন। হিলি থেকে ৪০ মাইল দূরে বগুড়ায় আমাদের সৈন্য প্রত্যাহার এবং বিমানের ছত্রছায়া ও দূরপাল্লার কামানের সহায়তা ছাড়া ভারতীয় বেষ্টনি ভেঙে ফেলা ছিল জেনারেল লক্ষ্মণ সিংয়ের নেতৃত্বের ওপর একটি কলঙ্ক চিহ্ন।

ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল হুসাইন মালিক পূর্ব পাকিস্তানে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন। আমি তাঁকে ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য রেখে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি অগ্রবর্তী অবস্থানে গিয়ে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে মেজর জেনারেল নজরের আওতায় ২০৫ ব্রিগেডে পাঠানো হয়। একজন ভালো কমান্ডার ও একজন সাহসী সৈনিক হিসেবে তার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে তিনি তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ করেছেন। তিনি ইসলামের একজন সত্যিকার সৈনিক হিসেবে তার গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছেন এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অসম সাহসের স্বাক্ষর রেখেছেন। আমি তাঁকে *নিশান-ই-হায়দার* পদকে ভূষিত করার জন্য সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তাঁকে এ পদক দেয়নি। আমি তাঁকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়ার জন্যও সুপারিশ করেছিলাম। ইসলামের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস থাকায় অনেকেই তাঁকে ভয় পেত। তাঁর পদোন্নতি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত তিনিই একমাত্র ব্রিগেডিয়ার যাকে পদোন্নতি দেয়া হয়।

আমাদের সৈন্যরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দিনাজপুর, রংপুর, সৈয়দপুর, বগুড়া ও রাজশাহীতে পেরেকের মতো আটকিয়ে রাখে যাতে শত্রু পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্য স্থানান্তর করতে না পারে। বস্তুত, ৯ম ডিভিশন থেকে ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরের ব্রিগেড ১৬ ডিভিশনের এলাকায় পৌঁছলে উত্তর ও দক্ষিণে শত্রুরা কাবাব হয়ে যায়। যুদ্ধবিরতি না হলে শত্রুদেরকে আরো কঠোর পরিস্থিতিতে পড়তে হতো।

এ সেক্টরে ভারতীয় কোর কমান্ডারের তৎপরতা ছিল নিম্নমানের। তিনি শুধু ঢাকা দখলেই ব্যর্থ হন নি, প্রাথমিক লক্ষবস্তুগুলো দখলেও তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেন। বিপুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও একটি ক্লান্ত, নিস্তেজ ও অর্ধসজ্জিত গ্যারিসন দখলে ব্যর্থতার জন্য যুদ্ধের পর পরই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। এ সেক্টরে যুদ্ধের ফলাফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, জেনারেল গুল হাসান ও টিক্কার অপপ্রচার ছিল সম্পূর্ণ ভুল। এ দু'জন সৈন্যদের মাঝে অর্থ কড়ি বিতরণের জন্য আমাদেরকে অভিযুক্ত করেছিলেন। এটা মনে রাখা উচিত যে, গুল হাসান কখনো কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং টিক্কা পাকিস্তানে কোনো যুদ্ধে জয়ী হতে পারেননি। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের অনুমোদিত কৌশলগত তত্ত্বের আওতায় সৈন্য মোতায়েন করা হয়। অন্যথায়, ১৬ ডিভিশন এমনকি আমার সমগ্র বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হতো।

কুষ্টিয়া-যশোর-খুলনা সেক্টর

মেজর-জেনারেল এম. এইচ. আনসারী ছিলেন ঢাকায় আমার লজিস্টিক এরিয়া কমান্ডার। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার সাহসিকতার জন্য আমি তাঁকে

পদোন্নতি দিই। তিনি ৯ ডিভিশনের কমান্ড গ্রহণ করেন মেজর জেনারেল শওকত রিজার কাছ থেকে। আনসারীর ডিভিশনে দুটি ব্রিগেড ছিল এবং তিনি যশোরে ৯ ডিভিশনের সদরদপ্তর স্থাপন করেন। লড়াই শুরু হলে তিনি ফরিদপুর এগিয়ে যান এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী লড়াই করেন। অধীনস্থ ফরমেশনের সঙ্গে কখনো কখনো তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এ সময়ে আমি তাঁদের দিকনির্দেশনা দিতাম।

কুষ্টিয়া-যশোর-খুলনা সেক্টর
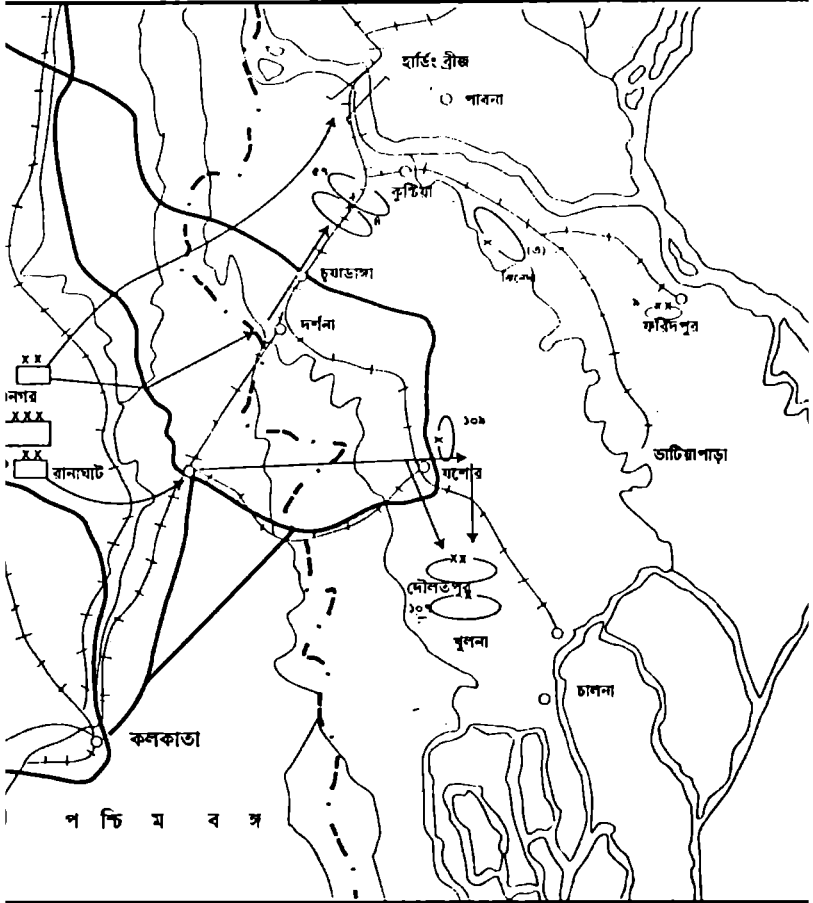
৯ ডিভিশন ছিল কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ-যশোর ও খুলনা প্রতিরক্ষা লাইন রক্ষার দায়িত্বে। শত্রুদেরকে ঢাকা পৌঁছতে বাধা দিতে এ ডিভিশনের সৈন্যদের ফরিদপুরও

এগিয়ে আসতে হয়। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ৫৭ ব্রিগেড ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া রক্ষার জন্য দায়ী ছিল। ব্রিগেডিয়ার হায়াত এসজে'র নেতৃত্বাধীন ১০৭ ব্রিগেডকে বায়রা-যশোর রক্ষায় মোতায়েন করা হয়। শত্রুর ক্ষতিসাধন ও তাদের অগ্রযাত্রায় বিলম্ব ঘটিয়ে এ ব্রিগেডকে মাগুরা-ফরিদপুরে পিছু হটে আসতে হয়। এক ব্যাটালিয়নকে সাতক্ষীরা-খুলনা এলাকা রক্ষায় রেখে আসা হয়। খুলনায় আমার সিএএফ'র একটি এডহক ব্রিগেড ছিল যেটাকে পরে আমি ঢাকায় স্থানান্তর করি।

৯ ডিভিশনের বিপরীতে ছিল ভারতের ২য় কোর, ঢাকা দখল করার জন্য এটা গঠন করা হয়। লে. জেনারেল রায়নার নেতৃত্বাধীন এ কোরে ছিল ৪ মাউন্টেন ডিভিশন, ৯ পদাতিক ডিভিশন, ৫০(১) প্যারা ব্রিগেড গ্রুপ, দুটি ট্যাংক রেজিমেন্ট ও পাঁচ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ। ঢাকা অভিযানের জন্য এ কোরকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়। ৪ মাউন্টেন ডিভিশনকে করিমপুর-হার্ডিঞ্জ ব্রিজ মেরুতে দ্বিমুখী এবং ঝিনাইদহ দখলের জন্য মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মেরুতে দ্বিতীয় হামলা চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৯৭১-এর ২১ নভেম্বর যখন যুদ্ধ শুরু হলো, বায়রা আক্রমণ করল ভারতীয়রা, কিন্তু এজন্য প্রচুর মূল্য দিতে হয় তাদেরকে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বায়রা পরিত্যাগ করা হলো। সৈন্যদেরকে আফ্রা-চৌগাছায় পরবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনে প্রত্যাহার করা হয়। ২ ডিসেম্বর দর্শনার পতন ঘটে। ৩৫০ ইন্ডিয়ান ব্রিগেডের একটি অগ্রবর্তী হামলা প্রতিহত করা হয়। ভারতীয়দের ক্ষয়ক্ষতি হয় অনেক। তারা বেশকিছু ট্যাংকও হারায়। এ এলাকায় গৌরিপুর গ্রামে প্রথম আকাশ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১০৭ পাকিস্তানি ব্রিগেডকে মোতায়েন করা হয় যশোর এলাকায়। ব্রিগেডিয়ার হায়াত, এস জে, সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আমি তাকে পরিস্থিতি যাচাই করতে বললাম এবং আরো বললাম যে, সৈন্য প্রত্যাহার সর্বোত্তম বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হলে তিনি তাও করতে পারেন। কারণ তিনি শত্রুদের বাধা দেয়ার অবস্থানেই দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং এ অবস্থান এক পর্যায়ে ছেড়েই দিতে হতো। তিনি খুলনার দিকে সৈন্য প্রত্যাহারের পরামর্শ দেন। কিছু বিবেচনার পর আমি তাঁকে সৈন্য প্রত্যাহারের অনুমতি দিই। আমি ভেবে দেখি যে, এ উদ্যোগ জেনারেল রায়নাকে যশোর এলাকায় সৈন্য পাঠাতে উৎসাহিত করবে এবং এভাবে শত্রুর বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে এখানে ব্যস্ত রাখা যাবে যাতে তারা পশ্চিম রণাঙ্গনে ছুটে যেতে না পারে। ৫ ডিসেম্বর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে প্রেরিত সংকেত অনুসারেই পরিকল্পনায় এ পরিবর্তন আনা হয়। আমি আরো দেখতে পেলাম যে, হায়াত ভারতীয়দের পশ্চাৎভাগ এবং এলওসি'র প্রতি একটি গুরুতর

হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারেন। আমাদের এ প্ররোচিত উদ্যোগে ভারতীয় কোরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে এবং এর ডিভিশনগুলো বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। এতে ফরিদপুর ও ঢাকার প্রতি রায়নার হুমকি কমবে।

হায়াতকে বলা হলো একসঙ্গে সৈন্য প্রত্যাহার না করে পর্যায়ক্রমে সৈন্য প্রত্যাহার করতে, শত্রুকে ব্যস্ত রাখতে, তাদের ক্ষতি করতে এবং অধিকাংশ সৈন্যকে প্ররোচিত করতে। তিনি এ কাজ অত্যন্ত চমৎকারভাবে সম্পন্ন করেন। প্রত্যাশা অনুযায়ী রায়নার নেতৃত্বাধীন ২য় কোরের অধিকাংশ সেন্য হায়াতকে খুলনার পথে অনুসরণ করে। হিলি থেকে ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুলের বগুড়া পশ্চাদপসরণ, ময়মনসিংহ থেকে ব্রিগেডিয়ার কাদিরের ঢাকা, সলিমুল্লাহর সিলেট, সাদউল্লাহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ভৈরব বাজারে প্রত্যাহারের মতো হায়াতের খুলনায় প্রত্যাহারের ঘটনা সামরিক ইতিহাসে একটি শিক্ষার বিষয় হয়ে থাকবে। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ১০৭ ব্রিগেডকে প্রত্যাহার করেন। শত্রুদের বিমান হামলা, সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং প্রতি পদে মুক্তিবাহিনীর বাধা সত্ত্বেও তিনি এ প্রত্যাহার কার্য সম্পন্ন করেন। তিনি শত্রুদের অগ্রাযাত্রায় বাধা দেয়ার অবস্থানগুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যবহার করেন। তিনি প্রত্যাহারকালে তাঁর ওপর শত্রুকে হামলা চালানোর সুযোগ দেননি। তিনি তাঁর কৌশলগত বুদ্ধি ও সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে রায়নার কোরকে প্রলোভন দেখান এবং হ্যামিলনের বংশী বাদকের পেছনে যেভাবে শিশুরা দৌড়াচ্ছিল সেভাবে ভারতীয় সেন্যরা তার পিছনে ছুটে।

হায়াত চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হন খুলনা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে দৌলতপুরে শত্রুক মোকাবেলা করার জন্য। এখানকার একদিকে ছিল বিশাল জলাভূমি এবং আরেকদিকে ছিল ভৈরব নদী। তিনি এলাকার ভৌগোলিক সুবিধা গ্রহণ করেন। বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সর্বোত্তম সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ পর্যায়ে মেজর জেনারেল দলবীর সিং ২ কোরের আর্টিলারি ও বিমান বাহিনীর সহায়তা নিয়ে দৌলতপুর দখলের জন্য তার ডিভিশন নিয়ে অগ্রসর হন। ১৫ ডিসেম্বর এ হামলা চালানো হয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। গোটা ডিভিশনকে থামিয়ে দেয়া হয়। শত্রুর সাঁজোয়া বাহিনী হায়াতের সুসমন্বিত ও নির্ভুল গোলাবর্ষনের মুখে এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়।

হায়াতের তৎপরতা ছিল অসাধারণ। একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে তিনি এক শক্তিশালী শত্রু বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেন। তিনি টি-৫৫ ও পিটি-৭৫ ট্যাংক নিয়ে গঠিত শত্রুর সাঁজোয়া বহরকে স্তব্ধ করে দেন এবং পাল্টা হামলা চালিয়ে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। হায়াত ছিলেন একজন সাহসী কমান্ডার। ১৯৬৫-এর যুদ্ধে তিনি আমার কমান্ডে কাজ করেছেন শিয়ালকোট সেক্টরে এবং একটি এফএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ডে চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এ জন্য তাকে এসজে পুরস্কার দেয়া হয়।

ভারতীয় নৌবাহিনীর দুটি বোট চালনা সমুদ্র বন্দরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু এদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। এ ঘটনার পর ভারতীয় নৌবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র বন্দর থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখে।

শত্রু চুয়াডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হয় ৬ ডিসেম্বর। যদিও কৌশলগতভাবে এটি কোনো গুরুত্ব হয় না। তবে এখানে শত্রুর অগ্রাভিযানে গভর্নরের ওপর একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ চুয়াডাঙ্গা ছিল তার নিজ শহর। বিদ্রোহীরা স্থানীয় লোকজনের ওপর নৃশংসতা চালায় এবং অনেকে নিহত হয়। আমরা ৬ ডিসেম্বর যশোর ত্যাগ করি। ৭ ডিসেম্বর শত্রু এ শহর দখল করে নিলে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। বেপরোয়া গভর্নর মালিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে থাকেন। আমি তাঁকে ব্রিফিং-এর জন্য ইস্টার্ন কমাণ্ডে আমন্ত্রণ জানাই। আমি তাঁকে জানাই যে, আরো কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। আমরা পশ্চিমে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও খুলনায় পিছু হটে আসবো। তার সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার পরিবর্তে তার মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। গভর্নর বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তিনি প্রাণহানি এবং নিরীহ লোকজনের হত্যাকাণ্ডে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন।

মাগুরার পর ৬২ ভারতীয় ব্রিগেড মধুমতির দিকে এগিয়ে আসে। এ অভিযানের লক্ষ্য ছিল মধুমতিকে পদানত করে ফরিদপুর দখল করা। অন্যদিকে, শত্রু বাহিনীকে ভিন্ন দিকে ধাবিত করা ছিল আমাদের অভিযানের লক্ষ্য। আমাদের সৈন্যরা কুষ্টিয়ায় ভারতীয় বাহিনীকে উত্তর দিকে ঘুরে যেতে প্ররোচিত করে। ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। কুষ্টিয়ায় আমাদের সৈন্যরা ঝিনাইদহে ভারতীয়দের সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কুষ্টিয়ায় ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরকে রাস্তা কেটে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি অগ্রসর হওয়ার আগেই শত্রুরা তার দিকে ধাবিত হয়। জেনারেল বারার ৭ মাউন্টেন ব্রিগেডকে কুষ্টিয়ায় হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। ভারতীয় সৈন্যরা কুষ্টিয়ায় এগিয়ে যাবার পথে একটি বৃত্তাংশে আটকা পড়ে যায়। এতে আমরা সংগঠিত হওয়ার জন্য প্রচুর সময় পাই। এ সময় আমরা ফরিদপুর ও গোয়ালন্দে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ পুনর্বিন্যাস করে ফেলি। ভারতীয় সৈন্যদের কুষ্টিয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে। তারা সেখানে আটকা পড়ে এবং ফরিদপুর ও ঢাকার প্রতি হুমকি কমে যায়।

কুষ্টিয়ায় আমাদের ৫৭ ব্রিগেডের সৈন্যরা ভারতীয়দেরকে সুরক্ষিত এলাকায় এগিয়ে আসতে দেয়। এ সময় আমাদের আর্টিলারি, অটোমেটিক ও রিকয়েললেস গান একযোগে গর্জে ওঠে। এক স্কোয়াড্রন ভারতীয় ট্যাংকের মধ্যে মাত্র একটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাদবাকিগুলো হয় ধ্বংস নয়তো আটক হয়। ভারতের অগ্রবর্তী ব্যাটালিয়নের বিপুল ক্ষতি হয়। আমাদের সৈন্যদের তীব্র প্রতিরোধ এবং

ভয়াবহ গোলাবর্ষণে ভারতীয় সৈন্যদের আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ভারতীয়রা আক্ষরিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পেছনে ও রিজার্ভে যেসব সৈন্য ছিল তারাও একইভাবে পালিয়ে যায়। ভারতীয় কোর কমান্ডার ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়ায় আরেকটি ব্রিগেড নিয়ে আসেন। ৪১ ব্রিগেডও এগিয়ে আসে। মধুমতিতে থেকে যায় কেবল একটি ব্যাটালিয়ন। এভাবে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে গোটা ডিভিশনকে কুষ্টিয়ায় নিয়ে আসা হয়।

৫৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ অতিক্রম এবং অধিকাংশ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ১৬ ডিভিশনের এলাকায় চলে যাবার অনুমতি দেয়া হয়। এ সেতু তখন ১৬ ডিভিশনের আওতায় ছিল। মঞ্জুর তার অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে প্রাথমিকভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করলে একটি রাইফেল কোম্পানিসহ তার সদরদপ্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এটি ঝিনাইদহ পৌঁছে। অন্যদিকে, মঞ্জুর তার ব্রিগেডের বাদবাকি সৈন্য ও টেকনিক্যাল সদরদপ্তর নিয়ে কুষ্টিয়ায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি তার সৈন্য নিয়ে ১৬ ডিভিশনের এলাকায় পৌঁছলে মেজর জেনারেল আনসারী ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরের অবশিষ্ট সৈন্য (ব্রিগেড সদরদপ্তর ও একটি রাইফেল কোম্পানি) এবং ঢাকা থেকে আসা দুটি নয়া ব্যাটালিয়ন নিয়ে একটি এডহক ব্রিগেড গঠন করেন। তিনি তার কর্নেল স্টাফ কর্নেল কে. কে. আফ্রিদীর কাছে এ ব্রিগেডের কমান্ড ন্যস্ত করেন। আফ্রিদীকে ফরিদপুর থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যোগাযোগ পথগুলো রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। আনসারী নিজে ফরিদপুর দুর্গ রক্ষায় নিয়োজিত সৈন্য গোয়ালন্দ ঘাঁটির কমান্ড গ্রহণ করেন। কর্নেল আফ্রিদী চমৎকারভাবে লড়াই করেন। শত্রু কখনো ফরিদপুর পৌঁছতে পারেনি। ফলে তাদের ঢাকা অভিমুখী অগ্রযাত্রা বার বার ব্যর্থ হয়েছে।

'৭ ডিসেম্বরের মধ্যে যশোর ও ঝিনাইদহের পতন ঘটায় জেনারেল রায়না ঢাকা অভিমুখে দ্রুত অভিযানের অবস্থায় পৌঁছে যান। তিনি তার দুটি ব্রিগেড নিয়ে কুষ্টিয়া ও খুলনায় আনসারীর দুটি ব্রিগেডের অবশিষ্টাংশকে মোকাবেলা করার এবং তার কোরের অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে ফরিদপুর ও গোয়ালন্দ ঘাটে এগিয়ে যাবার অবস্থায় উন্নীত হন। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে, তিনি তার একটি ডিভিশনকে কুষ্টিয়ায় যুদ্ধে জড়িত করে ফেলেন এবং তার দ্বিতীয় ডিভিশনও খুলনার পথে রাস্তায় আটকা পড়ে। এভাবে ঢাকা পৌঁছার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।'৫

ভারতীয় লেখকের এ অভিমত থেকে সকল ক্ষেত্রে বিপুল শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। তাদের প্রতি স্থানীয় জনগণের বিশাল সমর্থন ছিল। স্থানীয় জনগণ নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়েছে, ভারতীয়দের সর্বতোভাবে সহায়তা এবং তাদের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে। ঢাকা দখল তো দূরের কথা; সকল ভারতীয় কোর তাদের প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তু দখলেও ব্যর্থ হয়। ভারতীয় কমান্ডারদের প্রতিটি উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়া হয়। কৃতসংকল্প পাকিস্তানি

কমান্ডাররা প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয় জেনারেলদের হার মানিয়েছে।

নদ-নদীর প্রতিবন্ধকতার সাহায্যে আমি ঢাকা রক্ষা করছিলাম। আমরা সফল হয়েছিলাম শত্রুকে কোণঠাসা করে রাখতে। ভারতীয় সেনা ফরমেশনগুলোকে ঢাকা থেকে দূরে এবং একটি থেকে আরেকটিকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। তারা তাদের নিজ নিজ সেক্টরে আবদ্ধ ছিল। আমরা তাদেরকে পুরোপুরি নিশ্চল করে রেখেছিলাম যাতে তারা পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্য প্রত্যাহার করতে না পারে। শুধু তাই নয়, আমরা তাদেরকে এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে সৈন্য স্থানান্তর করতেও দেইনি। পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষায় আমাদেরকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া না হলে আমরা এক উল্লেখযোগ্য সময় লড়াই করতে পারতাম। আমরা শত্রুকে প্ররোচিত করে আমাদের দুর্গের কাছে নিয়ে আসি এবং আমাদের পছন্দসই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করি। আমরা ছিলাম সুরক্ষিত বাংকারে। অন্যদিকে, শত্রু ছিল উন্মুক্ত জায়গায়। ভারতীয়দেরকে বিস্তৃত এলওসি বজায় রাখতে হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের এরূপ করতে হয়নি অথবা করলেও তা ছিল খুবই সীমিত। ভারতীয়দেরকে সরবরাহ লাইন পাহারা দিতে হয়েছে। পক্ষান্তরে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্য ছিল বহুদূরে আমাদের দুর্গে।

ভারতীয় দ্বিতীয় কোর কমান্ডার জেনারেল রায়নাকে 'ইন্ডিয়ান আর্মি আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স' বইয়ের লেখক যে পরামর্শ দিয়েছেন তা খুবই মজার। তিনি বলেছেন যে, 'রায়নার উচিত ছিল তার দুটি ব্রিগেড নিয়ে দৌলতপুর (খুলনা) ও কুষ্টিয়ায় পাকিস্তানি দুটি ব্রিগেডকে মোকাবেলা করা এবং তার বাদবাকি সৈন্য নিয়ে স্বয়ং ঢাকার দিকে যাত্রা করা।' লেখকের এ মতামতে খানিক ভুল রয়েছে। তিনি যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত ও বাস্তবতার আলোকে এ কথা বলেননি। তিনি আমাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের নিম্নমানের তৎপরতাকে এড়িয়ে গেছেন। দুটি পাকিস্তানি ব্রিগেডকে কোনো অবস্থাতেই দুটি ভারতীয় ব্রিগেড মোকাবেলা করতে পারতো না। দুটি ভারতীয় ব্রিগেড এগিয়ে এলে রায়নার (এলওসি) অবরুদ্ধ হয়ে যেত। ফলে তাকে এলওসি রক্ষার জন্য সৈন্য পাঠাতে হতো। এতে তার আক্রমণাত্মক ক্ষমতা হ্রাস পেত।

জেনারেল আনসারীর ব্যক্তিগত কমান্ডের আওতায় ফরিদপুর ও গোয়ালন্দ অত্যন্ত চমৎকারে ধরে রাখা হয়েছিল। এসব দুর্গ অভিমুখী সড়কগুলো রক্ষা করছিল কর্নেল কে. কে. আফ্রিদীর নেতৃত্বাধীন এডহক ব্রিগেড। আফ্রিদীর ব্রিগেডই মধুমতি নদী রক্ষা করছিল। কিন্তু ভারতীয়রা তখনো এ নদী অতিক্রম করতে পারেনি। তার সৈন্যদেরকে ফরিদপুর ও গোয়ালন্দে পিছু হটে আসতে হয়। এতে এসব দুর্গের শক্তি ও প্রতিরক্ষা সামর্থ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এ পরিস্থিতিতে জেনারেল রায়নার পক্ষে ফরিদপুরে এগিয়ে আসা সম্ভব ছিল না।

চট্টগ্রাম

ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের এয়ার ক্র্যাফট মোতায়েন করেছিল। আমাদের সাবমেরিন 'গাজী' চুপি চুপি এ বিমানবাহী জাহাজ 'বিক্রম'-এর তলদেশে পৌঁছে যায়। খবরে জানা গেছে যে, গাজী এত নিচে ডুব দেয় যে, এটি ভেসে উঠতে ব্যর্থ হয়। কিছু কাগজপত্র ও যন্ত্রপাতি ভেসে উঠা নাগাদ এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে গাজী অত্যন্ত চমৎকার লড়াই করেছিল। তখন এর কমান্ডার ছিলেন কারামত নিয়াজী, যাকে সিতারা-ই-জুরাত পুরস্কার দেয়া হয় এবং পরে তিনি নৌবাহিনী প্রধান হন।

চট্টগ্রাম রক্ষা করছিল আমাদের নৌ সেনা এবং ব্রিগেডিয়ার আতা মোহাম্মদ মালিকের নেতৃত্বাধীন একটি এড্‌হক ব্রিগেড। মালিক চট্টগ্রাম বন্দর দখলে শত্রুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন এবং তাদের সৈন্যদের আটকে রাখেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। ব্রিগেডিয়ার তাসকীন আরেকটি এড্‌হক ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এ এড্‌হক ব্রিগেডে কমান্ডো, স্থানীয় চাকমা উপজাতি ও আসামের মিজোরাও ছিল। তারা ভারতীয়দের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শহরগুলো দখল করতে দেয়নি এবং তারা ভারতীয় কিলো ফোর্সের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করেছিলেন।

কক্সবাজারে ভারতীয়রা একটি উভচর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এ হামলা ব্যর্থ হয়। ভারতীয়রা যে ব্যাটালিয়ন নিয়ে এ হামলা চালিয়েছিল সেই ব্যাটালিয়নের মাত্র ১২ জন অবতরণে সক্ষম হয়েছিলেন। দু'জন পানিতে ডুবে মারা যায়। এভাবে এ অভিযান নিষ্ফল হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে তৎপর ভারতীয় কিলো ফোর্স কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি।

৩৯ *এড হক* ডিভিশন

৪ ডিসেম্বর আমাকে ফেনী পুনর্দখলের নির্দেশ দেয়া হয়। কৌশলগত গুরুত্ব না থাকায় বিরাজমান পরিস্থিতিতে আমি সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেছিলাম। কিন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাকে আবার ফেনী দখলের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। বস্তুতপক্ষে, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের হস্তক্ষেপ ছিল বাস্তবজতাবর্জিত। তারা মাঝে মাঝে পরিস্থিতি না বুঝে অথবা এলাকা সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর ছাড়াই নির্দেশ দিত।

লাকসাম ফেনীর প্রতিরক্ষায় ৩৯ এড্‌হক ডিভিশন গঠনের বিষয় মূল পরিকল্পনার অংশ ছিল না। আমি চাঁদপুরকে একটি কভারিং পজিশন হিসেবে রেখে ঢাকা ও চট্টগ্রাম দুর্গকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। লাকসাম অথবা ফেনীর চিন্তা আমার মাথায় ছিল না। কিন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে আরাম কেদারায় উপবিষ্ট জেনারেল গুল হাসান আমাকে ফেনী ও লাকসাম ধরে রাখার নির্দেশ দেন।
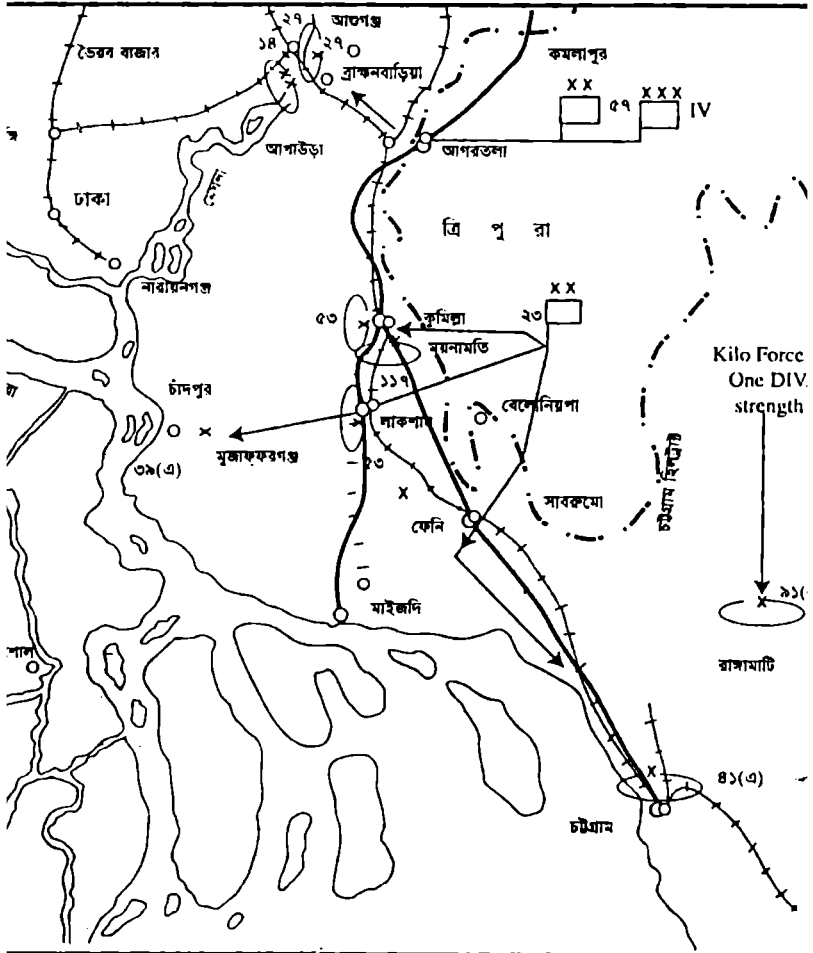
জেনারেল গুল হাসান কখনো কোনো লড়াইয়ে সৈন্য পরিচালনা করেননি। তিনি নানা অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তান সফর এড়িয়ে গেছেন। এ জন্য তাঁর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জটিল পরিস্থিতি বুঝার কথা ছিল না। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে পদাতিক যুদ্ধের কৌশলগত চাহিদা এবং মৌলিক কৌশল বুঝতে ব্যর্থ হন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমার মতামত উপেক্ষা করে সৈন্য পরিচালনার নির্দেশ দেয়। ফেনী সীমান্ত চৌকি দখলের নির্দেশ দিয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স মূলত এ এলাকায় আমাকে আমার নাক বাড়িয়ে দিতে বাধ্য করে। তারা বুঝতে পারেনি যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা লাইন (এফডিএল) গুলোই সীমান্তে পরিণত হয়।

মেজর জেনারেল আবদুর রহিম খানের নেতৃত্বে ৩৯ এড্‌হক ডিভিশন গঠন করা হয় ১৯৭১-এর ২১ নবেম্বর। বিদ্রোহ দমন অভিযানে ১৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসেবে জেনারেল রহিম অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। তার সাহসিকতা, বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার জন্য তাকে চাঁদপুর সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। ৩৯ এড্‌হক ডিভিশনে ছিল দুটি ব্রিগেড। এর একটি ছিল ৫৩ এবং আরেকটি ১৭৭। ১১৭ ব্রিগেড কুমিল্লা থেকে চৌদ্দগ্রাম পর্যন্ত এবং ৫৩ ব্রিগেড কুমিল্লা ও চৌদ্দগ্রামের আরো দক্ষিণে ফেনী পর্যন্ত এলাকা রক্ষার দায়িত্ব ছিল।

৫৩ ব্রিগেডের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজী। তিনি ঢাকার জন্য গঠিত রিজার্ভের কমান্ডার ছিলেন। ৫৩ ব্রিগেড চাঁদপুর রক্ষার দায়িত্বে ছিল এবং পরে এটি ঢাকায় পিছু হটে আসে। এ ব্রিগেডকে ৩৯ এড্‌হক ডিভিশনের কমান্ডে ন্যস্ত করা হয় এবং লাকসামে মোতায়েন করা হয়।

৩ ডিসেম্বর রাতে ভারতের ৩০১ মাউন্টেন ব্রিগেড লালমাই পাহাড় ও লাকসামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসে। ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে তারা মুজাফ্‌ফরগঞ্জ দখল করে এবং ২৫ এফএফ-এর একটি বড় অংশ দখল করতে সক্ষম হয়। কমান্ডিং অফিসার তাঁর মনোবল হারিয়ে ফেলেন। লড়াই করার মতো অবস্থা তাঁর ছিল, কিন্তু বিনা লড়াইয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। আমি তাঁকে কোর্ট মার্শাল করার জন্য সুপারিশ করেছিলাম। ভারত থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। কারণ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ভালো। মেজর জেনারেল রহিম মোজাফ্‌ফরগঞ্জে আক্রান্ত হন। সে সময় তিনি অগ্রবর্তী অবস্থানে তাঁর সৈন্যদের দেখার জন্য লাকসামের পথে ছিলেন।

৫৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আসলাম অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালান চাঁদপুরে পৌঁছানোর জন্য। হাজীগঞ্জে ভয়াবহ লড়াই হয়। উভয়পক্ষে প্রাণহানী ঘটে। ১৩ দিন পর ১৯৭১-এর ৮ ডিসেম্বর হাজীগঞ্জের পতন ঘটে। ব্রিগেডিয়ার আসলাম ব্রিগেডিয়ার আতিফের নেতৃত্বাধীন ১১৭ ব্রিগেডে যোগদান করার জন্য লালমাই অবস্থানে পিছু হটে আসেন।

আমি জেনারেল রহিমকে চাঁদপুর ছেড়ে দিয়ে তার চাঁদপুরস্থ গোটা গ্যারিসনসহ ঢাকায় পিছু হটে আসার নির্দেশ দিই। তাকে ঢাকা নিয়ে আসার জন্য ফেরিগুলো রাতের প্রথমভাগে নোঙ্গর ফেলে। ফেরিগুলো রওনা হওয়ার পর চরায় আটকা পড়ে। ফলে তাকে দিনের বেলা রওনা দিতে হয়। ভারতীয় বিমানবাহিনী তাদেরকে ধাওয়া করে। এতে আমাদের কেউ কেউ হতাহত হয়। জেনারেল রহিমও আহত হন। আহতদের ঢাকার পিলখানায় বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী সদরদপ্তরে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। এদেরকে পরে ঢাকা সিএমএইচ-এ স্থানান্তর করা হয়। আমি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রসহ মেজর জেনারেল রহিমকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাই।

ব্রিগেডিয়ার মিয়া মনসুর মোহাম্মদ মেজর জেনারেল রহিমের সৈন্যদের কমান্ড গ্রহণ করেন। জেনারেল রহিমের নেতৃত্বাধীন সৈন্যরা নারায়ণগঞ্জ এলাকায় মোতায়েন ছিল। ব্রিগেডিয়ার সোধির নেতৃত্বে ভারতের একদল ছত্রী সৈন্য এ এলাকায় এগিয়ে আসার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এখানে এবং অন্যান্য জায়গায় তীব্র প্রতিরোধের মুখে ভারতীয়রা তাদের প্রচেষ্টায় বিরতি দেয়।

এ সময় আমরা নারায়ণগঞ্জ ও মিরপুরে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করি। ঢাকায় হামলা চালানোর আগে ভারতীয়দের ব্যাপকভাবে সমরসজ্জা গড়ে তুলতে হতো। কিন্তু তারা সে অবস্থায় পৌঁছার আগেই আমাদেরকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া হয়। ১১ ডিসেম্বর লেঃ জেনারেল সগৎ সিংকে ঢাকা দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়। সেদিন তিনি ঢাকা দখলের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য ৭ দিন সময় চেয়েছিলেন। আমার হিসাব অনুযায়ী তার আরো বেশি সময়ের প্রয়োজন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয়রা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এমনভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল যে, তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সৈন্য প্রত্যাহার করতে পারছিল না। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে আমি ট্যাংক অথবা ভারী অথবা মাঝারি কামান ছাড়াই ঢাকা অঞ্চলে মোতায়েন ভারতীয় সৈন্যদের তাড়িয়ে দিতে পারতাম।

কুমিল্লা-ময়নামতি

কুমিল্লাকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা হয়নি। প্রাথমিক যুদ্ধের পর ১১৭ ব্রিগেড ময়নামতি দূর্গে পিছু হটে আসে। যে কোনো দিক থেকে শত্রুর হামলা মোকাবেলায় ময়নামতিকে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। এসব কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার পেছনে আরো তিনটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা হয়। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শত্রু ময়নামতির প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে সক্ষম হয়নি। ১১৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এম এইচ আতিফ আত্মসমর্পণে ভারতীয়দের আহ্বান উপেক্ষা করেন। ১৯৬৪ সালে হকি ক্যাপ্টেন হিসেবে অলিম্পিকে তিনি যেভাবে লড়াই করেছিলেন ঠিক সেভাবে তিনি ১৬ ডিসেম্বর শেষদিন পর্যন্ত লড়াই করেছেন। তিনি ময়নামতিকে দুর্ভেদ্য করে গড়ে তুলেছিলেন। লাকসাম থেকে ৫৩ ব্রিগেড আতিফের ব্রিগেডে এসে যোগ দেয়। তখন তাঁর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ হাজারে। এছাড়া, তাঁর অধীনে ছিল ৪টি ট্যাংক ও এক ব্যাটারি আর্টিলারি। ভারতীয়রা আমাদের সুরক্ষিত অবস্থান দখল অথবা ভেদ করতে পারেনি। হামলায় ভারতীয়দের চড়া মাশুল দিতে হয়। অতঃপর তারা ময়নামতি দুর্গ অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু যুদ্ধবিরতি নাগাদ এ দুর্গ ধরে রাখা হয়। আতিফ শত্রুর দুটি ব্রিগেডকে আটকিয়ে রাখেন। এতে ঢাকা দখলের জন্য জেনারেল সগৎ সিংয়ের কাছে এক ডিভিশনের সামান্য বেশি সৈন্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। তবে জেনারেল সগৎকে ঢাকা দখল করতে হলে ভৈরব বাজার ও নারায়ণগঞ্জকে মোকাবেলা করতে হতো। চট্টগ্রামের দায়িত্বও তার ওপর ন্যস্ত করা হয়।

সিলেট-আখাউড়া

১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল কাজী আবদুল মজিদ সিলেট, আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলেন। পরিকল্পনা করা হয় যে, তিনি অগ্রবর্তী অবস্থান, সুরক্ষিত ঘাঁটি ও দুর্গে ভারতীয়দের সঙ্গে লড়াই করার পর ঢাকা পিছু হটে আসবেন। ব্রিগেডিয়ার রানার নেতৃত্বে ৩১৩ পাকিস্তানি ব্রিগেড সিলেট রক্ষা করছিল। ৮ ভারতীয় মাউন্টেন ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল কৃষ্ণ রাও শমশেরনগর ও কুলাউড়ায় হামলা চালান। এ দুটি জায়গায় একটি করে ভারতীয় ব্রিগেড হামলায় অংশ নেয়। ৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড কৈলাশবাহার, শমশেরনগর ও মৌলভীবাজার মেরু বরাবর অগ্রসর হয়। শমশেরনগর ও কুলাউড়ায় ২২ বালুচ ও টচি স্কাউটের একটি করে কোম্পানি নিয়ে গঠিত আমাদের সৈন্যরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে এবং দীর্ঘদিন শত্রুর ব্রিগেডকে ঠেকিয়ে রাখে। ৩১ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত এবং ৮৭ জন আহত হয়। বিপরীত মেরুতে ৬৯ ভারতীয় ব্রিগেড কুলাউড়ায় হামলা চালায়। কিন্তু ৬ ডিসেম্বর নাগাদ তারা তা দখল করতে পারেনি। তবে ব্যাপকভাবে নাপাম বোমা ব্যবহারের পর এর পতন ঘটে।

১৯৭১-এর ৫ ডিসেম্বর ৮১ ভারতীয় মাউন্টেন ব্রিগেড মুন্সীবাজারে হামলা করে। এ শহর রক্ষায় ৩০ এফএফ-এর একটি রাইফেল কোম্পানি বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। এতে কোম্পানি কমান্ডারসহ ২২ জন নিহত হয়। ইতোমধ্যে হেলিকপ্টারযোগে দুই ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্য সিলেট শহরের দক্ষিণ পূর্বদিকে অবতরণ করে। ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে আমাদের ২০২ এডহক ব্রিগেড এ শহর দখল করে নিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ্ অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে পিছু হটে আসা কয়েকটি ইউনিটের সৈন্য নিয়ে এটাকে একটি দুর্গে পরিণত করেন। ব্রিগেডিয়ার আসগর হোসেনের নেতৃত্বাধীন আমাদের ৩১৩ ব্রিগেড মৌলভীবাজার থেকে সিলেটে পিছু হটে আসে। শত্রু এ ব্রিগেডের গতিরোধ করতে পারেনি। মেজর জেনারেল কৃষ্ণ রাও তার ডিভিশনের ৬টি ব্রিগেড নিয়ে এ শহর অবরোধ করেন। বিমান সহায়তা এবং নাপাম বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও তিনি সামনে এগিয়ে আসতে পারেননি অথবা সিলেটের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভাঙতে সাহস পাননি।

'এটা উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধে ক্লান্তি এবং একটি অসম যুদ্ধের সম্ভাবনা সত্ত্বেও শমশেরনগর ও কুলাউড়া থেকে পিছু হটে আসা দুটি কোম্পানি এবং আরো কিছু আধা সামরিক সৈন্য বিমান সহায়তা ছাড়া সামান্য কয়েকটি কামানের সাহায্যে কৃষ্ণ রাওয়ের ডিভিশনকে বেশ কয়েকদিন আটকে রাখে এবং নিজেদের প্রচণ্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা সিলেট থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়।'৬

এমন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার কৃতিত্ব ছিল ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ ও ব্রিগেডিয়ার আসগরের। তাদের সাহসিকতায় শত্রুর একটি গোটা ডিভিশনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শত্রুর এ ডিভিশনকে ঢাকা পাঠানোর কথা ছিল।

সিলেট সেক্টর
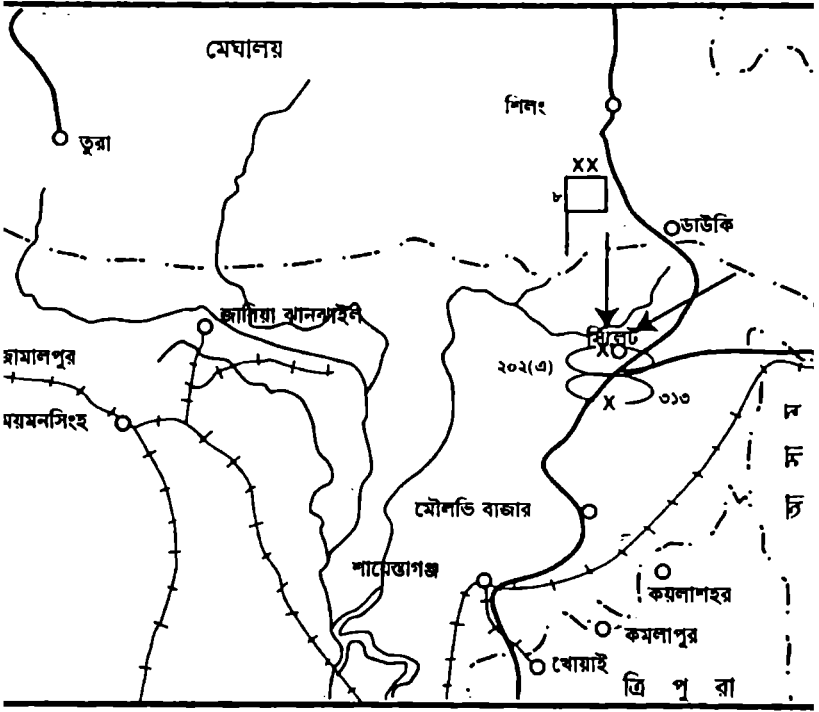
ব্রিগেডিয়ার সাদউল্লাহ্ ২৭ ব্রিগেডের কমান্ডার তার ব্রিগেড নিয়ে ভৈরব বাজার সেক্টর রক্ষা করছিলেন। সাদউল্লাহ্ ছিলেন একজন সাহসী অফিসার, প্রতিটি লড়াইয়ে তিনি থাকতেন সম্মুখভাগে। তিনি বেয়নেটের সাহায্যে পাল্টা হামলায় ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করে কয়েকটি জায়গা থেকে শত্রুকে হটিয়ে দেন। তাঁকে নিশান-ই-হায়দার পদক প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁকে দেয়া হয় হিলাল-ই-জুরাত। এটা খুবই দুঃখজনক যে, তাঁর মত একজন যোগ্য অফিসারের পদোন্নতি হয়নি। তাকে মৌলবাদী হিসেবে বিচেনা করা হয়েছিল।

সাদউল্লাহ্র ব্রিগেড মোতায়েন ছিল। আগরতলার কাছে আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত ছিল তিস্তা নদী ভিত্তিক। এর চারপাশে ছিল প্রচুর ঝিল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। আখাউড়া থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে নাম গঙ্গাসাগর। প্রতিটি শহরে আমাদের একটি করে ব্যাটালিয়ন মোতায়েন ছিল। লড়াই শুরু হওয়ার পর আগরতলায় ভারতীয় বিমানঘাঁটিতে আমাদের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক গোলাবর্ষণ করা হতো। ২৭ ব্রিগেড

তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ২১ নবেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয়রা আমাদের একটি অবস্থানও দখল করতে পারেনি। আমরা আমাদের পরবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থান আশুগঞ্জ এবং পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগ পর্যন্ত ২৭ ব্রিগেড ১৫ দিন তাদের হামলা প্রতিহত করেছে।

৫ ডিসেম্বর, ৩১১ ভারতীয় ব্রিগেডের অগ্রবর্তী সৈন্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে। ৭৩ ব্রিগেডও পরদিন এগিয়ে আসতে থাকে। মেজর জেনারেল গনজালভেজের নেতৃত্বে একটি মুক্তি ফৌজ ২১ নবেম্বর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তৎপরতা চালাচ্ছিল। ভারতীয় বাহিনীর অগ্রযাত্রায় মুক্তিবাহিনী সর্বোতভাবে সাহায্য করেছে। মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীকে আমাদের অবস্থান, অস্ত্রশস্ত্র ও শক্তি সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে।

'অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও যখনি প্রয়োজন হতো, একদল স্থানীয় লোক শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতো। ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে (ভারতীয় বাহিনীর কাছে তথ্য সরবরাহের জন্য কোনো স্থানীয় লোককে সন্দেহ হলে পাকিস্তানিরা তাকে নির্যাতন করে হত্যা করতো) তারা রাতে উধাও হয়ে যেত এবং সকাল হওয়ার আগে শত্রুর সুরক্ষিত অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে ফিরে আসতো। এ উপায়ে আমাদের সৈন্যরা অগ্রযাত্রা বজায় রাখতে, শত্রুর অবস্থানের আশপাশে তৎপরতা চালাতে এবং বরাবর এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দেশের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন করার প্রয়োজন হলে বাঙালি গ্রামবাসী, প্রতিরোধ যোদ্ধা, স্কুলের ছাত্র প্রভৃতি লোকজনকে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যেত– সবাই সাহায্য করার জন্য ছিল প্রস্তুত।'৭

নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক সিডনি শাম্বার্গ সে সময় একটি অগ্রবর্তী ব্রিগেডের সঙ্গে ছিলেন। তিনি একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। ২২ জন স্থানীয় লোককে 'একটি ৫ দশমিক ৫ ইঞ্চি মাঝারি কামানকে পানিতে ভর্তি একটি মাঠের মধ্য দিয়ে ঠেলে নিয়ে যেতে এবং অন্যান্যদের গোলাবারুদ বহন করতে দেখেছেন।'৮

ভারতীয়রা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পাকিস্তানি সৈন্যদের মোকাবেলা করার লক্ষ্যে আগরতলার দক্ষিণ দিক থেকে কুমিল্লা অভিমুখে একটি বহর পাঠায়। শত্রুরা দ্রুত আশুগঞ্জ সেতু দখলের চেষ্টা চালায়। কিন্তু আমরা তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিই। আমরা তাদের ডিভিশনকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘাঁটি গেড়ে বসতে দেইনি। আমরা আশুগঞ্জ সেতু ধ্বংস এবং আখাউড়ার পশ্চিম দিকের সেতুটি শত্রুর ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য অকেজো করে দিই। ৯ ডিসেম্বর ভারতের ৩১১ ব্রিগেডের অগ্রবর্তী সৈন্যরা এগিয়ে আসার আগে আমাদের ২৭ ব্রিগেড আশুগঞ্জে বাংকারে অবস্থান গ্রহণ করে। ভারতীয়দেরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

আশুগঞ্জ আসতে দেয়া হয়। আশুগঞ্জে তাদের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল। ফরমেশনগুলোর গোলাবর্ষণে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। আমরা ভারতীয়দেরকে আমাদের সুরক্ষিত এলাকায় এগিয়ে আসার সুযোগ দিই। এরপর শুরু হয় তাদের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ। আমাদের কার্যকর গোলাবর্ষণে ১২০ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত এবং তাদের ৪টি ট্যাংক ধ্বংস হয়। আরেকটি ব্যাটালিয়ন শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি করে। ব্রিগেডিয়ার সাদউল্লাহ্র নেতৃত্বে একটি পাল্টা হামলায় তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল কাজী মজিদ আশুগঞ্জ সেতু উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এ সময় আমাদের ২৭তম ব্রিগেড ছিল মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে। তবে তখনো আশুগঞ্জ সেতুর প্রতি তাৎক্ষণিক কোনো ঝুঁকি ছিল না। ব্রিগেড নদী পার হয়ে ভৈরব বাজারে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

ভারতীয়রা হেলিকপ্টারের সাহায্যে মেঘনা অতিক্রম করে ভৈরব বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবতরণ করতে থাকে। নরসিংদীতে ভারতীয়দের সমরসজ্জা ছিল ধীর-স্থির। এখানে আমাদের পক্ষ থেকে ভারতীয়দের বাধা দেয়া হয়নি। মেঘনা নদী দিয়ে ট্যাংক ও কামান বয়ে নিয়ে আসা ছিল একটি দুরূহ কাজ। আমাদের মাঝারি ও ভারী কামান না থাকায় আমরা শত্রুর অবতরণে বাধা দিতে পারিনি। আমার কাছে ট্যাংক রেজিমেন্ট ও দূরপাল্লার কামান থাকলে শত্রুরা হেলিকপ্টার যোগে সৈন্য অবতরণ অথবা টাঙ্গাইলে ছত্রসৈনা নামাতে পারতো না। আমার কাছে অন্তত কয়েক স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান থাকলে আমি শত্রুর ট্যাংক চলাচলে বাধা দিতে সক্ষম হতাম, ছত্রীসেনা ও হেলিকপ্টার সৈন্য অবতরণ অথবা টাঙ্গাইলে ছত্রীসেনা নামাতে পারতো না। আমার কাছে অন্তত কয়েক স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান থাকলে আমি শত্রুর ট্যাংক চরাচলে বাধা দান, ছত্রীসেনা ও হেলিকপ্টারে সৈন্য অবতরণ এবং তাদের নদী অতিক্রম রুখে দাঁড়াতে পারতাম।

সার্বিক প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার আওতায় ১৪ পদাতিক ডিভিশনের ওপর নরসিংদী-নারায়ণগঞ্জ সেক্টর রক্ষার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। সিলেট ও আশুগঞ্জ থেকে তাদেরকে সেখানে পিছু হটার নির্দেশ দেয়া হয়। সিলেট ব্রিগেড মৌলভীবাজারে এসে পড়ে। মজিদকে এসব সৈন্য ঢাকা পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তিনি তাদেরকে পুনরায় সিলেটে পাঠিয়ে দেন। ভৈরব সেতু ধ্বংস করে দেয়ার পর মজিদকে ঢাকায় পিছু হটার দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি প্রথমে তাঁকে নরসিংদীতে পিছু হটতে বলি। কিন্তু তিনি আমার নির্দেশ পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। রেলওয়ে লাইন তখনো উন্মুক্ত ছিল। ঢাকা আসার জন্য তাঁকে ৬পি ফেরি দেয়া হয়। ভারতীয়রা রেলপথ দখল করে নেয়। মজিদের সৈন্যরা নীরব দর্শকের মতো চেয়ে চেয়ে এ ঘটনা দেখেছে। মজিদ খুব সহজেই ঢাকা পৌঁছতে পারতেন। কিন্তু তিনি কখনো ঢাকা আসার চেষ্টা করেননি। তাঁর এ

অবাধ্যতা হচ্ছে ইস্টার্ন গ্যারিসনের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। তিনি জানতেন যে, ঢাকার প্রতিরক্ষা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা জেনেও তিনি আমার নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন। এরপর আমি তাঁকে ডিভিশনের কমান্ড থেকে অপসারণ করি এবং তাঁর সৈন্যদেরকে ৩৬ (এডহক) ডিভিশনের আওতায় ন্যস্ত করি। সিলেট-চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলকে এ ডিভিশনের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৪ ডিভিশনের ঢাকায় নির্ধারিত অবস্থানে পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়ার পর আমাকে এসব পুনর্বিন্যাস করতে হয়।

'যুদ্ধ তুঙ্গে থাকার কারণে মজিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মতো সময় তখন আমার হাতে ছিল না। যুদ্ধের পুরোটা সময় সাদউল্লাহ্ অত্যন্ত চমৎকারভাবে যুদ্ধ করেন। তাঁকে ঢাকায় ফিরে আসার অনুমতি দেয়া উচিত ছিল। তাঁর সৈন্যরা ঢাকা মেরুতে নির্ধারিত এলাকায় পৌঁছতে পারলে শত্রুরা সাফল্যের সঙ্গে নরসিংদীতে হেলিকপ্টারে সৈন্য নামাতে পারতো না। ঢাকার প্রতিরক্ষা জোরদারে মৌলভীবাজারে মোতায়েন ব্রিগেড ও সাদউল্লাহ্র ব্রিগেডকে না পাঠানোয় জেনারেল গুল হাসানের নেতৃত্বাধীন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে মজিদের যোগসাজশ সম্পর্কে আমার মনে একটি দৃঢ় সন্দেহ দেখা দেয়। জেনারেল গুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ওই গোষ্ঠীটি ইস্টার্ন গ্যারিসন ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। আমি মজিদের অসৈনিকসুলভ আচরণ এবং নির্দেশ পালনে অক্ষমতা তুলে ধরে তাঁর সম্পর্কে একটি কঠোর রিপোর্ট পেশ করি। তাঁর অবাধ্যতার জন্য তাঁর এলাকায় শেষ মুহূর্তে লড়াইয়ে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। তিনি ভৈরববাজারের কাছে হেলিকপ্টার থেকে অবতরণকারী ভারতীয় সৈন্যদের ওপর খুব সহজে হামলা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাদের ওপর কোনো ধরনের হামলা চালাননি। হেলিকপ্টার থেকে অবতরণের সময় ভারতীয় সৈন্যরা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। সে সময় খুব সহজেই তাদেরকে ফাঁদে ফেলে ধ্বংস করা যেত। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স মজিদকে শাস্তি দানের পরিবর্তে পুরস্কৃত করে। অবসর গ্রহণের পর তাঁকে লোভনীয় চাকরিও দেয়া হয়।

'ইতিপূর্বে ভৈরব বাজারের পেছনে ভারতীয় ছত্রীসেনা অবতরণ করলে ১৪ ডিভিশন ও ২৭ ব্রিগেড তাদের ওপর হামলা চালাতে এবং ঢাকার প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ঢাকায় আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে হামলা চালানোর অনুমতি দেয়া হয়নি।'৯

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ফজল মুকিমকে নিযুক্ত করে ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের নিজেদের ভাষ্য লেখার জন্য। কাজী মজিদ ছিলেন লেঃ জেনারেল হামিদের (ভূপালী) ভাই। লাহোরে অবস্থানরত অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে ইস্টার্ন কমান্ড ও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য জেনারেল টিক্কা জেনারেল

হামিদকে নিযুক্ত করেছিলেন। মজিদকে নির্দোষ প্রমাণ এবং ইস্টার্ন কমান্ডের ওপর দোষ চাপানোর এটা ছিল একটি সুচিন্তিত প্রচেষ্টা।

মজিদ ভৈরব সেতু উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর এ নির্দেশ দান খুবই রহস্যময়। কারণ এ সেতুর প্রতি তখন কোনো হুমকি ছিল না। তদুপরি সাদউল্লাহ্র ব্রিগেড ছিল মেঘনা নদীর অপর পাড়ে। নিজের এলাকায় শত্রুর ওপর হামলার জন্য একজন জেনারেলের অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। মজিদকে ঢাকায় পিছু হটে আসার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সুতরাং পূর্ব-নির্ধারিত এলাকায় আসার জন্য তাঁকে অনুমতি চাইতে হবে কেন? মুকিম কার কাছ থেকে এ তথ্য জানতে পেরেছেন, তা আমি বুঝতে পারছি না। তিনি যখন এসব বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে বই লেখা শেষ করেছেন তখন কাজী মজিদসহ আমরা ছিলাম ভারতে যুদ্ধবন্দি। আরেকটি কথা হলো, ভারতের হেলিকপ্টারবাহিত সৈন্যদের মোকাবেলায় মজিদের গুরুতর অক্ষমতার অভিপ্রায় সম্পর্কে মুকিমের বইয়ে কিছুই বলা হয়নি।

মুকিম হচ্ছেন একজন ভাড়াটিয়া লেখক। তিনি তাঁর কলম ও বিবেক বিক্রি করেছেন। তাঁকে যা বলা হয়েছে তিনি তাই লিখেছেন। ভৈরবে মজিদের পেছনে ছত্রীসেনা নয়; হেলিকপ্টারবাহিত সৈন্য অবতরণ করেছিল। এর একদিন আগে টঙ্গীর কাছেও ছত্রীসেনা অবতরণ করেছিল। জায়গাটি ছিল মজিদের অবস্থান থেকে বহুদূরে। তিনি সেখানে যাননি এবং তাই তাঁর এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার প্রশ্নই ওঠে না। হিলির পতন সম্পর্কে মুকিম যে ধরনের মিথ্যাচার করেছেন মজিদের অবস্থানের কাছে ভারতীয় সৈন্য অবতরণ সম্পর্কেও তিনি একই ধরনের মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছেন। ভুট্টো, গুল হাসান, টিক্কার মতো লোক যারা পাকিস্তান ভাঙার চক্রান্ত করেছিলেন, তাদের অপরাধ ও স্খলন চাপা দেয়ার জন্যই মুকিম কলম ধরেছিলেন।

'সেতু এলাকা থেকে প্রায় দু'মাইল দক্ষিণে ভারতীয় সৈন্যরা মেঘনা নদী অতিক্রম করে। ভৈরব বাজারে শত্রু গ্যারিসন নদী পারাপার বন্ধে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি তারা হেলিকপ্টারে সৈন্য নামানোর ঘটনাও প্রত্যক্ষ করতে পারেনি। মুক্তিবাহিনীর ভয়ে এবং নিজেদের মনোবল ভেঙে যাওয়ায় তার বাংকারে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখে।১০

এই একটিমাত্র ঘটনায় একজন ভারতীয় লেখক আমাদের সৈন্যদের সাহসিকতা ও মনোবল সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কাজী মজিদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ভূমিকার জন্যই ভারতীয় লেখক এমন মন্তব্য করতে পেরেছেন। অথচ তার এসব সৈন্যই ১৫ দিন শত্রুর একটি ডিভিশনকে কোণঠাসা করে রেখেছিল এবং আশুগঞ্জে ট্যাংকের সমর্থনপুষ্ট শত্রু বাহিনীকে বেয়নেটের সাহায্যে বিতাড়িত করেছিল। সৈন্যদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় উদ্দীপনা ছিল এবং কমান্ডারদের আরোপিত যে কোনো দায়িত্ব পালনের আগ্রহও তাদের ছিল। মজিদের কাপুরুষোচিত মন-মানাসিকতার জন্যই ভারতের হেলিকপ্টারবাহিত সৈন্যরা আমাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ময়মনসিংহ-জামালপুর

এ সেক্টর ছিল ৩৬ এডহক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল জামশেদের কমান্ডে। ব্রিগেডিয়ার কাদির নিয়াজীর নেতৃত্বাধীন ৯৩ এডহক ব্রিগেড ছিল এ সেক্টর রক্ষার দায়িত্বে। ৯৩ এডহক ব্রিগেডে দুটি ব্যাটালিয়ন ছিল। ব্রিগেডিয়ার কাদির নিয়াজী ছিলেন একজন সাহসী কমান্ডার। তাঁর অনুপম নেতৃত্বের ফলে তাঁর অন্যতম কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন আহসান নিজের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হন। এভাবে ভারতের ৯৫ ও ১৬৭ মাউন্টেন ব্রিগেডের অগ্রযাত্রা ২২ দিন বিলম্বিত হয়। ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা অভিমুখী রুটে নদ-নদীর প্রতিবন্ধকতা ছিল খুবই কম এবং এটাই ছিল ঢাকা পৌঁছার সংক্ষিপ্ততম পথ। ব্রিগেডিয়ার কাদির নিয়াজী ব্যর্থতার পরিচয় দিলে শত্রুরা অনেক আগেই ঢাকার প্রতিরক্ষা লাইনে পৌঁছে যেত। এ ব্রিগেড মুক্তিবাহিনীর এলাকায় প্রচণ্ড লড়াই করেছে। সেই এলাকায় জনগণ ছিল চরমভাবে বৈরি। প্রতিটি সৈনিকই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ লড়াই চালায়। দুটি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন নিয়ে ৯৩ এড্হক ব্রিগেড গঠন করা হয়। এর একটি ছিল ৩১ বালুচ এবং অন্যটি ৩৩ পাঞ্জাব। ৩৩ পাঞ্জাব ছিল একটি আধা সামরিক রেজিমেন্ট। এ ব্রিগেডে একটি মর্টার ব্যাটারিও ছিল।

ব্রিগেডিয়ার কাদির প্রায় এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে জামালপুরে ব্রহ্মপুত্রের পেছনে এবং ময়মনসিংহে প্রধান প্রতিরক্ষা অবস্থান গড়ে তোলেন। তিনি নদীর অপর পাড়ে হাতিবান্দা, শেরপুর ও জামালপুর মেরুতে শত্রুর অগ্রযাত্রা বিলম্বিত এবং তাদের ওপর নজরদারি করার জন্য চৌকি প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিবাহিনী এ এলাকায় অত্যন্ত তৎপর ছিল। তারা প্রায়ই জামালপুর ও হাতিবান্দায় আমাদের চৌকির ওপর হামলা চালাত। লেঃ কর্নেল সুলতানের নেতৃত্বাধীন ৩১ বালুচ ছিল এ মেরুর নিরাপত্তার দায়িত্বে। অন্যদিকে, কর্নেল রাজ্জাকের নেতৃত্বাধীন ৩৩ পাঞ্জাব ময়মনসিংহ মেরুর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত হয়।

হালুয়াঘাট, ফুলপুর, গোবড়াকুড়া, সরিষাপুর, দুর্গাপুর, বিসিসিড়ি ও পূর্বধলায় শত্রুকে বাধা দানের জন্য অবস্থান তৈরি করা হয়। তবে মূল শক্তি নিয়োগ করা হালুঘাটে। এই এড্হক ব্রিগেডে কোনো ট্যাংক, ফিল্ড গান অথবা মাঝারি আর্টিলারিও ছিল না। আগ্নেয়াস্ত্রের অভাবে প্রতিরক্ষা সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। উপরোক্ত অবস্থানগুলোর দায়িত্ব ছিল যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখা এবং এরপর ঢাকা দুর্গে প্রধান প্রতিরক্ষা লাইনে পিছু হটে আসা।

ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের লজিস্টিক এরিয়া ১০১ কমিউনিকেশন জোন নিয়ে হামলা চালায়। এ কমিউনিকেশন জোনে ছিল দুটি মাউন্টেন ব্রিগেডের সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন এবং মুক্তিবাহিনীর আরেকটি ব্রিগেড। এ জোনকে ঢাকা

দখলে সহায়তা করার লক্ষ্যে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সেক্টরে মোতায়েন আমাদের সৈন্যদের ওপর হামলা করার দায়িত্বও দেয়া হয়। মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং ছিলেন এ কমিউনিকেশন জোনের কমান্ডার। ২১ নবেম্বর যুদ্ধ শুরু হলে মেজর জেনারেল গুরুবক্স সিং ব্যক্তিগতভাবে কামালপুর চৌকি অবরোধে অংশ নেন। কামালপুর চৌকিতে আমাদের এক প্লাটুন নিয়মিত সৈন্য এবং আরো কিছু মুজাহিদ ছিল। এ চৌকির কমান্ডার ক্যাপ্টেন আহসান মালিকের বিপরীতে ছিল মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড। মুক্তিবাহিনীর এ ব্রিগেড আমাদের অবস্থানের ওপর বিরামহীন হামলা চালিয়েছে। একজন ভারতীয় জেনারেলের বিরুদ্ধে আমাদের তরুণ ক্যাপ্টেন আহসান মালিক লড়াই করেছেন।

'৪ ডিসেম্বর প্রত্যুষে কামালপুর পোস্টে পাকিস্তানি কমান্ডার ও তার ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের মধ্যে ওয়ারলেস বার্তা বিনিময় হয় এবং এ বার্তা ভারতীয়দের গোচরীভূত হয়। পোস্ট কমান্ডার সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য অনুমতি চাইছিলেন। কিন্তু ব্যাটালিয়ন কমান্ডার তার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। গুরুবক্স সিং এ পোস্টে মনস্তাত্ত্বিক রণকৌশল প্রয়োগ করেন। পাকিস্তানি পোস্টের কাছাকাছি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের পর সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মিগ-২১ সাত বার এ চৌকিতে রকেট নিক্ষেপ করে। একই দিন আরো দু'বার বিমান হামলা হয়।

প্রথম হামলার পর গুরুবক্স সিং মুক্তিবাহিনীর একজন বাহকের মাধ্যমে পোস্ট কমান্ডারের কাছে একটি চিরকুট পাঠান। এতে তিনি বলেন, 'আপনি বিগত কয়েকদিন ধরে সরবরাহ ও গোলাবারুদ আনতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং আপনি তাতে সফল হননি। এসব সরবরাহ আমাদের হাতে পড়েছে। আপনার পোস্টের সময় ফুরিয়ে গেছে এবং আপনি যে সিদ্ধান্তই নিন, আমরা কামালপুর চৌকি দখলে বদ্ধপরিকর। অপ্রয়োজনীয় প্রাণহানি এড়ানোর জন্য আপনার কাছে এ বার্তা পাঠানো হচ্ছে। গতকাল থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা আশা করি আপনি অবগত আছেন যে, এ মুহূর্তে আমাদের সৈন্যরা আপনার দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরে তৎপরতা চালাচ্ছে।'

পোস্ট কমান্ডার ক্যাপ্টেন আহসান কোনো জবাব দেননি। মেশিনগান চালিয়ে তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জেনারেল গুরুবক্স সিং দ্বিতীয়বার বিমান হামলার নির্দেশ দেন। আবার দ্বিপ্রহরে এ পোস্টে বিমান হামলা হয়। গুরুবক্স সিং এবার দ্বিতীয় একটি বার্তা পাঠান। এ বার্তায় তিনি বলেন, 'আপনি প্রথম বার্তার কোনো জবাব দেননি। একটু আগে আপনি আমাদের ওষুধের স্বাদ গ্রহণ করেছেন (পোস্টের ওপর বিমান হামলার প্রতি লক্ষ্য করে এ কথা বলা হয়)। আপনি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলে আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, একজন সাহসী শত্রুর প্রাপ্য সম্মান আপনাকে দেয়া হবে।'

১০. ময়মনসিংহ-ঢাকা সেক্টর
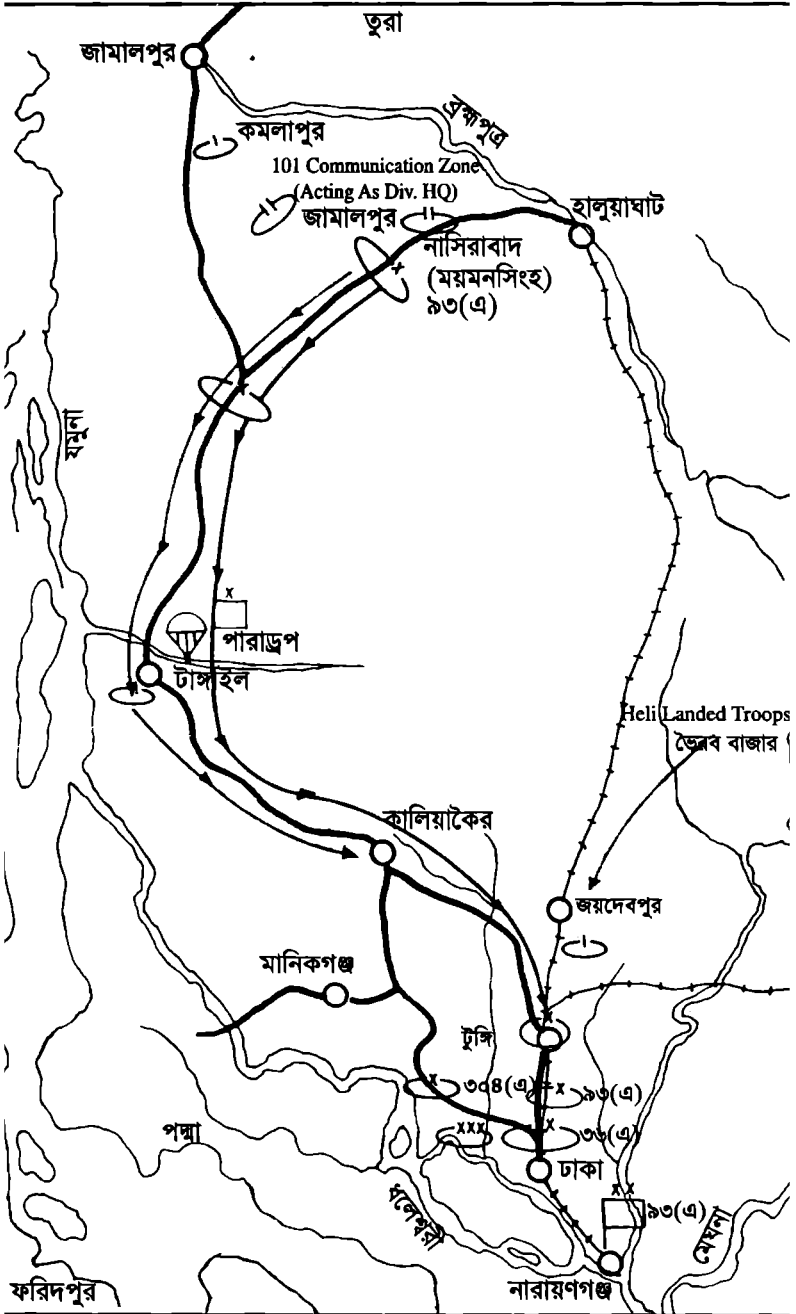
দ্বিতীয় বার্তারও কোনো জবাব দেয়া হয়নি। শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সংকেত হিসেবে বাংকার থেকে মেশিনগান গর্জে ওঠে। এরপর পোস্ট কমান্ডার ও তার কমান্ডিং অফিসারের মধ্যে ওয়ারলেসে আবার কথা হয়। কমান্ডিং অফিসার অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানোর এবং প্রতিশোধমূলক বিমান হামলা চালানোর প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি। জেনারেল গুরুবক্স সিং অধৈর্য হয়ে ওঠেন। তিনি বিকেলে আবার এ পোস্টের ওপর বিমান হামলার নির্দেশ দেন। অবশেষে তিনি চূড়ান্ত বার্তা পাঠান। বার্তায় তিনি বলেন, 'আপনি আত্মসমর্পণ করবেন কিনা তা অবশ্যই বিকেল ৪টার মধ্যে জানাতে হবে। আমি আপনাকে আর সময় দিতে পারছি না। আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য একজন বার্তাবাহক নিয়ে এলে খুবই ভালো হয়। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।' পোস্ট কমান্ডার এ বার্তারও কোনো জবাব দেননি। তিনি পোস্টে মোতায়েন সকল অস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। এতে গুরুবক্স সিং আরো হতাশ হন। তিনি নৈশকালীন হামলার পরিকল্পনা করছিলেন। এমন সময় পোস্ট কমান্ডার ক্যাপ্টেন আহসান রাত ৭টায় একটি সাদা পতাকা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং তার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। তবে তিনি বলেন যে, তার (গুরুবক্স সিং) চরমপত্রে সাড়া দিয়ে নয়, বরং তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে তিনি আত্মসমর্পণ করছেন। ক্যাপ্টেন আহসান অবরুদ্ধ অবস্থায় অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছেন এবং ৭৫ জন নিয়মিত সৈন্য ও মুজাহিদ নিয়ে ২১ দিন পোস্ট অবরোধকারী একটি ব্রিগেডকে মোকাবেলা করার পর আত্মসমর্পণ করেন। ভারতের অব্যাহত গোলাবর্ষণ ও বিমান হামলা সত্ত্বেও এ পোস্টে প্রাণহানির সংখ্যা খুবই নগণ্য। প্রতিপক্ষরাও এ বালুচ ক্যাপ্টেনের বীরত্বের প্রশংসা করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ তাঁর অনমনীয় ভূমিকার প্রশংসা করে ক্যাপ্টেন আহসানের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন। কামালপুর যুদ্ধবন্দিদের সাহসী সৈনিক হিসেবে প্রাপ্য যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি ফরমেশন কমান্ডারকে নির্দেশ দেন।' (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : সুখবন্ত সিং)

ভারতীয় ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ক্লার জামালপুরে ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের ওপর হামলা করতে এসে হতাশ হন। ব্রিগেডিয়ার ক্লারের অধীনে মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড এবং বিএসএফ-এর কয়েকটি ব্যাটালিয়নও ছিল। তিনি বহু হামলা চালিয়েও আমাদের কোনো একটি অবস্থানের পতন ঘটাতে পারেননি। ব্রিগেডিয়ার ক্লার ঢাকার দিকে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারেননি। জামালপুরে ৩১ বালুচের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল সুলতান আহমদ ও তার মধ্যেও বার্তা বিনিময়ের চমৎকার ঘটনা ঘটে। সুখবন্ত সিংয়ের বই থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি দেয়া হলো :

'৯ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় ক্লার জামালপুরে ৩১ বালুচের কমান্ডিং অফিসারের

কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে মুক্তিবাহিনীর একজন কুরিয়ারের মাধ্যমে তাঁর কাছে একটি চিরকুট পাঠান। এ কমান্ডিং অফিসারের সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি প্রতিরোধ অব্যাহত রাখলে তাঁর ওপর আরো প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হতো। সন্ধ্যায় লেঃ কর্নেল সুলতান মাহমুদ (আহমদ) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জবাব দেন। তিনি একটি খামে একটি চীনা বুলেট ভরে পাঠিয়ে দেন। এতে তিনি বলেন, 'আশা করি আপনি সুস্থ আছেন। চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা জামালপুরে লড়াই শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি। তবে এখনো লড়াই শুরু হয়নি। সুতরাং আলোচনা না করে চলুন আমরা লড়াই শুরু করি। ৪০ বার বিমান হামলা যথেষ্ট নয়। আরো বিমান হামলা চালাতে বলুন। আপনার কলমে ধার আছে। আশা করি পরবর্তী সময়ে কলমের পরিবর্তে আপনার হাতে একটি স্টেনগান দেখবো। কমান্ডার, জামালপুর দুর্গ।'

৯ ডিসেম্বর মেজর জেনারেল আনসারী আমাকে জানালেন যে, শত্রুর প্যারা ব্রিগেডকে স্থল অভিযান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ছত্রীসেনা কোথায় অবতরণ করতে পারে, আমি এ নিয়ে দ্রুত চিন্তা করতে লাগলাম। টাঙ্গাইল ও টঙ্গীকে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলে মনে হলো। এ দুটি জায়গা থেকে শত্রু ময়মনসিংহ থেকে ৯৩ ব্রিগেড প্রত্যাহারের পথ অবরোধ করতে পারে। টঙ্গী ঢাকার খুব সন্নিকটে হওয়ায় পাকিস্তানি সৈন্যরা এখানে ছত্রীসেনা অবতরণে বাধা দিতে পারবে। তাই টাঙ্গাইলকে ছত্রীসেনা অবতরণের জন্য সবচেয়ে সম্ভাব্য স্থান বলে মনে হতে লাগলো। তাই আমি মেজর জেনারেল জামশেদকে ময়মনসিংহ থেকে ৯৩ ব্রিগেড প্রত্যাহারের নির্দেশ দেই। আমি অন্যান্য ডিভিশনের কমান্ডারদেরও তাদের মূল অবস্থানে পিছু হটার নির্দেশ দেই। ১০ ডিসেম্বর বিকেলে টাঙ্গাইলে শত্রুর ছত্রী সৈন্য অবতরণ করেন।

৯/১০ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে ব্রিগেডিয়ার কাদিরকে ঢাকায় পিছু হটার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ৩১ বালুচ জামালপুর ও কামালপুরে ২১ দিন শত্রুর অগ্রযাত্রা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে। তারা ছিল অবরুদ্ধ। কিন্তু তারা বেয়নেট চার্জ করে শত্রুর অবরোধ ভেঙে তাদের পথ বের করে নেয়। লে. কর্নেল রাজ্জাকের নেতৃত্বে ৩৩ পাঞ্জাব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে এবং এ সেক্টরে শত্রুকে কোণঠাসা করে রাখে। তারা ভয়াবহ লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তা থেকেও তারা রক্ষা পেয়েছে। তারা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পিছু হটে আসে।

মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং আহত হন এবং ১০১ কমিউনিকেশন জোনের কমান্ডার হিসেবে মেজর জেনারেল নাগরা তার স্থলাভিষিক্ত হন। গুরবক্স সিং ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও বাস্তববাদী জেনারেল। অন্যদিকে, নাগরা ছিলেন দাম্ভিক ও

একজন ড্রয়িংরুম কৌশলবিদ। আমাদের পিছু হটার সময় নাগরার প্রতিটি হামলা ব্যর্থ করে দেয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার কাদির প্রতিটি বিলম্বিতকরণ অবস্থানে ভারতীয়দের ২৪ ঘণ্টার বেশি আটকে রাখেন। কোনো অবস্থায় এবং কখনো ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনী আমাদের ফাঁদে ফেলতে পারেনি। আমাদের সৈন্যরা প্রতিটি ঘটনায় নিজেদেরকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এবং শত্রুকে সাবধানে পা ফেলতে বাধ্য করেছে। শত্রুদেরকে ঢাকা এগিয়ে আসার সময় বিশৃঙ্খল ও নির্জীব হয়ে পড়তে দেখা গেছে।

৯৩ ব্রিগেড ভালোভাবে ঢাকা পৌঁছে। কিন্তু এর ব্রিগেড সদর দপ্তর ও রক্ষীদল কালুয়ারকারে শত্রুর ছত্রী সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে যায়। ব্রিগেডিয়ার কাদিরের নেতৃত্বাধীন এই ক্ষুদ্র বাহিনী শত্রুর অগ্রযাত্রা ৪ দিন বিলম্বিত করে। এরপর তারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে। তাদের কোনো বিশ্রাম ছিল না। গোলাগুলিও ফুরিয়ে যায়। এ অবস্থায় ব্রিগেডিয়ার কাদির যুদ্ধবন্দি হন।

১১ ডিসেম্বর লে. জেনারেল সগৎ সিং তার সৈন্যদের হেলিকপ্টারে করে মেঘনা নদী পার করান। ময়মনসিংহ থেকে পিছু হটা সৈন্যদের পথ রোধ করে দাঁড়ানোই ছিল সেখানে হেলিকপ্টারে সৈন্য নামানোর লক্ষ্য। এছাড়া, ভৈরব সেতুর পশ্চিমাংশ দখল করাও ছিল আরেকটি উদ্দেশ্য। ভারতীয় সৈন্যরা এসে পৌঁছানোর আগেই ব্রিগেডিয়ার সাদউল্লাহর ব্রিগেড আশুগঞ্জ থেকে ভৈরব বাজারে এসে পৌঁছে এবং অবস্থান গ্রহণ করে। হেলিকপ্টারে করে সৈন্য পরিবহনের সামর্থ্য ছিল অরোরার তুরুপের তাস। ময়মনসিংহ থেকে ৯৩ ব্রিগেডের ঢাকা এবং আশুগঞ্জ থেকে সাদউল্লাহ্‌র ব্রিগেড ভৈরব বাজারে পৌঁছার ঘটনায় শত্রুর কৌশল ব্যর্থ হয়ে যায়। শত্রু এ দুটি ব্রিগেডের পথ রোধ করতে ব্যর্থ হয়।

ঢাকার আশপাশে মোতায়েন অরোরার অধিকাংশ সৈন্যই ছিল পদাতিক। তাদের ভারী ট্যাংক ও দূরপাল্লার কামানের ঘাটতি ছিল। তবে ঢাকা দখলে ব্যর্থতার জন্য এটাই একমাত্র কারণ ছিল না। ১২ ডিসেম্বর অরোরা ঢাকার আশপাশে মোতায়েন সকল সৈন্যকে লে. জেনারেল সগৎ সিংহের কমান্ডে ন্যস্ত করেন। তাকে ঢাকা দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়। ৯ ডিসেম্বর অরোরার এ কাজ করা উচিত ছিল। ছত্রী সেনাদের তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কমান্ডে রেখে দেন। নাগরা ছিলেন একটি ডিভিশনের কমান্ডে। তবে হেলিকপ্টারবাহিত সৈন্য ছিল সগৎ সিংয়ের নেতৃত্বে। একই উদ্দেশ্যে একাধিক কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। এভাবে সার্বিক কমান্ডে সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়। এ জন্য এ অভিযান ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। জেনারেল সগৎ প্রস্তুতি গ্রহণ, রেকি এবং সৈন্য ও সম্পদ সংগ্রহে ৭ দিন সময় চান। মেজর জেনারেল খুশবন্ত সিংয়ের ভাষায় :

'এ সময় যুদ্ধে ভারতীয়রা আর্টিলারি ও সাজোয়া বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট ৪টির বেশি

দুর্বল ব্রিগেড প্রস্তুতে সক্ষম ছিল না। ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যূহে আঘাত হানার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমরসজ্জা গড়ে তোলার জন্য আরো কয়েকদিন লাগতো।'

ঢাকার ভেতরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। অভিজ্ঞ অফিসারদের কমান্ডে পোড়-খাওয়া সৈন্যদের এসব প্রতিরক্ষা ব্যূহে মোতায়েন করা হয়। অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়ে আসা হয় এবং তাদেরকে ঢাকার প্রতিরক্ষা আরো সংহত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ভৈরব বাজার, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ– এ তিনটি দুর্গ নিয়ে ঢাকা প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্স গঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ দুর্গ ঢাকার পশ্চাৎভাগ রক্ষা করছিল। ঢাকা থেকে দূরে হলেও ভৈরব বাজার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সড়ক রক্ষা করতো। ভারতের চতুর্থ কোরের ঢাকা এগিয়ে আসার সেটাই ছিল মূল পথ। ফরিদপুরের জন্য কুষ্টিয়ার অবস্থানের যে গুরুত্ব ছিল ঢাকার জন্য ভৈরব বাজারের অবস্থান ছিল একই রকম।

বিচ্ছিন্নভাবে এ তিনটি অবস্থানে হামলা করা যেত না। একযোগে হামলা চালাতে হতো। একটি দুর্গে হামলা করা হলে অপর দুটি দুর্গও মোকাবেলা করতে হতো। ঢাকা বিচ্ছিন্ন ছিল না। ঢাকা কমপ্লেক্সকে মোকাবেলা করার জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য সংগ্রহ করা অরোরার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠত। কামালপুরে একটি মিশ্র কোম্পানি ২১ দিন শত্রুর দুই ব্রিগেড সৈন্যকে আটকে রেখেছিল। হিলিতে আমাদের মাত্র একটি ব্যাটালিয়ন ভারতের ৫টি পদাতিক ও একটি ট্যাংক ব্রিগেড নিয়ে গঠিত একটি পুরো ডিভিশনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ সত্ত্বেও ভারতীয়রা হিলি দখল করতে পারেনি। আমাদের সৈন্যরা ১৯ দিন হিলি দখলে রেখেছিল এবং ভারতীয় অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। জামালপুর, আশুগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও দৌলতপুরেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ঢাকা দুর্গে আমাদের সৈন্য ছিল ৩১ হাজারের বেশি। বিরাজিত পরিস্থিতিতে ঢাকা প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্স ছিল দুর্ভেদ্য।

ভারতীয়দের নিজেদের ভাষ্য অনুযায়ী, ১২টি ডিভিশনের মধ্যে মাত্র তাদের ৪টি দুর্বল ব্রিগেড ঢাকা আক্রমণের জন্য তখন প্রস্তুত ছিল। ঢাকার মতো একটি সুরক্ষিত এলাকা যেখানে আমার ৩১ হাজার সৈন্য ছিল এবং ব্যক্তিগতভাবে যেখানে আমি সৈন্য পরিচালনা করছিলাম, সেখানে ঐ পরিমাণ শক্তি নিয়ে তারা কি ঢাকা দখল করতে পারতো? না, কখনো না। সামরিক বিবেচনায় আমরা ভারতের ১২টি ডিভিশনকে মোকাবেলা এবং এসব ডিভিশনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে সক্ষম হই। যশোর ও ময়মনসিংহ (যেখান থেকে আমরা সৈন্য প্রত্যাহার করেছিলাম) এছাড়া সকল বড় শহর এবং চট্টগ্রাম ও চালনাসহ সকল সমুদ্র বন্দর ও বিমানক্ষেত্র ছিল তখনো আমাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তান ভেঙে দেয়া হয় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গৌরব ধূলিস্যাৎ ও ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার ও সৈন্যদের পরিত্যাগ করা হয়। আমাদেরকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে অসম্মানিত

করা হয়। আমরা পরাজিত হইনি। আমাদেরকে পরিত্যাগ এবং আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়।

পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের রক্তের জন্য দায়ী কে? আমরা আমানত হিসেবে শহীদদের দাফন করেছি। তাদের দেহাবশেষ পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনা উচিত। স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ঐসব শহীদদের প্রতি; যারা পাকিস্তান ভেঙেছে তাদের প্রতি নয়। আমেরিকানরা যদি ভিয়েতনামে তাদের সৈন্যদের লাশ খুঁজে দেশে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমাদের সরকারের পক্ষেও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে আমাদের সৈন্যদের লাশ নিয়ে আসা সম্ভব। কারণ পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের ভালো সম্পর্ক রয়েছে।

কোনো সৈন্যের বীরত্বে মুগ্ধ হলে শত্রুর যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাখ লাখ সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল এবং এবং এ যুদ্ধ ৬ বছর স্থায়ী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শত্রুপক্ষের সৈন্যকে সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করার ঘটনা ঘটেছে মাত্র একটি। এ ভাগ্যবান ব্যক্তি হচ্ছেন একজন ব্রিটিশ সার্জেন্ট। এ সার্জেন্টকে ওয়েস্টার্ন ডেজার্টে জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল রোমেলকে হত্যা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তিনি এত চমৎকারভাবে এবং এত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন যে, রোমেল স্বয়ং তাকে সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে আমার অধীনে ছিল মাত্র ৪৫ হাজার নিয়মিত ও আধাসামরিক সৈন্য। পূর্ব পাকিস্তানে ২৬ দিনের প্রকাশ্য যুদ্ধকালে ভারতীয়রা ৪ জন পাকিস্তানি সৈন্যকে সামরিক মর্যাদায় দাফন করেছিল। আমার মতে, আর কোনো সেনাবাহিনী এ ধরনের সম্মান পায়নি। নিম্নোক্ত সৈন্যদের সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয় :

(১) '১৬তম ডিভিশনে বগুড়া সেক্টরে ২৪ ক্যাভালরির নায়েক সারোয়ার। একজন ভারতীয় লে. কর্নেল ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল হোসেনের সামনে মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ্র কাছে নায়েক সারোয়ারের বীরত্বের কাহিনী ব্যক্ত করেন। ওই ভারতীয় লে. কর্নেল বগুড়া সেক্টরে একটি গার্ড ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

(২) এবং (৩) ৩১ বালুচের মেজর আইউব ও
পশ্চিম পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের নায়েক আবদুল সাত্তারকে ময়মনসিংহ সেক্টরে ভারতীয়রা সামরিক মর্যাদায় দাফন করে। ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার ক্লার (পরে মেজর জেনারেল) ব্রিগেডিয়ার কাদির নিয়াজীর কাছে কর্তব্যের প্রতি তাদের নিষ্ঠা ও সাহসিকতার বর্ণনা দেন। ১০১ কমিউনিকেশন জোনের জিওসি মেজর জেনারেল নাগরাও এ ঘটনা স্বীকার করেছেন।

(৪) মাসলিয়ায় এক হামলায় ৩৮ এফএফ (১০৭ ব্রিগেড, ৯ ডিভিশন) এর মেজর আনিস নিহত হন। ভারতীয় ৯ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল দলবীর সিং মেজর আনিসকে সামরিক মর্যাদায় দাফন করেন এবং তিনি নিজে ফাতেহা পাঠ করেন।'[১২]

হুকাম দাদের বীরত্বের উপাখ্যান এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকে *নিশান-ই-হায়দার* পদক পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তাদেরকে এ সম্মান দেয়া হয়নি। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব ও আত্মত্যাগ বলতে কি বুঝায় তা অনেকেই জানে না। আমাদের ভাগ্য ঐসব সুবিধাবাদীদের কাছে জিম্মি ছিল যারা ক্ষমতা দখল অথবা ক্ষমতায় টিকে থাকার তীব্র লড়াইয়ে জড়িত ছিল।

আন্তঃবাহিনী, আন্তঃসেনাবাহিনী ও বেসামরিক-সামরিক সহযোগিতা

পূর্ব পাকিস্তান সরকারে কর্মরত সকল সার্ভিস, শাখা ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে টিম ওয়ার্ক ও সহযোগিতা ছিল চমৎকার। আমি সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা এবং স্থানীয় ও ভারতীয়দের সঙ্গে মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের বিস্তর অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হয়েছি।

এটা আমার জন্য খুবই গর্বের বিষয় যে, আমি আমার সৈন্যদের সবসময় উৎফুল্ল এবং পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় জীবন দানে প্রস্তুত দেখেছি। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ অফিসারদের পুর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছিল এবং এসব অফিসার বিদ্রোহ চলাকালে এবং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে কখনো সম্মুখভাগে আবার কখনো বা পশ্চাদভাগে থেকে তাদের ইউনিট ও ফরমেশনগুলোকে দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তারা অদ্বিতীয় সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পাকিস্তান নৌবাহিনী

ভাইস অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শরীফের কমান্ডে মাত্র ৪টি গানবোট নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নৌবাহিনী গঠিত হয়েছিল। সমুদ্র ও নদীতে শত্রুর শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও আমাদের নৌসেনারা তেজস্বিতা, সাহসিকতা ও দক্ষতা দেখিয়েছে। তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে সহায়তা দিয়েছে। বিলোনিয়া অপারেশনে তাদের অবদান প্রশংসনীয়। ক্যাপ্টেন জমিরের নেতৃত্বে নৌসেনারা সেখানে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ক্যাপ্টেন জমির সবসময়ই তাঁর কর্তব্য পালনে প্রস্তুত ছিলেন এবং ঝুঁকি গ্রহণে কখনো ভয় পেতেন না।

পাকিস্তান বিমান বাহিনী

পূর্ব পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে এফ-৮৬ মডেলের এক স্কোয়াড্রন বিমান ছিল। এসব বিমান ঢাকায় মোতায়েন ছিল। এয়ার কমোডর ইনামুল হক যেভাবে তাঁর সাহসী ও অকুতোভয় বাহিনীকে পরিচালনা করেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। প্রতিদিনই এসব জঙ্গিবিমান উড্ডয়ন করতো এবং সংখ্যায় বিশাল শত্রু বিমানের প্রচুর ক্ষতি করতো। ভারতীয় বিমানকে বরাবরই দৌড়ের ওপর রাখতো। বিমান ভূপাতিত হলে স্থানীয় লোকজনের হাতে নিহত হতে হবে–এ কথা জেনেও আমাদের পাইলটরা শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে আকাশে উড্ডয়ন করেছেন এবং কেউ কেউ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমাদের যেসব পাইলট প্যারাশ্যুটের সাহায্যে অবতরণ করেছেন বাঙালিরা তাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করেছে। তাদের কেউ ফিরে আসেননি। অন্যদিকে, ভারতীয় পাইলটরা প্যারাশ্যুটের সাহায্যে অবতরণ করলে তাদেরকে পাহারা দিয়ে নিরাপদে ভারত-অধিকৃত এলাকায় পৌঁছে দেয়া হতো। কখনো কখনো আমাদের পাইলটদেরকে বিধ্বস্ত বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করতে হয়েছে। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে তারা এ কাজ করতেন।

এয়ার কমোডর ইনাম তার স্বল্পপাল্লার রাডারে ভারতীয় সৈন্যদেরকে হেলিকপ্টারে করে মেঘনা নদী অতিক্রম করতে দেখেন এবং এ ঘটনা আমাকে অবহিত করেন। সময়মতো এ সংবাদ পেয়ে সাদউল্লাহ্‌র ব্রিগেডকে আশুগঞ্জ থেকে ভৈরব বাজারে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেই। এভাবে ভারতের হেলিকপ্টারবাহিত সৈন্যরা ঢাকা ও আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের মাঝে আটকা পড়ে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, ঢাকা বিমানক্ষেত্র এত ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, ৬ ডিসেম্বরের পর এখান থেকে আমাদের কোনো জঙ্গিবিমান উড্ডয়ন করতে পারেনি। এ কারণে গোটা পূর্ব পাকিস্তানের আকাশে ভারতীয় জঙ্গিবিমান একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে। আত্মসমর্পণের আগে আমরা আমাদের কিছুসংখ্যক পাইলটকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেই এবং বিমান বাহিনীর অবশিষ্ট সদস্যদের ঢাকার প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করি।

সাজোয়া

কর্নেল বখতিয়ারের নেতৃত্বে সাজোয়া সৈন্যরা শত্রু ট্যাংকের বিরুদ্ধে তাদের ভ্রাম্যমাণ অভিযানের মাধ্যমে এবং আমাদের নিজস্ব পদাতিক বাহিনীর সহায়তায় তাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে। অস্ত্রশস্ত্র ও সংখ্যায় নগণ্য হয়েও তারা বরাবর সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুর অত্যাধুনিক ট্যাংকের মোকাবেলা করেছে এবং উন্নত কৌশলের মাধ্যমে তারা শত্রুর সাঁজোয়া বাহিনীকে কোণঠাসা করে রেখেছে।

আর্টিলারি

আর্টিলারি ব্রিগেডিয়ার এস.এস.এ. কাসিম ছিলেন আমার আর্টিলারি কমান্ডার। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ গানার এবং অগ্রবর্তী সৈন্যদের পরিদর্শনের সময় তিনি সবসময় আমার সঙ্গী হতেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিমানযোগে আসার কারণে আমাদের আর্টিলারি ফরমেশন ও ইউনিটগুলো তাদের ভারী অস্ত্রগুলো নিয়ে আসতে পারেনি। এ বাস্তব অসুবিধার মুখে ব্রিগেডিয়ার কাসিম প্রাপ্ত গানগুলোর সম্ভব সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করেন। ডিভিশন ও ব্রিগেডগুলো ছিল তাদের কাজ-কর্মে প্রায় স্বাধীন। তবু তিনি তাদের গোলাবর্ষণ পরিকল্পনায় সমন্বয় সাধন করতেন এবং পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতেন। এসব পরিকল্পনা যুদ্ধকালে কার্যকর ও সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৬ হালকা এএ রেজিমেন্ট

লে. কর্নেল মোহাম্মদ আফজাল এ রেজিমেন্টের নেতৃত্বে ছিলেন। ঢাকায় ভারতীয় বিমান হামলার সময় কাসিম বরাবরই আশপাশে থাকতেন। যুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে শত্রুবিমান এএ রেজিমেন্টের ওপর উপর্যুপরি হামলা চালিয়েছে। কিন্তু আমাদের সাহসী গানাররা নির্ভীকচিত্তে শত্রু বিমানের ওপর গোলাবর্ষণ করেছে। বিমান হামলার সময় আমি কোনো একটি গান পিটে (বাংকারের যেখানে বিমান বিধ্বংসী কামান রাখা হয়) ছিলাম। ৬টি শত্রু বিমান আমাদের তিনটি গানপোস্টে হামলা চালায়। কামান চালকরা অত্যন্ত সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে লড়াই করেন। এ লড়াই প্রায় ১০ মিনিট স্থায়ী হয়। দুটি শত্রু বিমান ধ্বংস হয় এবং বাদবাকিগুলো পালিয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর এ রেজিমেন্ট শেষবারের মতো একটি ভারতীয় বিমান ভূপাপিত করে। এ বিমানটি ছিল একটি বোমারু বিমান। এ রেজিমেন্ট চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে। তারা ৩০টির বেশি শত্রু বিমান ভূপাতিত করেছে। সকল কৃতিত্বের দাবিদার হচ্ছেন আফজাল ও কাসিম। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং শত্রুকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স

আমাদের ইঞ্জিনিয়ারগণ পূর্ব পাকিস্তানের সংকটকালে মহৎ কাজ করেছেন। তাদের বিশ্রাম নেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। অনেক সময় আমরা ইঞ্জিনিয়ারদের পদাতিক সৈন্য হিসেবে ব্যবহার করেছি। তাদেরকে ঘাঁটি রক্ষার দায়িত্ব অথবা গেরিলাদের গোপন আস্তানায় পদাতিক বাহিনীর অভিযানকালে অথবা অন্যান্য হামলায় পদাতিক বাহিনী এগিয়ে গেলে পদাতিক বাহিনীর পার্শ্বভাগ রক্ষার দায়িত্বও তাদের পালন করতে হতো। সেতু নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে তারা পদাতিক বাহিনীর অগ্রযাত্রায় সহায়তা দিত। এছাড়া, তারা রাস্তাঘাট ও রেলসড়ক চলাচল উপযোগী রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করতো। সুরক্ষিত ঘাঁটি ও দুর্গ প্রস্তুত ও নির্মাণে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতেন। ইঞ্জিনিয়ার বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার

ইকবাল শরীফ। তিনি খুবই সাহসী ও পরিশ্রমী ছিলেন। বিপদসংকুল জায়গা এবং শত্রুর হামলাকালে তিনি তার সৈন্যদের অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন। নিজের জীবনের ঝুঁকির চিন্তা না করে তিনি সম্ভব সংক্ষিপ্ততম সময়ে বিমানক্ষেত্র মেরামত করতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ-কর্ম দেখাশোনা করতেন। যোগাযোগ, সেতু ও রাস্তাঘাট পুনঃপ্রতিষ্ঠার মতো দুরূহ কাজে তার দক্ষতার কোনো তুলনা হয় না। ঢাকায় তাঁকে একটি সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে তার সেক্টরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করেন।

সিগনাল

বরাবরই আমাদের সিগনালের তৎপরতা ছিল অত্যন্ত ভালো। তারা শেষদিন পর্যন্ত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং অগ্রবর্তী ইউনিটের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। এ কৃতিত্বের দাবিদার হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার আরিফ রেজা। ব্রিগেডিয়ার রেজার দায়িত্ব ছিল খুবই কঠিন এবং তার সম্পদ ছিল অপর্যাপ্ত। কিন্তু তিনি যোগাযোগ সমস্যার জট খুলতে খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নবগঠিত এড্হক ফরমেশনগুলোর জন্য যন্ত্রপাতি, সুযোগ-সুবিধা ও জনশক্তি সরবরাহে তাঁর অবদান অতুলনীয়। ভারতীয়দের এগিয়ে আসার পূর্ব মুহূর্তে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়া নাগাদ তিনি সকল ইউনিট, ফরমেশন ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের মধ্যে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।

হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন

লে. কর্নেল নিয়ামত বুখারীর কমান্ডে আমাদের হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন ন্যস্ত করা হয়। তিনি ছিলেন দক্ষ, বুদ্ধিমান ও একজন সাহসী কমান্ডার। টহলদার, রসদ সরবরাহ ও হতাহতদের স্থানান্তর করার কাজে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হতো। আমাদের হেলিকপ্টারে কোনো নাইট ভিশন অথবা নৈশকালে চলাচলের জন্য কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। ২৩ নভেম্বর আমি খুলনা সেক্টর, ২৬ নভেম্বর বগুড়া সেক্টর এবং ৩ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ সেক্টর পরিদর্শন করি। যুদ্ধ শুরু হলে আমরা দিনের বেলায় খুব একটা বের হতাম না। তখন রাতের অন্ধকারে আমরা কাজ করতে শুরু করি। রাতের বেলা কাজ করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তবু আমরা অত্যন্ত নৈপুণ্য ও সাহসের সঙ্গে নৈশ অভিযান চালাই।

জেনারেল নজর হোসেন শাহ্ আহত হলে তার স্থলে মেজর জেনারেল জামশেদকে নিয়োগ দেয়া হয়। জেনারেল জামশেদকে রাতে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ রাত ছিল খুবই অন্ধকার এবং হেলিকপ্টারগুলোকে মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অবতরণ করতে হয়। এটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কিন্তু আমি

একটি ডিভিশনে কমান্ডার নিয়োগ না করে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। সকল পাইলটই এ বিপজ্জনক মিশনে যেতে চেয়েছিল। অন্ধকার রাতে মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হেলিকপ্টার অবতরণ করলে মুক্তিবাহিনীর একজন সদস্য তা দেখে ফেলে। পাইলট তাকে চিনে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উড্ডয়ন করে ফিরে আসেন। নৈশকালে উড্ডয়ন করতে গিয়ে একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। তবে কেউ হতাহত হয়নি। ১৫/১৬ ডিসেম্বর রাতে সকল হেলিকপ্টার বার্মা গমন করে।

মেডিকেল সার্ভিসেস

মেডিকেল সার্ভিসের ব্রিগেডিয়ার ফাহিম আহমেদ খান অগ্রবর্তী অবস্থান অবধি চিকিৎসা সুবিধা পৌঁছে দেয়া এবং ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত হতাহতদের ঢাকা ও পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরের কাজে জড়িত ছিলেন। তার কাজ ছিল খুবই দুরূহ এবং ডিভিশনগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। বহু অসুবিধা সত্ত্বেও তাকে শেষদিন পর্যন্ত এডহক ফরমেশনগুলোতে চিকিৎসা সহায়তা পাঠাতে হয়েছে।

ইপকাফ

পুরনো পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্স বিদ্রোহ করার পর ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস গঠন করা হয়। এটা ছিল খুবই কঠিন কাজ এবং মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জামশেদের কাঁধে এ কাজ সমাধা করার দায়িত্ব চাপানো হয়। জেনারেল জামশেদকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেন তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ব্রিগেডিয়ার বশির আহমেদ। তারা নতুন করে লোক নিয়োগ করেন। অনুগত লোকজন খুঁজে পাওয়া এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া ছিল দুষ্কর। আমাদের নিয়মিত বাহিনী থেকে অফিসার ও নন-কমিশন্ড অফিসার নিয়োগ করতে হতো। উভয় ক্যাটাগরির অফিসারগণ ব্যতিক্রমধর্মী সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিতেন। মেজর জেনারেল জামশেদ ছিলেন আমার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড এবং ফরমেশন পরিদর্শনকালে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম। তিনি সুপরামর্শ দিতেন। কারণ তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার সৈনিক। তিনি ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী ছিলেন এবং তিনি এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কয়েক স্তরে ভাগ করেন।

ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর

আমি ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ব্রিগেডিয়ার এল-ইদ্রুস চিফ অভ স্টাফ হিসেবে ব্রিগেডিয়ার জিলানী খানের (পরে পাঞ্জাবের গভর্নর) কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। ব্রিগেডিয়ার জিলানী শুরুতে আমার ওপর অর্পিত মিশনের কাজ সম্পাদনে আমার নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী ছিলেন। তিনি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধকালে বিদ্রোহী ও মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড দমনে প্রণীত অপারেশনাল

পরিকল্পনাগুলো পুনঃপরীক্ষার কাজও করেছিলেন। তার পদোন্নতি ঘটলে ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী তার স্থলাভিষিক্ত হন। সেনাবাহিনীতে একজন চৌকস ও মেধাবী অফিসার হিসেবে ব্রিগেডিয়ার বাকিরের বেশ সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন সৎ, যোগ্য ও একজন সাহসী অফিসার। তিনি একসময় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডারও ছিলেন। তিনি প্রায় সকল সেক্টরের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে পুরোপুরিভাবে পরিচিত ছিলেন। এজন্য তিনি আমাদের কাছে একটি বিরাট সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হন। তিনি এত দ্রুত আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন করতেন যে, তা ছিল সত্যি বিস্ময়কর। একজন সৎ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অফিসার হিসেবে তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেন। তিনি আমাকে হামুদ-উর-রহমান কমিশনের জন্য রিপোর্ট তৈরিতে সহায়তা করেন। টিক্কা ও ভুট্টোর ভয়ে যেখানে অন্যান্য সবাই আমাকে ত্যাগ করেছিল অথবা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সেখানে ব্রিগেডিয়ার বাকির পাহাড়ের মতো অটল হয়ে আমার পাশে দাঁড়ান। তিনি কোনো প্ররোচনা ও প্রলোভনের কাছে মাথা নত করেননি। তার নিজের কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও তিনি দুর্ভোগ পোহান। তিনি ছিলেন পরিস্থিতির শিকার। আমাদের সামরিক ব্যবস্থায় কমান্ডারের কার্যকলাপের জন্য তার স্টাফ অফিসার দায়ী নয়। কিন্তু আমার প্রতি অবিচল আনুগত্য থাকায় তাকে বলি পাঁঠা বানানো হয়।

গণসংযোগ

জাতীয় পর্যায়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল আমাদের সমস্যাকে আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরা। কিন্তু তথ্য মন্ত্রণালয় সে কাজে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। টিক্কা সকল বিদেশি সাংবাদিককে বের করে দেয়ায় তারা অতিরঞ্জিত রিপোর্ট প্রকাশ করতে থাকে। আমি এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করি। আমার পিআরও সিদ্দিক সালিক ছিল তরুণ ও অনভিজ্ঞ। সুতরাং আমি আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ (আইএসপিআর) অধিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার আবদুল রহমান সিদ্দিকীর সহায়তা কামনা করি। তিনিই ছিলেন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের একমাত্র কর্মকর্তা যিনি নিয়মিত ঢাকা সফর করতেন। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, তাদের সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন করতেন এবং এভাবে আমাদের ভাবমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে তথ্য না পাওয়ায় তিনি অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছেন। সুতরাং আমরাই হয়ে উঠি তার একমাত্র ভরসা। আমাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ, সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে আমার স্টাফকে দিকনির্দেশনা দান, তার সাংবাদিক সম্মেলন এবং স্থানীয় ও বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে আমার যোগাযোগে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটে। কখনো কখনো সাংবাদিকরা অগ্রবর্তী অবস্থান পরিদর্শনকালে আমার সঙ্গী হতেন এবং গোলাগুলির মধ্যে পড়ে যেতেন। পাকিস্তানেও সাহসী সাংবাদিকদের অভাব ছিল না। হিলিতে আমার সফরকালে শত্রুর অবিরাম গোলাবর্ষণে জনাব সুবহানী প্রায় মরেই গিয়েছিলেন।

পিআইএ

মনে পড়ে শুরুতে পিআই'এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাকির উল্লাহ্ দুররানী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং তিনটি হালকা ডিভিশন ঢাকায় পরিবহনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। একটি রেকর্ড সময়ে এসব সৈন্য পরিবহন হচ্ছে পিআইএ'র একটি অনন্য কৃতিত্ব এবং এজন্য দুররানী গর্ব করতে পারেন। বার্লিনে সৈন্য পরিবহনের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। সীমিত সম্পদ নিয়ে পিআইএ একটি বিস্ময়কর দায়িত্ব পালন করেছে এবং ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্রীলংকা হয়ে ঘোরালো রুটে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা দান অব্যাহত রেখেছেন।

সিএসপি ও পুলিশ অফিসার

চিফ সেক্রেটারি মি. মুজাফ্ফর হুসাইন, তার মেধাবী বেসামরিক অফিসাররা এবং পুলিশের আইজি এমএকে চৌধুরী ও তার যোগ্য পুলিশ কর্মকর্তারা এক অসম্ভব কাজ করেছেন। সামরিক অভিযানের পর স্থানীয় প্রশাসন ভেঙে পড়ে। এসব অফিসারগণ বেসামরিক প্রশাসন পুনর্গঠিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তারা ছিলেন পাকিস্তান ব্যুরোক্রেসির অত্যন্ত মেধাবী অংশ। কিন্তু তাদেরকে প্রতি মাসে নামমাত্র ৫ টাকা স্টাইপেন্ডে বেরিলিতে যুদ্ধবন্দি শিবিরে ইন্টার্নি হিসেবে লাঞ্ছিত জীবন বেছে নিতে হয়। আমার জানা মতে, তারা বেসামরিক-সামরিক সহযোগিতায় এক অসাধারণ উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করায় আমরা তাদের জন্য গর্বিত।

নোটস

১. *সুখবন্ত সিং, দ্য লিবারেশন অভ বাংলাদেশ, বিকাশ, নিউদিল্লী, ১৯৭৯।*
২. *ইবিদ।*
৩. *ফজল মুকিম, ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ, অপ. সিট. পৃষ্ঠা-১৭৯।*
৪. *তাজাম্মল হুসাইন মালিক, দ্য স্টোরি অভ মাই স্ট্রাগল।*
৫. *ইন্ডিয়ান আর্মি আফটার ইনডিপেনডেন্স।*
৬. *সুখবন্ত সিং, দ্য লিবারেশন অভ বাংলাদেশ, অপ সিট.।*
৭. *মেজর জেনারেল ডি.কে পালিত, দ্য লাইটানিং ক্যাম্পেইন, কম্পাটন, সালিসবারি, ইংল্যান্ড, ১৯৭২।*
৮. *সিডনি এইচ শামবার্গ, নিউইয়র্ক টাইমস।*
৯. *ফজল মুকিম, অপ. সিট।*
১০. *ডি.কে. পালিত, অপ. সিট।*
১১. *সুখবন্ত শিং, অপ. সিট।*
১২. *শওকত রিজা, দ্য পাকিস্তান আর্মি ১৯৬৬-৭১।*

অধ্যায় ১১

পাকিস্তানের ভাঙন

যখন মুজিব ও ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়, তখন কৌশল নির্ধারণের দায়িত্বে ছিলেন ইয়াহিয়া, অ্যাডমিরাল আহসান, লে. জেনারেল পীরজাদা ও লে. জেনারেল ইয়াকুব। অ্যাডমিরাল আহসান ইয়াহিয়ার কাছে অভিযোগ করেন যে, তাদের মধ্যে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলো তৎক্ষণাৎ ভুট্টোকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হতো যে, পীরজাদা ভুটোকে ব্রিফ করতেন এবং ভুট্টো সেভাবে অগ্রসর হতেন।

ষড়যন্ত্রে ভুট্টোকে কেউ হারাতে পারেনি। তিনি গুল হাসানকে আশ্বাস দেন যে, তাকে পরবর্তী কমান্ডার-ইন-চিফ করা হবে এবং এয়ার মার্শাল রহিমকে বিমান বাহিনী প্রধান পদে বহাল রাখা হবে। যখন তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তখন তারা ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, সেটা ১৯৭১ সালের নভেম্বরে তাদের চীন সফরকালে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে লে. জেনারেল গুল হাসানের কোনো আগ্রহ ছিল না। আমি তাকে টেলিফোনে রিং করলে তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতেন না। এয়ার মার্শাল রহিম নিজেকে আড়াল করে রাখেন এবং যুদ্ধে তিনি বিমান বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা যখন সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করছিলাম এবং ভারতীয়দের নির্ধারিত ২ দিনের সময়সীমার মধ্যেও যখন মাথা নত করছিলাম না তখন গুল হাসান আমাদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পশ্চিম রণাঙ্গনে একটি বিলম্বিত ও অনভিপ্রেত লড়াই শুরু করার পরামর্শ দেন। ভুট্টোকে ক্ষমতায় আনার জন্য এয়ার মার্শাল রহিমের সঙ্গে তিনি যে ষড়যন্ত্র করছিলেন তা বাস্তবায়নের জন্য এ ধরনের পরামর্শ দেয়া হয়। ভুট্টোর ক্ষমতা দখলের জন্য আমাদের পরাজয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা অপরিহার্য ছিল।

ভুট্টো টিক্কাকেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাকে সেনাবাহিনী প্রধান বানানো হবে এবং মেজর জেনারেল ফরমানকেও তার সার্ভিসের জন্য পুরস্কৃত করার আশ্বাস

দেয়া হয়। ফরমান ছিলেন নেপথ্যচারী একজন চক্রান্তকারী। ভুট্টো ক্ষমতায় এসে গুল হাসানকে সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিযুক্তি দেন। সকল সিনিয়র জেনারেলকে ডিঙ্গিয়ে তিনি তাকে এ পদে নিয়োগ দান করেন। তখন সকল সিনিয়র জেনারেল তার অধীনে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং পেনশনে চলে যান। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন একমাত্র টিক্কা। লে. জেনারেল টিক্কা ছিলেন গুল হাসানের সিনিয়র। তা সত্ত্বেও টিক্কা তার জুনিয়র গুল হাসানের অধীনে কাজ করতে থাকেন। তিনি কখনো এ ব্যাপারে আপত্তি করেননি। কারণ এখানে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত ছিল। এরপর ভুট্টো লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানে তার মারাত্মক অপরাধ, ১৯৭১ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্যে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ক্ষমাহীন ব্যর্থতা এবং পাকিস্তানের প্রতিটি লড়াইয়ে তার নিম্নমানের তৎপরতা সত্ত্বেও তাকে সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিযুক্ত করেন। ১৫/১৬ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে আমাদের হেলিকপ্টারগুলো বার্মা পালিয়ে যায়। রাও ফরমান আলীও হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাকে পালিয়ে যাবার অনুমতি দেইনি। হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যেতে পারলে তিনিও প্রতিশ্রুত পুরস্কার পেয়ে যেতেন। তবে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ভারত থেকে ফিরে যাবার পর তিনি পুরস্কৃত হন। তাকে মিলিটারি ট্রেনিং-এর মহাপরিচালক নিযুক্ত করা হয়। এ পদে নিযুক্তির জন্য তার প্রশিক্ষণ অথবা অভিজ্ঞতা কোনোটাই ছিল না। এরপর তাকে ফৌজি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান করা হয়। অন্যান্য ত্যাগী ও অভিজ্ঞ অফিসারদের উপেক্ষা করে তাকে এ পদে বসানো হয়। তখন আত্মসম্মান রক্ষায় এসব অফিসার অবসরে চলে যান। ধুরন্ধর ফরমানকে মন্ত্রীও বানানো হয়।

আমি পরে জানতে পারলাম যে, ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভুট্টোকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে রাজনৈতিক বিষয় দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তাকে এ পদে এ জন্যই বসানো হয় যাতে পাকিস্তানের ভাঙন রোধে জাতিসংঘ অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছুই করতে না পারে। ফাইটিং ফরমেশন বিশেষ করে ইস্টার্ন গ্যারিসনে সামরিক সরবরাহ বন্ধ নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয় গুল হাসানকে। ষড়যন্ত্রকারীরা এটাও নিশ্চিত করে যে, এয়ার মার্শাল রহিম স্থল ও নৌবাহিনীকে সমর্থন দেবেন না। আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে, জেনারেল গুল হাসান আমার চতুর্দশ ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল কাজী মজিদকে ষড়যন্ত্রের জালে বেষ্টন করে ফেলেছিলেন। চতুর্দশ ডিভিশনের কমান্ডার কাজী মজিদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গুল হাসানের নীল নকশা অনুযায়ী কাজ করতে থাকেন। এ জন্য আমাকে নতুন করে যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজাতে হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা রাও ফরমান আলীকে গভর্নমেন্ট হাউসে আতঙ্ক ছড়াতে এবং যুদ্ধে নাশকতা সৃষ্টিতে নিয়োগ করে। তিনি এ কাজ অত্যন্ত চাতুর্য ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন।

১৯৪৮ সালে কোয়েটায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সি-ইন-সি জেনারেল ডিডি গ্রেসী (ডানে) লেখক নিয়াজীকে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন

১৯৫৯ সালে ৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের (শেরদিল) শতবর্ষ পালন উৎসবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খানের (প্রথম সারিতে মাঝে) ডান পাশে লেখক নিয়াজী

১৯৬৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টে পাকিস্তান ও ভারতীয় উভয় দেশের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ ফিল্ড মার্শাল ক্লদ অচিনলেকের (বামে) বাম পাশে লেখক নিয়াজী

১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে বেদিয়ান সেক্টরে ১৪ প্যারা ব্রিগেডের তৎপরতা। লেখক নিয়াজী (বাম দিক থেকে তৃতীয়) বাংকারে হাঁটু গেড়ে রণাঙ্গণের মানচিত্র দেখছেন।
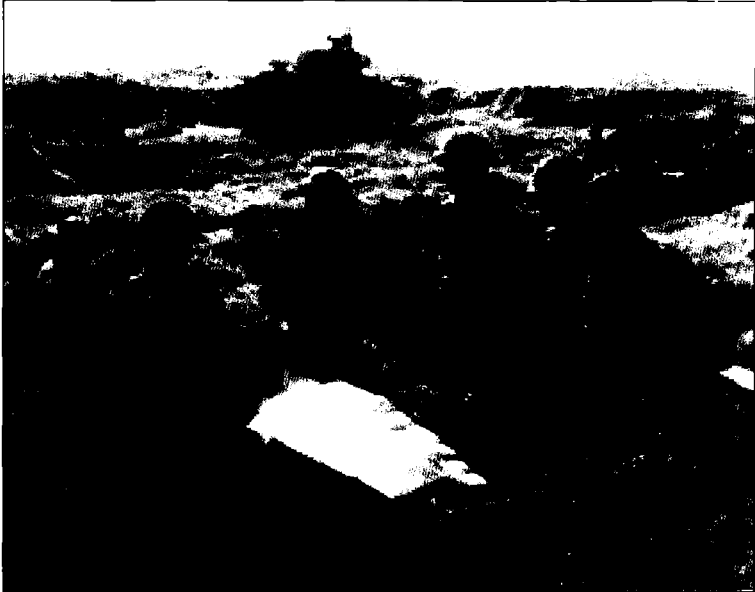
১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে বেদিয়ান সেক্টরে ব্রিগেডিয়ার নিয়াজী (ডান দিক থেকে প্রথম) বাংকারে দাঁড়িয়ে সামনে শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করছেন

১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইউব খান শিয়ালকোটের পাসরুর পরিদর্শনে আসেন। লেখক নিয়াজী পেছনের সারিতে (ডান থেকে দ্বিতীয়) দাঁড়িয়ে রয়েছেন

পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সি-ইন-সি জেনারেল মোহাম্মদ মূসা খান (ডানে) লেখক নিয়াজীকে হিলাল-ই-জুরাত পদক পরিয়ে দিচ্ছেন

১৯৭১ সালের এপ্রিলে চট্টগ্রামে ৫৩ ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার এম. আসলাম নিয়াজী লেখক লেঃ জেনারেল নিয়াজীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন

১৯৭১ সালের জুনে শাহবাজপুরে জেনারেল নিয়াজী (বামে)। চতুর্দশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবদুর রহিম (মাঝে চশমা চোখে) মানচিত্রে রণাঙ্গণের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছেন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চতুর্দশ ডিভিশনের এলাকা পরিদর্শনে জেনারেল নিয়াজী (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়)। বাম দিক থেকে রিয়ার এডিমরাল এম শরীফ পিএন, ব্রিগেডিয়ার এসএসএ কাশেম (আর্টিলারি কম্যান্ডান্ট, চতুর্দশ ডিভিশনের জিওসি মেঃ জেঃ এম রহিম খান ও চট্টগ্রামের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মালিক আতা মোহাম্মদ

১৯৭১ সালের ৫ জুলাই ৯ম ডিভিশনের এলাকা পরিদর্শনকালে ডিভিশনের জিওসি মেঃ জেনারেল এম.এইচ আনসারী (বামে) লেখক নিয়াজীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন

১৯৭১ সালে যশোরে ৯ম ডিভিশনের অগ্রবর্তী এলাকা পরিদর্শনে জেনারেল নিয়াজী

১৯৭১ সালের নভেম্বরে হিলিতে ২০৫ ব্রিগেডের এলাকা সফরে জেনারেল নিয়াজী/পেছনে ২০৫ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল হোসেন মালিককেও দেখা যাচ্ছে

জেনারেল নিয়াজী একজন নন-কমিশন্ড অফিসারকে প্রশংসাসূচক সনদ দিচ্ছেন/১১৭ তম ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এম এইচ আতিককেও ছবিতে দেখা যাচ্ছে

কুমিল্লা সেক্টরে সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন জেনারেল নিয়াজী

একজন আহত সৈনিককে হাত ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন জেনারেল নিয়াজী

লাহোরে এক জনসভায় জেনারেল নিয়াজী ভাষণ দিচ্ছেন

ফরমান ছিলেন বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক বিষয়ে গভর্নরের একজন উপদেষ্টা। কিন্তু তিনি নিজেকে পূর্ব পাকিস্তানের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করেন। বস্তুতপক্ষে, সামরিক বিষয় ও সামরিক অপারেশনে তার কোনো করণীয় ছিল না। তিনি তাঁর বইয়ে আমার পাঠানো সংকেতগুলোর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি গভর্নর মালিকের পক্ষে যেসব সংকেতগুলোর মুসাবিদা করে পশ্চিম পাকিস্তানে অযথা আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলো সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ সম্পর্কে একটি বিষাদময় পরিস্থিতি এবং প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রতি হুমকি তুলে ধরে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করেন যে, ইয়াহিয়া যুদ্ধের ৯ মাসে একবারও তার সৈন্য ও লোকজনকে দেখতে আসেননি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৭ ডিসেম্বর আমি আমার কৌশলগত ধারণা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে পাঠিয়েছিলাম এবং ৮ ডিসেম্বর প্রেরিত এক সংকেতে তা অনুমোদন করা হয়। ৭ ডিসেম্বর আমাকে না জানিয়ে গভর্নরের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে আরেকটি বার্তা পাঠানো হয়। এতে নিচের কথাগুলো বলা হয় :

'৭ ডিসেম্বর বার্তা নং এ ৬৯০৫ গভর্নরের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের প্রতি। পূর্ব পাকিস্তানের সঠিক পরিস্থিতি আপনার নজরে আনা খুবই জরুরি। আমি জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, সৈন্যরা পর্যাপ্ত আর্টিলারি ও বিমান বাহিনীর সহায়তা ছাড়া সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। বিদ্রোহীরা তাদের পশ্চাৎভাগ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে এবং জান-মালের এত ক্ষতি হয়েছে যে, তা পূরণ করা সম্ভব নয়। পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় সেক্টরের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলোর পতন ঘটেছে। মেঘনা নদীর পূর্ব দিকে গোটা করিডোরের পতন রোধ করাও সম্ভব নয়। ইতোমধ্যেই যশোরের পতন ঘটেছে। এতে পাকিস্তান-সমর্থক লোকজনের মনোবল ভেঙে যাবে। বেসামরিক প্রশাসন অচল হয়ে পড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া বেসামরিক প্রশাসনের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। খাদ্য ও অন্যান্য রসদ ফুরিয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না। গোটা প্রদেশেও একই অবস্থা। ৭ দিন পর ঢাকা শহরেও খাদ্যাভাব দেখা দেবে। জ্বালানি ও তেল সংকটের কারণে জনজীবন পুরোপুরি অচল হয়ে পড়বে। যেসব এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়েছে সেসব এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মারাত্মক। বিদ্রোহীরা হাজার হাজার পাকিস্তানপন্থী লোকজনকে হত্যা করছে। লাখ লাখ অবাঙালি ও অনুগত পাকিস্তানি মৃত্যুর প্রহর গুনছে। বহিঃশক্তির সরাসরি ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া কোনো ধরনের মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ অথবা বস্তুগত সহায়তা কোনো কাজে আসবে না। আমাদের কোনো বন্ধু যদি সাহায্য করতে চায় তাহলে এ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে আগামী ৪৮ ঘণ্টার

মধ্যে। আবার বলছি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে। সাহায্য পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকলে আমি আপনাকে আলোচনা করার পরামর্শ দিচ্ছি যাতে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পন্ন হয় এবং লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা পায় এবং অবর্ণনীয় দুর্দশা এড়ানো যায়। সাহায্য আসার সম্ভাবনা থাকলে পরিণতি যাই হোক না কেন, আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। বিবেচনার জন্য অনুরোধ রইলো।'

এ বার্তা আমার পক্ষ থেকে নয়, গভর্নর হাউস থেকে তা পাঠানো হয়েছিল এবং এটার খড়সা করেছিলেন ফরমান। বার্তায় পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় সেক্টরের পতন ঘটেছে বলে যে কথা উল্লেখ করা হয় তা ছিল পুরোপুরি ভুল। ১৬ ডিভিশনের কমান্ডার নজর হোসেন শাহ্ ছিলেন খুবই তৎপর। সীমান্তে হিলি সেক্টরে তখনো প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। দিনাজপুর, রংপুর ও সৈয়দপুরে শত্রুর ৬ ডিভিশনকে আটকে রাখা হয়েছিল। ৯ ডিভিশনের এলাকায় ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর কুষ্টিয়ায় পিছু হটছিলেন এবং ভারতের একটি ডিভিশনকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার হায়াত খুলনায় সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়ে যান এবং সেখানে তিনি আরেকটি ভারতীয় ডিভিশনের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। মধুমতি নদীপথ বিপদমুক্ত ছিল। ফরিদপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, আশুগঞ্জ, ময়নামতি অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিও কোনো হুমকি ছিল না। এসব ঘাঁটিগুলো তখনো বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছিল এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী লড়াই করার সর্বশেষ অবস্থানে সরে আসছিল। সকল সমুদ্রবন্দর, বিমানক্ষেত্র ও বিভাগীয় সদরদপ্তর এবং অধিকাংশ ফেরিঘাট ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণে। কমান্ডারগণ সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। শত্রুরা গ্রামাঞ্চলের দিকে পিছু হটছিল। তবে প্রধান প্রধান অনুপ্রবেশ পথগুলো ছিল তাদের দখলে। ৭ ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের পতন ঘটলে ৮ ডিসেম্বর সি-ইন-সি আমাকে অভিনন্দন জানাতেন না। ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর সি-ইন-সির সিগনাল নং জি. ০৯১০ ছিল :

'আমি আপনার এবং আপনার অধীনস্থ সৈন্যদের জন্য গর্বিত। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে আপনার তৎপরতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং আমি নিশ্চিত, আপনার কমান্ডে এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে। ভূখণ্ড হারানোর চিন্তা বাদ দিয়ে যেখানে সম্ভব সেখানেই প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করুন। এ বিষয়ে গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করুন। রাজনৈতিক পর্যায়ে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চলছে।'

ভারতীয় জেনারেল ডি. কে. পালিত তার 'দ্য লাইটনিং ক্যাম্পেইন'-এ স্বীকার করেছেন, তখনো আমাদের অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো ছিল অক্ষত।

আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো বার্তায় খাদ্য মজুদ সম্পর্কে যে তথ্য দেয়া হয় পরিস্থিতি মোটেও সেরকম ছিল না। ১৬ ডিসেম্বরের পরও খাদ্য ঘাটতির কোনো কথা শোনা যায়নি। আমার মনে হয়

পাকিস্তান ভাঙায় ফরমানের পরবর্তী কার্যক্রমকে যৌক্তিক করার জন্যই তিনি বার্তায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে এমন উদ্ভট তথ্য দিয়েছেন। ৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট গভর্নরের বার্তার জবাবে বলেন :

'আপনার ফ্ল্যাশ সিগনাল নং এ ৬৯০৫ এর জবাবে। সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ বিবেচনা করা হচ্ছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে পূর্ণাঙ্গ ও তীব্র লড়াই চলছে, বিশ্ব শক্তি একটি যুদ্ধবিরতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নিরাপত্তা পরিষদে উপর্যুপরি রুশ ভেটোর পর বিষয়টি সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করা হচ্ছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রতিনিধি দলকে নিউইয়র্কে পাঠানো হচ্ছে। আপনি আশ্বস্ত হতে পারেন, আপনি যে ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলা করছেন আমি সে ব্যাপারে পুরোপুরি ওয়াকেবহাল। কী ধরনের সামরিক কৌশল অবলম্বন করতে হবে সে বিষয়ে জেনারেল নিয়াজিকে নির্দেশ দানের জন্য আমি চিফ অভ স্টাফকে নির্দেশ দিয়েছি। আপনি এবং আপনার সরকারকে খাদ্য বরাদ্দ এবং সকল অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় এবং পতন রোধ করা যায়। আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হোন। আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করছি।'

প্রেসিডেন্ট গভর্নরের কাছে প্রেরিত বার্তায় বলেছেন যে, আমাকে কৌশলগত নির্দেশ দানের জন্য তিনি চিফ অভ স্টাফকে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু চিফ অভ স্টাফের কাছ থেকে আমি আদৌ এ ধরনের নির্দেশ পাইনি।

৭ ডিসেম্বর থেকে আমি গভর্নর হাউসে অস্বাভাবিক তৎপরতা লক্ষ্য করি। সর্বত্রই নৈরাশ্য ও হতাশার ছায়া। গভর্নর মালিক বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তা এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা সম্পর্কে উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। তবে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স অথবা প্রেসিডেন্ট হাউসে তেমন কোনো উদ্বেগ ছিল না। আমি চিফ অভ জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি আবারো আমাকে এড়িয়ে যান। মিলিটারি অপারেশনের ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার রিয়াজ যুদ্ধ চলাকালে কখনো আমার সঙ্গে অথবা আমার স্টাফের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তার ডেপুটি কর্নেল কোরেশী চার্জে ছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। তবে তিনি পরিস্থিতি মোকাবেলায় মোটেও সক্ষম ছিলেন না। সেনাবাহিনী প্রধান অধিকাংশ সময় প্রেসিডেন্ট হাউসে কাটাতেন। এ জন্য আমি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে আমার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারিনি।

রাজনৈতিক পর্যায়ে সংকট নিরসনের তথাকথিত প্রচেষ্টা ছিল একটি প্রহসন। জাতিসংঘে আমাদের অনেক বন্ধু ছিল। কিন্তু ২১ নভেম্বর ভারত পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালালে নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উত্থাপনে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো আগ্রহ দেখানো হয়নি। বিক্ষুব্ধ পক্ষ আগ্রহী না হলে অন্য কেউ এগিয়ে আসবে কেন? ভুট্টোর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কে রওনা

দেয়। কিন্তু ভুট্টোর উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে এ প্রতিনিধি দল ঘুরপাক খেতে থাকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব ও ব্যাপকতা সম্পর্কে ভুট্টোর কোনো উদ্বেগ ছিল না। তিনি 'এম. এম. আহমেদ' পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হন। কাবুল ও তেহরান হয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে রোমে যান। এরপর সেখান থেকে যান নিউইয়র্কে। ১০ ডিসেম্বর তিনি নিউইয়র্কে পৌঁছেন। কয়েক ঘণ্টায় যেখানে তিনি আমেরিকা যেতে পারতেন সেখানে তার সময় লাগে তিনদিন। নিউইয়র্কে গিয়ে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। নিউইয়র্কের পথে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি মোজাফফর হোসেনের স্ত্রীর সঙ্গে লন্ডনে সাক্ষাত করেন এবং তিনি তাকে জানান, তিনি (মোজাফফর হোসেনের স্ত্রী) তার স্বামীকে দীর্ঘদিন দেখতে পাবেন না। তার মানে হচ্ছে, ভুট্টো জানতেন, চিফ সেক্রেটারিসহ অন্যান্যরা যুদ্ধবন্দি হবেন। যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করলে অথবা সে ধরনের উদ্দেশ্য থাকলে তিনি এ কথা বলতে পারতেন না। একটি সম্মানজনক যুদ্ধবিরতি হলে পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করার অসম্মান থেকে রক্ষা পেত। আত্মসমর্পণের দিকে ঠেলে দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে ধ্বংস করে এমন এক মাত্রায় নিয়ে যাওয়া যেখানে জনগণ ইয়াহিয়ার পদত্যাগের আওয়াজ তুলবে এবং ইয়াহিয়া পদত্যাগ করলে ভুট্টো ক্ষমতায় আসতে পারেন। ভুট্টো তার চাতুর্যপূর্ণ চালের মাধ্যমে এক ঢিলে দুই পাখি মারেন এবং দেশের এক নম্বর ব্যক্তি হওয়ার খায়েশ পূরণে তিনি পাকিস্তানকে হত্যা করেন।

পরিস্থিতির ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে গভর্নর হাউস থেকে ঘন ঘন বার্তা প্রেরণ, গভর্নরের মনোবল ভেঙে দিতে ফরমানের প্রচেষ্টা এবং আমার স্টাফদের মধ্যে হতাশা ছড়ানোর ঘটনায় কুয়াশা কেটে যেতে থাকে। আমার চিফ অব স্টাফ কিছুদিন আগে যে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেই ষড়যন্ত্র তখন চূড়ান্ত রূপ নিতে যাচ্ছিল। আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম। আমার একজন স্টাফ অফিসার আমাকে জানায়, মেজর জেনারেল ফরমান তাকে ৯ ডিসেম্বর জানিয়েছেন যে, পরদিন যুদ্ধবিরতি হতে যাচ্ছে। ৭ ডিসেম্বর আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে যে সংকেত পাঠিয়েছিলাম তাতে আমি শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম। ইস্টার্ন কমান্ড অথবা অন্য কোথাও কেউ যুদ্ধ বিরতির কথা বলেন নি অথবা এ ধরনের চিন্তাও করেননি। গভর্নর অন্তত এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জানাননি অথবা তিনি এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগও নেননি। যেখানে কেউ যুদ্ধবিরতির কথা জানতো না সেখানে ফরমান জানতেন কিভাবে? মেজর জেনারেল ফরমান আলীর বইয়ে এমন বহু বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যেসব বিষয়ে আমি ছিলাম অনবহিত। যেসব বিষয় আমাকে জানানোর প্রয়োজন ছিল সেগুলো আমাকে জানানো হয়নি। আমাকে অন্ধকারে রাখা হয়। মনে হচ্ছিল, তিনি ভারতীয় সি-ইন-সি ও রুশদের সঙ্গে

আলোচনার জন্য একটি সমান্তরাল প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নয়তো যেখানে ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের কাছে লেখা গভর্নরের চিঠি প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হয় সেখানে তিনি আমার স্টাফ অফিসারকে ৯ ডিসেম্বর কিভাবে জানালেন যে, পরদিন যুদ্ধবিরতি হতে যাচ্ছে? ভারতীয় মেজর জেনারেল নাগরার কথার সঙ্গে ফরমান আলীর বইয়ে বর্ণিত ঘটনার চমৎকার মিল রয়েছে। জেনারেল নাগরা আমাকে জানিয়েছিলেন, তারা ৯ ডিসেম্বর জানতে পারেন যে, যুদ্ধ থেমে যাচ্ছে। দৃশ্যত ফরমান রুশ কমিউনিকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর আমাদের বার্তার জবাবে জেনারেল মানেকশ বলেছিলেন, তিনি ইতোমধ্যেই তার দুটি বার্তায় রাও ফরমান আলীকে জানিয়ে দিয়েছেন, সৈন্যদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। শত্রুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার অথবা আমার কোনো ডিভিশনাল কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলার এক্তিয়ার জেনারেল ফরমানের ছিল না। কিন্তু কেন তিনি শত্রুর সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয় আমাকে, গভর্নরকে ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে অবহিত করেননি?

৭ ডিসেম্বর পলাশবাড়িতে ষোড়শ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল নজর হোসেন ও ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল হুসাইনের ওপর হামলা হয়। কিন্তু অলৌকিকভাবে তারা রক্ষা পান। একজন বেসামরিক লোক নজরকে রক্ষা করেন। তাদেরকে রক্ষায় পাল্টা হামলা চালাতে হয়। এতে লে. কর্নেল সুলতান মাহমুদ নিহত হন। এ পাল্টা হামলায় শত্রুর অগ্রযাত্রা ২৪ ঘন্টা বিলম্বিত হয়। ষোড়শ ডিভিশনের কমান্ড গ্রহণ করার জন্য মেজর জেনারেল জামশেদকে পাঠানো হয়। তাকে বহনকারী হেলিকপ্টার অবতরণে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ঢাকা ফিরে আসেন। আমি ফরমানকে সেখানে পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি গা ঢাকা দেন। খুঁজে পাওয়া যায়নি তাকে। এ জন্য আমি আমার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড জামশেদকে সেখানে পাঠাই। গোটা যুদ্ধের সময় একবারই আমার ফরমানের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু তিনি হাওয়া হয়ে যেতেন। নতুবা বরাবরই তাকে গভর্নর হাউসে দেখা যেত।

৯ ডিসেম্বর আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে জানাই যে, জনগণ বৈরি হয়ে উঠছে এবং নৈশকালে চলাচল অসম্ভব। স্থানীয় লোকজন ভারতীয়দের সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছিল এবং আমাদের পশ্চাৎভাগ ও ফাঁক-ফোকর দিয়ে তাদেরকে এগিয়ে আনছিল। ভারতীয় বিমান বাহিনী জেটি, ফেরি ও নৌযান ধ্বংস করে দেয়। শত্রুর বিমান হামলায় ভারি অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের প্রচুর ক্ষতি হয়। ২০ দিনের একটানা অনিদ্রা ও ক্ষুধায় সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কয়েকটি এলাকায় গুরুতর পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমি লড়াই চালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমি বিমান হামলা এবং ঢাকায় বিমান যোগে সৈন্য পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কারণ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাকে জানিয়েছিল যে, চীনারা আমাদের সমর্থন করতে শুরু

করেছে। কিন্তু এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। মার্কিন নৌ সমর্থন লাভের আশায় আমি আমার সম্পদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এবং চট্টগ্রাম ও চালনা সমুদ্র বন্দরকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলাম। কিন্তু কোনো মার্কিন সহায়তাও আসেনি। সহায়তার প্রত্যাশা না থাকলে আমি খুব সহজেই চালনা ছেড়ে দিয়ে সৈন্যদেরকে খুলনা নিয়ে আসতে পারতাম।

৯ ডিসেম্বর গভর্নর আরেকটি বার্তা পাঠান। এ বার্তায় তিনি ঢাকাকে উন্মুক্ত নগরী হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাবে বহু জটিলতা ছিল। কারণ ঢাকার বাইরে অবস্থানরত সৈন্যদের আমি অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারছিলাম না। প্রথম বার্তায় এ ধরনের প্রস্তাব দেয়া হয়নি। তাই আমি গভর্নরকে জানালাম যে, আমি এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নই। নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার স্বার্থে ফরমানের এ বার্তাও প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত গভর্নরের বার্তায় বলা হয় :

'০৯১৮০০-এর এ ৪৬৬০। প্রেসিডেন্টের জন্য। সামরিক পরিস্থিতি মারমুখী। শত্রুরা পশ্চিম দিক থেকে ফরিদপুরে এগিয়ে আসছে এবং পূর্বদিকে কুমিল্লা ও লাকসামে আমাদের সৈন্যদের অতিক্রম করে মেঘনা নদী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। শত্রুর হাতে চাঁদপুরের পতন ঘটেছে। এর ফলে সব নৌ রুট বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরের সাহায্য দ্রুত না পৌঁছলে শত্রুরা যে কোনো দিন ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে যেতে পারে। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিনিধি বেসামরিক লোকজন বিশেষ করে অবাঙালিদের রক্ষায় ঢাকাকে একটি উন্মুক্ত নগরী হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি এ প্রস্তাবের পক্ষে। এ প্রস্তাব অনুমোদন করার জন্য আমি জোর সুপারিশ করছি। জেনারেল নিয়াজি এ প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নন। তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে চান এবং মনে করেন যে, এ প্রস্তাব ঢাকাকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করার শামিল। তার এ অভিপ্রায় গোটা সেনাবাহিনী, পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ, সকল অবাঙালি এবং অনুগত পাকিস্তানিদের নিধনের পথ প্রশস্ত করতে পারে। রিজার্ভে কোনো নিয়মিত সৈন্য নেই এবং চীন অথবা যুক্তরাষ্ট্র আজকে ব্যাপক স্থল ও বিমান হামলা শুরু না করলে শত্রুরা মেঘনা অথবা পদ্মা অতিক্রম করে এগিয়ে এলে আমাদের প্রতিরোধ হবে নিষ্ফল। আমি আবারো আপনাকে যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক নিষ্পত্তিতে পৌঁছার জন্য অনুরোধ করছি। নতুবা কয়েকদিনের মধ্যে পূর্ব রণাঙ্গন থেকে ভারতীয় সৈন্যরা মুক্ত হতে পারলে পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়ে উঠবে। স্থানীয় লোকজন অধিকৃত এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিচ্ছে। বিদ্রোহীদের তৎপরতার কারণে আমাদের সৈন্যরা পিছু হটতে এবং চলাচল করতে পারছে না। একইসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের আত্মত্যাগও হবে অর্থহীন।'

৯ ডিসেম্বর সিগনাল জি ০০০১-এ প্রেসিডেন্ট তার জবাব দেন। এ বার্তায় আমাকে গভর্নরের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। গভর্নরের কাছে প্রেরিত বার্তায় বলা হয় :

'আপনার ৯ ডিসেম্বর প্রেরিত সিগনাল নং এ ৪৬৬০ পেয়েছি এবং পুরোপুরি বিষয় ওয়াকিবহাল হয়েছি। আপনি আমার কাছে যেসব প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সে ব্যাপারে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি আপনাকে দেয়া হলো। আমি আন্তর্জাতিকভাবে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেষ্টা করেছি এবং এখনো চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে আপনার সুবিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আমি আপনার ওপর ন্যস্ত করছি। আপনি যে সিদ্ধান্তই নেবেন তাতে আমার সম্মতি রয়েছে। আমি একইসঙ্গে জেনারেল নিয়াজিকে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তাকে নির্দেশ দিচ্ছি। বেসামরিক লোকজনের জীবন বিশেষ করে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তার প্রয়োজনে আপনি যে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন এবং আমাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে সকল ধরনের রাজনৈতিক উপায়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।'

জাতিসংঘে কোনো রাজনৈতিক মীমাংসার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়নি। এ ব্যাপারে গভর্নর কি রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন? তার এক্তিয়ার ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সীমিত। এখানে কার্যত কোনো সরকার ছিল না। রাজনৈতিক অর্থাৎ আওয়ামী লীগের এমএনএ'রা ছিলেন কলকাতায় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। তাদেরকে বাদ দিয়ে কিভাবে রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব? শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একটি চুক্তি করা যেত। তিনি একটি কনফেডারেশন মেনে নিতে রাজি হতেন। তার সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপের কোনো পরামর্শ কেন ছিল না?

পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার গভর্নরের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। বিরাজমান পরিস্থিতিতে তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। কারণ প্রতিপক্ষ ছিল কেবল ভারত। পররাষ্ট্র বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। প্রেসিডেন্ট একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য জাতিসংঘে আমাদের মিশনকে নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেপথে যাননি। বস্তুত তারা আমার কাঁধে বন্দুক রেখে ফায়ার করতে চেয়েছিলেন। গভর্নর কিভাবে এবং কার কাছ থেকে সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারতেন? সশস্ত্র বাহিনী দেশের ভেতরে বিদ্রোহী মুক্তিবাহিনী ও বৈরি স্থানীয় জনগণ এবং রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে নিজেদেরকে রক্ষা করছিল।

১০ ডিসেম্বর আমি সেনাবাহিনী প্রধানের কাছ থেকে একটি বার্তা পাই। তাতে বলা হয় :

'ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডারের প্রতি সেনাবাহিনী প্রধানের পক্ষ থেকে। গভর্নরের কাছে প্রেরিত প্রেসিডেন্টের বার্তার কপি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব গভর্নরের ওপর অর্পণ করেছেন। পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটায় সঠিকভাবে কোনো বার্তা পাঠানো সম্ভব নয় বলে আমি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বিদ্রোহীদের সক্রিয় সহযোগিতায় শত্রুদের পূর্ব পাকিস্তানে পুরোপুরি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র একটি সময়ের ব্যাপার। ইতোমধ্যে বেসামরিক লোকজনের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে এবং সেনাবাহিনীর বিপুল প্রাণহানি ঘটছে। আপনি যদি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান তাহলে আপনাকে যুদ্ধের ভালো-মন্দ দিক বিচার করতে হবে এবং পরিস্থিতি মূল্যায়নের ভিত্তিতে গভর্নরকে আপনার আন্তরিক পরামর্শ দেয়া উচিত। প্রেসিডেন্ট তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ার দিয়েছেন। সুতরাং তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনি প্রয়োজনবোধ করলে অধিকাংশ সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করে দিতে পারেন যাতে এগুলো শত্রুর হাতে না পড়ে। আমাকে সবকিছু অবহিত করবেন। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।'

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ৯ ডিসেম্বর প্রেরিত বার্তায় প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব গভর্নরকে দিয়েছিলেন এবং ১০ ডিসেম্বর সেনাবাহিনী প্রধানের বার্তায় আমাকে আত্মসমর্পণ করার ইঙ্গিত দিয়ে অধিকাংশ সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করার পরামর্শ দেয়া হয় যাতে এগুলো শত্রুর হস্তগত না হয়। তার মানে হচ্ছে, আমার ও গভর্নরের দিকে বল ঠেলে দেয়া হলো যাতে আমাদেরকে দোষারোপ করা যায়।

১৯৭১-এর ১০ ডিসেম্বর ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে অশুভ দিন। সেদিন একজন ষড়যন্ত্রকারী তার খোলস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সত্যিকার রূপে আবির্ভূত হয়। এ অশুভ দিনে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ছাড়া নিজে নিজে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেন এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ প্রতিনিধি পল হেনরির কাছে পাকিস্তানের ভাঙন সম্পর্কে একটি অতি গোপনীয় বার্তা হস্তান্তর করেন। এটা ফরমানের বার্তা হিসেবে গণ্য হয়। কারণ এ বার্তায় প্রেসিডেন্ট অথবা গভর্নরের সম্মতি ছিল না। গভর্নর এ বার্তা সম্মতির জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে তা বাতিল করে দেন।

চিফ সেক্রেটারি ও ফরমান ১০ ডিসেম্বর দুপুরে আমার কমান্ড পোস্টে আসেন এবং বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। তারা আমাকে জানান, প্রেসিডেন্ট গভর্নরকে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক্তিয়ার প্রদান করেছেন এবং প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে জাতিসংঘের কাছে একটি বার্তা পাঠানোর বিষয়

নিয়ে আলোচনা করার জন্য গভর্নর তাদের পাঠিয়েছেন। আমি বার্তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চরম অসন্তুষ্ট হই। এ বার্তায় যে বিষয় উল্লেখ করা হয় তার অর্থ ছিল ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের মৃত্যু এবং দেশ ও পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর জন্য চরম অবমাননা। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এ বার্তা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি ফরমানকে স্পষ্টভাবে বলি, রাওয়ালপিন্ডির সঙ্গে লিখিত অথবা মৌখিক আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করতে হবে। আমি প্রেসিডেন্টের অনুমোদন স্বচক্ষে দেখার কথাও উল্লেখ করি। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আমার দ্বিমত পোষণের কথা উল্লেখ না করে এ বার্তায় লেখা হবে, 'জেনারেল নিয়াজি আপনার নির্দেশ মেনে নিতে প্রস্তুত।' তার মানে হচ্ছে, প্রেসিডেন্টের অনুমোদন দানের পরই কেবল আমি এ প্রস্তাবে সম্মতি দেব। গভর্নরের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে এ বার্তা পাঠানো হয়। তাতে বলা হয় :

'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জন্য। আপনার জি ০০০১, ০৯২৩০০ ডিসেম্বর বার্তার জবাব। আমার ওপর চরম ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করায় আমি আপনার অনুমোদনের পর ঢাকাস্থ জাতিসংঘ প্রতিনিধি পল হেন্‌রির কাছে নিম্নোক্ত বার্তা হস্তান্তর করতে চাই। বার্তা শুরু। পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কখনো ছিল না। কিন্তু এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা সশস্ত্র বাহিনীকে আত্মরক্ষামূলক তৎপরতা চালাতে বাধ্য করে। পাকিস্তান সরকার বরাবরই রাজনৈতিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের নিষ্পত্তি করতে চেয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী চরম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং এখনো লড়াই অব্যাহত রাখতে পারে। কিন্তু অধিক রক্তপাত ও নিরীহ মানুষের প্রাণহানি এড়াতে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করছি : যেহেতু রাজনৈতিক স্বার্থে এ লড়াই শুরু হয়েছে, তাই এ সংকট অবশ্যই রাজনৈতিক উপায়ে মীমাংসা করতে হবে। আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সম্মতিতে ঢাকায় একটি সরকার গঠনের ব্যবস্থা করতে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এ প্রস্তাব রাখার পাশাপাশি আমি আমার কর্তব্যের খাতিরে বলছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অবিলম্বে তাদের ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার কামনা করছে এবং আমি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং অনুরোধ করছি : এক, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি। দুই, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে সম্মানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবাসন। তিন, পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক সব পশ্চিম পাকিস্তানি লোকজনের প্রত্যাবাসন। চার, ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসতি স্থাপনকারী সকল লোকজনের নিরাপত্তা। পাঁচ, পূর্ব পাকিস্তানে কোনো ব্যক্তির ওপর প্রতিশোধ

গ্রহণ না করার নিশ্চয়তা। এ প্রস্তাব পেশ করে আমি এ কথা দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলতে চাই যে, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে এটা হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট প্রস্তাব। সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে না এবং এ প্রশ্ন উঠতেও পারে না। এ প্রস্তাব গ্রহণ করা না হলে সশস্ত্র বাহিনী শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে। বার্তা শেষ। জেনারেল নিয়াজির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং আপনার নির্দেশ মেনে নিতে সম্মতি দিয়েছেন। দ্রুত অনুমোদনের অনুরোধ রইলো।'

ফরমান তার বইয়ের ১৩০ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত বার্তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে 'দ্রুত অনুমোদনের অনুরোধ রইলো' বাক্যটি বাদ দিয়েছেন। এতেই তার দুষ্ট বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কার্যত তিনি প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতে চাননি। এ বাক্য এড়িয়ে যাওয়ায় এটা নিঃসন্দেহ যে, তিনি আমাকে এবং গভর্নর উভয়কে অমান্য করেছেন। এ বার্তায় দু'বার প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রথমে বার্তার শুরুতে এবং আবার শেষে। আরো উল্লেখযোগ্য যে, কবে, কখন ও কোথায় এ বার্তা তৈরি করা হয় ফরমান তাও এড়িয়ে গেছেন। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। এ বার্তা টাইপ করা হয় গভর্নর হাউসে এবং সই করেন ফরমান নিজে। ফরমান পাঠক এবং এমনকি হামুদুর রহমান কমিশনকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন যে, সেনাবাহিনীর যোগাযোগের জন্য যে বার্তায় প্রতিস্বাক্ষর দেয়ার প্রয়োজন ছিল। তার এ যুক্তি ভুল। আমাদের বার্তা বা সংকেতগুলোতে প্রতিস্বাক্ষর নয়, সই দিতে হয়। প্রতিস্বাক্ষরের রীতি চালু রয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীতে। এছাড়া, ঊর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে সামরিক বাহিনীর যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। চিফ সেক্রেটারি তাতে সই করতে পারতেন। ফরমান এও বলেছেন যে, আমার সঙ্গে দেখা করে ফেরার পর পল হেনরি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কেন? মনে হচ্ছে পল হেনরিকে আগেই জানানো হয়েছিল যে, তার কাছে ফরমান বার্তা নিয়ে আসছেন। এ কথা কেউ বিশ্বাস করবেন না যে, গভর্নর প্রেসিডেন্টের সম্মতির অপেক্ষা না করে সরাসরি পল হেনরির কাছে বার্তা হস্তান্তরের জন্য ফরমানকে বলতে পারেন। কারণ গভর্নর নিজেই বার্তায় লিখেছিলেন, 'প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের পর'। এটা কেমন কথা যে, সেনাবাহিনীর গোপন কোড লংঘন করে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ছাড়া একজন অননুমোদিত ব্যক্তির কাছে একটি অতি গোপনীয় বার্তা হস্তান্তর করা হলো এবং ওই অননুমোদিত ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ বার্তাটি জাতিসংঘে পাঠিয়ে দিলেন?

এ বার্তা প্রচার করা হলে আমি গভর্নরের কাছে টেলিফোন করি। তিনি তখন বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন, তিনি তখনো প্রেসিডেন্টের অনুমোদন পাননি। আমি সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তবে তাকে পাওয়া

যায়নি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করাও ছিল অসম্ভব। প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘে প্রেরিত বার্তা বাতিল করে দেন। (আমি প্রেসিডেন্টের বার্তার কোনো কপি পাইনি) পরে রেডিও সম্প্রচারে ফরমানকে দোষারোপ করা হয় এবং সরকারের তরফ থেকে বলা হয়, জাতিসংঘে এ বার্তা পাঠানোর ব্যাপারে ফরমানের কোনো অনুমতি ছিল না। কারণ এ জন্য প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। তখনো এ অনুমোদন দেয়া হয়নি। অতএব পল হেনরির কাছে প্রেরিত বার্তা অননুমোদিত এবং এটা একটা বিপজ্জনক কাজ। প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ছাড়া গভর্নর অথবা আমি কেউই এ বার্তা জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করতে পারতাম না। ফরমান কেন প্রেসিডেন্টের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করেন নি? এত তাড়াহুড়োর কারণ কি? তিনি তার বইয়ের ১৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

'অন্যান্যদের দোষারোপ করা এবং ক্ষমতায় থাকা ছিল এ পরিকল্পনার লক্ষ্য। যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারছিল না তাদের প্রতি জাতির ক্রোধকে ধাবিত করার এটা ছিল একটি নীচ ও নিষ্ঠুর অভিযান। তাদের নিজেদের অপকর্ম ও অশুভ অভিপ্রায় আড়াল করার জন্য এ গোটা নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।'

ফরমান তার নিজের কূটচাল ও ষড়যন্ত্রের জালে ধরা পড়ে যাচ্ছিলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সংকেতগুলো ছিল অস্পষ্ট এবং তাতে থাকতো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি যাতে আমাকে দোষারোপ করা যেতে পারে।

জাতিসংঘে পাঠানো বার্তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানে মর্মান্তিক পরিণতি ডেকে আনে। অধিকাংশ স্থানে সৈন্যরা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাণপণ লড়াই করছিল। কিন্তু জাতিসংঘে এ বার্তা পাঠানোর পর আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে তা প্রচার করা হয়। এতে লড়াইয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কারণ যুদ্ধবিরতি আসন্ন দেখে সৈন্যরা জীবন দিয়ে লড়াই করার মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ বার্তা বাতিল করার পর সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। মনস্তাত্ত্বিক আঘাত সামলানো হয়। আমার ডিভিশনাল কমান্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরিস্থিতির সর্বশেষ রিপোর্ট সম্পর্কে আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও সেনাবাহিনী প্রধানকে অবহিত করতাম। প্রতিটি রিপোর্টে আমি শেষ বুলেট ও শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করার দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করি। ১০ ডিসেম্বরের পরও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাদেরকে এমন কোনো ইঙ্গিত দেয়নি যে, ঢাকার পতন ঘটতে যাচ্ছে অথবা আমরা ঢাকার আশপাশে লড়াই চালিয়ে যেতে অসমর্থ। ১৩ ডিসেম্বর ভারতের হেলিকপ্টারবাহিত ছত্রী সৈন্যরা ঢাকার প্রতিরক্ষা লাইনের কাছাকাছি পৌঁছলেও ঢাকায় হামলা করতে তাদের কমপক্ষে দু'সপ্তাহ সময় নিতে হতো। কারণ তখনো তাদের যোগাযোগ লাইন এবং ঢাকা অভিমুখী সরবরাহ পথগুলো ছিল বিভিন্ন জায়গায় অবরুদ্ধ। শত্রুর এগিয়ে আসার একমাত্র রুট ছিল তুরা-ময়মনসিংহ-

টাঙ্গাইল। তখনো ঢাকা রক্ষায় সব মিলিয়ে আমার কাছে ৩১ হাজার সৈন্য ছিল। উর্দুভাষী পূর্ব পাকিস্তানি ও অনুগত বাঙালিরাও ছিল সশস্ত্র। সুরক্ষিত এলাকায় লড়াই করার জন্য সকল প্রস্তুতি ছিল সম্পন্ন। এ আত্মবিশ্বাস থেকে আমি বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতিতে বলেছিলাম, 'ঢাকা দখল করতে হলে ভারতীয় ট্যাংককে আমার বুকের ওপর দিয়ে যেতে হবে।' একই আত্মবিশ্বাস থেকে আমি ১৩ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটায় জি-১২৮২ নং বার্তায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে আশ্বাস দিয়েছিলাম, 'ঢাকা প্রতিরক্ষা দুর্গ পুরোপুরি সুসংগঠিত এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' ১৩ ডিসেম্বর রাত ১০টায় জি-১২৮৬ নং বার্তায় আরো বলেছিলাম, 'চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য সুরক্ষিত এলাকায় এগিয়ে যাচ্ছি।' তবে এ কথা সত্য যে, ঢাকায় আসন্ন লড়াইয়ের মুখে অফিসারদের মধ্যে কেউ কেউ সামান্য ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

১২ ডিসেম্বর চিফ অব জেনারেল স্টাফ গুল হাসান আমাকে টেলিফোন করে পশতু ভাষায় বলেন, উত্তর দিক থেকে পীত এবং দক্ষিণ দিক থেকে শ্বেতাঙ্গরা এগিয়ে আসছে (সম্ভাব্য চীন ও মার্কিন সহায়তাকে বুঝাতে তিনি প্রতীকী ভাষা ব্যবহার করেন)। সিজিএস আমাকে কেন ধোকা দিলেন আমি তা বুঝতে পারিনি। তবে মনে হচ্ছিল বিপর্যয়ের জন্য আমাকে দোষারোপ করার পরিকল্পনা থেকেই এরূপ ধোকা দেয়া হয়।

১১ ডিসেম্বর বেসামরিক কর্মকর্তাগণ গভর্নর হাউসে ওঠেন। তারা বেসামরিক প্রশাসনকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করেন। প্রচণ্ড প্রতিকূলতা ও বৈরি পরিস্থিতিতে তারা দ্বিরুক্তি না করে তাদের কর্মস্থলে কাজ চালিয়ে গেছেন। তারা তাদের জীবনের ওপর বিরাট ঝুঁকি নিয়েছেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সকল কষ্ট বরণ করেছেন।

১৩ ডিসেম্বর ভোর সাড়ে ৭টায় ফরমান রেডক্রস ও জাতিসংঘ ত্রাণ কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তার বইয়ে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে একটি আন্তর্জাতিক অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার জন্য রেডক্রসকে অনুরোধ করেন এবং এ ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রে স্বাক্ষর করেন। তিনি গভর্নর এবং আমার উভয়ের অনুমোদন ছাড়াই এ কাজ করেছিলেন। তিনি তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার প্রয়োজনবোধ করেননি। তিনি এমনভাবে কাজ করছিলেন যেন তিনি গভর্নর এবং ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার দুটিই। আমাদের বেসামরিক কর্মকর্তাগণ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ওঠেন। ঢাকায় কার্ফ্যু জারি করা হয়।

ফরমান আরেকটি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন যে, আমি নাকি গভর্নর হাউস থেকে যুদ্ধবিরতির একটি বার্তা পাঠাতে চেয়েছি। আমি নাকি আমার সৈন্যদের তা

জানাতে চাইনি। ফরমান একটি স্ববিরোধী কথা বলেছেন। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, এ ধরনের একটি বার্তা গভর্নর হাউসে না গিয়ে সেনাবাহিনীর কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই পাঠানো যেত এবং কোনো না কোনোভাবে সৈন্যরা তা জানতো। প্রকৃতপক্ষে, আমার বার্তায় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করার কৃতসংকল্পই ব্যক্ত করেছি।

১৩ ডিসেম্বর ভোরে ভারতীয় বিমান বাহিনী গভর্নর হাউসে বোমাবর্ষণ করে। সাড়ে ১২টার দিকে গভর্নর আমাকে জানান যে, প্রেসিডেন্ট তার কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি পদত্যাগ করছেন। তখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য গভর্নর প্রেসিডেন্টের ওপর প্রবল চাপ দিচ্ছেন। অতঃপর আমি ১৩, ১৫, ৩০ ডিসেম্বর জি-১২৮২ নং বার্তায় ঢাকা রক্ষায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করি। এতে আমি বলেছি :

'আলফা। মাতুয়াইলে শত্রু অবস্থান সুদৃঢ় করছে এবং হেলিকপ্টার যোগে সৈন্য পরিবহন অব্যাহত রয়েছে। শত্রুরা মাতুয়াইল-ডেমরা সড়ক বরাবর অগ্রসর হচ্ছে। ব্র্যাভো। ছত্রীসেনাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের অপেক্ষায়। চার্লি। দাউদকান্দিতে শত্রুর আগমনের খবর পাওয়া গেছে এবং নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণেও দুটি হেলিকপ্টার অবতরণ করেছ। বিস্তারিত জানার অপেক্ষায়। ডেল্টা। শত্রু ঢাকা দখলের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছে। ঢাকা প্রতিরক্ষা দুর্গ সংগঠিত এবং লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

পশ্চিম রণাঙ্গনেও পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ করা হয়নি। সর্বত্রই ছিল অস্বস্তি ও হতাশা। ১৯৬৫ এর চেতনা কোথাও দেখা যায়নি। পশ্চিম রণাঙ্গনে সেনাবাহিনী সাড়ে ৫ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড হারায়। আমার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী সেনাবাহিনী প্রধানের একান্ত সচিব ব্রিগেডিয়ার আমির গুলিস্তান জানজুয়ার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। চিফ অব জেনারেল স্টাফ থেকে শুরু করে মিলিটারি অপারেশনের অধিদপ্তর পর্যন্ত কারো কোনো সন্তোষজনক তৎপরতা অথবা নিকনির্দেশনা ছিল না। মিলিটারি অপারেশনের ডিরেক্টর একবারের জন্যও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এ জন্য আমাদের যোগাযোগ ছিল ব্রিগেডিয়ার জানজুয়া পর্যন্ত। ব্রিগেডিয়ার জানজুয়া খুবই সহায়ক ছিলেন। শুরুতে তিনি আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে লড়াইয়ের কয়েকদিন পর তিনি আমার চিফ অব স্টাফকে জানান যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ ব্যর্থ হয়েছে। সাজোয়া বাহিনীতে শ্রেষ্ঠত্ব এবং পদাতিক বাহিনীতে সমতা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তান ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতা অপ্রত্যাশিত এবং সামরিক দিক থেকে ক্ষমার অযোগ্য।

আমার বার্তা পাঠানোর কয়েক ঘণ্টার পর ১৯৭১-এর ১৩/১৪ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে ব্রিগেডিয়ার জানজুয়া আমার চিফ অব স্টাফের কাছে টেলিফোন

করেন এবং তাকে সতর্ক করে দেন যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠানো হচ্ছে। মধ্যরাতে এ বার্তা এসে পৌঁছে। এতে বলা হয় :

'প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে গভর্নর ও জেনারেল নিয়াজির জন্য। গভর্নরের বার্তার জবাবে। বিরাট প্রতিকূলতার মুখে আপনারা বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছেন। আপনাদের জন্য জাতি গর্বিত এবং গোটা বিশ্ব আপনাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করছে। এ সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করতে মানুষের পক্ষে যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব আমি ততটুকু চেষ্টা করেছি। আপনারা বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে রয়েছেন যেখান থেকে মানুষের পক্ষে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব এবং প্রতিরোধ হবে নিষ্ফল। এতে শুধু আরো প্রাণহানি ও সম্পদের ধ্বংসই হবে। এখন আপনাদেরকে লড়াই বন্ধ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য, পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক লোকজন ও সকল অনুগত নাগরিকের জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এদিকে, আমি পূর্ব পাকিস্তানে অবিলম্বে লড়াই বন্ধে ভারতকে অনুরোধ জানাতে এবং সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য লোকজন যারা দুষ্কৃতকারীদের হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে, তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদানে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়েছি।'

১৩ ডিসেম্বর গর্ভনরের পক্ষ থেকে পাঠানো জরুরি বার্তা সম্পর্কে আমি ছিলাম অনবহিত। গভর্নর অথবা ফরমান কেউই আমাকে এ ব্যাপারে জানায়নি। মনে হয় এ বার্তায় প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ভয়ংকর ধারণা দেয়া হয়। প্রেসিডেন্টের বার্তায় তাই প্রমাণিত হয়েছে। এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আনক্লাসিফাইড বার্তা হিসেবে পাঠানোর জন্য আমি বিস্মিত হই। এটা কি ষড়যন্ত্রের কোনো অংশ ছিল? আমার ধারণা, এ বার্তা ভারতীয়দের হাতেও পড়েছে।

আমাদের প্রথম ধারণা হয় যে, এটি একটি ভারতীয় চক্রান্ত। সুতরাং আমি এর সত্যতা এবং এর প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই। প্রথম কারণ হচ্ছে, আমি একটি আলাদা দেশে একটি স্বতন্ত্র সেনাবাহিনীর কমান্ডার হিসেবে একটি বিচ্ছিন্ন লড়াই করছিলাম না। সুতরাং আমি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ও যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী সম্পর্কে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সার্বিক পরিকল্পনা জানতে চাই। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমাকে আমার স্বতন্ত্র যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করতে হলে তা একটি শক্তিশালী অবস্থান থেকে সম্ভব নয়। তা হবে আত্মসমর্পণের শামিল।

এরপর আমার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির ব্রিগেডিয়ার জানজুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ব্রিগেডিয়ার জানজুয়া জানান যে, গভর্নরের বার্তাটি আনক্লাসিফাইড অবস্থায় পাঠানো হয়। আমরা প্রেসিডেন্টের বার্তার শেষাংশটি পরিষ্কার করে বলার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে অনুরোধ করি এবং টেলিফোনে সিজিএস ও সিওএস (সেনাবাহিনী প্রধান) এর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। প্রেসিডেন্টের বার্তা পাওয়ার ৯ ঘণ্টা পর ১৪ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে

আমি সিজিএস লে. জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাঁকে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি আমার কাছে জানতে চান আমি কোন্ বার্তা এবং কিসের যুদ্ধ বিরতির কথা বলছি। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলার পর তিনি জবাব দেন যে, তিনি এসব কিছুই জানেন না। তিনি তখন আমাকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে পরামর্শ দেন।

সেদিন সকাল সকাল গভর্নর এ এম মালিক প্রেসিডেন্টের নির্দেশ সম্পর্কে টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেন। আমি তাকে জানালাম যে, আমি প্রেসিডেন্টের বার্তা সম্পর্কে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছি। তিনি আমার কাছে জানতে চান আমি যুদ্ধ বন্ধে রাজি কিনা। জবাবে আমি তাকে জানাই যে, যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সকল অভিপ্রায় আমার রয়েছে। সেদিন বিকেলে আমি গভর্নরের পদত্যাগ করার খবর পাই। গভর্নরের পদত্যাগের পর তার সরকারি বাসভবনে বোমাবর্ষণ করা হয়। গভর্নর একই দিন গভর্নর হাউস ত্যাগ করেন। ১৫ ডিসেম্বর তিনি আমাকে নিম্নোক্ত পত্র লেখেন :

প্রিয় নিয়াজি,

আমি জানতে চাই, প্রেসিডেন্ট আপনাকে এবং গভর্নর হিসেবে আমার কাছে ১৪.১২.৭১ তারিখ পাক আর্মি সিগনাল নং ০০১৩-এ যে বার্তা পাঠিয়েছেন সে ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিনা। এ বার্তায় আপনাকে পরিষ্কারভাবে যুদ্ধ বন্ধ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য, পশ্চিম পাকিস্তানি সকল বেসামরিক লোকজন ও সকল অনুগত বাঙালিদের জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ বার্তায় আরো বলা হয়েছে যে, 'আপনি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছেন যেখান থেকে মানুষের পক্ষে কোনো প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব এবং প্রতিরোধ হবে নিষ্ফল।' যুদ্ধ চলছে এবং প্রাণহানি ও বিপর্যয় অব্যাহত রয়েছে। আমি আপনাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।'

আপনার বিশ্বস্ত,
এ এম মালিক

১৪ ডিসেম্বর সিজিএস-এর সঙ্গে কথা বলার পর আমি ১৫ ডিসেম্বর সকাল ৯টা ১০ মিনিটে আমার যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে একটি বার্তা পাঠাই। আমি প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে যেগাযোগ করার চেষ্টা করি। সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদ প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইতোমধ্যে মালিক সম্ভবত প্রেসিডেন্টের

নির্দেশ পালনে আমার অনিচ্ছার কথা তাকে জানিয়েছেন। জেনারেল হামিদের সঙ্গে আলাপ করে আমার এ বিশ্বাস জন্ম নেয়। আমি আমার চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকিরকে জেনারেল হামিদের বক্তব্য শোনায় এবং তা নোট করতে বলি। জেনারেল হামিদ আমাকে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে বলেন। তিনি আমাকে যুদ্ধ বন্ধ এবং ঢাকায় আমার জানাশোনা একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেন। আমি এ নির্দেশ মেনে নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করি। আমার অনমনীয় মনোভাব দেখে তিনি তিন/চার বার একই নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিপন্ন, পরিস্থিতি খারাপ এবং আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। জেনারেল হামিদ আমাকে জানান যে, তিনি বাথরুমে আছেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রেসিডেন্ট বাথরুমে ছিলেন না। অতিরিক্ত মাতাল হওয়ায় তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এয়ার মার্শাল রহিম খান আমার সঙ্গে কথা বলেন। তাকেও মাতাল মনে হলো। রহিম খান আমাকে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ মেনে নিতে পীড়াপীড়ি করেন।

একজন সৈনিক হিসেবে আমি নির্দেশ পালনে বিশ্বাস করতাম। সেনাবাহিনী প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান আমাকে বারবার প্রেসিডেন্টের নির্দেশ মেনে নিতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে চাপ দেন। অগত্যা আত্মসমর্পণে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ প্রাপ্তির ১৮ ঘণ্টা পর আমি আমেরিকান কন্সাল-জেনারেলের কাছে হাজির হই। জেনারেল ফরমান আমাকে রুশ চ্যানেল ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। নিম্নলিখিত শর্তাবলীর আওতায় একটি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে আমি ভারতীয় সি-ইন-সি'র কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করি :

ক) প্রতিপক্ষ বাহিনীর কমান্ডারদের পারস্পরিক সম্মতিতে নির্দিষ্ট এলাকায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর রিগ্রুপিং-এর ব্যবস্থা।

খ) সকল সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

গ) ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী সকল লোকজনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

ঘ) ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে প্রশাসনকে সহায়তাদানকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

এসব শর্তের অধীনে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী সকল ধরনের সামরিক তৎপরতা থেকে বিরত হবে।

এ প্রস্তাবের একটি কপি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে পাঠানো হয়। আমি তখনো আত্মসমর্পণ করার জন্য ফরমেশনগুলোতে নির্দেশ পাঠাইনি। কারণ ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান আমার শর্তে সম্মত না হলে আমি লড়াই চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলাম।

১৯৭১-এর ১৫ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ১১টায় আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ'র জবাব পাই। নিচে তার জবাব দেয়া হলো। তিনি যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত আমার বার্তা প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেন। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলেন যে, জেনারেল ফরমান আলীর কাছে তিনি ইতিপূর্বে যে দুটি বার্তা পাঠিয়েছেন সেসব বার্তার আলোকেই আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। জেনারেল মানেকশ'র সঙ্গে ফরমানের যোগাযোগের কথা আমি জানতাম না। আমি এটাও জানতাম না তিনি কেন, কিভাবে এবং কার নির্দেশে সরাসরি মানেকশ'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

'ভারতের চিফ অভ স্টাফ জেনারেল স্যাম মানেকশ'র পক্ষ থেকে লে. জেনারেল নিয়াজির প্রতি।

প্রথমত, আমি নয়াদিল্লীতে মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে আজ গ্রিনিচ সময় ১৪৩০ ঘণ্টায় বাংলাদেশে যুদ্ধ বিরতিতে আপনার বার্তা পেয়েছি।

দ্বিতীয়ত, আমি ইতিপূর্বে প্রেরিত দুটি বার্তায় জেনারেল ফরমানকে জানিয়েছি যে, বাংলাদেশে আমার কাছে আত্মসমর্পণকারী (ক) আপনার সকল সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং (খ) বিদেশি নাগরিক, জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সকল লোকজনকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। আপনি লড়াই বন্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমি আশা করছি আপনি বাংলাদেশে আপনার কমান্ডের আওতায় সকল বাহিনীকে অবিলম্বে লড়াই বন্ধ এবং আমার অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করার জন্য নির্দেশ জারি করবেন।

তৃতীয়ত, আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের প্রতি সৈনিক হিসেবে প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং আমি জেনেভা কনভেনশন মেনে চলব। এছাড়া, আপনার যেসব আহত সৈনিক রয়েছে তাদের সুচিকিৎসা করা হবে এবং নিহতদের যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাহিত করা হবে। কে কোথা থেকে এসেছে তাতে কিছু যায় আসে না। কারো নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার কমান্ডের আওতায় কোনো বাহিনী কারো ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে না।

চতুর্থত, আপনার কাছ থেকে ইতিবাচক জবাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার বাহিনীর বিরুদ্ধে সব বিমান ও স্থল হামলা থেকে বিরত হতে ইস্টার্ন কমান্ডে ভারতীয় ও বাংলাদেশ বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল অরোরাকে নির্দেশ দেব। আমার সততার নিদর্শন হিসেবে আমি আজ গ্রিনিচ সময় ১৭০০ ঘণ্টা থেকে ঢাকায় বিমান হামলা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছি।

পঞ্চমত, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার সৈন্যদের অযথা

প্রাণহানি ঘটানোর কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। কারণ আমি প্রাণহানিকে ঘৃণা করি। তবে আমি যেসব শর্ত দিয়েছি আপনি তাতে সম্মত না হলে ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় ০৯০০ ঘণ্টায় সর্বশক্তিতে পুনরায় লড়াই শুরু করা ছাড়া আমার আর কোনো বিকল্প থাকবে না।

ষষ্ঠত, আলোচনা এবং দ্রুত সকল বিষয় চূড়ান্ত করার স্বার্থে আমি আজ ১৫ ডিসেম্বর ভারতীয় সময় ১৭০০ ঘণ্টা থেকে একটি রেডিও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছি। দিনে এ ফ্রিকোয়েন্সি হবে ৬৬০৫ (৬৬০৫) কিলোহার্টজ এবং রাতে ৩২১৬ (৩২১৬) কিলোহার্টজ ও ঢ্যাক (ঢাকা)। আমি আশা করছি আপনি আপনার সিগনালারদের অবিলম্বে মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন পুনঃপ্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেবেন।'

আমি জেনারেল মানেকশ'র জবাবের একটি কপি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে পাঠাই এবং ১৫ ডিসেম্বর সেনাবাহিনী প্রধানের কাছ থেকে একটি সংকেত পাই। এতে আমাকে মানেকশ'র শর্তে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেয়া হয়।

ফরমান হচ্ছেন নিঃসন্দেহে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে জন্য তিনি স্যাম মানেকশ'র সঙ্গে তার গোপন বার্তা বিনিময়ের ঘটনা সম্পর্কে লোকজনকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তার বইয়ে লিখেছেন যে, বিবিসি'র খবরে বলা হয় যে, আমি নাকি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেছি এবং তিনি (ফরমান) দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ভারতীয়রা জানতো যে, আমি ঢাকায় অবস্থান করছি এবং কমান্ডেও রয়েছি। গভর্নর পদত্যাগ করা নাগাদ আমি নিয়মিত তার দপ্তরে গিয়েছি।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে গভর্নর হাউসে আসা-যাওয়ার রুট হচ্ছে শহরের কেন্দ্রস্থল বরাবর। আমি প্রতিদিন এ রুটে আসা-যাওয়া করেছি। প্রত্যেকে আমাকে দেখেছে। এছাড়া, আমি ঢাকার আশপাশের ইউনিটগুলো পরিদর্শন করেছি এবং অধিকাংশ সময় ৬ এলএএ রেজিমেন্টে কাটিয়েছি। এ রেজিমেন্ট রেকর্ডসংখ্যক শত্রু বিমান ভূপাতিত করেছে। আমি বেশ কয়েকটি সাংবাদিক সম্মেলন করেছি। ১৩ ডিসেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিন্টোলে বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছি যে, 'ভারতীয় ট্যাংককে ঢাকায় আসতে হলে আমার বুকের ওপর দিয়ে আসতে হবে।' ১৪ ডিসেম্বর আমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিয়ে বেসামরিক অফিসারদের ক্যান্টনমেন্টে শিফট করানোর চেষ্টা করি। ফরমান তার বইয়ে বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এখনো মনে করেন যে, ভারতীয়রা বিবিসির ভুয়া খবর বিশ্বাস করার মতো বোকা। ফরমান জানতেন যে, আমি ঢাকায় অবস্থান করছি। সুতরাং আমার কাছে মানেকশ'র বার্তা পৌঁছানো তার উচিত ছিল। এ ব্যাপারে তার গোপনীয়তা গুরুতর সন্দেহের উদ্রেক করে।

১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি

ভারতীয়রা একটি ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক লড়াই শুরু করেছিল। ৫ ডিসেম্বর থেকে তারা অল-ইন্ডিয়া রেডিও, বিবিসি, প্রচারপত্র ও স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে গুজব রটনা করছিল। জেনারেল মানেকশ'র বার্তা সকল সৈন্য, অফিসার ও কমান্ডারদের মধ্যে ছড়ানো হয় এবং তাদেরকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হয়। সকল এলাকায় ইউনিটগুলোতে লিফলেট নিক্ষেপ করা হয়।

ফরমান তার বইয়ের ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

'১১ ডিসেম্বর সকালে সোভিয়েত কন্সাল জেনারেল মি. পোপাস আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি বলেন, গভর্নরের বার্তায় যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তার সরকারের কাছে তা গ্রহণযোগ্য।'

পরবর্তী অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছেন যে, ১১ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় জেনারেল পীরজাদা তাকে টেলিফোন করেন এবং বলেন যে, সামান্য রদবদল করে গভর্নরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে এবং সংশোধিত খসড়া তার কাছে পাঠানো হচ্ছে। এ খসড়া তার কাছে এসে পৌঁছলে তিনি দেখতে পান যে, রাজনৈতিক সমাধান সম্বলিত অনুচ্ছেদটি কেটে দেয়া হয়েছে। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রেসিডেন্টের সম্মতি প্রদানের অপেক্ষা না করে গভর্নরের বার্তা জাতিসংঘ প্রতিনিধি ও রুশদের কাছে দিয়েছিলেন।

এটা সুবিদিত ছিল যে, রুশরা খোলাখুলিভাবে ভারতীয়দের তথ্য সরবরাহ করছিল এবং তাদের কাছে সর্বাধুনিক বোমাও সরবরাহ করছিল। রাশিয়ার সরবরাহকৃত বোমার সাহায্যে আমাদের বিমান ঘাঁটির অপূরণীয় ক্ষতি করা হয়। এছাড়া, রুশ পাইলটরা ভারতীয়দের সঙ্গে বিমান হামলায় অংশ নিচ্ছিল এবং রুশ বিশেষজ্ঞরা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে কাজ করছিল। স্বয়ং রুশ উপমন্ত্রী ভারতের অপারেশন রুমে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতের প্রতি এত মমত্ব সত্ত্বেও ফরমানের সঙ্গে ছিল রুশদের উষ্ণ সম্পর্ক।

সোভিয়েত কন্সাল-জেনারেল মি. পোপাসের সঙ্গে তার আলোচনা সম্পর্কে ফরমান লিখেছেন :

'এরপর তিনি বললেন : 'আমি কি আপনাকে একটি ব্যক্তিগত পরামর্শ দিতে পারি? মুক্তিবাহিনী আপনাকে হত্যা করতে যাচ্ছে। আমি আপনার জন্য একটি বিশেষ কক্ষ তৈরি করেছি। আসুন এবং সেখানে থাকুন। আমরা আপনাকে নিরাপদে ঢাকার বাইরে নিয়ে যাব।'

এ সময় আমি পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার লক্ষ্যে মি. মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দানের পরামর্শ দিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে আরেকটি বার্তা পাঠাই। আমার চিফ অভ স্টাফ ব্রিগেডয়ার বাকির সিদ্দিকী জেনারেল পীরজাদার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। ব্রিগেডিয়ার ইজাজ আজিম তাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে জানান যে, প্রেসিডেন্ট ঐ বার্তায় এনএফএ (নো ফার্দার এ্যাকশন) লিখেছেন।

ভারত থেকে ফিরে আসার পর রিপোর্ট তৈরি এবং হামুদুর রহমান কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দানের জন্য এ বার্তা এবং গভর্নর ও আমি অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠিয়েছিলাম সেগুলো সরবরাহ করার জন্য আবেদন করি। তখন আমাকে জানানো হয় যে, এগুলো জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে রয়েছে এবং তার কাছে আমাকে নিজে এগুলো চাইতে হবে। এসব বার্তা আমাকে কখনো দেয়া হয়নি।

১৫/১৬ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে আমি আমাদের হেলিকপ্টারগুলোকে বার্মা চলে যাবার নির্দেশ দেই। জেনারেল রহিম খানকে হেলিকপ্টারে করে বার্মা নিয়ে যাবার ব্যাপারে কয়েকজন স্বার্থপর ব্যক্তি বিতর্ক তোলেন। জেনারেল রহিম চতুর্দশ ডিভিশনের জিওসি হিসেবে বিদ্রোহী তৎপরতা চলাকালে খুবই প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাকে হিলাল-ই-জুরাত পদকে ভূষিত করা হয়। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি চাঁদপুরে একটি এডহক ডিভিশনের নেতৃত্ব দেন। শত্রুরা নিকটবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে এগিয়ে এলে এবং তার সদর দপ্তরের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করলে তাকে ঢাকার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে তার নির্দিষ্ট অবস্থানে পিছু হটার নির্দেশ দেয়া হয়। চাঁদপুর থেকে পিছু হটার সময় তার কয়েকটি ফেরি চরে আটকে যায়। ফলে তার পশ্চাদপসরণ বিলম্বিত হয়। নারায়ণগঞ্জের দিকে পিছু হটার সময় তাদের ওপর ভারতীয় বিমান হামলা হয়। জেনারেল রহিমের হেড কোয়ার্টার্স সম্বলিত নৌযান নিমজ্জিত হয়। এ ঘটনায় আমাদেরকে প্রচুর সৈন্য ও অফিসার হারাতে হয়। মেজর জেনারেল রহিম নিজেও আহত হন। তাকে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে আনা হয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পৌঁছানোর জন্য আমার ব্যক্তিগত নির্দেশে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। জেনারেল রহিমকে যেসব কাগজপত্র দিয়ে পাঠানো হয়েছিল সেগুলো পরে ভুট্টোর হস্তগত হয়। কিন্তু এসব কাগজপত্র আর কখনো পাওয়া যায়নি।

নার্সদের জন্য পৃথক হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়। অন্ধকারে নার্সরা বুল হেলিপ্যাডে পৌঁছে। তারা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। তাদের আসন শূন্য থাকে এবং হেলিকপ্টারগুলো তাদেরকে পেছনে রেখেই বার্মা চলে যায়।

মেজর জেনারেল ফরমান বার বার বলছিলেন যে, ১৫/১৬ ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে তাকে বার্মায় অথবা পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নেয়া উচিত ছিল। কারণ বাঙালি ও বুদ্ধিজীবীদের কথিত হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্য মুক্তিবাহিনী তাকে হত্যা করবে। তার মুখ মলিন হয়ে গিয়েছিল এবং তার স্ট্রোক করার মতো অবস্থা হয়েছিল। আমি তাকে কসম খেয়ে কথা দিই যে, আমার নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয়দের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবো। ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর উপর্যুপরি দাবি সত্ত্বেও আমি কাউকে ফরমানের গায়ে আঁচড় কাটতে দেইনি। আশা করি তিনি এ কথা স্বীকার করবেন।

পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, যুদ্ধের শেষদিকে নিম্নোক্ত এলাকাগুলো ছিল তখনো আমার নিয়ন্ত্রেণে। এগুলো হচ্ছে :

ক) (১) দিনাজপুর-রংপুর, সৈয়দপুর, বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, বেড়া এবং অধিকাংশ ফেরিঘাট।

(২) চালনা, খুলনা ও ফরিদপুর এলাকা।

(৩) ভৈরব বাজার, সিলেট ও ময়নামতি (কুমিল্লা)।

(৪) চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ, নোয়াখালী।

খ) মির্জাপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জভিত্তিক ঢাকা ত্রিভুজ।

গ) সাভার-মিরপুর, টঙ্গী, দেওড়া ও নারায়ণগঞ্জ।

ঘ) ক্যান্টনমেন্ট ও শহরের সুরক্ষিত এলাকা।

আমি কখনো কোনো সময় আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা, ইঙ্গিত অথবা আহ্বান জানাইনি। আমার গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলো শেষ রক্তবিন্দু ও শেষ বুলেট দিয়ে লড়াই অব্যাহত রাখবো– এ কথা উল্লেখ করে শেষ করা হতো। গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্সে ইস্টার্ন কমান্ডের সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েও এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমি লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে প্রেরিত প্রতিটি বার্তায় আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

হেনরি কিসিঞ্জার বলেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার কোনো প্রশ্নই ছিল না। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও আমি উভয়ে কয়েকমাস ধরে উপলব্ধি করেছি যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অনিবার্য।' তিনি আরো বলেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় দখলদারিত্বকে আমরা একটি অনিবার্য ঘটনা হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে হামলা থেকে রক্ষা করা।' ভারতীয়রা পশ্চিম রণাঙ্গনে শকরগড় দখল করে নেয়। তারা গুজরানওয়ালা-ওয়াজিরাবাদের দিকে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়। ভারতীয়রা মারালা হেড ওয়ার্কস থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ছিল এবং পাকিস্তানের অর্থনীতি ও অবকাঠামো ধ্বংসে উদ্যত হয়। আমি এসব ঘটনা জেনে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিই এবং আত্মসমর্পণের গ্লানি বরণ করি। আমার আত্মসমর্পণে সকল পক্ষ–মুজিব, ভুট্টো, ভারতীয়, আমেরিকান ও রুশরা সন্তুষ্ট হয়।

মতিউর রহমান ও ওয়াসিম হাসান 'আয়রন বারস্ অভ ফ্রিডম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বেশ কয়েকটি বন্ধুদেশ ভারতকে তার সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসনে সহায়তা দিয়েছে। এসব দেশের মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এরপর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ছোট ছোট দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসরাইল ও আফগানিস্তান। এসব দেশ সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র করেছে।' ফরাসি লেখক বি এইচ লেভি

যথার্থই বলেছেন, 'ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়। চক্রান্ত আঁটা হয়। পাকিস্তানকে মরতেই হবে। কারণ বৃহৎ শক্তিগুলো পাকিস্তানকে সর্বসম্মতিক্রমে বধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' ড. সফদর মাহমুদ লেভির উদ্ধৃতি দিয়ে তার বইয়ে লিখেছেন, 'ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে পাকিস্তান ভাঙার পরিকল্পনা হয়।'

সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের সহযোগিতা ছাড়া বহিঃশক্তি একটি দেশ ভেঙে দিতে পারে না। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তবে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ইয়াহিয়ার ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার অভিপ্রায়, ভুট্টোর বিশ্বাসঘাতকতা এবং ক্ষমতার অন্বেষণে মুজিবের সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডই হচ্ছে এ বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী।

ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে ইস্টার্ন গ্যারিসনকে একটি দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমাকে বানানো হয় কুরবানীর ভেড়া। পূর্ব পাকিস্তানে আমার অবস্থার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের প্যাসিফিক কমান্ডের তুলনা করা যেতে পারে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলে জাপানকে রক্ষায় নৌ ও বিমান সহায়তা থাকা সত্ত্বেও ৫৮ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে বিনা শর্তে জাপানি প্যাসিফিক কমান্ড আত্মসমর্পণ করে।

ঢাকার সর্বশেষ কমিশনার সৈয়দ আলমগীর রাজা তার 'ঢাকা ডিবাক্‌ল' নামে বইয়ে লিখেছেন, 'তিনি শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করতে চেয়েছিলেন।' জনাব রাজা 'তিনি' বলতে আমাকে, জেনারেল নিয়াজিকে বুঝাতে চেয়েছেন।

নোট

১। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে মদ্যপ বলায় আমি ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে রুশ কন্সাল-জেনারেল মি. পোপাসকে এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেছিলাম। অধিকাংশ কূটনীতিক তাদের আসন ছেড়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়ান। এমন সময় কে একজন বললেন, 'খুব হয়েছে জেনারেল, এখন ব্যাপারটি ভুলে যান। সব মীমাংসা হয়ে গেছে।' আমার মনে হয় আমাকে এ কথা বলে শান্ত করেছিলেন মার্কিন কন্সাল-জেনারেল। আমাদের প্রতি রুশদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব তুলে ধরার জন্যই আমি এ ঘটনার উল্লেখ করছি। কিন্তু আশ্চর্য, এই রুশরা ছিল ফরমানের বন্ধু।

অধ্যায় ১২

ঢাকা বৃত্ত সম্পর্কে ভুল ধারণা ও ভারতীয় পরিকল্পনা

ঢাকা বৃত্ত সম্পর্কে ভুল ধারণা

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী ঢাকার নিচে একত্রিত হয়েছে এবং এগুলো গঠন করেছেএকটি অসম ত্রিভুজের দুটি বাহু। এ ত্রিভুজের তৃতীয় বাহু ছিল উত্তরাঞ্চলে যেখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। ঢাকার এ এলাকা এবং এর উপকণ্ঠকে ভারতীয়রা তিনটি নদীর নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে পিবিএম বা ঢাকা বৃত্ত বলে অভিহিত করতো। আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই তা হচ্ছে ভারতীয়দের ধারণা অনুযায়ী পিবিএম এলাকায় আমার সৈন্য মোতায়েন করা উচিত ছিল কিনা।

এ ভুল ধারণা সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে ভারতীয়দের মনে এধরনের প্রশ্ন কিভাবে জন্ম নিল তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন। ভারতীয়দের ধারণা অনুযায়ী পিবিএম-এর অভ্যন্তরে সৈন্য মোতায়েন করলে আমার ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের একটিও আমি বাস্তবায়ন করতে পারতাম না এবং বিনা যুদ্ধে শত্রুদের কাছে আমাকে হার মানতে হতো। আমি কিভাবে ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশের রুটগুলো বন্ধ করতাম? যোগাযোগ কেন্দ্র, ঘাট, সেতু ও ফেরিঘাটের মতো রুটগুলো আমাকে খোলা রাখতে হয়েছে। আমরা সীমান্তে উপস্থিত না থাকলে কিভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পুনরুদ্ধার করা যেত এবং সেখানে কিভাবে নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হতো? প্রদেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকা থেকে সরে এলে আমরা কিভাবে সকল বিভাগীয় জেলা ও মহকুমা সদর দপ্তর ও থানা নিয়ন্ত্রণে রাখতাম? অথবা আমরা কিভাবে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠায় এবং ভারতীয় ঢাকা ত্রিভূজের অভ্যন্তরে অবস্থান করলে অথবা আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে অবস্থান না করলে এসব কোনো কিছুই করা সম্ভব ছিল না।

সর্বোপরি, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সীমাবদ্ধতা ছাড়া

আরো বহু সমস্যা ছিল যেগুলো হতো আরো জটিলতর। আমাদের উপযুক্ত সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ছিল না। আমরা এডহক ব্যবস্থা এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করেছি। আমরা যুদ্ধ ও বাঁচার জন্য হাতের কাছে যা পেয়েছি সেগুলোর ওপরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করেছি। বিরাট এলাকা নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্যই আমরা তা করতে পেরেছি। পিবিএম এলাকার ভেতরে সীমিত থাকলে আমরা গোটা বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত টাটকা রেশন সংগ্রহ করা দুরূহ হতো। তখন আমাদেরকে পুরনো ও শুষ্ক রেশনের ওপর বেঁচে থাকতে হতো। টাটকা খাবারের ঘাটতির কারণে অপুষ্টির শিকার ও অর্ধভুক্ত সৈন্যদের নানারকম রোগ-বালাই দেখা দিত। হাজার হাজার উর্দুভাষী লোক নিরাপত্তার জন্য এ এলাকায় ভীড় জমাত এবং তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিত। শত্রুরা খাদ্য সরবরাহের রুটগুলো বন্ধ করে দিত। ক্ষুধা, চিকিৎসা ও পয়ঃপ্রণালীর অভাবে একটি মহামারী দেখা দিতে পারত এবং আমার সৈন্যসহ লোকজন মশা-মাছির মতো মারা যেত। তখন তাদেরকে যথাযথভাবে কবর দেয়াও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াত।

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা (পিবিএম) নদীর ভিত্তিতে প্রতিরক্ষার ধারণা খুবই বিতর্কিত। এ বিষয়টি জটিলতর করতে আবেগ একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ভারতীয়রা তাদের বোকামি ও ব্যর্থতা, তাদের হাই কমান্ডের অদক্ষতা, তাদের ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা এবং অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও তাদের ফিল্ড কমান্ডারদের নিম্নমানের তৎপরতা আড়াল করার অশুভ উদ্দেশ্যে তারা এ পিবিএম ধারণার কথা উল্লেখ করেছে। ভারতীয়রা তাদের জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে, ১৯৬৫ সালের পর থেকে তাদের সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বাইরের শক্তির সহায়তা ছাড়া ভারত তার নিজের শক্তিতে এ লড়াইয়ে বিজয়ী হতে পারতো না। তাদেরকে এ সহায়তা দিয়েছে আমার হাই কমান্ড যারা ভারতীয়দের মতো পাকিস্তান ভাঙতে চেয়েছিলেন।

ঢাকা ত্রিভুজ ধারণাকে এর সত্যিকার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় নি। মেজর জেনারেল ফজল মুকিম, মেজর সিদ্দিক সালিক ও মেজর জেনারেল ফরমান আলীর মতো কিছু পাকিস্তানি লেখক ও ভারতীয়দের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছেন যে, পিবিএমই ছিল আমার অবরুদ্ধ ইস্টার্ন কমান্ডের লড়াইয়ের একমাত্র কৌশল। তবে তাদের কথা বলার সাহস নেই যে, ইস্টার্ন গ্যারিসনের স্বল্পসংখ্যক ক্লান্ত, অবসন্ন ও অর্ধসজ্জিত সৈন্য শত্রুদেরকে কেবল ঠেকিয়েই রাখে নি, তাদেরকে তাদের কোনো মিশনও পূরণ করতে দেয় নি। পক্ষান্তরে, চলাচলের সুযোগ এবং উভয় পার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগ আশংকামুক্ত এবং নিজেদের ইচ্ছামতো উদ্যোগ গ্রহণ করার ও যুদ্ধে জয়লাভের প্রতিটি সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ওয়েস্টার্ন

গ্যারিসন যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারে নি। কিন্তু এটা বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। কান দেয়া হচ্ছে ভারতীয়রা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে ভুল ধারণা প্রচার করছে তার ওপর। ভারতীয়দের এ প্রচারণায় বিভ্রান্ত হওয়ার আগে কেউ প্রাসঙ্গিক পয়েন্টগুলো তলিয়ে দেখছে না।

১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধে অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা বিন্যাস অনুসরণ করা হয় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এখনো এলাকার অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষা ও অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা বিন্যাস অনুসরণ করা হচ্ছে। এক কথায়, আমরা পুরোপুরি আমাদের জাতীয় ভূখণ্ড ও শহর, নগর, যোগাযোগ কেন্দ্র, বন্দর প্রভৃতি রক্ষা করছি। এটা হচ্ছে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া একটি প্রতিরক্ষা ধারণা। পাকিস্তান ও ভারত উভয়েই উত্তরাধিকার সূত্রে এ ধারণা লাভ করেছে। অগ্রবর্তী অবস্থান গ্রহণের অন্যতম কারণ হচ্ছে ভৌগলিক সীমাবদ্ধতা। পাকিস্তানের এ সীমাবদ্ধতা থাকায় কোনোক্রমেই শত্রুকে দেশের ভেতরে ঢোকার সুযোগ দেয়া সম্ভব নয়। রাশিয়ার মতো বড় বড় দেশগুলো শত্রুকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ দিতে পারে। কারণ এসব দেশের ভেতরে প্রচুর জায়গা আছে। সেজন্য তারা শত্রুকে ভেতর ঢোকার সুযোগ দিয়ে তাদের ধ্বংস করতে পারে। সীমান্তের কাছে অবস্থিত শহর, যোগাযোগ কেন্দ্র ও রাস্তাঘাটের পতন হলে তাতে একটি বিরাট বিরূপ মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি হয়। চীনের সঙ্গে ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারত সেলায় প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু বোমদিলা ছিল প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করার উপযুক্ত জায়গা। ভারতীয় মন্ত্রিসভা ও সে-দেশের জনগণ লড়াই ছাড়া জাতীয় ভূখণ্ড ছেড়ে দেয়ার কৌশলগত ধারণা মেনে নিতে পারে নি।

ইস্টার্ন গ্যারিসনকে একটি জটিল লড়াই করতে হয়েছে। একদিকে, তাকে লড়াই করতে হয়েছে ভূখণ্ডের ভেতরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে এবং অন্যদিকে, বহিঃশক্তি ভারতের বিরুদ্ধে। আমাকে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার রাজনৈতিক মিশন দেয়া হয়। এ মিশনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, মুক্তিবাহিনীর হাতে কোনো ভূখণ্ডের পতন হতে না দেয়া এবং পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ভারতকে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়া। পশ্চিম রণাঙ্গনে শত্রুর সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে পূর্ব রণাঙ্গনে অধিক ভারতীয় সৈন্যকে ব্যস্ত রাখার সামরিক মিশনেও আমাকে শৃঙ্খলিত করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গন ছিল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ উভয় রণাঙ্গনের লড়াই নিয়ন্ত্রণ করেছে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স।

পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের ছিল ৫টি সাজোয়া ডিভিশন এবং অন্যদিকে, ভারতের ছিল মাত্র ৩টি। এছাড়া, পশ্চিম রণাঙ্গনই যুদ্ধ শুরু করেছিল। তাই আক্রমণনাত্মক তৎপরতার মাধ্যমে তাদের ইপ্সিত বিজয় অর্জন করা উচিত ছিল। বাঙালিদের সমর্থন দানে ভারতকে বিরত রাখতে এবং আমাদের সম্ভাব্য দখলীকৃত ভূখণ্ড ছেড়ে

দেয়ার বিনিময়ে ভারতকে চুক্তি স্বাক্ষরে তারা বাধ্য করতে পারতো। এভাবে পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যেত।

আমার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব আমি পালন করি। আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১২ ডিভিশন পদাতিক সৈন্য, ৩৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, কয়েক স্কোয়াড্রন ট্যাংক, ১৭ স্কোয়াড্রন জঙ্গিবিমান ও ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি বিরাট অংশকে পূর্ব রণাঙ্গনে ব্যস্ত রাখি এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের বিপরীতে আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, ওয়েস্টার্ন গ্যারিসন তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে নি। ঢাকা ত্রিভুজ নিয়ে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব যে, ঢাকা বিভাগের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে এ ত্রিভুজ গঠিত হয়েছে। ঢাকা বিভাগের এক বৃহৎ অংশ এবং আরো তিনটি বিভাগ-চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী হচ্ছে এ ত্রিভুজের বাইরে। আমি কি চট্টগ্রাম (সমুদ্র বন্দর) ও বিভাগীয় সদর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চালনা (সমুদ্র বন্দর),খুলনা (সমুদ্র বন্দর) ও বিভাগীয় সদর দপ্তর, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী (বিভাগীয় সদর দপ্তর), হিলি, সৈয়দপুর, নাটোর, পাবনা, বেড়া, রংপুর, বগুড়া, সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল, চাঁদপুর, টেকনাফ ও নোয়াখালী ছেড়ে দিতে পারতাম? ঢাকা ও এর আশপাশের অঞ্চল ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের বাদবাকি অংশ ছিল এ ত্রিভুজের বাইরে। এসব জায়গা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের অর্থ ছিল লড়াই করা ছাড়া অথবা একটি গুলি খরচ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের তিন-চতুর্থাংশ জায়গা ছেড়ে দেয়া। তখন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যেত। একইভাবে, পশ্চিম রণাঙ্গনে মারালা (হেডওয়ার্ক), শিয়ালকোট, পাসরুর, নারোয়াল, জাফরওয়াল, শকরগড়, ওয়াগা (হেডওয়ার্ক), বেদিয়ান (হেডওয়ার্ক), কাসুর, রাওয়ালনগর, রেতি, ধারকি, ওমরকোট, মিরপুরখাস, চর ও বাদিনের মতো সীমান্ত শহর ও নগরগুলো ছেড়ে আমরা নদ-নদীর পেছনে হটে আসতে পারি নি। আমরা যা পশ্চিম রণাঙ্গনে করতে পারি নি, পূর্ব-রণাঙ্গনে আমরা তা কিভাবে করতে পারি? একই দেশে ও একই সেনাবাহিনীতে দু'রকম মানদণ্ড কেন?

নির্দেশ ছাড়া সৈন্য প্রত্যাহারে পুরো যুদ্ধ পরিকল্পনাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হতো না, তা হতো বিপর্যয়কর এবং কোর্ট মার্শালযোগ্য অপরাধ। অদূরদর্শী হলে ঢাকা ত্রিভুজের ভেতর সৈন্য প্রত্যাহার করে আমি আমার প্রতিরক্ষা এলাকার আয়তন সীমিত করতে পারতাম। বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ঢাকা ত্রিভূজের ভেতরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে হলে আমাকে আমার ভারী অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাংক ও গোলাবারুদের একটি বড় অংশ পেছনে ফেলে আসতে হতো। এটা হতো ভারতীয়দের জন্য একটি আশীর্বাদ। আমি এ ত্রিভুজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লে ভারতের ১২ ডিভিশন সৈন্যের বেশির ভাগ উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ত। মুক্তিবাহিনী ও বাঙালি

ভিন্নমতাবলম্বীদের সহায়তায় তিন থেকে চার ডিভিশন ভারতীয় সৈন্যই এ ত্রিভুজে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অবরুদ্ধ ও আটক করে ফেলতে পারত এবং ভারত তার উদ্বৃত্ত ৭/৮ ডিভিশন সৈন্য, অধিকাংশ সমরাস্ত্র ও বিএসএফ ব্যাটালিয়ন, বিমান ও নৌ বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ অতি সহজে পশ্চিম রণাঙ্গনে সরিয়ে নিতে পারত। সেক্ষেত্রে ভারতীয়রা বড় ধরনের জটিলতা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান গ্রাস করার অবস্থায় উন্নীত হতো। নদী পারাপার ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দেখা দিতে পারত। তবে বিমান ও হেলিকপ্টারে সৈন্য পরিবহন করে তারা সে বাধাও অতিক্রম করতে পারত। আমাদের বিমান বাহিনী যেখানে ছিল ক্ষুদ্র ও নিশ্চল এবং সৈন্য চলাচল ছিল রুদ্ধ সেখানে আমাদের পক্ষে ভারতীয় সৈন্য পরিবহনে বাধা দেয়া সম্ভব হতো না। বিমান বাহিনীর পরিপূর্ণ আধিপত্য, স্থানীয় জনগণের সহায়তা, ছত্রী সেনা অবতরণের সুযোগ এবং উত্তর দিক থেকে নিরাপদে এগিয়ে আসার সুবিধা ভারতীয়দের এমন এক অবস্থানে নিয়ে যেত যেখানে ঢাকা ত্রিভুজকেন্দ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শুধু অকার্যকরই নয়, ইস্টার্ন গ্যারিসনের সৈন্যদের জন্য একটি মরণ ফাঁদও হতো। অধিকাংশ নদীর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ভারত। সেখান থেকে পরে নদীগুলো পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। এজন্য ভারতীয়রা নদী পাড়ি না দিয়েই পূর্ব পাকিস্তানের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারত। শুধুমাত্র ঢাকায় প্রবেশ করার জন্য নদী অতিক্রম করতে হতো। তবে এ কাজও তারা বিমানের ছত্রছায়ায় উভচর যান ও জাহাজ এবং স্থানীয় মাঝি-মাল্লাদের সহায়তায় সম্পন্ন করতে পারত। শক্তি প্রয়োগই ছিল ভারতীয়দের নদী পাড়ি দিয়ে ঢাকায় প্রবেশে বাধা দেয়ার সর্বোত্তম উপায়। তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ঢাকা থেকে দূরে রাখার মানে ছিল নদীর বিপরীত পাশে অবস্থান নিয়ে ভারতীয়দের আটকে রাখা।

একজন মানুষের মতো একটি সেনাবাহিনীও ঘুরে না দাঁড়ালে সে শত্রুর আঘাত থেকে যথাযথভাবে তার পশ্চাৎভাগ রক্ষা করতে পারে না। ঘুরে দাঁড়াতে গেলে সাময়িকভাবে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। পেছনে হামলার ভয়ে মস্তিষ্ক খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। উল্লেখিত নদ-নদীর বাইরে সৈন্য মোতায়েন করায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী সারা দেশে ছড়িয়ে যায় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া সম্ভব হয়। তখন আমি সামনাসামনি ভারতীয়দের ওপর হামলা করতে পেরেছি। এ পরিস্থিতিতে আমাদের উভয়পার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগ রক্ষায় পর্যাপ্ত সৈন্যের প্রয়োজন দেখা দেয় নি। তাই আমি আমার পশ্চাৎভাগ রক্ষা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে মুক্তিবাহিনী ও বাঙালি ভিন্নমতাবলম্বীদের বৃহদাংশকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য বড় বড় নদীগুলো ব্যবহার করি। পক্ষান্তরে, ঢাকা ত্রিভুজকেন্দ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলা হলে তা মরণফাঁদে পরিণত হতো যা ভারতীয়দের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিত।

অনুগত জনগণ বিশেষ করে উর্দুভাষী স্থানীয় বিহারীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা ছিল ইস্টার্ন কমান্ডের অন্যতম দায়িত্ব। আমরা এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হই। নয়তো জাতিগত নিধন চলতো।

বেলুচিস্তান অভিযানকালে ভুট্টো পিএনএ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউল হকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন শান্তিকালীন অবস্থানে সৈন্যদের ফিরিয়ে আনতে কত সময় লাগবে। তাকে তখন জানানো হয়েছিল যে, কমপক্ষে ৪৫ দিন সময় লাগবে। বেলুচিস্তানে ছিল মাত্র ৩ থেকে ৪শ' কট্টর গেরিলা। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে ছিল লাখ লাখ মুক্তিবাহিনী, ১২ ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য এবং হাজার হাজার সশস্ত্র বাঙালি। বেলুচিস্তানে সৈন্যদেরকে অভিযান চালাতে হয়েছে কেবল শহরগুলোতে। সৈন্য চলাচলে কোনো বাধা-বিঘ্ন ছিল না। সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অক্ষুণ্ণ। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যদেরকে নোয়াখালী, চালনা, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, হিলি, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর, সৈয়দপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, টেকনাফ ও কক্সবাজারসহ অন্যান্য বহু শহরে অভিযান চালাতে হয়েছে। সকল যোগাযোগ ছিল অবরুদ্ধ। কোনো যানবাহন, বিমান ও নৌ সহায়তা ছিল না। এমনকি সৈন্য প্রত্যাহারকালে আমাদের নিরাপত্তা রক্ষায় কোনো দূরপাল্লার কামান অথবা ট্যাংকও ছিল না। পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সিন্ধুতে অগ্রবর্তী অবস্থানে মোতায়েন সৈন্যদের কেউ যদি নদীর পেছনে অথবা নদী বরাবর প্রত্যাহার করার পরিকল্পনা করে তাহলে তা হবে খুবই হাস্যকর একটি অনুশীলন। এমন পরিকল্পনা কেউ করতে পারে না। যার কোনো দায়িত্ব নেই তার পক্ষে সমালোচনা করা খুবই সহজ।

'নিয়াজি শুধুমাত্র ঢাকা অথবা তিনটি প্রধান শহর অথবা ৯টি বড় শহর রক্ষায়ও তার কমান্ডকে কেন্দ্রীভূত করতে পারেন নি। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী অবশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তান দখল এবং বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারত। ডিভিশন ও ব্রিগেডগুলো বিধ্বস্ত হতে পারত। এনিয়ে জাতিসংঘে কোনো হৈ-চৈ হতো না।'

(মেজর জেনারেল শওকত রিজা, *দ্য পাকিস্তান আর্মি ১৯৬৫-৭১*)

প্রতিরক্ষা লাইন

ভারতীয়রা আমার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সমালোচনা করেছে এবং বলছে যে, ঢাকা ত্রিভুজে আমার সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত ছিল। মেজর জেনারেল ফজল মুকিম ও ফরমান ভারতীয়দের এ যুক্তি সমর্থন করেছেন। ফরমান তার বই 'হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড'-এর ১১৩ পৃষ্ঠায় স্ববিরোধিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং লিখেছেন, 'তিনটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ ছিল।' তিনি আরো লিখেছেন, 'নদ-নদীর প্রতিবন্ধকতা পর্যন্ত

এগিয়ে গিয়ে সৈন্য মোতায়েনের মাধ্যমে মধ্যবর্তী বৃত্তাকার প্রতিরক্ষা লাইন ও নিকটবর্তী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে ভালোভাবে রক্ষা করা যেত। এরপর শত্রুর অগ্রাভিযানে বিলম্ব ঘটিয়ে ঢাকার নিকটবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানে পিছু হটে আসা যেত।' কমান্ডারদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের ওপর সৈন্য মোতায়েন নির্ভর করছে। কিন্তু জেনারেল ফরমান আলী আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে সমালোচনার সময় এ বিষয়টি বিবেচনায় আনেন নি। ফরমেশনগুলোকে তাদের অপারেশনের সীমানা নির্ধারণ করে দিতে হয়। প্রয়োজন হলে অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা অবস্থানের (এফডিএল) সীমানাও চিহ্নিত করতে হয়। শত্রুদের অগ্রযাত্রায় বিলম্ব ঘটানোতে আমার পরিকল্পনা সফল হয় এবং যশোর ছাড়া অন্যান্য শহর পরিত্যাগ না করেই আমরা শত্রুদের আটকে ফেলি অথবা থামিয়ে দেই। ফরমানের মধ্যবর্তী প্রতিরক্ষা লাইন এবং আমার শক্ত প্রতিরক্ষা লাইনের মধ্যে কোনো বড় ধরনের পার্থক্য নেই।

ঢাকা বৃত্ত সম্পর্কে ফরমান

মেজর জেনারেল ফরমান তার বইয়ে লিখেছেন :

"একজন পূর্ব পাকিস্তানির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে আমরা দেখব যে, এ প্রতিরক্ষা ধারণা ভয়াবহ যেখানে একজনকে একটি বিরাট অংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের একটি ব্যাপক অংশ শত্রুর কাছে সমর্পণ করতে হবে। বিশুদ্ধ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এ ধারণা সঠিক যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জীবন, বাড়িঘর এবং মহিলাদের সম্ভ্রম পশ্চিম পাকিস্তানিদের মতোই পবিত্র।"

এখানে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং ঢাকা ত্রিভুজ রক্ষায় তার নিজের মতবাদ নীতিগতভাবে অগ্রণযোগ্য। একথা স্বীকার করেও তিনি নির্লজ্জের মতো তার ধারণাকে সমর্থন করছেন।

একটি বিশেষ সময়

অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যবল, বিমান ও নৌ শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী এবং স্থানীয় জনগণের সমর্থনপুষ্ট শত্রুর মুখে সৈন্য প্রত্যাহার করা খুবই কঠিন কাজ। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ আসতে হতো। ২১ নভেম্বর ভারতীয় হামলা শুরু হওয়ার পর সৈন্য প্রত্যাহার অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ সৈন্যরা তখন ব্যস্ত ছিল যুদ্ধে। বিপরীতক্রমে, শান্তিকালীন পরিস্থিতিতেও কোনো প্রকার বাধা ছাড়া রাজশাহী থেকে একটি ডিভিশনকে সকল সাজ-রঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রসহ ঢাকায় প্রত্যাহারে সময় লাগতো পনেরো থেকে কুড়ি দিন।

ঢাকার প্রতিরক্ষা

জেনারেল জামশেদ ছিলেন ঢাকা দুর্গের সার্বিক দায়িত্বে। ১৯৭১ সালের অক্টোবর থেকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরির কাজ শুরু হয়। ৭ ডিসেম্বর জেনারেল জামশেদের সভাপতিত্বে ঢাকার প্রতিরক্ষা পর্যালোচনায় একটি বৈঠক হয়। পূর্ব দিক থেকে তাৎক্ষণিক একটি হুমকির সম্ভাবনা ছিল। হিসাব করে দেখা যায় যে, ঢাকায় হামলার প্রস্তুতি গ্রহণে শত্রুর অন্তত দু'সপ্তাহ সময় লাগবে। জেনারেল জামশেদ নতুন করে দায়িত্ব বণ্টন করেন। ৩৬(এ) ডিভিশনের ৯৩(এ) ব্রিগেডকে মিরপুর ব্রিজ, ১৪ পদাতিক ডিভিশনকে নরসিংদী, ৯৩ (এ) ডিভিশনের বাদবাকি অংশকে নারায়ণগঞ্জ এবং কর্নেল ফজলে হামিদের নেতৃত্বে ৩১৪(এ) ব্রিগেডকে মুন্সীগঞ্জের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করা হয়। টঙ্গীসহ ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্ব দেয়া হয় ব্রিগেডিয়ার কাসিমকে। ব্রিগেডিয়ার বশীর নগরীর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থেকে যান। মূল পরিকল্পনায় ঢাকা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল ৫৩ ব্রিগেডের ওপর। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে ৫৩ ব্রিগেডকে বিদ্রোহ দমনে ঢাকার বাইরে সরিয়ে নেয়া হলে আমি ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য ফরমেশনগুলোর অতিরিক্ত সৈন্যদের নিয়োজিত করি।

আমি ৪টি স্তরে ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিন্যাস ঘটিয়েছিলাম। (১২ নং মানচিত্র দেখুন)। পরিকল্পনা ছিল যে, সুরক্ষিত এলাকায় চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে। শহরের অভ্যন্তরে অথবা আশপাশে অবস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে শহরগুলো রক্ষার পরিকল্পনা করা হয় না। যতটুকু দূরে সম্ভব ততটুকু দূরে শহরগুলো রক্ষায় অবস্থান গ্রহণ করা হয় যাতে শহরগুলো শত্রুর গোলাবর্ষণের বাইরে থাকে। তবে সামরিক বিবেচনাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং সর্বশেষ লড়াই হয় শহরের ভেতরে ও আশপাশে। পশ্চিম পাকিস্তানে আমরা ওয়াগাহ্, ঘাভিন্দি ও কাসুর এলাকায় সৈন্য মোতায়েন করে লাহোর রক্ষা করেছি। লাহরের ভেতরে কোনো নিয়মিত সৈন্য রাখা হয় নি।

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে একটি প্রয়োজনীয় দিক হচ্ছে, শত্রুকে তার সৈন্য চলাচল ও পরিবহনের সুযোগ না দেয়া। পাল্টা হামলা, শত্রুর অবস্থান অবরোধ, গেরিলা কৌশল অবলম্বন এবং প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। শত্রুকে সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা অবস্থানে হামলা চালানোর জন্য প্ররোচিত করার আগে তাকে দুর্বল করে দেয়া যেতে পারে এবং এরপর শত্রু ক্লান্ত বিশৃঙ্খল ও হতোদ্যম হয়ে পড়লে তার ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে। কোথাও অবস্থান নেয়ার সময় এ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে যেন শত্রুর ওপর চূড়ান্ত হামলা করা যায়।

প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণকালে শত্রুকে ধোকা দেয়ার কৌশল, হিসাব মতো কার্যকর গোলাবর্ষণ, নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সৈন্য চলাচলের জন্য সুষম পকিল্পনাই হচ্ছে একমাত্র রক্ষাকবচ। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বাধাগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার, সেনা-পরিচালনা, গোলাগুলি ও যোগাযোগ, সৈন্যদের যুদ্ধ করার আগ্রহ ও দক্ষ নেতৃত্বই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধার করে।

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর ঢাকা প্রতিরক্ষা ব্যূহ
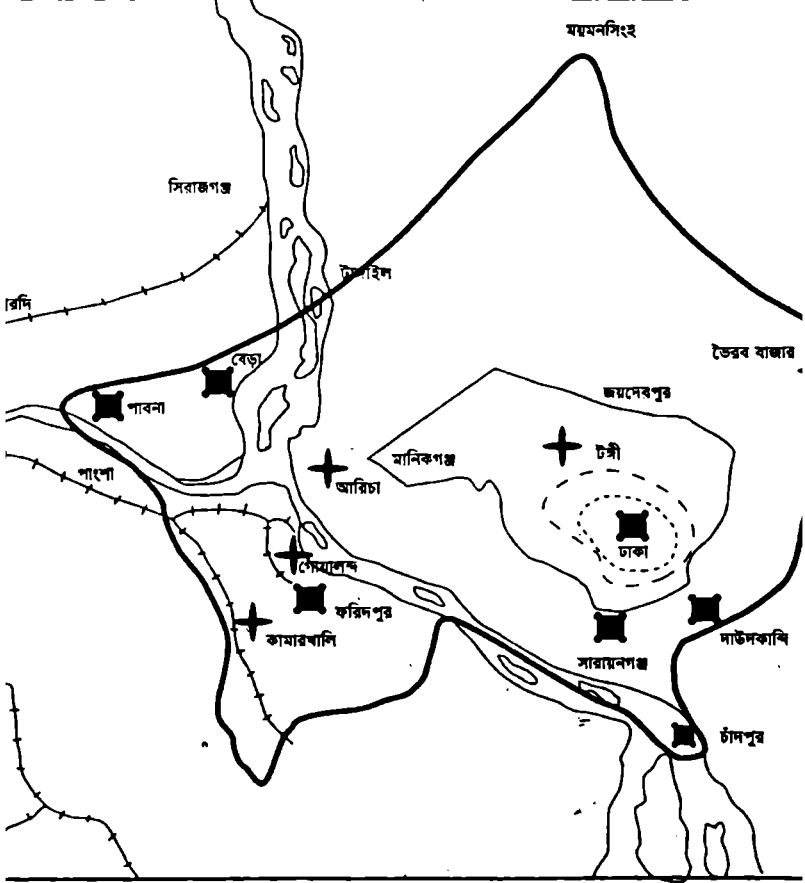
ডেক্স
টার ডিফেন্স লাইন
র ডিফেন্স লাইন
জ ডিফেন্স লাইন
-আপ ডিফেন্স এরিয়া
র্টরেসেস
পয়েন্টস

শত্রুর সম্পদ ও অভিপ্রায় এবং আমার ওপর অর্পিত দায়িত্বের সীমারেখা বিবেচনায় রেখে আমি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করি। আমি আমার কমান্ডারদের শুধু শত্রুর হামলা ব্যর্থ করার দায়িত্বই নয়, শত্রুকে আমাদের

শক্ত অবস্থানের কাছে প্ররোচিত করে নিয়ে আসা এবং সেখানে তাদেরকে লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলা এবং এভাবে শত্রুকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ঢাকা থেকে দূরে রাখার দায়িত্বও অর্পণ করি।

ঢাকার আশপাশের এলাকা ছিল প্রতিরক্ষার জন্য খুবই উপযোগী। এটা ছিল অনেকটা ইংরেজি 'ইউ' অক্ষরের মতো। ঢাকার দু'পাশে ও পেছনে নদী। নারায়ণগঞ্জ শহর হচ্ছে এই ইউ'র মধ্যে। এটি ঢাকা প্রতিরক্ষা লাইনের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করেছে। এবং পেছনের দিক রক্ষা করছে। উত্তরাঞ্চলে রয়েছে চতুর্থ বাহু। এখানে কোনো বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। এ গোটা প্রতিরক্ষা এলাকার আশপাশে পুকুর, খাল-বিল ও বিচ্ছিন্ন ক্ষেত-খামার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এছাড়া রয়েছে ঘন গাছপালা ও সবজি ক্ষেত যেগুলো প্রতিরক্ষা অবস্থানকে আড়াল করে রাখতে সহায়তা দেয়। সিমেন্ট ও ইট পাওয়া না যাওয়ায় স্থানীয় মাল-মসল্লা দিয়ে বাংকার তৈরি করা হয়। অধিকাংশ বাড়িঘর পাকা হওয়ায় সেগুলোকে সুরক্ষিত অবস্থানে পরিণত করা সহজ ছিল। পারস্পরিক সহায়তাদানকারী অবস্থানগুলোর মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁক ছিল এবং ব্যাটালিয়ন থেকে ওপরের দিকে ফরমেশনগুলোতে রিজার্ভ সৈন্য রাখা হয় এবং এ প্রতিরক্ষা এলাকার অভ্যন্তরে চলাচলের সর্বোচ্চ সুবিধা ছিল।

অবস্থানগুলোতে কোথাও ছিল এক কোম্পানি সৈন্য, কোথাও বা এক ব্যাটালিয়ন। বিকল্প অবস্থান এবং শত্রুর অবস্থানভেদ করার মতো অবস্থানও তৈরি করা হয়। এক কথায় এটা ছিল একটি চৌকস প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

প্রতিরক্ষায় আমরা ব্যাপকভাবে গুপ্ত বন্দুকধারী (স্নাইপার) ব্যবহার করি। তাদের দায়িত্ব ছিল কমান্ডার ও তাদের সিগনালারদের তুলে নিয়ে আসা। কমান্ডার আক্রান্ত হলে হামলায় বিপর্যয় ঘটতে পারে। একইভাবে, সিগনালার আক্রান্ত হলে সিনিয়র ও জুনিয়র অফিসারদের সঙ্গে কমান্ডারের যোগাযোগ ব্যাহত হয়।

আমার উভয় পার্শ্ব থেকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন হামলার জন্য সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রও ব্যবহার করি। পরিকল্পনা করা হয়, আক্রমণকারী ইউনিট বা সাব-ইউনিটগুলো আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হলে পিছিয়ে আসবে। পার্শ্বদেশ থেকে গোলাগুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে আক্রমণকারী সৈন্যরা তাদের লক্ষ্যস্থলে এগিয়ে যাবে। এ লক্ষ্যস্থলে পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণকারী সৈন্যরা আর্টিলারি ও মর্টারের গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখবে। শত্রুরা আমাদের পরিখায় পৌঁছে গেলে আমরা আমাদের নিজেদের আর্টিলারি ও মর্টারের সাহায্যে আমাদের নিজস্ব পরিখায় গোলাবর্ষণ করব। আমাদের সৈন্যদের তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ তাদের মাথার ওপরে থাকবে দুর্ভেদ্য আচ্ছাদন। হতাহত হবে কেবল শত্রুপক্ষ। আমাদের গোলাবর্ষণেও শত্রুরা জীবিত থাকলে আমরা বেয়নেটের সাহায্যে পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদেরকে উচ্ছেদ অথবা ধ্বংস করব। আমাদের বেয়নেট চার্জ বরাবরই সফল হয়েছে।

মরুময় অথবা উন্মুক্ত দেশের মতো পূর্ব পাকিস্তানের কোনো সমান্তরাল রেখায় প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো গড়ে তোলা হয়নি। সর্পিল রেখায় একটি বৃত্তাকারে প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলো বিন্যাস করা হয়। এগুলো ছিল অনেকটা জালের গ্রন্থির মতো। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এবং ভৌগলিক কারণে ঢাকার বাইরে মধ্যবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনে শত্রুকে ট্যাংকের সমর্থনপুষ্ট হয়ে অন্তত এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে অধিকাংশ হামলা চালাতে হতো। অনুরূপভাবে গোলান্দাজ সহায়তা নির্দিষ্ট অবস্থান পর্যন্ত সীমিত থাকতো। আমাদের সৈন্যদের মাথার ওপরে শক্ত আচ্ছাদন থাকায় কামানের গোলাবর্ষণ কার্যকর হতো না। ঘটনাক্রমে শত্রু কোনো অবস্থান দখল করে নিলেও তারা গভীরে প্রবেশ করতে পারত না। কারণ অব্যবহিত পেছনের অবস্থান অথবা পার্শ্ববর্তী অবস্থানে এসে তাদেরকে থেমে যেতে হতো।

আমরা চোরা ফাঁদ, বাঁশের ফলা ও খাদের ব্যাপক ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের অবস্থানের সামনে ও আশপাশের কিছু কিছু এলাকা প্লাবিত করা হয় এবং প্রয়োজন হলে আরো এলাকা প্লাবিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এটা ছিল শত্রুর ট্যাংক, যানবাহন ও পদাতিক সৈন্যের বিরুদ্ধে একটি উত্তম প্রতিরোধক। অবস্থানগুলো আড়াল করে রাখা হয় এবং ধোঁকা দেয়ার জন্য নকল ট্যাংক, যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থান প্রস্তুত করা হয়।

বুলডোজার, ট্রাক্টর, ট্রাক, ট্রলি, ওয়াগান, জিপ ও নৌকা সংগ্রহ করা হয় এবং বালির বস্তা দিয়ে সেগুলোকে ভ্রাম্যমান শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়। এগুলোকে প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোয় যে কোনো ফাঁক-ফোকর পূরণ, প্রয়োজনে যে কোনো এলাকার শক্তি বৃদ্ধি, পাল্টা হামলা এবং পাল্টা অনুপ্রবেশে সৈন্য পরিবহনে ব্যবহার করা যেত। এছাড়া, রসদ সরবরাহ এবং হতাহতদের অপসারণেরও কাজে লাগানো যেত। আমাদের গোলাবারুদ ও রেশন এবং ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্রের কোনো অভাব ছিল না। টঙ্গী-ডেমরা এলাকায় আমাদের একটি দুর্বল ট্যাংক স্কোয়াড্রন মোতায়েন ছিল। আমাদের পর্যাপ্ত তিন ইঞ্চি ব্যাসের মর্টার, প্রচুর ১০৬ রিকয়েললেস রাইফেল, সিক্স পাউন্ডারগান এবং বিপুল পরিমাণ ট্যাংক-বিধ্বংসী স্বল্পপাল্লার অস্ত্র ছিল। এছাড়া, আমাদের একটি এএ রেজিমেন্টও ছিল।

আমার প্রচুর সিনিয়র এনসিও, জেসিও অফিসার ছিল, সুতরাং আমার কমান্ড কাঠামো ছিল খুবই ভালো অবস্থায়। উদাহরণস্বরূপ, জিসিও (জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার)-গণ সেকশন এবং সেকেন্ড-ইন কমান্ড হিসেবে লেফটেন্যান্টসহ ক্যাপ্টেনগণ প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন। আমি ছাড়া আরো তিনজন মেজর জেনারেল, একজন এ্যাডমিরাল, একজন এয়ার কমোডর এবং বেশ কয়েকজন ব্রিগেডিয়ার ছিলেন। মোটের ওপর, দুর্ভেদ্য না হলেও ঢাকায় আমার প্রতিরক্ষা ছিল খুবই শক্তিশালী এবং এখানে একটি আদর্শ প্রতিরক্ষা অবস্থানের সব উপাদান বিদ্যমান ছিল।

চারটি বিন্যাসে ঢাকার প্রতিরক্ষা পুনর্গঠন করা হয়। সেগুলো হচ্ছে :

বাইরের প্রতিরক্ষা :

(১) বেড়া-পাবনা লাইন ১৬ ডিভিশন।

(২) মধুমতী রিভার লাইন ৯ ডিভিশন।

(৩) পুরনো ব্রহ্মপুত্র লাইন ৯৩ ব্রিগেড।

(৪) আশুগঞ্জ-দাউদকান্দি-চাঁদপুর লাইন ১৪/৩৯ ডিভিশন।

মির্জাপুর-জয়দেবপুর-নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ লাইনভিত্তিক ঢাকা ত্রিভুজ।

ঢাকা নগরীর বহিঃস্থ প্রতিরক্ষা—সাভার, মিরপুর, টঙ্গী, ডেমরা ও নারায়ণগঞ্জ লাইন।

ক্যান্টনমেন্ট ও নগরীর সুরক্ষিত এলাকা।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকা প্রতিরক্ষার জন্য নিম্নোক্ত সেনাদের পাওয়া যায় :

এডহক স্কোয়াড্রন অভ ট্যাংকস	৫০
আর্টিলারি (৬ এলএএ রেজিমেন্ট, প্রচুর গোলাবারুদসহ সব কামান অক্ষত, হেড কোয়ার্টার্স আর্টিলারি)	৭০০
ইঞ্জিনিয়ার্স (বিভিন্ন ইউনিটের পশ্চাৎভাগ রক্ষাকারী পক্ষ, এক ব্যাটালিয়ান হিসেবে হেড কোয়ার্টার্স ইঞ্জিনিয়ার্স	৫০০
সিগনাল (৩ ব্যাটালিয়ন ইউনিট)	২,০০০
পদাতিক (৩১ বালুচ, ৩৩ পাঞ্জাব, সাবেক ৯৩ [এডহক] ব্রিগেড, দুই কোম্পানি কম একটি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন)	৪,৫০০
মাগুরা সেক্টরের জন্য সৈন্য	৯০০
সার্ভিসেস (অস্ত্র ও সরবরাহ প্রতিষ্ঠা ওয়ার্কসপ)	১,০০০
নেভি (মেরিনস)	৫০০
এয়ার কমান্ডো (পিএএফ)	৫০০
ইপকাফ	৪,৫০০
মুজাহিদ	১,৫০০
রাজাকার	৭০০
পশ্চিম পাকিস্তানি পুলিশ	২,৫০০
শিল্প নিরাপত্তা সেনা	১,৫০০
ইস্টার্ন কমান্ড ও ৩৬ ডিভিশনের সদর দপ্তর	৯,০০০
	৩০,৩৫০

ঢাকা সেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল জামশেদ, যিনি ছিলেন একজন সাহসী জেনারেল। তিনি দুটি মিলিটারি ক্রস ও *সিতারা-ই-জুরাত* পদক লাভ করেন। প্রতিটি অক্ষ দেখাশোনা করতেন একজন ব্রিগেডিয়ার। সাব-ইউনিটগুলো কমান্ড করতেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং প্লাটুনগুলো মেজর অথবা ক্যাপ্টেন।

শত্রুরা ঢাকা পৌঁছার আগে ১৩/১৪ ডিসেম্বরের মাঝরাতে আমরা আত্মসমর্পণের নির্দেশ পাই। ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে শত্রুর প্রথম দলটি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এ সময় আত্মসমর্পণের খুঁটিনাটি বিষয় চূড়ান্ত করা হচ্ছিল। ঢাকায় হামলা চালাতে শত্রুদেরকে আরো দু'সপ্তাহ প্রস্তুতি নিতে হতো। ভারতীয়রাই এ কথা স্বীকার করেছে। আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া না হলে আমি দীর্ঘদিন ঢাকা রক্ষা করতে পারতাম।

ভারতীয়রা এতো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিল, এত বাজেভাবে সম্পৃক্ত ছিল যে, তারা কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। ভৈরব সেতু আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তারা ট্যাংক ও কামান আনতে পারছিল না। ঢাকার কাছে তাদের প্রায় সাড়ে চার ব্রিগেড সেনা ছিল। তবে তাদের কোনো ট্যাংক ও কামান ছিল না। সুতরাং ঢাকার সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করার কোনো আশা ছিল না। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে ভারতীয়রা আমাদের হাতে চরমভাবে নাজেহাল হতো।

ভারতীয় পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন

ভারতীয় সামরিক পরিকল্পনা সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে নয়, আগে থেকে অনুমানের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়। তাদের পরিকল্পনায় অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি ছিল। তারা ভূ-প্রকৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের লড়াই করার সামর্থ্য বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় জনগণের পূর্ণ সমর্থন, স্থানীয় সম্পদের ওপর পূর্ণ আধিপত্য, আমাদের সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য, অনুকূল পরিবেশ এবং সবকিছুতেই শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় তারা তাদের লড়াই করার সামর্থ্য এবং দ্রুত বিজয় অর্জনে তাদের সম্ভাবনা সম্পর্কে অতি আশাবাদী হয়ে ওঠে।

তাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিকল্পনা ছিল তাদের সামরিক পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়নের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। মিসেস গান্ধী পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম হন। তিনি শরণার্থী সমস্যাকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে অদূরদর্শীভাবে ভারতের ওপর হামলা শুরু করলে ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ্যে রাশিয়াকে ভারতের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণে সফল হন। রুশরা বিশেষ টহল বিমান, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে।

ভারতের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্বি-জাতি তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করা। ভারতীয়রা তিনটি পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাদের তৎপরতা পরিচালনা করে। সেগুলো হচ্ছে :

১) বিদ্রোহ

২) পরোক্ষ যুদ্ধ

৩) প্রকাশ্য যুদ্ধ
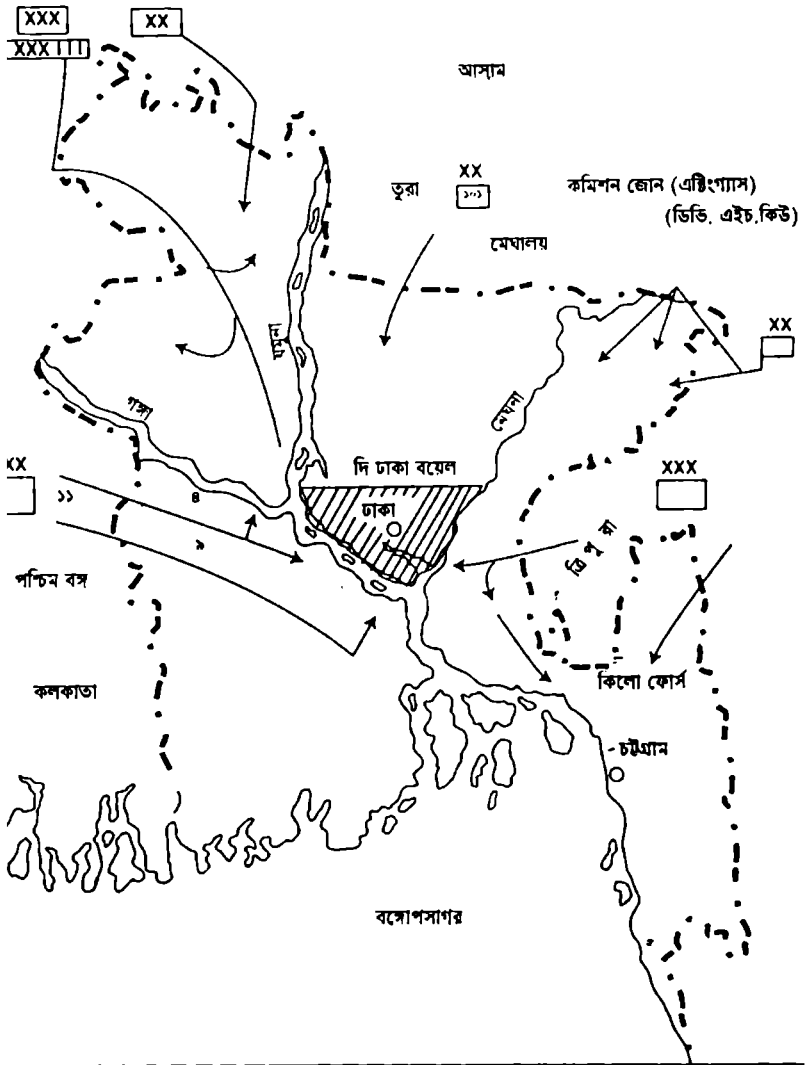
বিদ্রোহ

আমাদের সৈন্যদের বিশৃঙ্খল ও ক্লান্ত করার লক্ষ্যে ভারতীয়রা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর বিদ্রোহে সমর্থন দেয়। প্রাথমিকভাবে তারা বিদ্রোহ উস্কে দিতে সফল হয়। তবে তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। তাদের পরিকল্পনায় ত্রুটি থাকায় তা ব্যর্থ হয়। তারা আমাদের সামর্থ্য, দৃঢ়তা ও প্রস্তুতিকে অবজ্ঞা করে। কমান্ড গ্রহণ করার পর

আমি ক্ষিপ্র আক্রমণ ও উপর্যুপরি অভিযানের মাধ্যমে বিদ্রোহী ও গেরিলাদের উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেই। দু'মাসের মধ্যে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পুনরুদ্ধার এবং বিদ্রোহীদের ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করি। ১৯৭১-এর মে মাসে আমরা ফিরে আসি স্বাভাবিক অবস্থায়।

পরোক্ষ যুদ্ধ

বিদ্রোহ তৎপরতা ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয়রা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় একটি ভূখণ্ড দখলের পরিকল্পনা করে। ওদের একজন জেনারেল মন্তব্য করেন যে, প্রতিটি গেরিলা একজন করে সৈন্য হত্যা করলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী বেসামরিক লোকজনের ছদ্মাবরণে বহু নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়েছে এবং রাস্তাঘাট ও রেল যোগাযোগ ধ্বংস করেছে। এছাড়া, তারা আড়াই হাজার মাইলব্যাপী সীমান্ত বরাবর সীমান্তের ওপার থেকে গোলাবর্ষণ করে বিদ্রোহীদের সমর্থন দিয়েছে এবং ফরমেশন আকারে হামলা চালিয়েছে। বিলোনিয়ায় এক বিগ্রেড ভারতীয় সৈন্যের হামলা ব্যর্থ করে দেয়া হয়। তাদের হামলায় আবার বিশৃঙ্খলা ও সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়। তারা সুশৃংখলভাবে হামলা চালালে এবং তাদের অভিযান সুসমন্বিত হলে আমাদের প্রচুর প্রাণহানি ঘটতো। বস্তুত, নভেম্বরের মধ্যে ভারতের পরোক্ষ যুদ্ধ নিঃশেষ হয়ে যায়।

প্রকাশ্য যুদ্ধ

ভারতের সামরিক পরিকল্পনায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীকে সমন্বিত করা হয়। আমাদের কোনো নৌবাহিনী না থাকায় এবং বিমান বাহিনীর এক স্কোয়াড্রন পুরনো এফ-৮৬ অকেজো হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় নৌ ও বিমান বাহিনীর কোনো করণীয় ছিল না। তবে ভারতীয় নৌ ও বিমান বাহিনী স্থল যুদ্ধে সহায়তা দিয়েছে প্রচুর। এছাড়া, তাদের বিমান বাহিনী ফেরি, ক্ষুদ্র সেতু ও নৌকা ধ্বংসে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। মূলত এ লড়াই ছিল স্থলযুদ্ধ। এ যুদ্ধে ভারতের ১২টি পদাতিক ডিভিশন অংশগ্রহণ করে। নভেম্বরের শুরুতে সৈন্য মোতায়েনে ভারতের প্রকাশ্যে যুদ্ধের অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে সৈন্য মোতায়েন যুদ্ধে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাদের পরিকল্পনা ছিল সকল অনুপ্রবেশ পথে বহিঃস্থ লাইনে চারদিক থেকে এগিয়ে আসা। এতে তারা যুদ্ধের একটি নীতি লংঘন করে। তারা একমাত্র প্রধান সড়ক এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে একমাত্র রেলপথের সীমাবদ্ধতা আমলে আনে নি। এছাড়া, তাদের পার্শ্বভাগ রক্ষার এবং এক সেক্টর থেকে আরেক সেক্টর অথবা এক সাব-সেক্টর থেকে আরেক সাব-সেক্টরে চলাচলের কোনো সামর্থ্যও ছিল না। তারা দৃশ্যত এলাকায় ভৌগলিক অবস্থাও অগ্রাহ্য

করেছিল। দু'টি ক্ষেত্রে এলাকার ভৌগলিক অবস্থা আক্রমণকারীদের পক্ষে ছিল। এক, নদী এবং আরেক হচ্ছে ঢাকা অভিমুখী ময়মনসিংহ সড়ক। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব নদ-নদীর উৎসই হচ্ছে ভারত। সুতরাং হেলিকপ্টারে করে ভারতীয়দের নদী পাড়ি দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। তারা নিজেদের ভূখণ্ড থেকে রওনা দিয়ে সোজা পূর্ব পাকিস্তানের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারতো। এছাড়া তারা উত্তর দিকের বিপদমুক্ত মহাসড়ক ধরেও এগিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু এ দু'টি সুযোগ তারা কাজে লাগায় নি।

লক্ষ্য বজায় রাখা হচ্ছে যুদ্ধের একটি অন্যতম মূল নীতি এবং ভৌগলিক অবস্থা হচ্ছে একটি মুখ্য উপাদান। ভারতীয়দের প্রতি স্থানীয় সমর্থন ছিল পর্যাপ্ত। মুক্তিবাহিনী তাদেরকে রাস্তাঘাট চিনিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের ব্যাংকারসহ যাবতীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছে। ভারতীয় অফিসারদের বেসামরিক লোকের ছদ্মবেশে এলাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হতো এবং আমাদের অবস্থান চিনিয়ে দেয়া হতো। এটা খুবই বিস্ময়কর যে, সকল গোয়েন্দা তথ্য অবগত হওয়ার পরও তারা একটি প্রচলিত লড়াইয়ে ভুল করেছে। ভৌগলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি, সীমিত চলাচল এবং পশ্চাদপসরণের সম্ভাব্য এলাকা অথবা আমাদের অবস্থান এড়িয়ে যাওয়ার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। আমাদের লড়াই করার সামর্থ্য সম্পর্কে তাদের চিন্তা করা উচিত ছিল। তারা প্রথমে আঘাত হেনেও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে জিততে পারে নি। তখন বেশ কয়েকটি জায়গায় তারা তাদের পছন্দসই অবস্থানে থেকে লড়াই করেও সুবিধা করতে পারে নি। আমরা তাদেরকে বিআরবি ও চৌবিন্দায় থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং লাহোর ও শিয়ালকোটে তাদেরকে বিজয়ী হতে দেই নি। পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহকালে তারা আমাদের সঙ্গে লড়াই করছিল এবং আমাদের সামর্থ্য সম্পর্কে জানতো। পূর্ব পাকিস্তানে আমরা তাদের সমর্থনপুষ্ট বিদ্রোহীদের বিজয়ী হতে দিই নি এবং সীমান্তে আমরা তাদের হামলা ব্যর্থ করে দিয়েছি। তারা ধারণা করেছিল যে, আমার সৈন্যরা ক্লান্ত। তাই তারা দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না। এ হিসাব থেকে ভারতীয়রা ভেবেছিল যে, সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তারা বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করবে। কিন্তু তাদের হিসাব ভুল প্রমাণিত হয়। আমার সৈন্যরা বীরোচিত প্রতিরোধের মাধ্যমে ব্যর্থ করে দেয় তাদের হামলা । এ ব্যর্থতার জন্য আমি তাদের পকিল্পনায় ক্রটি, অদক্ষ যুদ্ধ পরিচালনা এবং উদ্যোগের অভাব ও অনমনীয়তাকে দায়ী করবো। সমন্বিত ও কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টার ঘাটতি এবং বেপরোয়াভাবে গোলাবর্ষণ না করায় ভ্রাম্যমাণ হামলায় তাদের দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। আমি তাদের অদক্ষ নেতৃত্ব, দুর্বল পরিকল্পনা, অতি সতর্ক পদক্ষেপ ও দোদুল্যমানতার সুযোগ দিয়েছি। তাদের এ দুর্বলতার জন্য আমার কমান্ডারগণ তাদের অবস্থান পুনর্বিন্যাস করতে

পেরেছেন এবং সর্বত্র তাদের হামলা ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

তাদের অতি সতর্কতা এবং দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন অথবা এড়িয়ে যেতে ব্যর্থতা দেখে মনে হচ্ছিল যে, তারা যুদ্ধের বই-পুস্তকে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী যুদ্ধ করছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল আমাদের কাছে স্পষ্ট। অরোরার ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানসিকতা ছিল না। তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিতেও কুণ্ঠিত হন। এজন্য তাঁর বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচেষ্টাকে গুঁড়িয়ে দিতে আমাদের বেগ পেতে হয় নি। তিনি দক্ষতার সঙ্গে তাঁর সৈন্য চলাচলের সুবিধা ও গোলাবর্ষণকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। এজন্য আমাদের সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে দিতে সক্ষম হই।

প্রথম অভিজ্ঞতার পরই সাধারণত পরিকল্পনায় পবিরর্তন আনার অথবা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। মূল পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে প্রতিটি কমান্ডার বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি করে। আমরা প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করেছি এবং সীমান্ত থেকে পেছনের পরবর্তী প্রতিরোধমূলক অথবা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহারে কোনো ঝামেলা হয় নি। আমরা এ ক্ষেত্রে কোনো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হই নি। আমরা প্রতিটি মধ্যবর্তী অবস্থানে ভারতীয়দের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে দিতে সক্ষম হই।

প্রথম অভিজ্ঞতার পরই সাধারণত পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার অথবা পর্যালোচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। মূল পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে প্রতিটি কমান্ডার বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি করেন। আমরা প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করেছি এবং সীমান্ত থেকে পেছনের পরবর্তী প্রতিরোধমূলক অথবা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহারের কোনো ঝামেলা হয় নি। আমরা এক্ষেত্রে কোনো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হই নি। আমরা প্রতিটি মধ্যবর্তী অবস্থানে ভারতীয়দের অগ্রযাত্রায় বাধা দিতে এবং তাদের থামিয়ে দিতে সফল হয়েছি। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভারতীয়দের কোনো বিকল্প পরিকল্পনা ছিল না। তারা একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল এবং আমাদের অবস্থান এড়িয়ে যাবার পরিবর্তে বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থানের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। যুদ্ধে তাদের যেসব সুযোগ ছিল সেগুলো তারা কাজে না লাগিয়ে বরং তারা আমাদের তৎপরতার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল।

আমাদের বাহিনীকে ধ্বংস করার পরিবর্তে তারা ভূখণ্ড দখলের ওপর জোর দিচ্ছিল। তবে তারা ভূখণ্ড দখল চরমভাবে ব্যর্থ হয়। আমরা স্বেচ্ছায় কৌশলগত কারণে যশোর ও ময়মনসিংহ থেকে পিছু হটে এসেছি। এজন্য এ দুটি শহরে ভারতীয়রা প্রবেশ করতে পেরেছে। এছাড়া, আর কোনো শহর তারা দখল করতে

পারে নি। প্রতিটি সেক্টরে আমরা তাদেরকে থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। বস্তুতপক্ষে, ঢাকা আক্রমণের যখন সুযোগ ছিল তখন তাদের হাতে ছিল মাত্র ৪টি দুর্বল ব্রিগেড। বাদবাকি ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত অবস্থানের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ে জড়িত ছিল। অরোরার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ঢাকা দখল। কিন্তু তিনি সময়মতো অর সৈন্যদের ঢাকা দখলে নিয়ে আসতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে, এ পর্যায়ে ঢাকা ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত যা ছিল দুর্ভেদ্য। এ পরিস্থিতিতে ঢাকা দখল করতে হলে ভারতীয়দেরকে তাদের সকল সৈন্য একত্রিত করতে হতো। তবে ঢাকা দখল করতে হলে ভৈরব বাজার ও নারায়ণগঞ্জে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

ঢাকা ছিল কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং ঢাকা দখল করতে হলে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে হতো। কিন্তু তাদের লক্ষ্য ছিল অন্যান্য শহর দখল করা। এজন্য এসব শহর দখলে তারা তাদের সৈন্যদের নিয়োজিত করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ যথার্থই বলেছিলেন যে, জেনারেল অরোরা জার্মান সেনাধ্যক্ষ মার্শাল রোমেল নন। কারণ রোমেল অথবা অন্য যে কোনো দক্ষ জেনারেল 'শেয়ারপাংকট' (মূল প্রচেষ্টার কেন্দ্র বিন্দু) চিহ্নিত করতেন।

ভারতীয়রা দুই ডিভিশনের বেশি সৈন্য নিয়ে তাদের দ্বিতীয় কোর গঠন করে। এ কোর জেনারেল রায়নার নেতৃত্বে যশোরের বিপরীতে অবস্থান করছিল এবং তাদেরকে ঢাকা দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়। জেনারেল থাপনের নেতৃত্বাধীন ৩৩ তম কোরকে রংপুর-বগুড়া ও রাজশাহী, জেনারেল সগৎ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন চতুর্থ কোরকে সিলেট, কুমিল্লা, ময়নামতি ও চাঁদপুর, কে (কিলো) ফোর্সকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামের প্রতি হুমকি সৃষ্টি, দুটি ব্রিগেড এবং মুক্তিবাহিনীর আরো একটি ব্রিগেড নিয়ে গঠিত ১০১ তম কমিউনিকেশন জোনকে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকা দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়। জেনারেল অরোরা তার বিশাল বাহিনীকে ৪টি অংশে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক অংশের ওপর পূর্ব পাকিস্তানের ৪টি বেসামরিক বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এটুকু করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন। তিনি ছিলেন যুদ্ধে নীরব দর্শক। তিনি কোথাও কোনো লড়াইয়ের তীব্রতা বৃদ্ধি অথবা ঢাকায় তার সৈন্যদের অগ্রাভিযান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কোনো রিজার্ভ ইউনিট অথবা ফরমেশন পাঠানোর জন্য খুঁজে পান নি।

২০ ভারতীয় ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল লক্ষ্মণ সিং বলেছেন, ঈদের দিন হওয়ায় ২১ নভেম্বর ডি-ডে'র তারিখ এগিয়ে আনা হয়। ভারতীয়রা সেদিন সকল দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। আমরা তাদের মোকাবেলা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও তৈরি ছিলাম। ২২ নভেম্বর যশোর সেক্টরে তিনটি বিমান হারানো ছাড়া ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা কোনো উল্লেখযোগ্য ভূখণ্ড হারাই নি। আমাদের সৈন্যরা

অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে লড়াই করে এবং সীমান্ত বরাবর ভারতীয় হামলাগুলো প্রতিহত করে। সীমান্ত এলাকায় তাদের লড়াই সীমিত হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে পিছু হটতে হয়।

রংপুর-হিলি-বগুড়া-রাজশাহী সেক্টর

এ এলাকা দেশের শস্যবহুল অঞ্চল বরাবর প্রসারিত। ভূমি অনেকটা পাঞ্জাবের মতো। ট্যাংক ও ভ্রাম্যমাণ যুদ্ধের জন্য উত্তম। জেনারেল অরোরা এখানে ৩৩ কোর মোতায়েন করেন। এ কোরে ছিল দুটি ডিভিশন, একটি স্বতন্ত্র ব্রিগেড, মুক্তিবাহিনীর আরো ৩টি ব্রিগেড, একটি সাজোয়া রেজিমেন্ট ও বেশ কয়েকটি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন। জেনালের অরোরা হিলিতে বড় ধরনের হামলা করার পরিবর্তে দিনাজপুর-রংপুরে ৬ মাউন্টেন ডিভিশন মোতায়েন করেন। এখানে আমাদের একটি ব্রিগেড এ ডিভিশনকে আটকে রাখে। অরোরা যেখানে একটি ডিভিশন মোতায়েন করেছিলেন সেখানে তিনি বিএসএফ ও মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় কয়েক ব্যাটালিয়ন সৈন্য মোতায়েন করলেই পারতেন। তিনি সাজোয়া বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ সমর্থনে আমাদের ২০৫ ব্রিগেডের বিরুদ্ধে দুটি ডিভিশন নিয়ে ব্যাপক হামলা চালালে হিলিতে আমরা ১৯ দিন টিকে থাকতে পারতাম না। আমি ৭ দিনের মাথায় সীমান্ত থেকে ৪০ মাইল দূরে বগুড়ায় সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করেছিলাম। ২০৫ ব্রিগেডের অবস্থান পুনর্বিন্যাস করে উত্তরে শত্রুর ট্যাংক হামলা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করা হয়।

ষোড়শ ডিভিশনের সৈন্যরা শত্রুর অগ্রযাত্রায় বিলম্ব ঘটানোর প্রচেষ্টায় সফল হয় এবং যুদ্ধ শুরুর ২৫ দিন পর ১৫ ডিসেম্বর শত্রুরা বগুড়ায় আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান অবধি পৌঁছতে সক্ষম হয়। ভারতের ৩৩ কোরের অগ্রযাত্রার গড় হার ছিল দৈনিক দু'মাইলেরও কম। ভারতীয়রা এটাকে 'বজ্র অভিযান' বলে আখ্যায়িত করছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে, সিরাজগঞ্জ ও বাহাদুরাবাদ ঘাট (ঢাকা পৌঁছার প্রধান ফেরি স্টেশন ও রেল জংশন) ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া সত্ত্বেও অরোরা অথবা থাপন কেন ঢাকা এগিয়ে এলেন না। তারা হিলি, বগুড়া, দিনাজপুর ও সৈয়দপুর দখল করে কি লক্ষ্য অর্জন করতে পারতেন?

তাদের তৎপরতার ফলে উত্তর দিকে ২০ ডিভিশনের পার্শ্বদেশ উন্মোচিত হয়ে পড়ে এবং ততটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের যোগাযোগ লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমি এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য ও সিএএফ-এর সাহায্যে ভারতের ৬ মাউন্টেন ডিভিশনকে বাধা দান ব্রিগেডের সাহায্যে হামলা চালানোর একটি পরিকল্পনা তৈরির জন্য আমার স্টাফকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। স্থির করা হয় যে, ১০৭ ব্রিগেড ভারতের ২০ ডিভিশনের পশ্চাৎভাগে হামলা চালাবে এবং সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধন করবে। আমি

নিশ্চিত যে, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে ৯ ডিভিশন থেকে ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুরের ব্রিগেড এসে পৌঁছুলে জেনারেল নজর ভারতের ২০ ডিভিশনের এক বিরাট অংশ ধ্বংস করে দিতে পারতেন। ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলো জেনারেল থাপনের তীব্র সমালোচনা করেছে। তার পদোন্নতি ঘটার পরিবর্তে পদাবনতি ঘটে।

অনুকূল ভূখণ্ড ও সকল লজিস্টিক সহায়তা পেয়েও এ সেক্টরে ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্যর্থ হয়। এজন্য দায়ী তাদের ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা, অদক্ষ নেতৃত্ব,

অদূরদর্শিতা, অনমনীয়তা ও সতর্ক পদক্ষেপ। এতে তাদের অযোগ্যতা, কৌশলগত ও সামরিক জ্ঞানের অভাব এবং এগিয়ে না আসার ইচ্ছাই প্রমাণিত হচ্ছে। অরোরা তার সমরাস্ত্র ও ফেরিগুলো ব্যবহারে ব্যর্থ হন। তিনি ফেরিগুলোকে সিরাজগঞ্জ ঘাটে নিয়ে আসতে পারতেন। নদী ব্যাপক প্রশস্ত হওয়ায় সেতু নির্মাণ সম্ভব ছিল না। বিমান বাহিনীতে শ্রেষ্ঠত্ব, বিমান অথবা হেলিকপ্টারে নদী পারাপারের সামর্থ্য এবং স্থানীয় জনগণের সমর্থন থাকায় ভারতীয়রা কয়েকদিনের মধ্যেই যমুনা নদী পার হতে পারত। তারা আমাকে ময়মনসিংহ থেকে পিছু হটতে বাধ্য এবং ঢাকা সেক্টরে টাঙ্গাইল এবং রাজশাহী সেক্টরে বেড়া-পাবনা দখল করতে পারত। জেনারেল নজরের বাহিনীকে পরাজিত অথবা এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টায় তারা তাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করলে ভারতীয়রা ঢাকার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারত এবং ঢাকা অভিমুখী তাদের অগ্রযাত্রা নিষ্কন্টক করতে নজরকে বেড়া-পাবনা লাইনে অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করতে পারত।

জেনারেল নজরের সৈন্যরা সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও ভারতীয়দের অভিপ্রায় নস্যাৎ করে দেয় এবং তাদেরকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হয়। একজন দক্ষ জেনারেল অবশ্যই আমাদের সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে এগিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু অরোরা আমাদের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়ার ভয়ে তিনি আমাদের দুর্গের মোকাবেলা করতে সাহস পান নি। তার নিশ্চিত পরাজয়কে বিজয়ের শিরোপা পরিয়ে দেয়ার জন্য ভুট্টো, ইয়াহিয়া ও ভারতীয় অপপ্রচারের কাছে অরোরার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। নয়তো এ সেক্টরে তাঁর বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অরোরা ও থাপনের কার্যকলাপ খুবই নিম্নমানের।

কুষ্টিয়া-যশোর-খুলনা সেক্টর

ঢাকা দখল করতে লে. জেনারেল রায়নার নেতৃত্বে দ্বিতীয় কোর গঠন করা হয়। ভারতীয়দের বিচারে রায়না ছিলেন একজন মেধাবী জেনারেল। কিন্তু কোর পরিচালনায় ব্যর্থতা তাঁর সুনামকে নস্যাৎ করে দেয়। আমি এখনো ভেবে অবাক হই, কি কারণে জেনারেল মানেকশ ও অরোরা যশোরের বিপরীত দিকে কৃষ্ণনগরে দুটি পদাতিক ডিভিশনের সমন্বয়ে এ কোর গঠন করলেন। এ সেক্টরে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিপত্তি রয়েছে। কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে অন্তত একটি করে নদী। মাঠ-ঘাট পানিতে পরিপূর্ণ থাকায় রাস্তা ছেড়ে চলাচল করা ছিল অসম্ভব। এখানকার ভূখণ্ড ছিল প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ের জন্য এক উত্তম জায়গা। লড়াইয়ে তাই প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের ৪টি ডিভিশন ফরিদপুর-ঢাকার পথে অগ্রসর না হয়ে যুদ্ধ শুরুর ২৬ দিন পরও কুষ্টিয়ায় আটকা পড়ে এবং সেখানেই লড়াই করতে থাকে। বিগ্রেডিয়ার হায়াতের নেতৃত্বাধীন ১০৭ ব্রিগেডকে এড়িয়ে যেতে, বিচ্ছিন্ন করতে এবং পদানত

করতে রায়নার কোরের অধিকাংশ রিজার্ভ সৈন্যের সহায়তায় ভারতীয় ৯ ডিভিশন দৌলতপুর-কুষ্টিয়ার তাদের সব প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করে। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এ ডিভিশনের অধিকাংশ সৈন্যও ফরিদপুর এগিয়ে যেতে পারত।

সামান্য কয়েকজন ভারতীয় সৈন্য মধুমতি নদীতে পৌঁছেছিল। তবে তারা ফরিদপুর অগ্রসর হতে পারে নি। অন্তত একজন ভারতীয় লেখক স্বীকার করেছেন যে, এখানে ঢাকা পৌছার একটি সুযোগ নষ্ট হয়। এটা অবিশ্বাস্য যে, প্রয়োজনীয় সব গোয়েন্দা তথ্য পেয়েও রায়না তাঁর মিশনে ব্যর্থ হন। আমি এজন্য দায়ী করব অরোরাকে। অরোরা কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি অন্ধভাবে তাঁর সৈন্য পরিচালনা করছিলেন যেন তিনি পাঞ্জাবে লড়াই করছেন। উত্তর-পশ্চিম সেক্টরের ভূমি ছিল পাঞ্জাবের মতো। কিন্তু তিনি সেখানেও সফল হতে পারেন নি। আমি তাঁকে একজন 'ক্ষমতাহীন' জেনারেল হিসেবে আখ্যায়িত করব। তাঁর কৌশলগত জ্ঞানের ঘাটতি ছাড়াও যথেষ্ট সামরিক জ্ঞান ছিল না। তিনি মুক্তিবাহিনী ও বিএসএফ-কে সঙ্গে রেখে আমার দুটি ব্রিগেডকে পদানত করতে পারতেন এবং ফরিদপুর দখল মনোযোগ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

আমি ভেবে আরো অবাক হই যে, যেখানে তিনি ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৯ দিনের লড়াইয়ে কোনো সীমান্ত শহরও দখল করতে পারেন নি, সেখানে তিনি ১২ দিনে কিভাবে ঢাকা দখল করতে পারতেন? নির্বিবাদে তাকে ঢাকা পৌঁছার সুযোগ দেয়া হলেও তিনি দু'সপ্তাহ তো দূরে থাকুক, ৬ সপ্তাহেও ঢাকা দখল করতে পারতেন না। কারণ ঢাকার পথে প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী রয়েছে। এসব নদীতে হয়তো ভাসমান সেতু নির্মাণ করতে হতো নয়তো পরিবহন বিমান অথবা হেলিকপ্টারের সাহায্যে সৈন্য পারাপার করতে হতো। যমুনা নদী কয়েক মাইল প্রশস্ত। এ নদী তিনি ফেরি ছাড়া কিভাবে পার হতেন? যমুনা নদীতে সেতু নির্মাণের প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং ঢাকা দখলে দ্বিতীয় কোরকে নির্দেশ দান তিনি কিভাবে যৌক্তিক বলে প্রমাণ করবেন? এ যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে, কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে তার কোনো সূত্র ছিল না।

সিলেট-কুমিল্লা সেক্টর

জেনারেল জগৎ সিংয়ের নেতৃত্বে ৪ ভারতীয় কোরকে আশুগঞ্জ পর্যন্ত দখলের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু পরে সগৎ সিংকে ঢাকা দখলের দায়িত্বও দেয়া হয়। ৩৩ ও ২ কোর কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে ঢাকা দখলের মিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ এলাকার ভূমি ছিল সামরিক অভিযানের জন্য মারাত্মক। এ এলাকা নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওরে পরিপূর্ণ। তাই এখানে বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানো সম্ভব ছিল না। তবে এটি প্রতিরক্ষার জন্য ছিল বেশ উপযুক্ত।

ভারত তিনটি পদাতিক ডিভিশন, কয়েকটি স্বতন্ত্র ব্রিগেড, কিলো ফোর্স ও মুক্তিবাহিনীর আরো কয়েকটি ব্রিগেড নিয়ে এ এলাকায় তাদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে। ভারতীয় সৈন্যরা সিলেটে আমাদের দুটি ব্রিগেডকে অবরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা ৬টি ব্রিগেডের সমন্বয়ে গঠিত ভারতের ৮ পদাতিক ডিভিশনকে বাধা দিতে সক্ষম হই। একইভাবে, আমরা কুমিল্লা ও ময়নামতিতে ৫৭ মাউন্টেন ও ২৩ পদাতিক ডিভিশনকে প্রতিহত করি। ভারতীয়রা এ এলাকা দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তাদের চাঁদপুর এগিয়ে আসার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। চাঁদপুর ধরে রাখার আমাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে আমরা চাঁদপুর দখল করি এবং ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে থেকে পিছু হটি।

অরোরা গুরুত্বহীন লক্ষ্য অর্জনে তাঁর প্রাপ্ত সকল সম্পদ নষ্ট করেন। ভৈরব বাজার ও আশুগঞ্জে ভারতের ৫৭ ডিভিশনের বিপর্যয় ঘটে। ৪ ভারতীয় কোর ও ১০১ কমিউনিকেশন জোনের মাত্র ৪টি দুর্বল ব্রিগেডের ঢাকা দখলের জন্য এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ভারতীয় হেলিকপ্টারগুলো পদাতিক সৈন্যদের পৌঁছে দিতে পারত মেঘনার এপারে। প্রতিটি হেলিকপ্টারে করে অন্তত এক সেকশন সৈন্য পরিবহন সম্ভব। কিন্তু ভারতীয়রা তা করতে পারে নি। শুধু তাই নয়, তারা তাদের ট্যাংক ও ভারি কামানগুলোও মেঘনার এপারে আনতে ব্যর্থ হয়। রেলওয়ে লাইন ছিল ভৈরব বাজারে মোতায়েন আমাদের ২৭ ব্রিগেডের গোলাবর্ষণের আওতায়। ভৈরববাজার বিপদমুক্ত করতে পারলে ভারতীয়রা ভৈরব সেতু দিয়ে তাদের ট্যাংক ও কামান নিয়ে আসতে পারত এবং ঢাকায় দিকে এগিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সগৎ সিং এ কাজ করতে ব্যর্থ হন। কারণ তার কোরের সৈন্যরা সিলেট থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এজন্য তিনি ভৈরব বাজারে আমাদের মোকাবেলা করতে পারেননি।

ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল-ঢাকা সেক্টর

ভারতের তুরা থেকে আগত রাস্তাটিই হচ্ছে ঢাকা পৌঁছার সংক্ষিপ্ততম রুট। শস্যক্ষেত ও মাঠের মধ্য দিয়ে এ রাস্তাটি এসেছে। কোথাও বড় ধরনের কোনো বাধা-বিঘ্ন ছিল না। তবে মধুপুর বন ও টাঙ্গাইলে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান ছিল। কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। এরা ভারতীয়দের ঢাকার দিকে অগ্রাভিযানে সহায়তা দিতে পারত। আমি নিজে অরোরার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন তিনি এ এলাকায় ১০১ কমিউনিকেশন জোনের নেতৃত্বে মাত্র দুটি নিয়মিত পদাতিক ব্রিগেড এ একটি মুক্তিবাহিনী ব্রিগেড পাঠিয়েছিলেন। ঢাকা দখলের মূল লক্ষ্য অর্জনে এ এলাকায় সাজোয়া ও পদাতিক বাহিনীর এটি সম্মিলিত সমাবেশ ঘটানো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভারতের অদক্ষ নেতৃত্ব ছিল অতি

মাত্রায় সতর্ক এবং কামালপুর পর্যন্ত দখল করতে পারে নি। কামালপুরে আমাদের বিরুদ্ধে ভারতের একটি কোম্পানিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা এখানে একটি নিয়মিত ব্রিগেড এবং মুক্তিবাহিনীর আরো একটি ব্রিগেড নিয়োগ করে। এতেও তারা কুলিয়ে উঠতে পারেনি। ২১ দিন পর আমি কামালপুর পোস্টে আমার কমান্ডার ক্যাপ্টেন আহসান মালিককে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেই। আমি আজো বুঝতে পারছি না, অরোরা কেন এ সেক্টরের গুরুত্বকে খাটো করে দেখেছেন। এখানে বিরাট সামরিক অপারেশন শুরু করলে তিনি সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ততম সময়ে ঢাকার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারতেন এবং এ পরিস্থিতিতে আমাকে বিকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হতো। টাঙ্গাইলে ভারতীয় ছত্রীসেনাদের অবতরণ ব্যর্থ হয়। কারণ সময়টা ছিল ভুল। ভারতীয় ছত্রী সৈন্যরা ময়মনসিংহ এলাকা থেকে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহারে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। জেনারেল অরোরা বলেছেন, তিনি টাঙ্গাইলে এক ব্যাটালিয়ন ছত্রীসেনা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হয়নি। ভারতীয় সৈন্যরা তাদের অবতরণ স্থলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তারা ঢাকা অভিমুখী তাদের নিজেদের বাহিনীকে কোনো সহায়তা দিতে পারে নি। একইভাবে, মেঘনা নদীর এপারে ভারতের হেলিকপ্টারে সৈন্য প্রেরণও লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। হেলিকপ্টারবাহিত ভারতের চতুর্থ কোরের সৈন্যরা সাদুল্লাহর ব্রিগেডকে আশুগঞ্জ থেকে ভৈরব বাজারে পিছু হটে আসতে বাধা দিতে পারে নি। নাগরার সৈন্যরা টাঙ্গাইলের কাছে আটকা পড়ে। কারণ তাদের কোনো পরিবহন ছিল না। সমন্বয় ও দুরদর্শিতার অভাবে এসব ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন বহরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা এবং শত্রু বহরের অগ্রযাত্রায় বাধা দানের জন্য ছত্রীসেনা ব্যবহার করা হয়। অরোরা ছত্রীসেনা ব্যবহার করে কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন নি।

ভারতীয় অপপ্রচার এবং আমাকে আত্মসর্মপণের নির্দেশদানকারী ষড়যন্ত্রকারীদের কল্যাণে ভারতীয়রা বিজয়ী হতে পেরেছে। কিন্তু কোনো সামরিক বিশেষজ্ঞই বলতেন না যে, ভারত বিজয়ী হয়েছে।

অরোরাসহ তার কমান্ডের অধিকাংশ জেনারেলকে পদোন্নতির জন্য অযোগ্য বিবেচনা করা হয় এবং সেনাবাহিনীতেও তাদের রাখা হয় নি। এতেই প্রমাণিত হয় যে. পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিজয়ী হতে পারে নি। বিজয়ী হলে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা হতেন ভারতের পরবর্তী সি-ইন-সি অথবা শো-পিস হিসেবে হলেও তাকে সেনাবাহিনীতে রাখা হতো।

পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধকে ভারতীয়রা 'বজ্র অভিযান' হিসেবে আখ্যায়িত করছে। কিন্তু কোথাও এ যুদ্ধের গতি বজ্রের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে নি। বরং এ যুদ্ধের গতি ছিল শম্বুক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা দ্রুতগতিতে ডানকার্ক দখলের জন্য যে

অভিযান চালায় তার ছদ্মনাম ছিল ব্রজ অভিযান। অরোরা জার্মানদের এ অভিযান পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে সেভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারতেন। কিন্তু তার পরিকল্পনা ছিল সেকেলে ও গতানুগতিক।

জার্মানরা তাদের আক্রমণাত্মক অভিযানের নাম দিয়েছিল 'ব্লিৎসক্রিগ' (ঝটিকা হামলা)। ঝড়ের গতিতে এবং তীব্র বেগে হামলা চালিয়ে শত্রুর অবস্থানকে তছনছ করে দেয়ার জন্যই এ ধরনের নামকরণ করা হয়। জার্মানরা আর্দেনিজ দখলের জন্য তাদের সৈন্য সমাবেশ করে এবং এত দ্রুতগতিতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যায় যে শত্রুরা প্রতিরোধেরও সময় পায় নি এবং তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্তত দু'টি সেক্টরে এবং দুটি অক্ষে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবার মতো পর্যাপ্ত ট্যাংক ও সাজোয়া যান অরোরার ছিল। সেখানে ভূমি ছিল যানবাহন চলাচলের জন্য খুবই উপযোগী। তার গতি বাড়ানোর জন্য স্থানীয় সহায়তাও ছিল। সম্পদের অভাব অথবা ভূমির প্রতিকূলতার জন্য নয়, বরং দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং ভ্রাম্যমান যুদ্ধের অনভিজ্ঞতা, দক্ষ ফিল্ড কমান্ডারের ঘাটতি এবং সর্বোপরি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তীব্র ও সংগঠিত প্রতিরোধের কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের রণাঙ্গনে অরোরার পা মাটিতে সেঁধিয়ে যায়।

জেনারেল অরোরার পরিকল্পনায় ব্লিৎসক্রিগের কোনো উপকরণ ছিল না। তিনি তার সৈন্যদের কেন্দ্রীভূত করার পরির্তে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ছড়িয়ে দেন। তিনি রংপুর-হিলি এবং তুরা-ময়মনসিংহ সেক্টরে তার সব ট্যাংক ও সাজোয়া যান কেন্দ্রীভূত করলে সুফল পেতে পারতেন। এ দুটি সেক্টরে মুখোমুখি লড়াইয়ের পরিবর্তে তার ট্যাংক হামলা চালানো উচিত ছিল। ৬ ডিভিশনের পুরো শক্তিকে ব্যবহারের পরিবর্তে সর্বনিম্ন শক্তিতে তিনি আমাদের মোকাবেলা করলে এবং রংপুর-দিনাজপুর এড়িয়ে গেলে তিনি হিলি এলাকার উত্তরে অগ্রগতি অর্জন করতে পারতেন। তবে অনেক পরে তিনি সে চেষ্টা করেছিলেন। অরোরা হিলি থেকে সিরাজগঞ্জ ঘাট এবং এখান থেকে ফেরি দিয়ে যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে তিনি ঢাকার দিকে এগিয়ে আসতে পারতেন। একইভাবে তিনি তুরা-ময়মনসিংহ সেক্টরে সর্বোচ্চ সংখ্যক ট্যাংক এবং কয়েক ডিভিশন পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে আমাদের অবস্থানের পতন ঘটিয়ে অথবা এড়িয়ে গিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারতেন। তিনি কামালপুরে আমাদের একটি মিশ্র কোম্পানির বিরুদ্ধে দুটি ব্রিগেড, আরেকটি ট্যাংক ব্রিগেড ও কোর আর্টিলারি মোতায়েন করেন। এ হিসাব থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তান দখলে অরোরার অন্তত কয়েক মাস লেগে যেত। আমাদের সৈন্যরা ভারতীয় সৈন্যদের তিন সপ্তাহ সীমান্তে আটকে রাখে এবং পরে তাদেরকে প্ররোচিত করে আমাদের মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানের কাছাকাছি নিয়ে আসে। এ পরিস্থিতিতে অরোরা পূর্ব পাকিস্তান দখলের চিন্তাও করতে পারেন নি।

অন্যদিকে, আমরা প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করেছিলাম। ৫ ডিসেম্বর আমাদেরকে ভারতীয় সৈন্যদের পূর্ব রণাঙ্গন থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে অপসারণের সুযোগ না দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। আমরা এ নির্দেশ পালনে সফল হয়েছি। সত্যি, ভারত পূর্ব রণাঙ্গন থেকে একটি ইউনিটও পশ্চিম রণাঙ্গনে স্থানান্তর করতে পারে নি। পূর্ব পাকিস্তানের লড়াই পশ্চিম পাকিস্তানে করা হবে বলে যে পরিকল্পনা ছিল, পশ্চিম পাকস্তিানের সেনাবাহিনী সে লড়াই করতে পারে নি। তাদের ব্যর্থতার জন্যই আমাদের বিপর্যয় ঘটে। অথচ লড়াইয়ে জেতার মতো তাদের পর্যাপ্ত সৈন্য, বিপুল সম্পদ ও উদ্যোগ ছিল। আমরা পূর্ব রণাঙ্গনে ১২ ডিভিশন ভারতীয় সৈন্যকে আটকে রেখে পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করেছিলাম।

ঢাকা দখল করতে হলে ভারতীয়দেরকে কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হতো এবং আমার বাহিনীকে ধ্বংস করতে হলে তাদের প্রচুর প্রাণহানি ঘটত। কিন্তু তাদের ভাগ্য ভালো যে, আমার হাই কমান্ডের ভুলের কারণে তাদের সামরিক বিপর্যয় একটি বিজয়ে পরিণত হয়েছে। আমাকে শুধু সাংকেতিক ভাষায় বলা হয়, 'থামো নীল, লাল জয়ী হয়েছে।'

অধ্যায় ১৩

পরিকল্পিত বিপর্যয়

পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ক্রমাগত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত প্রকাশ করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আমি অবশ্যই বলব যে, দেশ শাসন ও নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের বৈধ অধিকার থেকে পূর্ব পাকিস্তানিদের বঞ্চিত করা ছিল পাকিস্তানের সকল শাসকের একটি অভিন্ন নীতি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন করার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়া হলে পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারত।

ঐ নির্বাচনে মুজিবের বিজয়ে ইয়াহিয়া ও ভুট্টো নাখোশ হন। কারণ নির্বাচনের পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়তে হবে এবং ভুট্টোকে বসতে হবে বিরোধী দলীয় নেতার আসনে যা তার আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি। তাই ইয়াহিয়া ও ভুট্টো এক হন এবং ভুট্টোর নিজ শহর লারকানায় উভয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এ ষড়যন্ত্র 'লারকানা ষড়যন্ত্র' হিসেবে পরিচিত। 'এম, এম, আহমেদ পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের জন্য এ ষড়যন্ত্র করা হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত এবং কূটবুদ্ধি, হুমকি, চক্রান্ত ও সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি করা ছিল এম. এ. আহমেদ পরিকল্পনার লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে একটি উত্তাধিকারী সরকারবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার তারিখ ঘোষণা করার পর মেজর জেনারেল ওমর এ আধবেশন বর্জন করার জন্য রাজনীতিকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। তিনি অধিবেশন বর্জনের যুক্তি হিসেবে বলতেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীদের এটি আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দিতে হবে। শেষটায় পোলিশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগে তার পরিকল্পনা সফল হয়।

মি. সাজ্জাদ হায়দার তখণ ভারতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত। রাশিয়া ও ভারত ১৯৭১

সালের আগস্টে প্রতিরক্ষা চুক্তি করার পর তিনি পাকিস্তান সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন যে, ভারত তার মিত্র রাশিয়ার সহায়তায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং ইস্টার্ন গ্যারিসনকে গ্রাস করার জন্য বিপুল সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে। মি. হায়দার এ হুঁশিয়ারি দেয়ার পর তাঁকে অযথা ভীতি ছড়াতে নিষেধ করা হয়। এরপর তিনি ভারতীয়দের ইচ্ছে সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাতে শুরু করলে তাঁকে তুরস্কে বদলি করা হয়।

আমি এম. এম. আহমেদ পরিকল্পনার বিষয়বস্তু জানতে পারি পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন চিফ সেক্রেটারি জনাব মোজাফফর হোসেনের কাছ থেকে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পর তাঁকে গভর্নর হাউস থেকে সরিয়ে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসা হয়। প্রচণ্ড রাগে ও ক্ষোভে তিনি বলে ফেলেন যে, শেষ পর্যন্ত এম. এম. পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলো। প্রবীণ রাজনীতিক জাফর আহমেদ আনসারী আমার সঙ্গে এক বৈঠকে এ ধরনের একটি পরিকল্পনার অস্তিত্ব ছিল বলে স্বীকার করেন। জনাব এম. এম. আহমেদের এক ডজন পরিকল্পনার মধ্য থেকে এ পরিকল্পনা বেছে নেয়া হয়। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ইয়াহিয়াকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত রাখা এবং ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেয়া।

লারকানা ষড়যন্ত্র ছাড়াও ভুট্টো ও তাঁর লোকজন আরো বহু চক্রান্ত করে। এসব ষড়যন্ত্রের একটি হচ্ছে ভুট্টো, লে. জেনারেল গুল হাসান ও এয়ার মার্শাল রহিম খানের মধ্যকার ষড়যন্ত্র। কথা দেয়া হয় যে, ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হলে চিফ অভ জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসানকে সেনাবাহিনী প্রধান বানানো হবে এবং এয়ার মার্শাল রহিম খানকে বিমান বাহিনী প্রধান হিসেবে পুনঃ নিয়োগ দেয়া হবে। এক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় এ ষড়যন্ত্রের কিঞ্চিত বাস্তবায়ন করা হয়। ইয়াহিয়াকে ক্ষমতা হস্তান্তরে চাপ দেয়া হলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। তখন এয়ার মার্শাল রহিম খান তার জঙ্গিবিমান নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনের ওপর চক্কর দিতে থাকেন। জেনারেল গুল হাসান তার স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছেন যে, আমাদের আত্মসমর্পণের পর এয়ার মার্শাল রহিম খানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা হয়। ভুট্টো জেনারেল টিক্কার সঙ্গেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। জুনিয়র অফিসার জেনারেল গুল হাসান সেনাবাহিনী প্রধান হলে ২১ জন সিনিয়র জেনারেল ও বিগ্রেডিয়ার অবসর গ্রহণ করলেও টিক্কা অবসর গ্রহণ করেন নি। পূর্ব পাকিস্তানে বিপর্যয়ের জন্য টিক্কাই মূলত দায়ী। ২৫ মার্চের নৃশংস সামরিক অভিযানের জন্য তাকে 'কসাই' খেতাব দেয়া হয়। পাকিস্তানের পুরো যুদ্ধ পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়ার জন্য দায়ী হওয়া সত্ত্বেও তাকে সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিযুক্তির আশ্বাস দেয়া হয়। আমি এসব ষড়যন্ত্রের কথা অনেক পরেও জানতে পারি নি।

১৯৭৪ সালে আমি ভারতের বন্দি দশা থেকে ফিরে এসে পূর্ব পাকিস্তানে বিপর্যয় সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরিকালে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে

পারি যে, একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইস্টার্ন কমান্ডকে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং বিপর্যয়ের জন্য ইস্টার্ন কমান্ডের সিনিয়র কমান্ডারদের বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে। এ বই লেখার সময় আমি যখন বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলোচনা ও যোগাযোগ শুরু করি তখন আমার সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। আমি যাদের সঙ্গে আলাপ করেছি তারা আমাকে জানিয়েছেন যে, সুচিন্তিতভাবে ইস্টার্ন কমান্ডের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে এবং হাই কমান্ডের একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই তা করা হয়েছে। ভারতের জব্বলপুরে ভারতীয় মেজর জেনারেল শাহ বেগ সিংয়ের কাছ থেকেও আমি এই কথা শুনেছি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, স্যার। তারা এ বিপযর্য়ের সব দোষ আপনার ও আপনার কমান্ডের ওপর চাপিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

আমার মতে নিম্নলিখিত ঘটনাবলী প্রমাণ করছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের পতন ছিল একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফল :

মে ১৯৭১ :

আমাকে পর্যুদস্ত ও পিছু হটে যাওয়া গেরিলাদের পশ্চাদ্ধাবনে ভারতের প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয় নি যদিও রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভারতে প্রবেশ করা ছিল সবদিক থেকে যুক্তিযুক্তি। ভারতীয়রা তখন আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল এবং আমাদের ভূখণ্ডে গোলাবর্ষণ করছিল। আমাকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলে অংকুরেই বিদ্রোহ নস্যাৎ হয়ে যেত এবং পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ থাকতো।

সেপ্টেম্বর ১৯৭১ :

লারকানা ও এম. এম. আহমেদ পরিকল্পনার পরবর্তী ঘটনা। শত্রুদের নতুন করে সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে আমাকে আমার চিফ অভ স্টাফের ব্রিফিং। সব যোগাযোগ কেন্দ্র রক্ষা এবং সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ার পরামর্শ। মূল দায়িত্ব সংশোধন করার ক্ষেত্রে কোনো লিখিত নির্দেশ না দেয়া।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারে আমার সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা।

অক্টোবর ১৯৭১ :

সেনাবাহিনী প্রধানের পূর্ব পাকিস্তান সফর। আমার কৌশলগত পরিকল্পনা অনুমোদন। সেনাবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ না দেয়ার এবং ভূখণ্ড না হারানোর ওপর জোর দেন। আমাকে দেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্তে সামরিক তৎপরতা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত আমাদের রাষ্ট্রদূত সাজ্জাদ হায়দার ভারতের আসন্ন হামলা সম্পর্কে বার বার সতর্ক করায় তাঁকে তুরস্কে বদলি।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সব পর্যায়ে বিদ্রোহ দমন তৎপরতায় আমাকে রিজার্ভ সৈন্য ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। এতে আমি চরম সংকটে পড়ে যাই।

প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত সৈন্য না পাঠানো। ট্যাংক, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনিয়ার্স ও সাজ-সরঞ্জামের ঘাটতি পূরণ না করা। এতে যুদ্ধ পরিচালনায় সমস্যা দেখা দেয়।

গভর্নর মালিক আওয়ামী লীগের বাদবাকি এমএনএ-দের সরকারের অন্তর্ভুক্ত করার এবং পলাতক এমএনএ-দের আসন পূরণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়।

১৫ নভেম্বর ১৯৭১ :

মেজর জেনারেল জামশেদ ও আমার চিফ অভ স্টাফ পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েনকৃত হালকা ডিভিশনগুলোকে আর্টিলারি, ট্যাংক ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে এগুলোকে পূর্ণাঙ্গ ডিভিশনে রূপান্তরিত করার জন্য সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন। কিন্তু এ অনুরোধে কর্ণপাত করা হয় নি। সেনাবাহিনী প্রধানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোথাও কোনো ঘাটতি পূরণ করা হয় নি। এতে ভারতীয় হামলা মোকাবেলায় পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েনকৃত সৈন্যরা খুবই দুর্বল বলে প্রতীয়মান হয়।

১৯ নভেম্বর ১৯৭১ :

খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ঈদের দিনে পূর্ণাঙ্গ হামলা শুরু করার পরিকল্পনা করছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় ৮টি ব্যাটালিয়ন, ১১১ পদাতিক ব্রিগেড এবং একটি ইঞ্জিনিয়ার রেজিমেন্ট পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ১১১ ব্রিগেড পাঠানোর পরিকল্পনা বাতিল করা হয় এবং এ ব্রিগেডকে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে রেখে দেয়া হয়। পরবর্তী ৪ দিনে মাত্র ২টি ব্যাটালিয়ন ঢাকা এসে পৌছে। বাদবাকি ব্যাটালিয়নের বরাদ্দ বাতিল করা হয়। ঢাকা প্রতিরক্ষায় বরাদ্দকৃত সৈন্যরা কখনো এসে পৌছে নি।

২১ নভেম্বর ১৯৭১ :

ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানে হামলা করে। শুধুমাত্র ভাইস চিফ অভ জেনারেল স্টাফকে এ সংবাদ দেয়ার জন্য খুঁজে পাওয়া যায়। চিফ অভ জেনারেল স্টাফ গুল হাসান খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন যে, ঈদের দিনে ভারত হামলা করবে। এ কথা জেনেও তিনি লাহোরে ঈদ উদযাপন করছিলেন।

২২ নভেম্বর ১৯৭১ :
প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনী প্রধান শিকারের জন্য শিয়ালকোটে চলে যান এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে ব্রিফিং-এ যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানান। প্রেসিডেন্টের জঘন্য উক্তি, "আমি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য দোয়া ছাড়া আর কি করতে পারি?"

পাকিস্তান আক্রান্ত। কিন্তু ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদের যাবার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের কোনো উদ্যোগ নেই। পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধও শুরু করা হয় নি। পরিকল্পনা ছিল যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ করা হবে পশ্চিম পাকিস্তানে।'

২২ নভেম্বর ১৯৭১ থেকে ২ ডিসেম্বর ১৯৭১ :
কোনো কূটনৈতিক অথবা রাজনৈতিক উদ্যোগ নেই। অথবা ঘাটতি পূরণ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা জোরদার করারও উদ্যোগ নেই। ভুট্টো লাহোর বিমানবন্দরে এক বিবৃতিতে বলেন যে, "পাকিস্তান ভারতীয় আগ্রাসনের বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের উত্থাপন করতে যাবে না।" সম্ভবত এটাই একমাত্র উদাহরণ যেখানে আগ্রাসনের শিকার একটি দেশ নিরাপত্তা পরিষদে যেতে চায় নি।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ :
পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডকে পূর্বাহ্নে অবহিত করা ছাড়া ভারতের ওপর পশ্চিম রণাঙ্গনে স্থল হামলার পরিবর্তে বিমান হামলা।

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ :
নিরাপত্তা পরিষদে পোল্যান্ডের প্রস্তাব উত্থাপন। এ প্রস্তাবে যুদ্ধ বিরতি ও রাজনৈতিক মীমাংসার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু পাকিস্তান ও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ :
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে শত্রু-বাহিনীকে ব্যস্ত রাখতে পরামর্শ দেয় যাতে তারা পশ্চিম রণাঙ্গনে ছুটে যেতে না পারে। এজন্য আমাকে যুদ্ধবিরতি নাগাদ শত্রুদের মোকাবেলায় দিনাজপুর, রংপুর, খুলনা প্রভৃতি জায়গায় পর্যান্ত সৈন্য মোতায়েন রাখতে হয়েছে। এসব জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করায় রাজশাহী সেক্টরে লড়াইয়ে আমার পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমাকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে জানানো হয়েছিল যে, শিগগির চীনা সহায়তা আসছে। এটা ছিল একটি প্রহসন। আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার একটি অপচেষ্টা।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ :

এয়ার মার্শাল রহিম খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে ছিল নিষ্ক্রিয়। জেনারেল টি‍ক্কা খান পরিকল্পনা অনুযায়ী হামলা চালান নি। ভারতীয় নৌবাহিনী করাচি নৌঘাঁটি আক্রমণ করে। কিন্তু আমাদের নৌবাহিনী কোনো তৎপরতা চালায় নি।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ :

গভর্নর হাউস থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে একটি জরুরি বার্তা পাঠিয়ে বলা হয় যে, ইস্টার্ন ফ্রন্ট পতনের মুখে। প্রকৃত ঘটনা ছিল যে, তখনো ইস্টার্ন ফ্রন্টের পতন ঘটার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। যশোর থেকে পিছু হটে ব্রিগেডিয়ার হায়াত ও মঞ্জুর দুটি ভারতীয় ডিভিশনকে খুলনা ও কুষ্টিয়ায় তাড়িয়ে নিয়ে যান। শত্রুর দ্বিতীয় কোর সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং এর ডিভিশনগুলোকে তাদের লক্ষ্যস্থল থেকে বহুদূরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সিলেট, ভৈরব, ময়নামতি, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, চালনা, খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী প্রভৃতি যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। হিলিতে প্রচণ্ড লড়াই চলছিল এবং পশ্চিম দিকে লড়াইয়ে আমাদের অগ্রগতি হচ্ছিল যে, ইস্টার্ন কমান্ডের বিপর্যয় ঘটছে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল পুরোপুরি বিপরীত। আমরা তখনো তীব্র লড়াই চালাচ্ছিলাম। অন্যদিকে, ওয়েস্টার্ন গ্যারিসনের পতন ঘটেছিল অথবা পতন ঘটতে যাচ্ছিল। পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতকে অবাধে সমুদ্র, অন্তরীক্ষ ও স্থলে হামলা চালানোর সুযোগ দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কাছে যেসব রিপোর্ট পাঠানো হয় আমি ছিলাম সে ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞ।

৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ :

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে আমার কাছে একটি বার্তা পাঠিয়ে বলা হয় যে, চীনাদের তৎপরতা শুরু হয়েছে। কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভারতীয় আগ্রাসন সম্পর্কে জাতিসংঘকে অবহিত করতে এত সময় কেন লাগল তাও একটি দুর্বোধ্য রহস্য। পশ্চিম রণাঙ্গনে হামলা ব্যর্থ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভুট্টোকে ৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। ভুট্টো তিন দিনে নিউইয়র্কে পৌছেন। সেখানে গিয়েই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। (তার অসুখে কোনো ডাক্তার ডাকা হয়নি। বেনজির ভুট্টোও ছিলেন একই হোটেলে। তিনিও তার পিতাকে দেখতে যান নি)।

৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ :

রাও ফরমান ঢাকাকে একটি উন্মুক্ত নগরী হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব ছিল তার নিজেকে রক্ষা, ইস্টার্ন কমান্ডকে দোষারোপ এবং ঢাকার অভ্যন্তরে ও বাইরে মোতায়েন আমার সেনাদের একটি অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়ার আরেকটি চক্রান্ত। এ প্রস্তাবে প্রকারান্তারে সকল অবাঞ্ছিত শক্তিকে এগিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং বুঝানো হয় যে, একটি গুলি ছোঁড়ার ক্ষমতাও আমার নেই। এটা ছিল আমার সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দেয়ার একটি সুচতুর চক্রান্ত। ফরমান এ প্রস্তাব দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত।

গভর্নর হাউস থেকে পাঠানো আরেকটি বার্তায় প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরামর্শ দেয়া হয়। আমি দ্বিমত পোষণ করি এবং গর্ভনরের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের কাছে একই বার্তায় শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আমাকে গভর্নরের নির্দেশ মেনে নিতে বলেন। প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক সমাধানসহ যে কোনো মীমাংসায় পৌঁছার ক্ষমতা গভর্নরের ওপর ন্যস্ত করেন। পূর্ব পাকিস্তান সংকটে রাজনৈতিক মীমাংসা করা গভর্নরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ মুজিব ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দি।

১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ :

গভর্নর যুদ্ধবিরতি, ক্ষমতা হস্তান্তর ও পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের একটি প্রস্তাব জাতিসংঘ প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তরে প্রেসিডেন্টের অনুমতি কামনা করেন। প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ছাড়াই ফরমান এ অতি গোপনীয় বার্তা জাতিসংঘ প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করেন। জাতিসংঘ প্রতিনিধি এ বার্তা তৎক্ষণাৎ জাতিসংঘে পাঠিয়ে দেন। ফরমান ঢাকা ও পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করার জন্য ফ্রান্স, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের কন্সাল-জেনারেলদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগও করতেন। তিনি জাতিসংঘ ও চীনা প্রতিনিধি দলকেও একই আহ্বান জানান। ফরমান আমাকে অথবা গভর্নরকে না জানিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন। একইভাবে, আমাকে অথবা গভর্নরকে অবহিত না করে তিনি উপরে উল্লেখিত বার্তা জাতিসংঘ প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করেন। রুশ কন্সাল-জেনারেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ সম্পর্কেও আমাদের দু'জনকে অন্ধকারে রাখা হয়।

১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ :

সেনাবাহিনী প্রধান আমাকে গভর্নরের নির্দেশ মেনে নিতে বলেন। সোজা কথা, আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে সৈন্যদের নিরাপত্তা ও অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করার প্রশ্ন ওঠে।

ফরমান আগের দিন জাতিসংঘ প্রতিনিধির কাছে যে বার্তা হস্তান্তর করেছিলেন পরদিন সকালে রুশ কন্সাল-জেনারেল ফরমানের কাছে টেলিফোন করে জানান যে, তার সরকার এ বার্তায় বর্ণিত শর্তাবলী মেনে নিয়েছে। রুশ কন্স্যুলেটে ফরমানকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান এবং নিরাপদে পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ :
চিফ অভ জেনারেল স্টাফ লে. জেনারেল গুল হাসান আমাকে আরেকটি মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে পশতুতে বলেছিলেন, 'উত্তর দিক থেকে পীত এবং দক্ষিণ দিক থেকে শ্বেতাঙ্গরা আসছে।' আমাকে ৩৬ ঘণ্টা টিকে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয় যে, এরপরই উত্তর দিকে থেকে চীনা এবং দক্ষিণ দিক থেকে মার্কিন সাহায্য আসবে। এটা ছিল একটি ডাহা মিথ্যা। আমি কখনো বলি নি যে, আমার পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি বার্তায় আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার সংকল্প ব্যক্ত করেছিলাম। আমার ওপর দোষ চাপানোর জন্য আবার চালাকি করা হয়। আমি তখন টেলিফোনে গুল হাসানকে বলেছিলাম, 'দয়া করে আমার সঙ্গে আর মিথ্যা কথা বলবেন না। আমি সাহায্য চাই নি এবং আমার সাহায্যের প্রয়োজনও নেই। আমি আপনাকে পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রতি লক্ষ্য রাখার অনুরোধ করছি। এ রণাঙ্গনেই আমাদেরকে বিজয়ী হতে হবে। আমি আমার দিকটা দেখছি।' এরপর তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন না।

মেজর জেনারেল কাজী মজিদ যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকায় পিছু হটে আসেন নি।

১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ :
জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছে পাঠানো বার্তায় আমি জানাই যে, 'ঢাকা দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংগঠিত এবং আমি লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' আমি বিদেশি প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করি যে, 'আমার লাশের ওপর দিয়ে ভারতীয় ট্যাংককে ঢাকায় আসতে হবে।' সেদিন রাতে আরেকটি বার্তায় আমি জানাই যে, 'আমি চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য সুরক্ষিত এলাকায় অগ্রসর হচ্ছি।' আমি শেষ ব্যক্তি জীবিত থাকা পর্যন্ত লড়াই করে যাবার নির্দেশ দেই। ফরমান আমাকে অথবা গভর্নরকে না জানিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে একটি আন্তর্জাতিক নিরাপদ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন।

রাত ১৩/১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ :
আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে পাঠানো একটি অশ্রেণীভুক্ত উন্মুক্ত বার্তা। আমার অজ্ঞাতে গভর্নরের পক্ষ থেকে রাও ফরমান আলী যে বার্তা পাঠান প্রেসিডেন্ট তার জবাবে আমাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। যোগাযোগ

করে সেনাবাহিনী প্রধান অথবা মেজর জেনারেল পীরজাদা কাউকেই পাওয়া যায় নি। জেনারেল গুল হাসান কোনো কিছুই না জানার ভান করেন। অথচ তিনি ছিলেন চিফ অভ জেনারেল স্টাফ এবং সামরিক গোয়েন্দা ও সিগনালস অধিদপ্তরের মহাপরিচালক। গভর্নর মালিক ও তার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। আমি আত্মসমর্পণ করতে চাই নি বলেই আমার ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য তিনি পদত্যাগ করেন। দৃশ্যত আত্মসমর্পণের দলিলে সই করা থেকে বিরত থাকার জন্যই তিনি এ উদ্যোগ নেন।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ :

রাশিয়ার সমর্থনে পোল্যান্ড জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। এ প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং প্রাথমিকভাবে ৭২ ঘণ্টা যুদ্ধ বিরতির কথা উল্লেখ করা হয়। জেনারেল হামিদের একান্ত সচিব ব্রিগেডিয়ার জানজুয়া আমার চিফ অভ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকীকে জানান যে, উপরে উল্লেখিত বার্তাটি পাঠানো হচ্ছে। আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছে পাঠানো এক বার্তায় জানাই যে, "আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে প্রস্তুত।" জেনারেল হামিদ ও এয়ার মার্শাল রহিম ১৪ ডিসেম্বর জেনারল হেড কোয়ার্টার্স থেকে পাঠানো বার্তা অনুযায়ী কাজ করার জন্য টেলিফোনে নির্দেশ দেন। তারা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিপন্ন।

ফরমান রাশিয়ার মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করেন। আমি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হই এবং আমার সৈন্য ও অনুগত পাকিস্তানিদের নিরাপত্তা দাবি করি।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ :

ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে বার্তা পাঠান। আমি তাঁর প্রস্তাব সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে পাঠাই। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং আত্মসমর্পণ করতে বলেন। আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তান ও সশস্ত্র বাহিনীর সম্মান রক্ষা করার জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে একটি বার্তা পাঠাই। প্রেসিডেন্ট বার্তায় লিখেন 'এনএফএ' (আর কোনো যুদ্ধ নয়)। আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। তবে তাঁকে পাওয়া যায় নি। সেনাবাহিনী প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি নি। জেনারেল পীরজাদা তখন স্কোয়াশ খেলছিলেন। তিনি টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

পোলিশ প্রস্তাব গ্রহণ করার পরিবর্তে ইস্টার্ন কমান্ডের ওপর আত্মসমর্পণ করার অসম্মান চাপিয়ে দেয়া। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি উত্তরাধিকারী সরকারবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বরের পর :

এ অপমানে জাতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়। জেনারেল হামিদ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে অফিসারদের উদ্দেশে বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালে ব্রিগেডিয়ার ফজলে রাজিক খানের নেতৃত্বে একদল অফিসার তাঁর প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে। ব্রিগেডিয়ার রাজিক ছিলেন গুল হাসানের খুবই ঘনিষ্ঠ। এয়ার মার্শাল রহিম ব্যক্তিগতভাবে জঙ্গিবিমান নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য প্রেসিডেন্ট ভবনের ওপর চক্কর দিতে থাকেন। এটা ছিল, ভুট্টো, এয়ার মার্শাল রহিম ও গুল হাসানের নেতৃত্বে একটি পরিকল্পিত অভ্যুত্থান। ভুট্টো অধিকাংশ জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারকে বরখাস্ত করেন। তবে টিক্কাকে রেখে দেন। ফরমানকেও রেখে দেয়া হয়। সকল ইলেক্ট্রনিক ও প্রচার মাধ্যমে সামরিক বাহিনী বিরোধী প্রচারণা চালানো হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে বিপর্যয়ের জন্য দোষ চাপানো হয় ইস্টার্ন কমান্ড ও আমার ওপর। ইস্টার্ন কমান্ডের পক্ষে কথা বলার এবং ভুট্টোর ষড়যন্ত্র ও অপকর্ম প্রকাশ করার জন্য তখন আমি দেশে ছিলাম না। গুল হাসান ও টিক্কা ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব।

২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ :

এ রাতকে বলা হয় 'জেনারেলদের রাত'। সে রাতে গুল হাসানের বাসভবনে তিনি নিজে, মেজর জেনারেল শওকত রিজা, এয়ার মার্শাল রহিম, শাকিল উল্লাহ্ দুররানী, সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান আসগর খানকে গদিতে বসানোর প্রস্তাব করেন। কিন্তু গুল হাসান ও রহিম খান তাতে আপত্তি করেন। এরপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ভুট্টোকে ক্ষমতায় বসানো হবে। অন্যদিকে, ইয়াহিয়ার বাসভবনে আরেকটি গ্রুপ বৈঠকে বসে। এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইয়াহিয়া নিজে, জেনারেল হামিদ, ওমর ও মিঠা। এ গ্রুপ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য আলোচনা করছিল। কিন্তু গুল হাসানের গ্রুপই জয়ী হয়। গুল হাসানের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ বন্দুকের মুখে ইয়াহিয়াকে পদত্যাগে বাধ্য করে।

২১ ডিসেম্বর ১৯৭১ :

জনগণের সামনে আমাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য আমার নিজের, আমার সৈন্য ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপপ্রচার শুরু হয়। আমার বিরুদ্ধে এমন জঘন্য ও ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হয় যে, জনগণের দৃষ্টিতে ভুট্টো অথবা ইয়াহিয়া নয়, আমিই মূল অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হই। মূল অপরাধী ভুট্টোকে আড়াল করে রাখার জন্য ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত পূর্বে এ উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার চালানো হয়।

জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত :

পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটার পর ভুট্টোর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকটভাবে ধরা পড়ে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সিমলায় ভুট্টোর অবস্থানকালে সবকিছু তদারকির জন্য জনাব মোহাম্মদ ইউনুসকে দায়িত্ব দেন। তিনি লিখেছেন :

'দ্বিতীয় দিন তিনি (ভুট্টো) ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, আমি যুদ্ধ বন্দিদের মুক্ত করার জন্য এখানে আসি নি। এই যুদ্ধবন্দিরা এমন এক ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েছে সেখানকার লোকজন শত শত বছর ধরে ব্রিটিশের কামানের খোরাক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাকিস্তানের জন্য দু'এক লাখ লোকের মৃত্যুতে কি আসে যায়?'[১]

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, ভুট্টো যুদ্ধবন্দিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে না গেলে তিনি কেন সিমলা গিয়েছিলেন? তিনি সেখানে গিয়ে কি অর্জন করলেন? তথাকথিত সিমলা চুক্তির আওতায় কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখাকে নিয়ন্ত্রণ রেখায় পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতীয়রা আজাদ কাশ্মীরে যেসব চৌকি দখল করেছিল সেগুলো থেকে ভারতীয় সেন্য প্রত্যাহার করা হয় নি। এ চুক্তিতে কাশ্মীরে ও কাশ্মীরী জনগণের ভাগ্যে সীলমোহর মেরে দেয়া হয়। দুটি দেশের প্রতিনিধি-দলের মধ্যে নয়, দু'জন ব্যক্তির মধ্যে এ সমঝোতা হয়। দু'জন প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের আগে দুটি দেশের প্রতিনিধি দলের মধ্যে যে আলোচনা হয় তা ছিল একটি আইওয়াশ। সিমলা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ভুট্টোর চাটুকাররা দাবি করেন যে, ভুট্টো তাদের মধ্যকার একান্ত বৈঠকে মিসেস গান্ধীকে বশীভূত করেছেন। কিন্তু ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে, মিসেস ইন্দিরা গান্ধীই ভুট্টোকে বশীভূত করেছেন। ভুট্টো খালি হাতে সিমলা থেকে ফিরে আসেন। তিনি যুদ্ধবন্দি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের হৃত সাড়ে ৫ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড ও আজাদ কাশ্মীরের চৌকিগুলো মুক্ত করা ছাড়াই দেশে ফেরেন।

ইন্দিরা গান্ধী ও ভুট্টো উভয়েই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানে আগ্রহী ছিলেন।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের অর্থ হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের কফিনের শেষ পেরেক ঠুকে দেয়া। ইন্দিরা গান্ধী ও ভুট্টো বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের এক দেশে পরিণত হওয়ার যে কোনো সম্ভাবনাকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তান যতক্ষণ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিত ততক্ষণ বাংলাদেশের যে কোনো ভবিষ্যৎ সরকার অথবা জনগণ পুনরেকত্রীকরণের চেষ্টা করতে পারতো। ভুট্টো যুদ্ধবন্দিদের ভারত থেকে ফিরিয়ে আনার আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন।

বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশের বিরুদ্ধে চীন নিরাপত্তা পরিষদে তার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের হুমকি দেয়। পাকিস্তানের জনগণ ছিল স্বীকৃতি দানের বিপক্ষে। ভুট্টো ইসলামী শীর্ষ বৈঠকের আয়োজন করেন। বাংলাদেশকে দাওয়াত দেয়া হয়। মুজিব বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে

তিনি লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করবেন না। মুসলিম দেশগুলোর চাপের মুখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। মুজিব সদর্পে ওআইসি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ভুট্টো যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে আনতে চান নি। তিনি যুদ্ধবন্দিদের ফিরিযে আনতে চাইলে আমরা অনেক আগেই ফিরে আসতে পারতাম। ভুট্টোর হাতে ৪টি তুরুপের তাস ছিল। একটি হচ্ছে, মুজিব। মুজিবের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দিদের ফিরিয়ে আনা যেত। কিন্তু তাঁকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেয়া হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ২ লাখ বাঙালি। এসব বাঙালির মধ্যে জেনারেল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নারী ও শিশু ছিল। যুদ্ধবন্দিদের বিনিময় করা যেত এদের সঙ্গে। কিন্তু তাদেরকেও নিঃশর্তভাবে যেতে দেয়া হয়।

তৃতীয় তুরুপের তাস ছিল ভারতীয় যুদ্ধবন্দি এবং চতুর্থটি হচ্ছে ফিরোজপুর হেডওয়ার্ক। এ হেডওয়ার্কের কাছাকাছি পৌঁছে গোটা ফিরোজপুর ও আশপাশের এলাকা করে দেয়া যেত প্লাবিত, ভারতীয় যুদ্ধবন্দি ও ফিরোজপুরের সঙ্গে যুদ্ধবন্দিদের বিনিময় করা যেত। কিন্তু ভুট্টো ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেন।

সিমলায় ভুট্টো মিসেস গান্ধীর সঙ্গে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারতে দীর্ঘদিন আটক রাখার বন্দোবস্ত করেন। আমাদেরকে মুক্তি দেয়া না হলে চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগের হুমকি দেয়। চীনের এ হুমকির পর ভারত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় আমাদেরকে। ভুট্টো আমাদেরকে ফিরিয়ে আনেন নি। চীনের প্রশংসনীয় ভূমিকায় আমরা দেশে ফিরতে পেরেছিলাম।

'এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভুট্টো যুদ্ধবন্দিদের ফেরত দেয়ার প্রশ্নে ভারতের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা ছাড়াই পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দি মুজিবকে মুক্তি দেন। নতুন রাষ্ট্র গঠনে মুজিবের ঢাকা উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য এবং ভারতীয়দের কাছে তার প্রয়োজন ছিল এত বেশি যে, ভুট্টো মুজিবকে মুক্তি দানের বিনিময়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রত্যাবসান দাবী করলে তিনি তাদের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে ৯৫ হাজার যুদ্ধবন্দিকে দীর্ঘদিন অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হতো না। কার্যত ভুট্টো মুজিবকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দানে আগ্রহী ছিলেন যাতে মুজিব নিজের ঘর (বাংলাদেশ) গোছাতে পারেন।" এছাড়া তার আগ্রহ ছিল বাংলাদেশকে স্বীকার করা।

শামিম আখতার, ডন, ২৭ অক্টোবর, ১৯৯৩

নোটস

১. মোহাম্মদ ইউনুস : পার্সন, প্যাট্রিয়ট অ্যান্ড পলিটিক্স।

অধ্যায় ১৪

আত্মসমর্পণ এবং যুদ্ধবন্দি শিবির নং ১০০

আত্মসমর্পণ

জেনারেল মানেকশ আমাদেরকে জানান যে, একটি ভারতীয় প্রতিনিধি দল আত্মর্পণের দলিলপত্র চূড়ান্ত করার জন্য ঢাকা আসছে। বিশাল পাখা ঝাপটে একটি ভারতীয় হেলিকপ্টার ঢাকা বিমান বন্দরে চক্কর দিতে থাকে। একটু পরেই হেলিকপ্টারটি অবতরণ করে। মেজর জেনারেল জ্যাকব, চিফ অভ স্টাফ, ইন্ডিয়ান ইস্টার্ন কমান্ড, তার প্রতিনিধি দল নিয়ে হেলিকপ্টার থেকে বের হয়ে আসেন। পাকিস্তানি সিওএস ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী বিমান বন্দরে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তরে নিয়ে আসেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দল এসেছিলেন যুদ্ধবিরতির শর্তাদি নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তবে তাঁরা আলোচনা করা ছাড়াই আত্মসমর্পণের একটি খসড়া দলিল সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। ব্রিগেডিয়ার বাকিরের অফিসে জ্যাকবের সঙ্গে তার প্রাথমিক আলোচনা হয়। প্রস্তাব উত্থাপনের পর বাকির এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার বাকিরকে জেনারেল জামশেদ, ফরমান এবং অ্যাডমিরাল শরীফ এবং উর্ধ্বতন পাকিস্তানি সেনা ও নৌ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরমার্শ করার নির্দেশ দেই। ভারতীয় প্রতিনিধি দল আমাদেকে হুমকি দেয়, যে আমরা তাদের শর্তে রাজি না হলে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয়গ্রহণকারী স্থানীয় অনুগত লোকজন ও আমাদের বেসামরিক অফিসারদের মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হবে এবং মুক্তিবাহিনী তাদের হত্যা করবে। 'ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ কমান্ড' শব্দের ব্যবহার এবং আত্মসমর্পণের স্থান ও ধরন সম্পর্কে আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের এ হুমকিতে আমরা তাদের শর্তে আত্মসমর্পণে রাজি হই।

জেনারেলদের মধ্যে একমাত্র ফরমানের আচরণ নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। সংকটকালে তিনি যে দুর্বলতা ও স্খলন প্রদর্শন করেছিলেন তা মিলিয়ে যেতে থাকে। তার চোখ মুখ থেকে ভীতি ও হতাশা দূর হয়ে যায়। ৫ জন গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় এবং ২৫ মার্চের নিষ্ঠুর সামরিক অভিযানে জড়িত থাকায় তার প্রতি বাঙালিদের ক্রোধ ও ঘৃণা জন্ম নেয়। বাঙালিরা তার

অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। তাকে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করা হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের তালিকা একটু বাড়িয়ে দেখানো হয়। কারণ এ তালিকায় যাদের নাম ছিল তাদের কেউ কেউ তখনো জীবিত ছিলেন। একটি প্রচণ্ড ভীতি গ্রাস করায় ফরমান চেয়েছিলেন পালাতে। বাঙালিরা যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ গ্রহণের শপথ নেয়।

আমি ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে আমার অফিসে ডেকে পাঠাই সামান্য আলাপ-আলোচনার পর ঊর্ধ্বতন পাকিস্তানি কর্মকর্তাগণ ভারতীয় প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হওয়ায়। ভারতীয় প্রস্তাবে বেসামরিক লোকজনের নিরাপদ হেফাজতের ব্যবস্থা না থাকায় আমি ব্যক্তিগতভাবে অসন্তুষ্ট হই এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। ১৪ ডিসেম্বর গভর্নর পদত্যাগ করায় এবং বেসামরিক কর্মকর্তাগণ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের নিরাপদ এলাকায় আশ্রয় নেয়ায় সামরিক কমান্ডার ও বেসামরিক প্রশাসক হিসেবে আমার ওপর বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তা রক্ষার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তাই আমি তাদের রক্ষা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার কোনো চেষ্টা বাকি রাখি নি। আমি জ্যাকবের কাছে দুটি শর্ত পেশ করি। প্রথম শর্ত : ঢাকা এলাকায় পর্যাপ্ত ভারতীয় সৈন্য এসে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত পাকিস্তানি সৈন্যরা নিজেদের আত্মরক্ষা ও বেসামরিক লোকজনকে রক্ষায় তাদের ব্যক্তিগত অস্ত্র বহন করতে পারবে। দ্বিতীয় শর্ত : পাকিস্তানি বেসামরিক লোক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও স্টাফদের বেসামরিক বন্দির মর্যাদা দিতে হবে এবং সৈন্যদেরকে যেখানে রাখা হবে, তাদেরকেও রাখতে হবে সেখানেই।

জ্যাকব প্রথম শর্তে রাজি হন তাৎক্ষণিকভাবে । তবে আপত্তি করে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের সঙ্গে বিনিময় না হওয়া পর্যন্ত বেসামরিক লোকজনকে বাংলাদেশেই অবস্থান করতে হবে। আমি ভেবে দেখলাম যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব উভয়ের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তার ফয়সালা ছাড়া পরবর্তী আলোচনা হবে অর্থহীন। আমার অনমনীয় মনোভাবের কারণে জ্যাকব আমাদের পূর্বশর্ত নিয়ে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হন। টেলিফোন দীর্ঘ কথাবার্তার পর এ বিষয় নিষ্পত্তিতে জ্যাকবকে তার বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়। বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত জটিতা দূর হওয়ার পর বিষয়টির সুরাহা হয়।

প্রতিনিধি দলের বাঙালি সদস্য এতে আপত্তি করে কিন্তু অগ্রাহ্য হয় তার আপত্তি। এ সময় বহু ঊর্ধ্বতন ভারতীয় ও বাঙালি কর্মকর্তা এবং সাংবাদিক ঢাকা এসেছিলেন। আলোচনা ভেঙে গেলে তাদের যুদ্ধবন্দি হওয়ার ঝুঁকি ছিল। কারণ তখনো লড়াই চলছিল। যুদ্ধের আচরণ বিধি ও পেশাগত নৈতিকতা অনুযায়ী প্রতিনিধি দলকে কেবল নিরাপত্তা দেয়া হতো, অননুমোদিত ব্যক্তিদের নয়।

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের ধারণা সম্পর্কেও আপত্তি জানিয়েছিলাম আমরা। আমি

এভাবে আত্মসমর্পণ করতে চাই নি। তাই আমাদের আলোচনায় অচলাবস্থায় দেখা দেয়। ভারতীয়রা অনমনীয় অবস্থান গ্রহণ করে। তারা অনুগত লোকজনকে হত্যার হুমকি দেয়। সত্যি সত্যি তখন বহু তরুণকে জবাই করা হয়। আমাদেরকে বলা হয় যে, সব বেসামরিক লোকজনকে মুক্তিবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হবে। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেত। কিন্তু তারা পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ এলাকায় আশ্রয় নেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে পরিত্যাগ করায় আমাকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এরপর মেজর জেনারেল জ্যাকব ও ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী পূর্ব নির্ধারিত এলাকায় বেসামরিক লোকজনকে একত্রিতকরণ এবং অন্যান্য সেক্টরে মোতায়েন সৈন্যদের এক জায়গায় নিয়ে আসা এবং তাদেরকে ওয়াগার দিকে নিয়ে যাবার মতো অন্যান্য প্রশাসনিক সমস্যাগুলোর খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন।

ঢাকার আশপাশে অবস্থানরত সৈন্য, বেসামরিক কর্মকর্তা, বেসামরিক লোকজনও তাদের পরিবারবর্গকে একত্রিত করা ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ। সিভিল এভিয়েশন, পিআইএ, কাস্টমস ও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সরিয়ে আনতে হবে। শহরে পরিস্থিতি বিভ্রান্তিকর। মুক্তিবাহিনী তখন খুবই সক্রিয়। তারা বেসামরিক লোকজনের ওপর হামলা চালাচ্ছে। আমার চিফ অভ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির দিন-রাত পরিশ্রম করে এসব লোককে সরিয়ে আনেন এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এনে একত্রিত করেন। ঢাকা থেকে আমাদের প্রস্থানের তিন দিনের মধ্যে এ কাজ শেষ করা হয়।

বিহারি ও অন্যান্য অনুগত লোকজনের অবস্থা ছিল হৃদয়বিদারক। তাদেরকে গণহত্যার মুখে রেখে যাওয়ায় তাদের কান্না ও আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। গণহত্যার খবর আসছিল। অনুগত তরুণ পূর্বপাকিস্তানিদের লাইনে দাঁড় করিয়ে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাদের হত্যা করেছে। সাবেক এমএনএ মৌলভী ফরিদ আহমেদসহ অন্যান্যদের হত্যা করে ঢাকার রাজপথে তাদের লাশ টানা-হেঁচড়া করা হয়। আমরা ভারতীয়দের বললাম যে, এসব ঘটনা চুক্তির প্রকাশ্য লংঘন। কিন্তু ভারতীয়রা আমাদের হাতে দড়ি পরাবার জন্য এসব ঘটনাকে ব্যবহার করছিল।

ভারতীয় যুদ্ধবিমানের ব্যাপক বোমাবর্ষণে ৬ ডিসেম্বর থেকে আমাদের এফ-৮৬ স্যাবর জেটের বহর অকেজো হয়ে পড়ে। বিধ্বস্ত হয়ে যায় রানওয়ে। এয়ার কমোডর ইনাম জঙ্গিবিমানগুলোকে ব্যবহারোপযোগী নয় বলে ঘোষণা করেন। পাইলটদেরকে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বন্দিত্ব বরণের জন্য রয়ে যান কেবল এয়ার কমোডর ইনাম। আর্মি এভিয়েশনের হেলিকপ্টারগুলো শিশু, নারী ও আহতদের নিয়ে বার্মা হয়ে পাকিস্তানে চলে যায়।

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর। মেজর জেনারেল

ফরমান ও অ্যাডমিরাল শরীফ এ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। আমি কাঁপা হাতে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করি। তখন আমার অন্তরে উত্থিত ঢেউ দু'চোখ বেয়ে অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ে। অনুষ্ঠানের একটু আগে একজন ফরাসি সাংবাদিক এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন আপনার অনুভূতি কী, টাইগার?' জবাবে বললাম, 'আমি অবসন্ন।' অরোরা আমার পাশেই ছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, 'এক চরম বৈরি পরিবেশে তাঁকে এক অসম্ভব দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। কোনো জেনারেলই এ পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভালো করতে পারত না।'

আমাকে যে দুর্ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে তাতে আমার কোনো হাত অথবা ইচ্ছা ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষায় প্রেসিডেন্ট আমাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। তখন আমার সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। এক: পশ্চিম পাকিস্তানকে হারানোর ঝুঁকি নেয়া অথবা দুই : আমার সুনাম, আমার ক্যারিয়ার, আমার ভবিষ্যৎ ও পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর মহান ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেয়া। পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষায় প্রেসিডেন্টের নির্দেশে আমি শেষোক্ত পথই বেছে নেই। আমি চরম বিশৃঙ্খল ও সমস্যা সংকুল একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। দু'জন সিনিয়র জেনারেল বিভিন্ন অজুহাতে এ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। বিদ্রোহের আলামত স্পষ্ট হয়ে ওঠা মাত্র একজন পদত্যাগ করেন এবং আরেকজন পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলেন। সেনাবাহিনীর এ তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করার সময় সিনিয়রিটিতে আমি ছিলাম দ্বাদশ। তবু আমাকেই দায়িত্ব দেয়া হয়। এতে আমি আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি। কিন্তু আমি আমার সম্মানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জাতীয় স্বার্থে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করি।

যুদ্ধ জয়ের আনন্দে আত্মহারা ছিল তখন বাঙালিরা ছিল। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের পর তবু তাদের অনেকেই আমার কাছে এগিয়ে আসেন এবং বলেন, "আমরা নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় আরো প্রতিনিধিত্ব এবং উন্নয়নের জন্য আরো বরাদ্দ চেয়েছিলাম। তবে এ ঘটনা আমরা চাই নি।" অনেকেই সত্যি সত্যি খুব মর্মাহত ও বেদনার্ত বলে মনে হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা আগেও তারা আমাদের রক্তের জন্য পিপাসার্ত ছিল। কিন্তু মুহূর্তে তারা বদলে যায়। তাদের দেখে মনে হয়েছে, আমাদের প্রতি তাদের যেমন ঘৃণা রয়েছে তেমনি রয়েছে মমত্ববোধও। আমি তাদের বললাম, "বহু রক্ত ঝরেছে। এখন আর অনুতপ্ত হয়ে লাভ নেই। আমরা আমাদের নেতাদের দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছি। নেতারা ক্ষমতায় যাবার জন্য রক্তপাতের পথ বেছে নিয়েছেন। রোমান সম্রাটরা যেভাবে মল্লযোদ্ধাদের লড়াই দেখতেন, আমাদের নেতারা ঠিক সেভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে দাঁড়িয়ে এ রক্তপাত দেখে তৃপ্ত হয়েছেন। যুদ্ধে ফলাফল যাই হোক, বিজয়ী হবেন তারাই।" আমি বাঙালিদের সাফল্য কামনা করি এবং আশা প্রকাশ করি যে, আমাদের কালে না হলেও আমাদের নাতি-পুতিদের কালে হলেও এ ক্ষত নিরাময় হবে এবং বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে দু'টি দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

সামরিক ও বেসামরিক সকল পাকিস্তানিদের সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয় ভারতীয় ও পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর। স্থির করা হয় যে, পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ট্রেনযোগে ওয়াগাহ সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে বেসামরিক লোকজন, তাদের পরে বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ এবং সবার পরে সশস্ত্র বাহিনীকে পাঠানোর নির্দেশ দেই। সব সৈন্য নিরাপদে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করার পর তিন বাহিনীর সিনিয়র অফিসারগণ রওনা দেবেন। বেসামরিক লোকজনকে নিয়ে প্রথম ট্রেনটি এগিয়ে যেতে থাকে। হঠাৎ করে ট্রেনের গন্তব্যস্থল পরিবর্তন করা হয় এবং এলাহাবাদের দিকে ট্রেন যেতে থাকে। আনন্দ হতাশায় পরিণত হয়। ভুট্টো নিঃশর্তভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুজিব ছিলেন পাকিস্তানের হাতে একটি তুরুপের তাস। শেখ মুজিব, পাকিস্তানের শিবিরে আটক হাজার হাজার বাঙালি সৈন্য, ভারতীয় যুদ্ধবন্দি এবং ভারতের স্পর্শ কাতর ভূখণ্ড ফিরোজপুর হেডওয়ার্কস পাকিস্তানের হাতে থাকায় ভারতের সঙ্গে যুদ্ধবন্দি বিনিময়ে পাকিস্তান ছিল একটি শক্তিশালী অবস্থানে। কিন্তু ভুট্টো কলমের এক খোঁচায় পাকিস্তানের এ শক্তিশালী অবস্থানকে তছনছ করে দেন। শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়ার পর পাকিস্তান দর কষাকষিতে দুর্বল অবস্থানে এসে দাঁড়ায়।

ভুট্টো ছিলেন খুবই চতুর। কোন্ ঘটনা তাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রত্যাবাসনে ব্যাঘাত ঘটায়? শেখ মুজিবকে ব্যবহার করে ভারত ও বাঙালিদের কাছ থেকে সর্বাধিক সুবিধা আদায়ের সুযোগ তাঁর ছিল। তাছাড়া, তিনি আমাদের হাতে থাকলে আন্তর্জাতিক চাপে দ্রুত সংকট নিষ্পত্তিও হতে পারত। ভুট্টো কেন তাড়াহুড়ো করে মুজিবকে ছেড়ে দিতে গেলেন? ইরানের শাহ্‌র পাকিস্তানে আসার কথা ছিল। তিনি শেখ মুজিবকে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে রাজি করানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ দেয়া হয় নি। শাহ্‌র পাকিস্তান এসে পৌঁছানোর আগেই মুজিবকে লন্ডনগামী বিমানে তুলে দেয়া হয়।

'অপদস্থ ইস্টার্ন কমান্ডের যুদ্ধবন্দিদের ভুট্টো দেশে ফিরিয়ে নেবেন, তবে অবিলম্বে নয়। এজন্য মুজিবকে কোনো বোঝাপড়া ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং ভুট্টো সফলতার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যর্থতার দায় ইয়াহিয়া এবং সামরিক বিপর্যয়ের দায় নিয়াজির ওপর চাপিয়ে দেয়া নাগাদ যুদ্ধবন্দিদের ভারতেই থাকতে হবে।'

(সৈয়দ আলম রাজা, ঢাকা ডেবাকেল পৃষ্ঠা-১১১)

ভুট্টো ইস্টার্ন কমান্ডের সৈন্য সংখ্যা ৪৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৯৬ হাজার পর্যন্ত উল্লেখ করতেন এবং সিমলা চুক্তিতে এ সংখ্যা ১ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়। ইতিহাসে একটি দেশের প্রেসিডেন্ট তার নিজ দেশের ভাগ্য বিড়ম্বিত সৈন্যদের সম্পর্কে এমন মিথ্যাচার করেছেন কিনা সন্দেহ। ভুট্টোর এ মিথ্যাচার গুল হাসান

অথবা টিক্কা কেউই সংশোধন করেননি। ইস্টার্ন কমান্ডে পাকিস্তানের নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যছিল মাত্র ৩৪ হাজার। রেঞ্জার্স, স্কাউট, মিলিশিয়া ও বেসামরিক পুলিশ মিলিয়ে আরো ছিল ১১ হাজার। সব মিলিয়ে ইস্টার্ন কমান্ডে সশস্ত্র সদস্য ছিল ৪৫ হাজার। নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্য, ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর, সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়, ডিপো, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ওয়ার্কশপ ও ফ্যাক্টরি প্রহরায় নিয়োজিত ব্যক্তি, নার্স, মহিলা ডাক্তার, পাচক, ধোপা, নাপিতসহ হিসাব করলে এ সংখ্যা বড় জোর ৫৫ হাজারে পৌঁছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ৯৬ হাজার অথবা ১ লাখ হয় না। ৪৫ হাজারের বাইরে যাদেরকে হিসাবে ধরা হয় তারা হচ্ছে বেসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারি এবং মহিলা ও শিশু। ভারতীয়রা যেখানে ইস্টার্ন কমান্ডে নিয়োজিত তাদের সৈন্য সংখ্যা ১২ ডিভিশনের স্থলে ৮ ডিভিশন বলে উল্লেখ করছে, সেখানে ভুট্টো আমাদের সৈন্য সংখ্যাকে ৪৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৯৬ হাজার বলে উল্লেখ করতেন। ইস্টার্ন কমান্ড ও এ কমান্ডের সৈন্যদের বিদ্রূপ করা যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে সে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় নি। এটা গোটা জাতিকে বিদ্রূপ করার শামিল এবং ভারতীয় অপপ্রচারকে জোরদার করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। ভারতীয়রা দাবি করছে যে, তারা ৯৬ হাজার সৈন্যের একটি বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেছে। ভুট্টো ইস্টার্ন কমান্ডের সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে বলে ভারতের দাবিকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

এটা মনে রাখতে হবে যে, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ও সরকার প্রধান হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ নয়। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে আমার হাই কমান্ড ও প্রাদেশিক সরকার আমাকে পরিত্যাগ করে। এজন্য বেসামরিক ও সামরিক উভয় বিষয়ে আমাকের একাই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। গভর্নর তখনো তার পদে বহাল থাকলে প্রাদেশিক সরকার প্রধান ও প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে তাকেই আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করতে হতো, সৈন্যদের কমান্ডার হিসেবে আমাকে নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে ইয়াহিয়া প্রয়োজনীয় সব দলিলে স্বাক্ষর করেছেন; ভারপ্রাপ্ত সি-ইন-সি হিসেবে সেনাবাহিনী প্রধান অথবা চিফ অভ জেনারেল স্টাফ নয়।

সেনাবাহিনীর যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক লোকজনকে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্পে নেয়া হয়। লে. জেনারেল সগৎ সিং আমাকে জানান যে, ২০ ডিসেম্বর সিনিয়র অফিসারদের কলকাতা নেয়া হবে। তবে ভারতীয়রা রাও ফরমান আলীকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রেখে যেতে চেয়েছিল। ৫ জন গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা থাকায় প্রতিটি কাজ-কর্মে তার হাত ছিল এবং তিনি নির্বাচন পরিচালনা ও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতে চূড়ান্ত ভূমিকা পান করেছেন। বস্তুতপক্ষে, ফরমান ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন। তার ভূমিকায় বাঙালিরা ক্রুদ্ধ হয়। ২৫ মার্চের সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় তার বিরাট ভূমিকা ছিল। বাঙালিরা তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিল না। আমি তখন জোর

দিয়ে বললাম যে, জেনারেল মানেকশ'র প্রদত্ত আশ্বাস অনুযায়ী কোনো পাকিস্তানি সৈন্যকে তদন্তের জন্য ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তর করা যাবে না। কথিত আচরণ সংক্রান্ত যে কোনো তদন্ত রিপোর্ট সিদ্ধান্তের জন্য একটি পাকিস্তানি আদালতে পেশ করতে হবে। একইভাবে, গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থায় কর্মরত কোনো কর্মকর্তাকেও আটক করার অনুমতি দেয়া হয় নি। আমাদের সঙ্গে আল-বদর ও আল-শামসের কয়েকজন সদস্যও ছিল। তারা যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করেছে। এজন্য বাঙালিরা তাদের খুঁজছিল।

আমাদেরকে কলকাতার পথে রওনা দিতে হবে ২০ ডিসেম্বর সকালে। আমি তাই আমার কমান্ড পোস্ট এলাকায় যাই। সেখানে গিয়ে দেখি যে, কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক লোকজনকে জড়ো করা হয়েছে। আমি তখন তাদেরকে জানাই যে, প্রেসিডেন্টের নির্দেশে আমাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করতে হয়েছে। আমি আরো বললাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট এ নির্দেশ দিয়েছেন।

আমি নিজে, মেজর জেনারেল ফরমান, অ্যাডমিরাল শরীফ, এয়ার কমোডর ইনামুল হক, ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার এসএস কাসিম, আমাদের এডিসি ও ব্যাটম্যানগণ ক্যারিবু হেলিকপ্টারে কলকাতার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করি। আমি ফরমানের এডিসি পরিচয় দিয়ে আমার পিআরও মেজর সিদ্দিক সালিমকেও সঙ্গে নেই। বাঙালি ও ভারতীয় উভয়েই তাঁকে খুঁজছিল। আমি তাঁকে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে চাই নি। বাংলাদেশের সামরিক গভর্নর লে. জেনারেল সগৎ সিং ঢাকা বিমান বন্দরে আমাদের বিদায় জানান। আমরা কলকাতা দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করি। হেলিপ্যাড থেকে দুটি স্টাফ গাড়ি আমাদের নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামে আমাদের আবাসিক কোয়ার্টারের উদ্দেশে যাত্রা করে।

আমাদের আবাসিক কোয়ার্টারটি ছিল একটি নবনির্মিত তিন তলা ভবন। বেশ পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো। একটি কক্ষকে ডাইনিংরুমে পরিণত করা হয়। এখানে সকল অফিসারগণ খাওয়া-দাওয়া করতেন। আমাদেরকে সিপাহীর রেশন দেয়া হতো। ভারতীয় পাচকরা রান্না করত। তবে পরিবেশন করতো আমাদের নিজস্ব আর্দালি। ব্যায়াম, বই পড়া ও রেডিও শোনা প্রভৃতি সময় কাটানোর নিয়মিত রেওয়াজে পরিণত হয়। আমরা রেডিওতে শুনতে পেলাম যে, ভুট্টো দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ফরমান রেডিওতে এ সংবাদ শুনে মন্তব্য করল, যে কিছুদিন বিলম্বে অভ্যুত্থান ঘটেছে। কিছুক্ষণ পর মেজর জেনারেল নজর, মেজর জেনারেল এম. এইচ. আনসারী ও মেজর জেনারেল কাজী মজিদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। মেজর জেনারেল জামশেদ তখনো এসে পৌছান নি। কর্নেল খারা কলকাতায় আমাদের দেখাশোনা করতেন। উদ্বিগ্ন হয়ে তার কাছে জামশেদ সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি তখন আমাকে জানান যে, জামশেদ প্রশাসনিক বিষয়াদিতে সহায়তা করার জন্য এখনো ঢাকা রয়েছেন। তিনি সুস্থ আছেন এবং উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি পরে জানতে পারি যে, তিনি ঢাকায় নেই। কলকাতায়

একটি নির্জন সেলে আটক রয়েছেন। আমার অনুমতি ছাড়া তাঁকে কারাগারে নেয়া হয়।

যুদ্ধবন্দি শিবির নং ১০০

আমাদেরকে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম থেকে জব্বলপুরে ১শ' নম্বর শিবিরে নেয়া হয়। এ শিবিরটি জেনারেলদের শিবির হিসেবে পরিচিত ছিল। আমাদের ব্যাটম্যানগণ আমাদের সঙ্গেই রইল। কিন্তু আমাদের এডিসিদের জন্য আরেকটি জায়গায় সরিয়ে নেয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী ও ব্রিগেডিয়ার কাসিমকে বেরিলিতে এবং মেজর সিদ্দিক সালিককে এডিসিদের সঙ্গে স্থানান্তর করা হয়। ফরমানের ওপর আবার শ্যেনদৃষ্টি পড়ে। ভারতীয়রা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করতে চাইল। আমি কর্নেল খারাকে ডেকে পাঠালাম এবং কড়া ভাষায় তার কাছে প্রতিবাদ জানাই। আমি তাকে বললাম যে, জেনেভা কনভেনশন ও ঢাকা সমঝোতার আলোকে ফরমানকে আটক ভারতীয় প্রস্তাব চুক্তির একটি সুস্পষ্ট লংঘন এবং এতে জিজ্ঞাসাবাদের নামে প্রতিশোধ গ্রহণ ও হয়রানির আশঙ্কা রয়েছে। খারা আমাকে জানান যে, মুজিব মুক্তি পাবার পর বাঙালিরা ফরমানকে তাদের হাতে হস্তান্তরের জন্য প্রবলভাবে দাবি করছে। বাঙালি স্বার্থের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করায় তারা যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তার বিচার করতে চায়। ১৪ ডিসেম্বর ফরমানের অফিস থেকে উদ্ধারকৃত ডায়েরির কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এ ডায়েরিতে ফরমান নিজ হাতে লিখেছিলেন, "শ্যামল মাটিকে রক্তে লাল করে দেয়া হবে।" আমি পাকিস্তানে ফিরে আসার পর ভুট্টোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারকালে তিনি আমাকে এ ডায়েরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

ফরমান দাবি করেছেন যে, তিনি শক্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু ২৫ মার্চের সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় তার সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি শক্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করেন নি। ফরমান কখনো সরকারি নীতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন নি। সুতরাং আমরা একথা বলতে বাধ্য যে, তিনি সরকারি নীতি ও কার্যক্রমকে সমর্থন করেছেন। তাকে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সরকার তার মতামতের মূল্য দিত এবং তার পরামর্শ ও সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতো। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার দায় থেকে তিনি নিজেকে কখনো মুক্ত করতে পারবেন না।

আমি ভারতীয়দের বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, ২৫ মার্চ অথবা কথিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে ফরমানের সংশ্লিষ্টতা সত্ত্বেও চুক্তি অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। পাকিস্তান সরকারই তার ভাগ্যের ফয়সালা করবে। আমি জেনারেল অরোরাকে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য কর্নেল খারাকে অনুরোধ করি। খারা চলে গেলেন। তিনি কয়েক ঘণ্টা পর আবার ফিরে এসে জানান যে, ফরমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেয়া হচ্ছে না। আমি

ফরমানকে একথা জানানোর পর তিনি ভীষণ খুশি হন এবং আমার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বললেন, 'স্যার, আমাকে সাহায্য করায় আমি আপনার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করি, আমরা পাকিস্তানে ফিরে যাবার পর আপনি আমাকে এভাবেই সাহায্য করবেন।' আমি প্রতিশ্রুতি দেই। তবে আমি ঘূর্ণাক্ষরেও জানতাম না যে, পাকিস্তানে ফিরে যাবার পর তাকে পুরস্কৃত করা হবে। পাকিস্তানে তার আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয় নি। যে লোকটি তার দেশ ও সেনাবাহিনীকে অবর্ণনীয় দুর্দশায় ফেলেছে সেই লোকটিকেই বিপুলভাবে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথমে তাকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে চাকরি দেয়া হয় এবং তরে তাকে ফৌজি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান করা হয়। আরো পরে তিনি মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকটি ইউনিটের ব্যাচেলর কোয়ার্টারে আমাদের থাকার জায়গা হয়। প্রত্যেক অফিসারকে একটি করে কোয়ার্টার দেয়া হয়। প্রতিটি কোয়ার্টারে ছিল একটি বেডরুম, পাশে বাথরুম এবং একটি বৈঠকখানা। সামনে একটি বারান্দাও ছিল। ভবনটি সদ্য নির্মাণ করা হয়েছে এবং সাজ-সজ্জা ছিল চমৎকার। বাড়তি ছিল কিছু রুম। আমরা এসব রুমের একটিকে মসজিদ, আরেকটিকে মেস বানানোর এবং আরেকটি কোয়ার্টার আমাদের চাকর-বাকরদের থাকার জন্য ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। খাবার ছিল একঘেয়ে। ভাত, চাপাতি, শাক-সবজি, ডাল এবং মাঝে মাঝে মাংস।

আমাদের শিবির ঘেরাও করে রাখা হয় প্রায় ৫০ গজ উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে যাতে কেউ ভেতরে প্রবেশ অথবা ভেতর থেকে বের হতে না পারে। শিবিরের চার কোণায় ৪টি ত্রিশ ফুট উঁচু প্রহরা চৌকি ছিল। ওগুলোতে সার্চলাইট ছিল এবং রাত হলেই চারদিকে আলো করে এগুলো জ্বলে উঠতো। একজন টহলদার পাঞ্জাবি সৈন্য একটি এ্যালসেশিয়ান কুকুর সঙ্গে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা শিবির এলাকায় টহল দিত। এটা ছিল ভেতরের নিরাপত্তা ব্যূহ। বাইরে আকেটি নিরাপত্তা ব্যূহ ছিল। তাতেও এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য মোতায়েন করা হয়। এভাবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

জেনারেল জামশেদ কিছুদিন পর আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। আমাদের এডিসি ও দু'জন ব্রিগেডিয়ার ছাড়া কলকাতায় আমরা যারা একসঙ্গে ছিলাম তারা আবার এখানে একত্রিতই হই।প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য আমাদের শিবির সরাসরি একজন স্টেশন কমান্ডারের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। স্টেশন কমান্ডার ছিলেন মেজর জেনারেল পদ্ম। শিখ ক্যাভালরি অফিসার জেনারেল পদ্ম ছিলেন খুবই স্মার্ট, বুদ্ধিমান ও সহানভূতিশীল। তার মর্যাদাপূর্ণ আচার-আচরণে আমাদের কাছে বন্দিশালার পরিবেশও সহনীয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিবিরের কমান্ডার ছিলেন একজন মেজর। মেডিকেল কোরের একজন ক্যাপ্টেন শিবিরের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করতেন। চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল এবং কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে জব্বলপুর সিএমইচ-এ পাঠানো হতো। আমাদের কেউ কেউ

জব্বলপুর সিএমএইচ-এ গিয়েছেন। তবে কেউ কখনো ভর্তি হন নি অথবা সেখানে অবস্থান করেন নি। মোট কথা, শিবিরের স্টাফদের ব্যবহার ছিল চমৎকার এবং তাদের আচরণ ও কথাবার্তায় কখনো ঔদ্ধত্য ও বাড়াবাড়ি প্রকাশ পায় নি।

আমরা রুটিনমাফিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর। বিপদে ও দুঃসময়ে আল্লাহকে মানুষ বেশি স্মরণ করে। তাই আমরা নিয়মিত নামাজ আদায় করতাম। জেনারেল আনসারী নামাজে ইমামতি করতেন। বন্দি হওয়ার আগেও আমি নিয়মিত নামাজ পড়তাম। তবে বন্দি জীবনে আমি নামাজ ও কোরআন তেলোয়াতে পুরোপুরি আত্মনিবেদন করার সুযোগ পাই। আমরা রুমে ব্যায়াম করতাম এবং শিবির চত্বরে হাঁটাহাঁটি করতাম। এতে আমাদের উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হতো। আমরা প্রচুর বই-পত্র ও ম্যাগাজিন পড়তাম। এগুলো হয় কিনতে হতো নয়তো স্টেশনের লাইব্রেরি থেকে ভাড়া করে আনতে হতো। নিয়মিত দৈনিক পত্রিকাও পড়তাম। পত্রিকা পড়ে আমরা বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিশ্বের নানা খরব জানতে পারতাম। সময় যেমন কাটতেই চাইত না।

নগদ টাকার পরিবর্তে টোকেন দেয়া হত আমাদেরকে। প্রতি মাসে আমি বেতন হিসেবে ১৪০ রুপি পেতাম। এ অর্থ ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবনে এ সামান্য অর্থ বিরাট উপকারে আসত। আমরা এ অর্থ দিয়ে বই-পুস্তক, লেখার উপকরণ ও খাবার-দাবার কিনে খেতাম। আমাদের কেনা-কাটার জন্য একজন ভারতীয় হাবিলদারকে নিযুক্ত করা হয়। এ হাবিলদার প্রতিদিন আমাদের কাছে আসত এবং বাজার থেকে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন হতো সেগুলো সে কিনে আমাদের কাছে পৌঁছে দিত।

বন্দিত্বের মেয়াদ বাড়তে থাকে এবং আশু মুক্তির কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলাম না। নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে থাকায় চিঠিপত্রই ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র উপায়। আমরা চিঠি পেলে এবং চিঠি লিখে খুবই সান্ত্বনা পেতাম। আপনজনদের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি পড়ে যে আনন্দ পেতাম তার সঙ্গে অন্য কোনো আনন্দের তুলনা খুঁজে পেতাম না। এসব চিঠিতে থাকতো সান্ত্বনা ও ভালোবাসার পরশ। তাই চিঠিগুলো বার বার পড়তাম। প্রথমদিকে ভারতীয়রা আমাদেরকে লেখার উপকরণ সরবরাহ করত। কিন্তু পরে এ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে গাঁটের পয়সা দিয়ে আমাদেরকেই এগুলো নিতে হতো। প্রতিদিনই আমাদের চিঠিপত্র সংগ্রহ করা হতো এবং আমরা চিঠি পাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। চিঠিগুলো সেন্সর করা হতো এবং মাঝে মধ্যে চিঠির মূল কথাও কেটে বাদ দেয়া হতো। আমি প্রচুর চিঠি পেয়েছি। কোনো কোনোটি ছিল তিক্ত এবং কোনো কোনোটি ছিল উৎসাহব্যাঞ্জক। উৎসাহব্যাঞ্জক চিঠিগুলো আমাকে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে বন্দি জীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণা মোকাবেলা করার প্রেরণা যোগাতো। আমি সংক্ষিপ্ত করে হলেও প্রতিটি চিঠির উত্তর পাঠাতাম। বিদেশ থেকেও খাদ্যদ্রব্য, উপহার সামগ্রী ও চিঠি আসতো। পার্সেলগুলোর মধ্যে থাকতো

চকোলেট, টফি, শেভ করার সাজ-সরঞ্জাম, সুগন্ধি প্রভৃতি। পাকিস্তান ও বিদেশ থেকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে সান্ত্বনা ও উৎসাহ না পেলে ভারতে আড়াই বছরের বন্দি জীবন হতো দোযখের মতো। ভারতীয় কূটনীতিক ও ভারতপন্থী মুসলমানরা অন্যান্য শিবিরে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চালাচ্ছিল। জুনিয়র পাকিস্তানি অফিসারগণ এসব প্রচারণাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। আমাদের অফিসারগণ বৈরি মনোভাব প্রদর্শন করায় ভারতীয়দের পক্ষে তাদের মগজধোলাই করা সম্ভব হয়নি। আমাদের সৈন্যরাও একই মনোভাব প্রদর্শন করে। তাই আমাদের মাঝে ভারতীয়দের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার লোক তৈরি করা সম্ভব হয় নি।

ভারতীয় কর্মকর্তা ও রেডক্রসের প্রতিনিধিগণ আমাদের শিবির পরিদর্শন করতে আসতেন। তবে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সফর আমাদের কাছে স্বস্তিদায়ক না হলেও রেডক্রস প্রতিনিধি দলের সফর ছিল আমাদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। রেডক্রস প্রতিনিধি দল ভারতীয়দের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতেন এবং পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ওপর ভারতীয়রা কোনো জুলুম বা বাড়াবাড়ি করছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতেন। তাদের কাছে কোনো অভিযোগ করা হলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করতেন। তারা বন্দি জীবনে পাকিস্তানি সৈন্যদের ভদ্র আচরণের প্রশংসা করেছেন।

এক পর্যায়ে ভারতীয়রা শিবিরের চারদিকে একটি দেয়াল তৈরি করতে শুরু করে। আমি প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু আমাকে জানানো হয় যে, আমার নিরাপত্তার জন্যই এ দেয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। জেনারেল পদ্ম আমাকে জানান যে, পাকিস্তান সরকার আমাকে হত্যা করার জন্য দু'জন ঘাতক পাঠিয়েছে। কলকাতায় জামশেদ নামে একজন পাকিস্তানিকে ভারতীয় গোয়েন্দারা আটক করেছে। জামশেদ স্বীকার করেছে যে, আমাকে হত্যা করার জন্য তাঁকে এবং আরো একজনকে পাঠানো হয়েছে। এজন্য ভারতের জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে জেনারেল পদ্মকে নির্দেশ দিয়েছে। শিবিরের চারদিকে ছিল প্রচুর গণ ঝোপ-ঝাড়। এগুলোর আড়ালে যে কোনো ব্যক্তি টেলিস্কোপিক রাইফেল নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। এ দেয়াল নির্মাণের পর আমি বাইরে বের হওয়া মাত্র শিবিরের বাইরের কয়েকটি চৌকিকে সতর্ক করে দেয়া হতো এবং সৈন্যরা পরিখায় প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করত। সশস্ত্র টহল দল প্রতিদিন ভোরে শিবিরের আশপাশের এলাকায় অনুসন্ধান চালাতো। লাহোরে ফিরে আসার পরও দু'বার আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়।

মেজর জেনারেল শাহ বেগ সিংকে মেজর জেনারেল পদ্মর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। শাহ বেগ ব্রিগেডিয়ার থাকাকালে ঢাকায় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি ছিলেন খুবই বন্ধুবৎসল এবং তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা প্রকাশ করেন। তিনি খোলাখুলি অভিযোগ করে যে, শিখদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা হয়েছে এবং তাদেরকে এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়েছে যেন তারা পূর্ব

পাঞ্জাবেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে না পারে। প্রথম মনে হয়েছিল যে, তিনি আমার সঙ্গে চাতুরি করেছেন। কিন্তু পরে আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি যা বলেছেন তাতে কোনো খাদ ছিল না। তিনি আমাকে খালিস্তানসহ গোটা পাঞ্জাবের একটি মানচিত্র দেখান। জেনারেল শাহ্ বেগ সিং অমৃতসরে স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সৈন্যদের অভিযানে সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালের সঙ্গে নিহত হন।

ইতোমধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতেও বেশকিছু পরিবর্তন ঘটে। লে. জেনারেল গুল হাসানকে সেনাবাহিনী প্রধান করা হয় যদিও তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল না। তার সিনিয়র সকল জেনারেল অবসর গ্রহণের আবেদন করেন। শুধুমাত্র গুল হাসানের সিনিয়র টিক্কা খান তার অধীনে কাজ করার জন্য রয়ে গেলেন। এটা এক নজিরবিহীন ঘটনা। মনে রাখা প্রয়োজন যে, গুল হাসান পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং চিফ অভ জেনারেল স্টাফ হিসেবেও তার ভূমিকা সন্তোষজনক ছিল না। তিনি ইস্টার্ন কমান্ডে একটি প্রতারণাপূর্ণ বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এবং জেনারেল ইয়াহিয়াকে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা দিয়েছিলেন।

শাহ বেগ আমাকে জানিয়েছিলেন যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার মতে এটা একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং টিক্কা খানকে পরবর্তীতে গুল হাসানের স্থলাভিষিক্ত করা হবে। আমি তার কথা বিশ্বাস করি নি, কারণ গুল হাসান ভুট্টোকে ক্ষমতায় আসতে সহায়তা করেছেন। কিন্তু ভারতীয়দের ধারণা কত সঠিক! এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পাকিস্তানি নাগরিকরা যতটুকু ভেতরে যেতে না পারে ভারতীয়রা তার চেয়েও বেশি ভেতরে ঢোকার ক্ষমতা রাখে। দৃশ্যত তারা ভুট্টোর অভিপ্রায় সম্পর্কে সচেতন ছিল, কারণ বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতায় যারা লাভবান হয় তারাও বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাস করে না। ভুট্টো গুল হাসানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যকলাপে লাভবান হয়েছিলেন এবং তার এসব কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই ভুট্টো "একজন বিশ্বাসঘাতক সবসময়ই বিশ্বাসঘাতক"–এই বহুল প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী কাজ করেন। সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পরই অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে গুল হাসানকে সেনাবাহিনী থেকে বিদায় করে দেয়া হয়।

অধ্যায় ১৫

পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন

ক্যাম্পের ছোট ও বন্দি পরিবেশে আটাশ মাস কেটে গেল। ভুট্টো যুদ্ধবন্দিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিয়োগান্ত ঘটনায় তার ভূমিকা এত বিশাল ছিল যে, তিনি তার এ ভূমিকা গোপন রাখার জন্য যুদ্ধবন্দিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে চান নি। তিনি মনে করতেন যে, যুদ্ধবন্দিদের যতদিন ভারতের ক্যাম্পে রাখা যাবে ততদিন তার ঘৃণ্য কার্যকলাপ প্রকাশ পাবে না।

জাতিকে বোকা বানাতে যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাঠাতে ভারতকে রাজি করানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের কাছে অনুরোধ জানাতে তিনি একটি মহিলা প্রতিনিধি দলকে বিদেশে পাঠান। এ মহিলা প্রতিনিধি দলে কারো কোনো রাজনৈতিক মর্যাদা ছিল না। এটা জাতির সঙ্গে বাস্তবিকভাবে একটি ঠাট্টা করা সত্ত্বেও কেউ এর প্রতিবাদ করেন নি। ভুট্টো যদি এ ব্যাপারে আন্তরিক হতেন তাহলে তিনি তাঁর পরিবারের একজন সদস্যকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতে পারতেন। একথা মনে রাখা উচিত যে, মিসেস গান্ধী তাঁর দেশের পক্ষে কথা বলার জন্য নিজেই বিদেশ সফরে যেতেন। ভুট্টো আরেকটি ছেলেমানুষি করেন। তিনি পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাঠাতে ভারত সরকারকে রাজি করাতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে এ মর্মে অনুরোধ জানিয়ে তাঁদের কাছে চিঠি লিখতে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পীদের আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দানে আমি শুধু অভিনেতা মোহাম্মদ আলীর নামই শুনেছি, যিনি রাজকাপুরকে পুরান বন্ধু হিসেবে তাঁর ডাক নাম ধরে ডাকতেন। একটি জাতির বীর যোদ্ধাদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য এর চেয়ে সস্তা ও অমর্যাদাকর উপায় আর হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মিসেস গান্ধী কেন ভুট্টোর পরিকল্পনায় সায় দেন এবং আমাদেরকে স্থায়ীভাবে না হলেও দীর্ঘদিন ভারতে রাখতে রাজি হন? ভারতে আমরা ছিলাম ব্যারাকে। অন্যদিকে, ভারতীয় সৈন্যরা বাস করতো তাঁবুতে এবং অন্যান্য অস্থায়ী বাসস্থানে। ভারতীয়রা আমাদেরকে খাওয়াচ্ছিল এবং নামমাত্র হলেও বেতন দিত। এসব ব্যয় মোটেও সামান্য ছিল না। আমরা ছিলাম শ্বেতহস্তীর মতো।

বিনিময়ে আমরা ভারতকে কিছুই দেই নি। কিন্তু কেন? ভারত কেন আমাদেরকে পুষতে গেল? ভারতীয়রা প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ইস্টার্ন গ্যারিসনের তৎপরতা দেখেছে। ভারতীয়রা যুদ্ধ করেছে এমন এক অনুকূল পরিবেশে ইতিহাসে যা কখনো কোনো সেনাবাহিনীর ভাগ্যে জোটে নি। তবু তারা তাদের মিশনের একটি লক্ষ্য অর্জন করতে পারে নি। ইন্দিরা গান্ধী চান নি যে, যুদ্ধ করার মানসিকতা ও সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত পাকিস্তানি সৈন্যরা দেশে ফিরে যাক। যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ভারতীয় হেফাজতে তাদের পচিয়ে মারতে চেয়েছিলেন। মিসেস গান্ধী কোনো এক ঘটনায় বলে ফেলেছিলেন যে, পাকিস্তানের তিনটি ক্র্যাক ডিভিশনকে তিনি পাকিস্তানে ফিরে যেতে দিতে পারেন না। মেজর জেনারেল লক্ষণ সিং লিখেছেন :

'পাকিস্তানের পদাতিক বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লড়াই করেছে। তারা আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রদর্শন করেছে এবং তাদের জুনিয়র অফিসার ও নন-কমিশন্ড অফিসারগণ দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা ভূমি ও অস্ত্রশস্ত্রেরও চমৎকার সদ্ব্যবহার করেছে।'

(দ্য ইন্ডিয়ান সোর্ড স্ট্রাইকস ব্যাক)

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আরেকটি প্রশ্ন দাঁড়ায়, যদি ভুট্টো আমাদেরকে ফিরিয়ে নিতে চাননি এবং মিসেস গান্ধীও আমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে চান নি, তাহলে আমরা দেশে ফিরলাম কিভাবে? বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত তার কোনো মর্যাদা ছিল না। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের লক্ষ্যে লাহোর দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করা হয় এবং এ সম্মেলনের অজুহাতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রয়োজন ছিল জাতিসংঘের সদস্য পদ। 'জাতিসংঘে বাংলাদেশকে সদস্য করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে চীন ভেটো প্রয়োগের হুমকি দেয় এবং জানিয়ে দেয় যে, ভারতে বন্দি পাকিস্তানি সৈন্যদের মুক্তি দেয়া না হলে সে বাংলাদেশেকে জাতিসংঘের সদস্য হতে দেবে না। চীনের এ হুমকিতে ভারত যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়" (ডন, করাচি, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৩)। সুতরাং ভারত আমাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং ভুট্টোকে তা মেনে নিতে হয়।

যখন জানাজানি হলো যে আমরা দেশে যাচ্ছি, তখন জেনারেল শাহ বেগ সিং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, অফিসারদের দুটি দলে পাঠানো হচ্ছে কিনা। আমি তাঁকে জানালাম যে, মেজর জেনারেল ফরমান, অ্যাডমিরাল শরীফ ও এয়ার কমোডর ইনামকে প্রথম ব্যাচে পাঠানো হবে এবং আমি ও আমার ডিভিশনাল কমান্ডারগণ যাব দ্বিতীয় ব্যাচে। আমি তাঁকে আরো জানালাম যে, গ্যারিসনের

কমান্ডার হিসেবে আমি সবার পরে পাক-ভারত সীমান্ত অতিক্রম করব। কিছুদিন পর শাহ্ বেগ সিং আমার কাছে এসে বললেন যে, দিল্লীর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নয়। কারণ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল ফরম্যান ও মজিদকে অন্যান্য জেনারেলদের আগে পাঠাতে বলেছেন। তিনি আমাকে আরো জানান যে, তিনি তাঁর নিজস্ব সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন যে, আলোচনা ও ব্রিফিং-এর জন্য এ দু'জন জেনারেলকে টিক্কা খানের প্রয়োজন। ফরমানকে সবার আগে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে টিক্কার আগ্রহের কারণ হচ্ছে যে, ফরমান ছিলেন তারই মতো একজন আর্টিলারি অফিসার এবং তিনি ২৫ মার্চ বাঙালিদের বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে টিক্কাকে সহায়তা করেছিলেন। মেজর জেনালের হাজী মজিদ ছিলেন লে. জেনারেল আব্দুল হামিদের (চতুর্থ কোর কমান্ডার) ছোট ভাই। জেনারেল হামিদ লাহোরে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে অফিসারদের প্ররোচিত করেছিলেন। যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে কাজী মজিদের ভূমিকা চরম বিশৃঙ্খলপূর্ণ হওয়ায় আমি তাঁকে কমান্ড থেকে অপসারণ করেছিলাম। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় কাউকে তাঁর জায়গায় পাঠানো সম্ভব হয় নি। তবে আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে অবহিত করেছিলাম।

এটা স্পষ্ট যে, এ দু'জন সন্দেহভাজন জেনারেলকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের ইশারায় আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করার জন্য একটি সংগঠিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছিল। ফরমান "জাতিসংঘ সিগনাল কেস"-এ জড়িত ছিলেন। তিনি আমার ও গভর্নরের অনুমতি ছাড়া ফরাসি, ব্রিটিশ, রুশ ও মার্কিন প্রতিনিধির পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জেনারেল নজর যে রাতে আক্রান্ত হন সে রাতে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। তাকে ১৬ ডিভিশনের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলাম আমি। রুশ ও ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় তিনি একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। মজিদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমার নির্দেশ অমান্য করেন, তিনি তাঁর সৈন্যদের একটি অংশকে মেঘনা নদীর পূর্ব পাড়ে রেখে ভৈরব সেতু উড়িয়ে দেন। ভৈরব সেতুর প্রতি তখন আদৌ কোনো হুমকি ছিল না। তাঁকে নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান গ্রহণের জন্য ঢাকা পিছু হটার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি এ নির্দেশ অগ্রাহ্য করেন। শত্রুরা যখন মেঘনা নদীর এপারে হেলিকপ্টার থেকে সৈন্য নামায় তখন তিনি তাদের বাধা দেন নি। শত্রুরা ছিল তাঁর আর্টিলারির পাল্লার আওতায়। এসব ক্ষমাহীন অপরাধ সত্ত্বেও ফরমান ও কাজী মজিদকে সবার আগে ভারতের বন্দিশালা থেকে বের করে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। ফরমান জব্বলপুরে আমাদের শিবিরের গোয়েন্দা কর্মকর্তা কর্নেল রান্ধাবার সৌজন্যে পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ কয়েকটি টেলিফোন করেন।

আমাদেরকেও টেলিফোন করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ফরমান ছাড়া আমাদের কেউ এ সুযোগ গ্রহণ করেননি। শিবিরের একজন স্টাফ আমাকে জানায় যে, ফরমান রাওয়ালপিন্ডিতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে কারো সঙ্গে কথা বলেছেন। শেষ পক্ষকালে কর্নেল রান্ধাবা নিয়মিত ফরমান ও মজিদের কাছে আসতেন। ফরমান ও মজিদ মানিকজোড়া হয়ে একসঙ্গে থাকতেন, একসঙ্গে হাঁটতেন এবং দু'জন একান্তে সারাক্ষণ কথা বলতেন।

দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল দ্রুত। আমাদের স্যুটকেসে মালপত্র গোছানো শুরু হয়। প্রত্যেকের মুখে তৃপ্তির হাসি, দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা ও দুর্দশার পর তারা তাদের পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে।

পাকিস্তানে পৌঁছেই ফরমান ও মজিদ জেনারেল টিক্কার সঙ্গে হাত মেলান। কিন্তু এ দু'ব্যক্তি আমাকে, তাদের সহযোদ্ধাদের এবং ইস্টার্ন কমান্ডকে অপমানিত করতে যে ভূমিকা রেখেছেন তা মুছে যাবার নয়। তারা যে ক্ষতি করছেন তা অপূরণীয়। ফরমানের ক্যারিয়ারের কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। মজিদকেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লোভনীয় চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু যারা চরম দুঃসময়ে নিজের জীবন বাজি রেখে রণাঙ্গনে প্রবল পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাদের প্রত্যেককে অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করা হয়।

ফরমান ও মজিদের তুলনায় অন্যান্য জেনারেলগণ উঁচু নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বেলুচিস্তানে পিএনএ'র নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হলে আমি জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভূমিকা উন্মোচন করি। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কয়েকজন জেনারেলকে আমার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে উস্কানি দেন। ভুট্টোর আত্মীয় ও মন্ত্রী মমতাজ ভুট্টো জেনারেল আবদুল হামিদ ও জেনারেল মিঠার সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদেরকে আমার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে চাপ দেন। তাঁদেরকে পুরস্কৃত করার লোভও দেখানো হয়। কিন্তু তারা সরাসরি অস্বীকৃতি জানান। অফিসারদের মধ্যে কী বৈসাদৃশ্য! তাদের কেউ কেউ কত স্বার্থপর ও নিচ এবং কেউ কেউ কত মহৎ ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। হামিদ ও মিঠা ছিলেন জান্তার অংশ। কিন্তু তাঁরা আমার বিরুদ্ধে যান নি। অন্যদিকে, ফরমান ও কাজী মজিদ ছিলেন আমার কমান্ডে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দু'জন আমার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়। ভারত থেকে ফিরে আসার পর জেনারেল পীরজাদা আমাকে জানান যে, ভুট্টো আমাদের কারো বিচার করবেন না। তিনি ইস্টার্ন কমান্ডের কোনো অফিসার অথবা পশ্চিম পাকিস্তানি জান্তার কোনো শীর্ষ কর্মকর্তার গায়ে আঁচড় কাটলে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে। সামরিক আদালতে কারো বিচার হয় নি। শুধুমাত্র আমাকে ও আমার চিফ অভ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকীকে বলির পাঁঠা বানানো হয় এবং সামরিক আদালতে আমাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের

কোনো সুযোগ দেয়া হয় নি।

অবশেষে উপস্থিত হয় মুক্তির দিন। আমাদের মুখে হাসি এবং অন্তরে আনন্দের বন্যা। আমরা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রেনে ওঠার জন্য জব্বলপুর রেল স্টেশনের পথে রওনা হই। আমাদের শিবিরের কর্মচারী ও জব্বলপুর ক্যান্টনমেন্টের সিনিয়র অফিসারগণ আমাদের বিদায় জানান। জেনারেল শাহ বেগ সিং আমাকে বিদায় জানাতে এসে বলেন, "আমি দুঃখিত স্যার। আপনার সুনাম ধ্বংস করা হয়েছে। তাঁরা ১৯৭১-এর বিপর্যয়ের গোটা দোষ আপনার ও আপনার কমান্ডের ওপর চাপিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে।" আমি বললাম, "আপনাকে ধন্যবাদ। আল্লাহই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। মানুষ তাঁর ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে না।" একথা বলে আমি বিদায় নিলাম। গার্ড সবুজ পতাকা উড়িয়ে সংকেত দেয়। ট্রেন ধীরে ধীরে পাকিস্তানের পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

ট্রেন সামনের দিকে এগিয়ে যাবার সময় জব্বলপুরের বিজলি বাতিগুলোকে হাজার তারার মতো মনে হলো। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে বাতিগুলো। ট্রেনের বাতি ছাড়া সবকিছু অন্ধকারে তলিয়ে যায়। এ অনুজ্জ্বল বাতিতে রেলওয়ের আশপাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। নীরব প্রকৃতির ধ্যানে যেন ব্যাঘাত ঘটছিল। কম্পার্টমেন্টে আলো-আঁধারির মাঝে আমাদের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি বার বার হোঁচট খাচ্ছিল। ভুট্টো ইয়াহিয়াকে অপসারণ করে তাঁর উচ্চাকাঙক্ষা চরিতার্থ করেছেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে জ্বলতে-পুড়তে দেখেছেন এবং এ বিপর্যয় লক্ষ্য করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাই ভস্মের ওপর তিনি তাঁর ভাগ্য গড়েছেন। এ ছাই-ভস্ম থেকে তিনি মুকুট তুলে মাথায় পরেছেন। তার ভাগ্যে লেখা হয়েছিল যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা হবেন।

মানব ইতিহাসে এমন লোক খুব কমই আছেন যিনি ইতিহাসকে এত জঘন্যভাবে বিকৃত করেছেন। তিনি অকুতোভয় ইস্টার্ন কমান্ডকে কলংকিত করার জন্য বানানো কাহিনী ও মিথ্যাচার দিয়ে ইতিহাসকে সাজিয়েছেন। শুধুমাত্র ক্ষমতার লিপ্সা থেকেই তিনি এ কাণ্ড করেছেন। ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড এবং পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার পেছনে তার অনস্বীকার্য ভূমিকা আড়াল করার জন্য তাঁর কাউকে বলির পাঁঠা বানানোর প্রয়োজন ছিল। তিনি একজন সংহারক থেকে একজন নির্মাতা, উগ্র আত্মকেন্দ্রিক দেশপ্রেমিক থেকে একজন বিনম্র ব্যক্তি এবং সামন্ত প্রভু থেকে দরিদ্র জনগণের বন্ধু হিসেবে পরিচিতি হতে চেয়েছিলেন। তিনি ইস্টার্ন কমান্ডের ওপর পুরো দোষ চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন। যে ইস্টার্ন কমান্ডের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়া হয় সেই ইস্টার্ন কমান্ড গেরিলা যুদ্ধে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, বিরাট বাধা-বিপত্তি ও নজিরবিহীন প্রতিকূলতার ভেতর লড়াই করেছে, সামান্য শক্তি নিয়ে সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করেছে। তাদের কোনো আরাম-আয়েশ, বিশ্রাম ও খাদ্য ছিল না। কোনো দিক থেকে সহায়তা পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। তাদেরকে

তাদের নিজ দেশের প্রেসিডেন্ট পরিত্যাগ করেছিল এবং প্রাদেশিক সরকারও তাদের ত্যাগ করেছিল। কিন্তু তাদের সাহস, তাদের আত্মত্যাগ, তাদের অসামান্য অবদান সবকিছু ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হয়।

১৯৭৪ এর ৩০ এপ্রিল খুব ভোরে ট্রেন ওয়াগাহ্ পৌঁছে। ওয়াগাহতে ভারতীয়রা সীমন্তের খুব কাছাকাছি তাঁবু ফেলেছে। পাকিস্তানে প্রবেশ করার আগে আমাদের চা পান করানো হয়। আমি সবার শেষে পাকিস্তান ভূখণ্ডে প্রবেশ করি। আমাদের বন্দিদশার কাল ছিল আটাশ মাস। পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭১-এর মার্চ থেকে হিসাব করলে দাঁড়ায় তিন বছর।

ওয়াগাহতে পাকিস্তান সীমান্তে সুদৃশ্য শামিয়ানা টানানো হয়। সেখানে সবচেয়ে উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল কাজী মজিদের বড় ভাই চতুর্থ কোর কমান্ডার লে. জেনারেল আবদুল হামিদ। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল টিক্কা খান রহস্যময় কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। আমি পাকিস্তানে প্রবেশ করা মাত্র আনজুম নামে একজন ব্রিগেডিয়ার আমাকে অভিবাদন করেন এবং বলেন, 'স্যার, প্রেসের কাছে কোনো বিবৃতি দেবেন না।' এরপর তিনি '১নং' লেখা সম্বলিত প্রায় চার ইঞ্চি দীর্ঘ আয়তাকার একটি কার্ড বোর্ড বাড়িয়ে দেন। তিনি আমাকে এটি বুকে এঁটে নিতে বলেন যাতে ছবি তোলা যায়। আমি তখন জানতে চাই যে, এ ব্যবস্থা কি শুধু আমার জন্য, না অন্যান্যদের জন্যও। তিনি বললেন যে, এ ব্যবস্থা অন্যান্য জেনারেলদের জন্যও। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম যে, ইতোমধ্যে কারো ছবি তোলা হয়েছে কিনা এবং কে এ ধারণা দিয়েছেন। জবাবে তিনি জানালেন যে, অন্য কারো ছবি তোলা হয় নি। আমি জানতাম যে, এটা ছিল টিক্কার নির্দেশ। ভারতেও আমরা এ ধরনের অপমানের শিকার হই নি। আমি খুব রেগে যাই এবং আনজুমকে আমার সামনে থেকে সরে যেতে বলি। ঠিকই তিনি সরে যান। তখন জেনারেল হামিদ আমার দিকে এগিয়ে আসেন এবং পত্রিকায় কোনো বিবৃতি না দিতে ও ভারতের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিশোধ নেব এমন কোনো কথা বলতে নিষেধ করেন। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'এটা নয়া সরকারের নীতি।'

টিক্কার অনুপস্থিতি থেকে আমরা আমাদের প্রতি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও সরকারের মনোভাব আন্দাজ করতে সক্ষম হই। সত্যিই মর্মাহত হই আমি। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময় কাজ করেছি আমি এবং একে অপরকে ভালোভাবে চিনি। হয়তো তিনি ইস্টার্ন কমান্ড এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত হওয়ার জন্য আমাকে দায়ী করেছেন। আমি কখনো চিন্তা করি নি যে, এত পরে বিশেষ করে তিনি যখন সেনাবাহিনী প্রধান তখনো আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবেন। সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে তিনি তাঁর জুনিয়রদের অভিভাবক ও রক্ষক। ভারতে যুদ্ধবন্দি হিসেবে চরম দুর্ভোগ সয়ে দেশে ফিরে এসেছি। এমন একটি পরিস্থিতিতে আমার মতো একজন ব্যক্তির মনের অবস্থা কী হতে পার তা সহজেই অনুমেয়। টিক্কার অনুপস্থিতিতে সরকারের অসন্তুষ্টি প্রকটভাবে ধরা পড়ে। ভুট্টোর ঔদ্ধত্য ছিল

বোধগম্য। কিন্তু টিক্কার দৃষ্টিভঙ্গি সন্দেহজনক। ভারতে আমাদেরকে জব্বলপুর সেনানিবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিদায় জানান। কিন্তু আমার স্বদেশ আমার মাতৃভূমিতে আমাকে অভ্যর্থনা জানান আমার একজন জুনিয়র অফিসার।

কিছুদিন পরই স্পষ্ট হয়ে ওঠে টিক্কার ভূমিকা। সশস্ত্র বাহিনী যাতে কখনো ভুট্টোর প্রতি হুমকি হয়ে উঠতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য টিক্কা ও ভুট্টো উভয়ে সশস্ত্র বাহিনীকে হেয় ও খাটো করার তোড়জোড় শুরু করেন। হামুদুর রহমান কমিশন বাংলার কসাই টিক্কাকে অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়। অথচ এর আগে এক ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ভুট্টো ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রক্তাক্ত সামরিক অভিযানের জন্য টিক্কাকে দোষারোপ করেছিলেন।

ওয়াগাহ অভিমুখী সব পথ পুলিশ অবরোধ করে রাখা সত্ত্বেও লাখ লাখ লোক আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে হাজির হয়েছিলেন। আমরা শামিয়ানার নিচে বিশ্রাম করার জন্য এলে হাজার হাজার লোক শ্লোগান দিতে থাকে, "আমাদের গাজী জেনারেল নিয়াজিকে দেখতে দাও।" দূর-দূরান্ত থেকে এমনকি উপজাতীয় এলাকা থেকেও লোকজন এসেছিল। জনতার ভিড় দেখে জেনারেল হামিদ ভড়কে যান এবং সটকে পড়েন। তিনি পুনরায় এলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, তিনি কোথায় গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, যে, ওয়াগাহ থেকে ৮ মাইল দূরে শালিমার গার্ডেন পর্যন্ত সকল রাস্তা লোকে-লোকারণ্য হওয়ায় গাড়ি নিয়ে লাহোর পৌছানো সম্ভব নয়। তাই আমাকে হেলিকপ্টারে করে লাহোর বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। লাহোরে এলাম। আমার বাসভবনের বাইরেও জনতা ভিড় করে। আমি গাড়ি থেকে নেমে কারো কারো সঙ্গে করমর্দন করি এবং বাদবাকিদের হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাই। অনেকে মিষ্টি, ফুলের মালা প্রভৃতি নিয়ে এসেছিল। উপহার সামগ্রীর পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, এগুলো রাখার জন্য আমাদেরকে একটি রুম খালি করে দিতে হয়। আমি ১০ দিন লাহোরে ছিলাম এবং প্রতিদিন আমার বাসভবনে প্রচুর লোকজন আসতো।

আমি মারি-ইন্দাস ট্রেনে মিয়ানওয়ালির পথে যাত্রা করি। লাহোর থেকে ট্রেন ছাড়ে রাত আটটা প্রতিটি স্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য লোকজন ছুটে এসেছিল। সে রাতে ঘুমাতে পারি নি আমি। প্রতিটি স্টেশনে থামি এবং জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ি। ট্রেন মিয়ানওয়ালি জেলায় প্রবেশ করলে জনতার ভিড় আরো বেড়ে যায়। লোকজন ঢোল ও বাঁশি নিয়ে এসেছিল এবং আনন্দে নাচছিল। ট্রেন মিয়ানওয়ালি স্টেশনে এসে থামে। কিন্তু সেখানে ছিল শুধু পুলিশ। এসপি এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করেন। আমি লোকজনকে স্টেশনে আসতে না দেয়ার কারণ সম্পর্কে জেলা প্রশাসককে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, 'সরকারি হুকুম।' আমি তখন বললাম, 'ডিসি সাহেব, আমি একজন আইন মান্যকারী নাগরিক এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন দায়িত্বশীল অফিসার। এটা বাড়াবাড়ি। লোকজনকে আসতে দিন।' তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন। আমি তখন তাঁকে বললাম যে, আমি অবশ্যই লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আমি তাঁকে গোলযোগ এড়ানোর জন্য

তাঁর লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে বললাম। কিন্তু তিনি আমার উপদেশ রক্ষা করেন নি। আমাকে যারা অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারও ছিলেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁরা ছুটি নিয়েছিলেন।

আমি হাত দিয়ে ইশারা দিই তাদেরকে। মুহূর্তের মধ্যে তারা পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের রাইফেল কেড়ে নেয়। আক্ষরিকভাবে তারা পুলিশকে লৌহ বেষ্টনীর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমার লোকজন সশস্ত্র হওয়ায় পুলিশ গুলি চালানোর সাহস পায় নি। এরপর এসপি ও ডিসি ঘটনাস্থল থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। গোটা শহর আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে আসে। সেদিন কেউ কারো কাজে যায় নি, কেউ অফিস করে নি। কোনো দোকানপাটও খোলে নি। এখানে প্রতিদিন অসংখ্য লোক আমাকে দেখতে আসতো। অধিকাংশই ছিলেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত লোক।

আমার জনপ্রিয়তা দেখে ভুট্টো ভয় পেয়ে যান এবং আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। জেনারেল হিসেবে প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তিনি আমাকে এক বছরের বেশি সময় সেনাবাহিনীতে রাখতে চেয়েছিলেন।

দশ দিন ছুটির পর হামুদুর রহমান কমিশনের জন্য রিপোর্ট তৈরি এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রিপোর্ট করার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে আমাকে ডাকা হয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। আমি তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য অথবা উৎসাহ পাই নি। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও গভর্নর মালিক এবং আমার হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল হেড কোয়ার্টাসের মধ্যে যেসব বার্তা বিনিময় হয়েছিল সেগুলো দেয়ার জন্য জেনারেল টিক্কাকে অনুরোধ করি। তিনি এসব বার্তা আমাকে সরবরাহ করতে পারেন নি। কারণ এগুলো ছিল ভুট্টোর কাছে। আমি প্রধান বিচারপতি হামুদ-উর-রহমানের কাছেও আবেদন করি। তিনিও ভুট্টোর কাছ থেকে এসব দলিল উদ্ধার করতে পারেন নি। আত্মসমর্পণের নির্দেশ পাবার পর আমরা আমাদের সকল রেকর্ড ধ্বংস করে ফেলি। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ১৯৭১-এর সংকটের ওপর বই লেখার জন্য মেজর জেনারেল মুকিমকে সকল সুবিধা এবং আমাদের সকল দলিলপত্র সরবরাহ করে। আমি সেনাবাহিনীতে চাকরিরত থাকা সত্ত্বেও আমার রিপোর্ট তৈরিতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের সহযোগিতা পাই নি। পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি জনাব মোজাফফর হোসেন আমার নিজের ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং গভর্নর ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে কয়েকটি বার্তার কপি আমাকে দিয়েছেন। এসব কপি আমার রিপোর্ট তৈরিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। তার একটি বিরাট উদারতা এটা।

অধ্যায় ১৬

হামুদ-উর-রহমান কমিশন

কখনো পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী জনগণের কাছে প্রকাশ করা হয় নি। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও সরকার ব্যর্থ হয়েছে প্রদেশের বাস্তবতা জনগণের সামনে তুলে ধরতে। তাই তারা পারে নি পরিস্থিতিকে এর যথাযথ প্রেক্ষিতে বিচার করতে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও সরকার ছিল ঘটনাস্থল থেকে বহু দূরে। সৈন্যরা সেখানে কী পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে তা তাদের বোঝার কথা নয়। জনগণকে মিথ্যা সংবাদ ও মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এতে ফুলে ফেঁপে ওঠে তাদের প্রত্যাশা। বেড়ে যায় আশা। বিপর্যয়ের সংবাদ প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দেয় জনগণের বিবেককে। এ দুঃসংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না তারা। এতে তাদের আশা ভেঙে যায় এবং ধূলিসাৎ হয়ে যায় অহংকার। ক্ষোভ ওঠে চরমে তাদের। জাতিকে গ্রাস করে গভীর হতাশা। তাদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে হবে এবং এটা অপরিহার্যও ছিল। এ পটভূমিতে গঠন করা হয় হামুদ-উর-রহমান কমিশন।

জনগণের দাবি ছিল বিশ্বাসঘাতকদের ফাঁসিতে ঝুলানো। ১৯৭১-এর ২০ ডিসেম্বর তারা নেমে আসে রাস্তায়। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টোকে জিজ্ঞেস করা হয়, "ইয়াহিয়া খানের কি বিচার করা হবে?"জবাবে তিনি বলেন যে, বিশ্বাসঘাতকদের বিচার করার জন্য যারা আওয়াজ তুলেছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ইতোমধ্যেই তারা পরাজিত হয়েছে। যখন বলা হলো যে, জাতি তাদের ফাঁসি চায়। তিনি বললেন, "আমি এর অংশ হতে চাই না।"

জনগণের দাবি এত প্রবল ছিল যে, তা উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সময়ক্ষেপণে ভুট্টোর অবস্থান নাজুক হয়ে উঠবে। তাকে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণে এ উভয় সংকট থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ১৯৭১-এর ২৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভেঙে যাবার বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো তদন্তে ভুট্টো নয়া প্রেসিডেন্ট ও বেসামরিক সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে প্রধান বিচারপতি হামুদ-উর-রহমানের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন।

সর্বস্তরের মানুষ এ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। জনগণের দাবি

পূরণ করা হয়েছে। এটা ছিল একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন। আশা করা হয়েছিল যে, এ কমিশন ভয়-ভীতি ও পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কাজ করবে। জাতি কমিশনের ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে। যুদ্ধবন্দি শিবিরে থেকেও আমরা খুশি হয়েছিলাম। একজন প্রধান বিচারপতি এ ঘটনার নিষ্পত্তি করবেন। সত্যের জয় হবে, সত্য প্রকাশিত হবে এবং প্রকৃত দোষীদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং অশুভ মেঘ কেটে যাবে। কিন্তু হামুদ-উর-রহমান কমিশন একটি প্রহসনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপ্রধান কমিশনের শর্তাবলী নির্ধারণ করেন। এসব শর্তের আওতায় কমিশনকে শুধু ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার ও তার কমান্ডের আওতায় সশস্ত্র বাহিনী কোন পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণ এবং পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত এবং জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্ত বরাবর যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, ততটুকু তদন্ত করার ক্ষমতা দেয়া হয়।

তদানীন্তন সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল গুল হাসান শর্ত আরোপ করে তদন্ত কমিশনের হাত-পা বেঁধে দেয়ার বিরুদ্ধে কোনো শব্দটি করেননি। গুল হাসান ও টিক্কা দুজনেই পূর্ব পাকিস্তানে বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ছিলেন। তাই তদন্ত কমিশনের সীমানা সংকুচিত হওয়ার তারা সন্তুষ্ট হন। বস্তুতপক্ষে, তাদেরকে ছাড় দেয়ার জন্যই কমিশনের তদন্ত কাজে শর্তারোপ করা হয়। ভুট্টোর ওপর চাপ দেয়া ছিল গুল হাসান ও টিক্কার নৈতিক দায়িত্ব। এ চাপ দিয়ে তারা পাকিস্তান ও সশস্ত্র বাহিনীর বিরাট উপকার করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, স্বার্থ ও উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার জন্য জাতি ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রতারণা করেন। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন হওয়ার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা কমিশনের কখনো লক্ষ্য ছিল না। জনগণের আবেগ-অনুভূতিকে ধামাচাপা দেয়াই ছিল কমিশনের কাজ। কমিশন সুচিন্তিতভাবে গোপন করেছে বেশি এবং প্রকাশ করেছে কম। একজন ক্ষমতালিপ্সু লোকের ঘৃণ্য তৎপরতা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এটাকে একটি বলির পাঁঠা খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ ক্ষমতালিপ্সু লোকটি একটি জাতির এমন ক্ষতি করেছে যা কখনো পূরণ হবার নয়। খুব সাদামাটা দৃষ্টিতেও শর্ত আরোপের অসৎ উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। কমিশনের এক্তিয়ার সামরিক তৎপরতা বিশেষ করে পূর্ব রণাঙ্গনে সামরিক তৎপরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এ সামরিক তৎপরতাকে মূল জাতীয় যুদ্ধ পরিকল্পনা থেকে আলাদা করে বিচার করা হয়। যেসব ঘটনা পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য দায়ী সেসব ঘটনাকে কমিশনের দায়িত্বের বাইরে রাখা হয়। রাজনৈতিক সংকটেই এ বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু কমিশনকে রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ ও রাজনেতিক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হয় নি। ক্ষমতালিপ্সুদের প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতায় জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু এসব তৎপরতা ছিল কমিশনের এক্তিয়ার বহির্ভূত।

ক্ষমতা লিপ্সার জন্যই ঘটেছে সর্বনাশ। রাজদণ্ড ও রাজসিংহাসন দখলে দেশের অর্ধেক খোয়ানো হয়েছে। ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা থেকে সরে যাওয়া ভুট্টোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সত্যকে মিথ্যা বানানো ক্ষমতার রাজনৈতিক খেলায় খুবই সামান্য পাপ।

"এ ভয়াবহ নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে ভুট্টোর একজন জীবনী লেখক চমৎকারভাবে বলেছেন যে, ১৯৭১ এর বিপর্যয়ের জন্য ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভুট্টোই দায়ী। তবে অনেকেরই অভিমত এই যে, এ তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ হিসেবে ভুট্টোকেই এ ঘটনার সিংহভাগ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কেননা, তাঁর কর্মকাণ্ডের পরিণাম সম্পর্কে ধারণা করার মতো তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন।"

(সালমান তাসির, আ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি, ২৩ ও ২৬ জুলাই, ১৯৮৬, দৈনিক ডন-এ এ. টি. চৌধুরী এ উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন)

যদি ভবিষ্যতে প্রয়োগের জন্য সামরিক শিক্ষা আহরণ অথবা সামরিক কর্মকর্তাদের তৎপরতা মূল্যায়ন করা কমিশনের লক্ষ্য হতো তাহলে বিষয়টি ছিল ভিন্ন। পেশাগত যোগ্যতা ও প্রশ্নাতীত সততার অধিকারী সামরিক বিশেষজ্ঞদের ওপর এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা অপরিহার্য ছিল। তদন্তের সীমারেখা বেঁধে দেয়ায় তাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ উঁকি দেয়। তারা সুস্পষ্টরূপে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কয়েকজন অফিসারকে বলির পাঁঠা বানানো হবে।

"এসব ঘটনায় যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তারাই তদন্তের শর্তাবলী ঠিক করায় এতে দুটি বড় রকমের ত্রুটি লক্ষ্যণীয়। প্রথমত তারা পেশাগত সামরিক বিষয়াদিতে তদন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীকে তদন্তের আওতায় রেখেছেন। প্রথম ছাড় দেয়ার লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে রক্ষা করা এবং দ্বিতীয় ছাড় দেয়ার লক্ষ্য হচ্ছে মিলিটারি হাই কমান্ডের কার্যকলাপ গোপন রাখা। এসব ছাড় দেয়ার কারণ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কারণ, যে রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব তদন্তের এসব শর্ত নির্ধারণ করেছেন তারাই পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। এ ধরনের ছাড় দেয়ার বিপর্যয়ের জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করা আদৌ সম্ভব হবে না। পূর্ব পাকিস্তানের কমান্ডার ও তার সৈন্যদের অভিযুক্ত করাই মূল নায়কদের জন্য সুবিধাজনক। এজন্য তদন্তের সীমারেখা বৃদ্ধি করা হয় নি।"

(দ্য মুসলিম, ইসলামাবাদ, জানুয়ারি ১৯৯১)

আশংকা অনুযায়ী হামুদ-উর-রহমান কমিশন একটি প্রহসনে পরিণত হয়।

জাতীয় পর্যায়ে এটা ছিল একটি হাস্যকর তদন্ত। বিপর্যয়ের দুই মূল নায়ক ভুট্টো ও টিক্কা দৃঢ়ভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। নিজেদের মধ্যে তারা রাষ্ট্রের দুটি শীর্ষ পদ ভাগাভাগি করে নেন। একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শীর্ষ রাজনৈতিক পদ এবং আরেকজন সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদ দখল করেন। ক্ষমতার অলিন্দ থেকে তারা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন।

লোকজন স্বার্থের মোহে নয়তো চাপের মুখে কমিশনের কাছে জবানবন্দি দেন। পুরোপুরি দায়মুক্ত করা হয় টিক্কাকে। রিপোর্টে তার নাম উল্লেখ করা হয় নি। ভুট্টো নিজের নির্দোষিতা নিশ্চিত করেন। ব্যর্থতা ক্ষমা করা যায়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করা যায় না। মরহুম খ্যাতিমান সাংবাদিক জনাব এ.টি. চৌধুরী তার অনুসন্ধানী রিপোর্টে লিখেছেন :

"পিপিপি'র হোমরা-চোমড়ারা হামুদ-এর রিপোর্টকে শুধু প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতেই পরিণত করে নি, তারা 'একপেশে, সংক্ষিপ্ত ও পক্ষপাতদুষ্ট' প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করে এ রিপোর্টের নিন্দাও করেছে। রিপোর্টকে অপর্যাপ্ত দেখে ভুট্টোর লোকজন তাদের নেতাকে দোষারোপ না করে পারেন নি। বস্তুত তদন্ত কমিশন গঠন করার সময় ভুট্টো সতর্ক ছিলেন যাতে এ কমিশনের পরিধি সীমিত থাকে এবং এজন্য তিনি শর্ত বেঁধে দিয়েছিলেন।

সন্দেহাতীত সূত্রের ভিত্তিতে যে কেউ একথা বলতে পারে যে, এ তদন্ত কমিশনকে তাদের তদন্ত সামরিক বিপর্যয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার এবং আত্মসমর্পণের কারণ বিশেষভাবে সামরিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী রাজনৈতিক পটভূমি উদ্ঘাটন না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বিচারপতি হামুদুর রহমান ঢাকার পতন ঘটার আগে পরিস্থিতির সামগ্রিকতাকে পুংখানুপুংখভাবে তলিয়ে দেখার জন্য তদন্তের সীমানা বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু তাকে রাজনৈতিক বিষয়ে নাক না গলানোর জন্য কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়।"

(ডন, করাচি, ২৩ ও ২৬ জুলাই, ১৯৮৬)

যেহেতু যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির একটি সম্প্রসারিত অংশ, তাই পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকটের ফলে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সামরিক অভিযান একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ ও পাকিস্তানের ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করে। কিন্তু হামুদ-উর-রহমান কমিশনকে রাজনৈতিক বিষয়ে তদন্ত করতে দেয়া হয় নি। আমি যতবার কমিশনের মুখোমুখি হয়েছি ততবারই রাজনৈতিক ব্যর্থতার উদাহরণ দিয়ে কমিশনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, এটা সামরিক নয়, একটি রাজনৈতিক বিপর্যয় ও সংকট। কিন্তু প্রতিবারই কমিশন বলতো যে, রাজনৈতিক বিষয় তদন্তযোগ্য নয়। রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে সামরিক তৎপরতাকে আলাদা করা সম্ভব নয়। রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক সমস্যা

নিয়ে দেন-দরবার করেন। তারা ব্যর্থ হলে সামরিক ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং রাজনৈতিক নিষ্পত্তির মধ্য দিয়ে সামরিক তৎপরতার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। জনাব এ. টি. চৌধুরী আরো লিখেছেন:

'হামুদ কমিশনের স্পন্সর সুপার পলিটিশিয়ান যদি এ কমিশনের পরিধি নির্ধারণ করে থাকেন এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী এড়িয়ে যাবার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যারা ক্ষমতার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন তাদের অপকর্ম আড়াল করা জন্যই এ রিপোর্টকে অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছে।"

এ কমিশনের পরিধি সামরিক তৎপরতা বিশেষ করে পূর্ব রণাঙ্গনের সামরিক তৎপরতা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়। কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক তৎপরতাকে এর আওতায় আনা হয় নি। এটা অন্যায় এবং এর উদ্দেশ্য উচ্ছে ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার ও তার সৈন্যদের ক্রুশবিদ্ধ করা। ভৌগলিক বাস্তবতাকে বিচেনায় রেখে উভয় রণাঙ্গনের জন্য অভিন্ন জাতীয় যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পারস্পরিক সম্পর্কে বজায় রেখে যুদ্ধ করার কথা ছিল। একথা সত্য না হলে বলা হতো না যে, "পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানে করা হবে" এবং হাই কমান্ডও পূর্ব রণাঙ্গন থেকে পশ্চিমে ভারতীয় সৈন্যদের সরিয়ে নেয়ার সুযোগ না দিতে আমাকে নির্দেশ দিত না। হাই কমান্ডের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আমাকে ভারতের ২০ ডিভিশনের বিরুদ্ধে আমার পরিকল্পিত অভিযান বন্ধ রাখতে হয় এবং ভারতের ৬ ডিভিশনকে ব্যস্ত রাখার জন্য দিনাজপুর-সৈয়দপুর এলাকায় আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। ভারতের ৬ ডিভিশনকে পশ্চিম রণাঙ্গনে স্থানান্তর করার কথা ছিল। অভিন্ন পরিকল্পনার আওতায় যুদ্ধ না হলে লড়াই চালিয়ে যাবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমাকে অস্ত্র সংরবরণ করতে হতো না। প্রথমে আঘাত হেনেও ভারতীয় সৈন্যদের অগ্রযাত্রা রোধে আমাদের অক্ষমতার জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে আমরা পরাজিত হই।

জাতীয় ও সামরিক কৌশলের সঙ্গে গভীরভাব পরিচিত না হওয়ায় আমরা একথা আশা করতে পারি না যে, এ কমিশন একটি নির্ভূল সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে। লে. জেনারেল আফতাব একটি তদন্ত চালাচ্ছিলেন। তার সঙ্গে আমার বাদাদুবাদ হয়। আমি পশ্চিম রণাঙ্গনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চাপ কমাতে পশ্চিম রণাঙ্গনে পরিকল্পিত হামলা চালাতে টিক্কার ব্যর্থতার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা মাত্র তিনি উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলেন, "পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে চিন্তা করবেন না। চলুন আমরা পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে মনোযোগ দেই।" আমি কোনো নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা ছিলাম না। একজন লে. জেনারেল ও একটি রণাঙ্গনের কমান্ডার হিসেবে আমাকে কৌশলগত পর্যায়ে ভাবতে হয়েছে। তাই পশ্চিম রণাঙ্গনের তৎপরতা এড়িয়ে যেতে পারি নি। আমি আমার স্টাফকে একটি মানচিত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের ছক আঁকতে নির্দেশ দেই। জেনারেল আফতাব ছিলেন একজন সরল ধরনের মানুষ। তিনি রাষ্ট্রদূত হিসেবে লিবিয়ার যাবার টোপ

প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। কর্নেল সাবির কোরেশী হামুদুর রহমান কমিশন ও আফতাব কমিটির মধ্যে একজন লিঁয়াজো অফিসার হিসেবে কাজ করছিলেন। তাকেও সৌদি আরবে সামরিক এ্যাটাশে করে পাঠানো হয়।

হামুদ-উর-রহমান কমিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি হামুদ-উর-রহমান। এ কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন বিচারপতি আনোয়ারুল হক ও বিচারপতি তোফায়েল আলী আবদুল রেহমান। কর্নেল হাসান ছিলেন আইন উপদেষ্টা। যুদ্ধের পরিকল্পনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতকে সহায়তা করার জন্য সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে লে. জেনারেল (অব.) আলতাফ কাদিরকে নিযুক্ত করা হয়। এ ধরনের কমিশন গঠনে অনেকেই ভ্রূ কুঞ্চিত করেছেন।

এ ব্যাপারে এ. টি. চৌধুরী লিখেছেন , 'কমিশন গঠনেও অভিপ্রায় ধরা পড়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ কমিশন গঠন করা হয়েছে এমন একজন বিচারপতির নেতৃত্বে যার সততা সন্দেহের উর্ধ্বে। তবে তিনি ছিলেন সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের লোক। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তিনি অবশ্যই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। এছাড়া, কমিশনে কোনো নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অথবা উঁচুমানের একজন সামরিক বিশেষজ্ঞকেও রাখা হয় নি।'

সব বাঙালিকে বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। প্রধান বিচারপতি হামুদ-উর-রহমানকেও ফেরত পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু যেতে চান নি তিনি। এ দুর্বলতাকে একটি অনুকূল রিপোর্ট প্রণয়নে কাজে লাগানো হয়। সাধারণত বিচারপতিগণ রাজনৈতিক দলের সংশ্রব থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু ভুট্টো হামুদ-উর-রহমান কমিশনের সদস্যদের পিপিপিতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। এতে তাদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে। বিচারপতি হামুদ-উর-রহমান একবার আমাকে জানিয়েছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো তাকে বলেছেন যে, ভুট্টো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক টন প্রমাণসহ শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে একটি অভিযোগ পেয়েছেন। বিচারপতি হামুদ-উর আমাকে আরো জানিয়েছিলেন যে, তার এক ছেলে মেজর। কিন্তু তাকে বাংলাদেশে যাবার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। হামুদ-উর-রহমানের ছেলেই একমাত্র বাঙালি যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থেকে যায়।

কমিশনের দ্বিতীয় ব্যক্তি বিচারপতি আনোয়ার-উল-হক ছিলেন রাজনীতিতে নিরাসক্ত। তৃতীয় ব্যক্তি বিচারপতি তোফায়েল আলী আবদুল রহমান ছিলেন একজন খাঁটি বিচারক। তার আচরণ ছিল পক্ষপাতহীন এবং মর্যাদাপূর্ণ। চতুর্থ ব্যক্তি লে. জেনারেল (অব.) আলতাফ কাদির এ ধরনের একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দায়িত্ব পালনে মোটেও যোগ্য ছিলেন না। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে কখনো কোনো ফরমেশনের নেতৃত্ব দেন নি। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি এবং সৈন্য চলাচল ও সামরিক অভিযানে ভূমির প্রভাব সম্পর্কেও জানতেন না। তিনি যুদ্ধে কখনো সৈন্য পরিচালনা করেন নি। ১৯৬৫-এ ৭ ডিভশনের কমান্ডার ছিলেন তিনি। কিন্তু যুদ্ধ

আসন্ন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কমান্ড থেকে অপসারণ করা হয়। তিনি এক অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে কাজ করেছেন এবং তার সামরিক জ্ঞান ও পূর্ব পাকিস্তানে লড়াইয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। জেনারেল কাদির অহেতুক প্রশ্ন করতেন এবং অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতেন। এতে কমিশন মাঝে মাঝে তার প্রতি বিরক্ত হতো এবং বিচারপতি হামুদুর রহমানকে তার ভুল সংশোধনে এগিয়ে আসতে হতো।

বেসামরিক বিচারকদের সামরিক বিষয়াদিতে অভিজ্ঞতা বিশেষ করে অসামরিক জ্ঞান ও স্টাফ সিস্টেম, যুদ্ধের কৌশল ও পরিকল্পনা, স্থায়ী নির্দেশ, ড্রিল ও পদ্ধতি এবং নিয়ম-কানুন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো জ্ঞান ছিল না। হামুদ-উর-রহমান কমিশন বার বার আমাকে প্রশ্ন করছিল আমি কেন সৈন্যদের বার্মার দিকে নিয়ে যাই নি। এ প্রশ্নে প্রকাশ পেয়েছে তাদের সরলতা। লড়াই থেকে পিছু হটে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাজার হাজার সৈন্যের শত শত মাইল পাড়ি দেয়া সম্পর্কে তাদের ন্যূনতম ধারণা ছিল না। অনুগত লোকজনের পরিণতির কথাও মাথায় আসে নি তাদের। আমার মনে হয় তারা রিপোর্টে লিখেছেন যে, আমি সকল সৈন্য নিয়ে বার্মায় চলে যেতে পারতাম। বার্মার পালিয়ে যাওয়া যদি যুক্তিযুক্ত হয় তাহলে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত প্রস্তাব মেনে নেয়া ছিল তার চেয়েও যুক্তিযুক্ত। সম্ভবত কমিশন মেজর জেনারেল ফজল মুকিমের 'অন প্রিসারভেশন অব কমান্ড'-এর ধারণায় প্রভাবিত হয়েছেন। এ ধারণা বলতে কী বোঝায় তা মুকিম নিজে এবং কমিশন উভয়েই কিছু বুঝতেন না। ভূ-রাজনীতি, সামরিক কৌশল এবং জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কমিশনের বিবেচ্য বিষয় ছিল না। একটি বিদেশি রাষ্ট্রে সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমস্যা ও ঝুঁকি তারা বুঝতে চেষ্টা করতেন না। বার্মার দিকে সৈন্য পরিচালনার কোনো কারণ তারা উল্লেখ করেন নি। আমি চমৎকারভাবে লড়াই করছিলাম এবং সংখ্যায় বিশাল একটি শত্রুকে তাদের লক্ষ্য অর্জনের সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিচ্ছিলাম। আমি কৌশলগত দিক থেকে ভারতীয়দের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলাম।

সামরিক উপদেষ্টার প্রশ্নগুলো ছিল কেতাবী, শিশুসুলভ ও বাস্তবতাবিবর্জিত। ঘটনার বাস্তবতার সঙ্গে তার প্রশ্নের মিল ছিল না। এ পরিস্থিতিতে কমিশন চক্রান্ত ও পরিকল্পিত মিথ্যাচারের অতলে হারিয়ে যাওয়া সত্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়। তিনজন বিচারপতি, একজন আইন ও আরেকজন সামরিক উপদেষ্টা নিয়ে এ কমিশন গঠিত হওয়া সত্ত্বেও মেজর জেনারেল কোরেশী, কর্নেল সাবির কোরেশী ও আরো কয়েকজনের সমন্বয়ে গঠিত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের একটি টিমও তদন্তে অংশগ্রহণ করতো। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের এ টিমের বাগাড়ম্বরপূর্ণ আচরণ ও উপর্যুপরি হস্তক্ষেপ শুধু উস্কানিমূলকই ছিল না, তারা এ কমিশনকে একটি বেআইনি তদন্ত আদালতেও পরিণত করেন। তারা ইচ্ছামতো সাক্ষীদের জেরা করতেন। আমাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার মৌলিক অধিকারও দেয়া হয় নি। তাদের

সার্বক্ষণিক বিঘ্ন সৃষ্টি ছিল কমিশনের প্রতি একটি অমার্যাদা ও অসম্মান। তবু কমিশন বিনা আপত্তিতে তাদের বাড়াবাড়ি মেনে নিতেন। তারা আইন কর্মকর্তা অথবা কমিশনের সদস্য কোনোটাই ছিলেন না। তারা কোন্ ক্ষমতা বলে আমাদের জেরা করেছিলেন তা স্পষ্ট নয়।

কমিশনের কাজে বাধা দানই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের একমাত্র অনিয়ম নয়। তারা সামরিক তৎপরতা তদন্তে লে. জেনারেল আফতাব কাদিরের নেতৃত্বে আরেকটি সমান্তরাল কমিটিও গঠন করেছিল। এ কমিটি গঠন করা ছিল আদালত অবমাননার শামিল। কারণ হামুদ-উর-রহমান কমিশন তখন তদন্ত চালাচ্ছিল। এ কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্বাহ্নে অফিসারদের বিবৃতি তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করা, তাদের মনের ভাব ও গতি ঠিক করে দেয়া এবং তাদেরকে গ্রুপে বাছাই করা। সাধারণত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নীতির সঙ্গে যাদের মতের মিল হতো কেবলমাত্র তাদেরকে হামুদুর রহমান কমিশনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেয়া হতো। আর যারা দ্বিমত পোষণ করতো তাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং বক্তব্য পাল্টানোর জন্য প্রলোভন দেখানো হতো। এরপরও যারা নতিস্বীকার করে নি তাদেরকে যথাক্রমে সেনাবাহিনী থেকে বিদায় করা হয়। অফিসারদের মতামত পরিবর্তনে জেনারেল টিক্কা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে যা করছিলেন লাহোরে চতুর্থ কোর কমান্ডার লে. জেনারেল হামিদ কাজীও তাই করছিলেন। জেনারেল হামিদ লোকজনকে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বলেন। ব্রিগেডিয়ার আসগর হাসান ও ব্রিগেডিয়ার কাদির আমাকে একথা জানিয়েছেন।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও লাহোরের ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে আমি টিক্কার কাছে প্রতিবাদ করি। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। টিক্কার নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এসব অশুভ তৎপরতা চালানো হচ্ছিল। তাই তার পক্ষে কাউকে শাস্তি দেয়া অথবা কাউকে ভর্ৎসনা করা সম্ভব ছিল না। আমি আফতাব কমিটিতে হাজির হতে অস্বীকৃতি জানাই। তখন আমাকে কোর্ট মার্শালের ভয় দেখানো হয়। তাই প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি এ কমিটিতে হাজির হই। লে. জেনারেল আফতাবের কাছে লেখা চিঠিতে আমি পরিষ্কার ভাষায় জানাই যে, বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় আইন ভঙ্গের দায়-দায়িত্ব জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের।

আমি একটি আইনগত রুলিং চাই। কিন্তু আমাকে এ রুলিং দেয়া হয়নি। আমি বুঝতে পারি যে, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে জেনারেল টিক্কা খানের অধীনের একটি বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। এ সেলের দায়িত্ব ছিল সাক্ষ্য মূল্যায়ন করা এবং কমিশনের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা। সাক্ষীদের যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস হবে যেসব প্রশ্নের একটি তালিকা দেয়া হয় কর্নেল সাবির কোরেশীকে। টিক্কা কর্নেল সাবিরকে ব্যক্তিগতভাবে ব্রিফ করতেন।

ফজল মুকিমের বই ছিল আদালত অবমাননার শামিল। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করা হলে প্রধান বিচারপতি হামুদুর নিরাসক্তভাবে বলেন, 'আমার সময় নষ্ট করবেন না।' বিচারকরা যেখানে ছিলেন তৈরি সেখানে সঙ্গত কারণেই ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা

করা যায় না। ফজল মুকিমের বই পরোক্ষ এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে সাক্ষীদের প্রভাবিত করছিল এবং সরকারি লাইনে তাদেরকে চিন্তা করতে উৎসাহিত করছিল। এজন্য আমার আপত্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ইস্টার্ন গ্যারিসনের সৈন্যরা ভারতে যুদ্ধবন্দি শিবিরে আটক থাকাকালেই হামুদুর রহমান কমিশন কাজ করতে শুরু করে। এ কমিশনের তদন্ত শুধু পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে দুর্নীতি, অযোগ্যতা, অসন্তোষজনক যুদ্ধ তৎপরতা, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে যেসব অফিসারকে বরখাস্ত করা হয় সেসব অফিসারের জাবনবন্দিই কমিশন রেকর্ড করতে থাকে। তখনি এ কমিশনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। যেসব সৈন্য ও অফিসার বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে যুদ্ধবন্দি হয় তাদেরকে ওসব অযোগ্য অফিসারদের সামনে খাটো করার ঘৃণ্য মানসিকতা থেকেই এরূপ করা হচ্ছিল। হামুদুর রহমান কমিশন এসব অযোগ্য অফিসারের বিবৃতির ভিত্তিতেই এর তদন্ত চালাচ্ছিল।

আমার আপত্তির পর কমিশন একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে মেজর জেনারেল কোরেশীকে এ কার্যক্রমে যোগানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমাদের চরিত্র ও সম্মানের প্রশ্ন জড়িত থাকা সত্ত্বেও সাক্ষীদের বক্তব্য শ্রবণ এবং তাদেরকে জেরা করার অনুমতি দেয়া হয় নি। কিন্তু দেশের কোন আইনের বলে কোরেশীকে কমিশনে বসার অনুমতি দেয়া হয়েছিল? এছাড়া, এডিসি ও স্টেনোগ্রাফারদেরকে তাদের জেনারেলের অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেনারেলদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। এ থেকে আমি ও ধারণায় উপনীত হই যে, কমিশনের রিপোর্টে আমার প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে না।

দৈনিক ডন– এ ১৯৮৬ সালের ২৩ ও ২৬ জুলাই প্রকাশিত মরহুম এটি চৌধুরীর অনুন্ধানী রিপোর্ট একটি চক্ষু উন্মোচনকারী ঘটনা। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি আমার নিজস্ব বক্তব্য পরিবেশন করার চেয়ে তাঁর উক্তি উল্লেখ করাই শ্রেয় বলে মনে করি। দৈনিক ডন-এর সৌজন্যে পরিশিষ্ট ৫-এর তাঁর এ অত্যন্ত মূল্যবান রিপোর্টগুলো দেয়া হলো। এখানে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করছি :

"এটা খুবই দুঃখজনক যে, কমিশন বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের ব্যবচ্ছেদ এবং সামরিক বিপর্যয়ের রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও ইচ্ছায় নীরব সম্মতি দিয়েছে। যেসব দেশপ্রেমিক পুরনো ছাইভস্মের ওপর 'নয়া পাকিস্তান' সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন তারা ইয়াহিয়ার বিচার করে নি। প্রশ্ন হচ্ছে, মূল খলনায়ককে কেন ছেড়ে দেয়া হলো? এর কারণ হচ্ছে, তার বিচার করা হলে নির্লজ্জ নায়কদের চেহারা উন্মোচিত হতো এবং প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যেত।

ভুট্টো হামুদ-উর রহমান কমিশনের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করার সাহস পান নি। কারণ যেসব রাজনৈতিক কারণ ও ভুলের জন্য দেশ ভেঙে গেছে তিনি সেগুলোর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। কমিশন ভুট্টোকে তুষ্ট করার মানসিকতা নিয়ে কাজ করা সত্ত্বেও এ রিপোর্ট পিপিপি সরকারের মন্ত্রিসভাকেও দেখতে দেয়া

হয়নি। মন্ত্রিসভার একটি সাব-কমিটিকে এক নজর এ রিপোর্ট দেখার অনুমতি দেয়া হয়। এ কমিটিতে যারা ছিলেন তারা হলেন, জে. এ. রহিম, খান আবদুল কাইউম খান (জোটের শরীক), হাফিজ পীরজাদা, জেনারেল টিক্কা খান, আজিজ আহমেদ, রফি রাজা ও গিয়াসউদ্দিন। এরা এ রিপোর্ট প্রকাশ না করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন বলে জানা যায়। রিপোর্টের পক্ষপাতিত্ব খুবই স্পষ্ট। কমিশনে যেসব বিবৃতি রেকর্ড করা হয় রিপোর্টে সেগুলো স্থান পায় নি। রিপোর্টের অর্ধেক হচ্ছে পুনরাবৃত্তি এবং বাকি অর্ধেক হচ্ছে ভাসা-ভাসা। কমিশন চরিত্র হনন করেছে। এটা পুরো অথবা আংশিকভাবেও তদন্ত আদালতের রীতি-নীতি অনুসরণ করেনি।"

সর্বাধুনিক সামরিক মতবাদ এবং যুদ্ধের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় এগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে কমিশনের ধারণা না থাকায় এ কমিশনের রিপোর্টের কতটুকু মূল্য আছে? আমাদের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগ আইনগত সিদ্ধান্তের জন্য সকলের কাছে সমাদৃত। কিন্তু যেখানেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয় জড়িত ছিল সেখানেই তারা ভুল করেছেন। গোলাম মোহাম্মদ ও মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের মামলায় প্রধান বিচারপতি মুনীরের সিদ্ধান্ত অথবা জেনারেল জিয়াউল হকের ল' অব নেসেসিটি অথবা ইয়াহিয়ার পদত্যাগের পর ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে তাকে ঘোষণা দানের ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্তে ভুল হয়। হামুদুর রহমান কমিশন প্রচলিত দন্ত কমিশনের কোনো রীতি-নীতি অনুসরণ করে নি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আইনের উল্লেখিত ধারার আওতায় যেখানে কারো চরিত্র হনন ও সুনামের প্রশ্ন জড়িত সেখানে বিবাদীকে সাক্ষীদের জেরা করার অনুমতি দান বাধ্যতামূলক। আমাদেরকে এ আইনগত অধিকার দেয়া হয় নি। ফলে কোনো সাক্ষীকে জেরা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

শর্ত অনুযায়ী কমিশনের আত্মসমর্পণ ও অস্ত্র সংবরণের ঘটনা তদন্ত করার কথা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কাগজপত্র পরীক্ষা করতেই দু'দিন কেটে যায়। কমিশন আদালতে ঘোষণা করে যে,

১. প্রেসিডেন্ট ১৪ ডিসেম্বর অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ ইস্যু করেন।

২. ১৯৭১ এর ১৪ ডিসেম্বর ০৯১০ গ্রিনিচ সময়ে জে. নিয়াজি একটি পাল্টা বার্তা পাঠিয়ে বলেন যে, 'যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তে আমি এখনো অটল রয়েছি।'

৩. সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ অস্ত্র সমর্পণের জন্য তাগিদ দেন। তিনি নিয়াজির লড়াই চালিয়ে যাবার অনুরোধে সাড়া দেন নি। এরপর বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খান টেলিফোনে একই তাগিদ দেন। তিনি নিয়াজির নির্দেশ পালনে এয়ার কমোডর ইনামুল হককে নির্দেশ দেন।

৪. নিয়াজি ফরমানকে সঙ্গে নিয়ে মার্কিন কনস্যুলেটে যান এবং যুদ্ধবিরতির

আহ্বান জানিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে একটি বার্তা পাঠান।

৫. তিনি ভারতের কাছ থেকে যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি জ্ঞানকারী একটি বার্তা পান। তবে তাতে আত্মসর্পণের দাবিও জানানো হয়।

৬. জে. নিয়াজি ভারতের এ বার্তা হুবহু প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠান।

৭. রাতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে প্রেসিডেন্ট তার কাছে একটি বার্তা পাঠান।

উপরেল্লিখিত ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা বর্ণনা দিয়ে কমিশন ঘোষণা করে যে, তারা স্বীকার করছেন যে, প্রেসিডেন্টই আমাকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কার নির্দেশে এবং কিভাবে আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেছে, সেটাই কমিশনের তদন্তের মূল বিষয়বস্তু ছিল। কমিশন যখন একথা বুঝতে পেরেছে এবং নিশ্চিত হয়েছে যে, প্রেসিডেন্টের নির্দেশেই আমি আত্মসমর্পণ করেছি, তখন আমার বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ থাকে না। কমিশনের একথাও ঘোষণা করা উচিত ছিল যে, পোলিশ প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে দেশকে এ অপমান থেকে রক্ষা করা যেত এবং ভুট্টোই হচ্ছেন এ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। কমিশনের রিপোর্টে কী রয়েছে তা আমরা জানি না। তবে দৃশ্যত মনে হচ্ছে এতে হয়তো ভুট্টোকে দোষারোপ করে কিছু লেখা হয়েছে, নয়তো সুপারিশগুলো বদলে ফেলা হয়েছে অথবা আমাকে অব্যাহতি দিতে বলা হয়েছে।

বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হয়তো রিপোর্টের সুপারিশগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে নয়তো সুপারিশের বিপরীত কাজ করা হয়েছে। পরে এক বিয়ে অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানের সঙ্গে আমার চিফ অভ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকীর সাক্ষাৎ হয়। বিচারপতি হামুদুর জানতে চান ব্রিগেডিয়ার বাকির তখন কোথায় আছেন। জবাবে বাকির জানালেন যে, তিনি আর সেনাবাহিনীতে নেই এবং তার রিপোর্টের জন্যই এ পরিণতি হয়েছে। বিচারপতি হামুদুর জানালেন যে, কমিশন তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে নি। বরং পূর্ব পাকিস্তানে এক অসম্ভব যুদ্ধে তার ভূমিকার প্রশংসা করা হয়েছে। এ ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মূল রিপোর্ট গায়েব করে ফেলা হয়েছে।

আমি যতদূর জানি জনগণকে শান্ত এবং তৎকালের ক্ষমতাসীনদের অপকর্ম চাপা দেয়ার জন্য ভুট্টো এ কমিশন গঠন করেছিলেন। এ কারণে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি জাজ অ্যাডভোকেট-জেনারেল এ রিপোর্টকে 'দুর্বল' বলে অভিহিত করেছিলেন। আমার দৃষ্টিতে এটা হচ্ছে একটি অবৈধ তদন্ত। আমরা ছিলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনী আইনের আওতায় এবং এ আইনে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধা আমাদের প্রাপ্য ছিল। আমরা কোনো অপরাধ করি নি এবং পাকিস্তান

সেনাবাহিনী আইনের রীতি-নীতি অনুসরণ করা উচিত ছিল। হামুদুর রহমান কমিশনের একটি বেসামরিক আদালতের নিয়ম-পদ্ধতি মানা উচিত ছিল। বেসামরিক আদালতে সাক্ষীকে বিবাদীর জেরা করার সুযোগ থাকে। আমাদেরকে এ ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করায় সাংবাদিক এ. টি. চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন তাই সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কমিশন এসব রীতি-নীতি অনুসরণ না করায় তাদের সিদ্ধান্ত অকার্যকর ও অবৈধ।

শোনা যায় যে, হামুদুর রহমান কমিশনের চেয়ে আরো শক্তিশালী একটি কর্তৃপক্ষ এ কমিশনের রিপোর্ট পরিবর্তন ও সংশোধন করেছে। রিপোর্টের ১৮টি পৃষ্ঠায় ভুট্টোর কার্যকলাপের বর্ণনা ছিল। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি। এরপর তিনি সকল কপি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন এবং তার কার্যকলাপের বিবরণ সম্বলিত পাতাগুলো সরিয়ে সেখানে নতুন পাতা সংযোজন করা হয়। রেজিস্ট্রারকে তলব করে সংযোজিত পাতাগুলো সত্যায়িত করার নির্দেশ দেয়া হয়। রেজিস্ট্রার অস্বীকৃতি জানালে ভুট্টো তাকে একটি কক্ষে আটক করেন। তাকে সেখানে দানা-পানি ছাড়া রাখা হয়। প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানের সরাসরি হস্তেক্ষেপে রেজিস্ট্রার মুক্তি পায়। বিচারপতি হামুদুর রহমান হাবিবুর রহমানের কাছে এ ঘটনা প্রকাশ করেছেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, রিপোর্ট উপস্থাপনের পর ভুট্টো বিচারপতিদের তাদের ব্যক্তিগত মন্তব্য হস্তান্তর করতে বলেন। বিচারপতিগণ পরস্পর পরামর্শ করেন এবং বিচারপতি তোফায়েল সকল মন্তব্য ও রেকর্ড হস্তান্তরের পক্ষে মতামত দিয়ে বলেন যে, অন্যথায় তারা অফিসিয়াল সিক্রেট আইনে অভিযুক্ত হবেন।তার এ মন্তব্যের পর তারা তাদের কাছে রক্ষিত রেকর্ডপত্র ও মন্তব্যগুলো হস্তান্তর করেন। গোয়েন্দারা (এফএসএফ) কমিশনের অফিসে তল্লাশি চালায় এবং কমিশনের স্টাফ ও অন্যান্যদের বাসা থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে আসে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বিচারপতিরাও ভুট্টোর হয়রানির ভয়ে তটস্থ ছিলেন।

হামুদ-উর-রহমান কমিশনের রিপোর্ট হিসেবে যা প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের মস্তিষ্ক প্রসূত ফসল। প্রকৃতপক্ষে, মূল কপিগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। মাত্র একটি সংশোধিত কপি রক্ষা পেয়েছে। তবে কেউ এ কপির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হামুদ-উর-রহমান কমিশনের কোনো রিপোর্ট আর অবশিষ্ট নেই। কোনো কপিতে হয়তো এ কমিশনের নাম থাকতে পারে। কিন্তু বিষয়বস্তু হবে সম্পূর্ণ বিকৃত। সংশোধিত তথাকথিত রিপোর্টটি প্রকশিত হলেও ক্ষমতাসীনদের বহু দুষ্কর্ম প্রকাশিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খান আবদুল ওয়ালি খান এক উর্দু দৈনিকে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, 'হামুদ-উর-রহমান কমিশনের রিপোর্টে যথেষ্ট ফাঁক-ফোকর রয়েছে।" সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, সকল পক্ষকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আমি আমার সাক্ষ্যে বলেছিলাম যে, রাজনীতিকরা সংকট সমাধানে ব্যর্থ

হওয়ায় সেনাবাহিনী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়। আমি বিচারপতি হামুদুর রহমানকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলাম যে, ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার ঘৃণ্য ভূমিকায় পাকিস্তান ভেঙে গেছে। আমার বিবৃতি টাইপ করা কপি দেখে আমি বিস্মিত হই। আমি দেখতে পাই যে, আমার বিবৃতি পাল্টে ফেলা হয়েছে। আমি আবার খসড়া সংশোধন করি এবং পুনরায় টাইপ করে পাঠিয়ে দেই। সংশোধিত খসড়ার একটি ফটোকপি এখনো আমার কাছে রয়েছে।

নতুন কমিশন

হামুদ-উর-রহমান কমিশনের রিপোর্ট ছিল একটি অতি গোপনীয় দলিল। এ তথাকথিত রিপোর্টের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ পাকিস্তান ও বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। যেটুকু প্রকাশ করা হয়েছে সেটুকু ছিল স্বার্থবাদীদের অনুকূলে। এ পর্যন্ত যা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ রিপোর্ট প্রকাশ করার প্রয়াস যতটুকু, গোপন করার প্রয়াস তার চেয়েও বেশি। আমি নিশ্চিত যে, কমিশনের রিপোর্টের নির্বাচিত অংশ হিসেবে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা মূল রিপোর্ট থেকে নয়। মূলকপি গায়েব করে নতুন কপি তৈরি করা হয়।

পরিবর্তন এত বেশি করা হয়েছে যে, এটি এর বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক এমভি নকবী ১৯৮৬ সালে দৈনিক ডন-এ লিখেছেন :

"সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা, রাজনীতিক ও প্রবীণ বিচারপতিদের সমন্বয়ে সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে সত্য উদ্ঘাটন এবং দোষীদের শাস্তি দান করা অপরিহার্য।"

সমগ্র পাকিস্তান এবং আলাদাভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতা মূল্যায়নে হামুদ-উর-রহমান কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্সে বিরাজমান রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে একটি কম্পিউটার মডের সংযোজনের জন্য আমি সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু কমিশন আমার সুপারিশে কর্ণপাত করে নি। আধুনিককালে কর্মতৎপরতা যাচাইয়ে কম্পিউটার মডেলই হচ্ছে উত্তম পদ্ধতি। আমার এ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা হলে আমাকে ও আমার অধীনস্থ অন্যান্য জেনারেলকে দেশের সবচেয়ে সফল জেনারেল হিসেবে দেখানো ছাড়া উপায় ছিল না।

অধ্যায় ১৭

বেসামরিক জীবন

যখন আমি রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থান করছিলাম তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমি কোনো কমিশনের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাব না। তাই আমি সামরিক আদালত গঠনের প্রস্তাব করি। সামরিক আদালত থেকেই ন্যায়বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। চার্জ গঠন করা হয়। কিন্তু ডেপুটি জজ এডভোকেট-জেনারেল (ডিজেএজি) সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল টিক্কা খানকে জানান যে, অভিযোগগুলো খুবই দুর্বল এবং আমি সহজেই খালাস পেয়ে যাব। এজন্য আমাকে সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করা হয়। ডিজেএজি আমার সঙ্গে এক সাক্ষাতে এ কথা স্বীকার করেছেন। টিক্কা খান আমাকে এক পক্ষকালের মধ্যে বাসা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিতে লাহোর সদর দপ্তরের স্টেশনকে নির্দেশ দেন। আমার নিজের কোনো বাড়ি ছিল না এবং কোনো বাড়ি কেনা অথবা ভাড়া নেয়ার মতো অর্থও ছিল না। সুতরাং ৪০ বছরের চাকরি জীবনে আমার যা কিছু ছিল সবকিছু বিক্রি করে দিতে হয়। আমি ভীষণ আঘাত পাই। যা প্রতিকার করা যায় না তা মেনে নিতে হয়। সুতরাং আমি লাহোরে লরেন্স রোডে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় উঠি। স্ত্রী ও মেয়েকে পাঠিযে দিই ছেলের বাসায়। আমার ছেলে তখন সেনাবাহিনীর একজন মেজর। বাড়ি নির্মাণের জন্য এক খণ্ড জমি বিক্রি করে দিই। চল্লিশ বছর চাকরি করে এ পুরস্কারই আমি পেয়েছিলাম! আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। সম্ভবত ভুট্টোর নির্দেশে এ হামলা করা হয়।

প্রখ্যাত রাজনীতিক ও আইনজীবী মিয়া মাহমুদ আলী কোরেশী এক পর্যায়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি যেসব কাগজপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যাই সেগুলো তিনি মনোযোগ দিয়ে দেখেন এবং আমার সব কথা শুনে তিনি বলেন, "আপনার মামলা খুবই জোরালো। তবে ভুলবশত আপনাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে।" আমি তখন তাকে জানালাম যে, আমি উন্মুক্ত বিচার চাই যাতে মূল অপরাধীদের চিহ্নিত করা যায়। হামুদ-উর-রহমান কমিশনকে সক্রিয় করে তোলা সম্ভব হয় নি। এ কমিশনের সীমাবদ্ধতা থাকায় এবং সরকার, সেনাবাহিনী ও প্রশাসন ভুট্টো ও

টিক্কার কথায় ওঠা-বসা করায় আমি তাদের কাছ থেকে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করি নি। উন্মুক্ত বিচার হলে সত্য উদ্ঘাটিত হতো এবং প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করা যেত। আইনজীবী মাহমুদ আলী কোরেশী আমাকে বলেছিলেন "আমি আপনার মামলা নিয়ে লড়বো এবং আমি আপনার কাছ থেকে কোনো পয়সা নেব না। আপনার কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও আপনি যথেষ্ট দুর্ভোগ ভোগ করেছেন।" জনাব কোরেশী আমার মামলা নিয়ে অগ্রসর হবার আগেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি আমার একজন মহৎ বন্ধু ও অভিভাবককে হারাই।

আবদুল কাইউম খান আমাকে একদিন টেলিফোন করেন এবং বলেন যে, কিছু রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি আমার বাসায় আসছেন। তিনি আমাকে কাইউম মুসলিম লীগে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাঁকে আমি বললাম, 'খান লালা, আপনি ভুট্টো সরকারের একজন মন্ত্রী। সুতরাং তাঁর প্রতি আপনার দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে আমি তাঁর বিপক্ষে। এ কারণে বিভিন্ন প্রশ্নে আপনার সঙ্গে আমার মতবিরোধ হতে পারে। আমি চাই না আপনার সঙ্গে আমার মতবিরোধ হোক।' তিনি তখন বললেন, "রাজনীতিতে যোগদানের প্রস্তাব একটি ছলনা মাত্র। পাকিস্তানের বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডারের পদ গ্রহণে আপনাকে প্রস্তাব দিতে স্বয়ং ভুট্টো আমাকে পাঠিয়েছেন।' আমি বললাম, 'খান লালা, এ পদ খুবই লোভনীয়। তবে আমি আবারো 'না' বলছি, ভুট্টো আমাকে ঘৃণা করেন। আমি কোর্ট মার্শাল গঠন করতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি যথাযথ অভিযোগ গঠন করতে পারেন নি। আমি আবার ইউনিফর্ম পরিধান করলে তিনি আমার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ আনতে পারেন এবং দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিও দিতে পারেন। অতএব, আমি ভুট্টোর এ লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি।'

পরবর্তী সময়ে ভুট্টো আমাকে তলব করেন এবং বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক নয়, সামরিক বিপর্যয় ঘটেছে– একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হলে আমাকে কূটনৈতিক দায়িত্ব দেয়া হবে। আমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করি এবং বলি যে, এটা একটি রাজনৈতিক পরাজয় এবং সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য তিনি এ সামরিক বিপর্যয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি আমাকে আবার ভেবে দেখতে বলেন। অন্যথায় তিনি আমাকে 'দেখে' নেবেন বলেন। আমি তাকে 'চেষ্টা' করার কথা বলে বাসায় ফিরে আসি।

ভুট্টো তার হুমকি বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি আমার চিফ অভ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির সিদ্দিকী ও আমাকে বলির পাঁঠা বানান। পুরো সেনাবাহিনী থেকে মাত্র আমাদের দু'জনকেই অপসারণ করা হয় এবং পেনশন থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়। প্রকৃত অপরাধীদের হয় পদোন্নতি নয়তো কূটনৈতিক দায়িত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া, হামিদ, পীরজাদা, মিঠা, ওমর প্রমুখকে পূর্ণ সুযোগ-

সুবিধা দিয়ে অবসরে পাঠানো হয় এবং সামরিক মর্যাদা তাকে দাফন করা হয়। গুল হাসান সেনাবাহিনী প্রধান হন। ইয়াকুবকে রাষ্ট্রদূত করা হয়। টিক্কা খানও সেনাবাহিনী প্রধান হন।

রাজনীতিতে যোগদান

রাজনীতিতে যোগদানে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না কারণ আমি একজন সৈনিক। কিন্তু ভুট্টো আমার বিরুদ্ধে এমনভাবে বিষোদগার ও মিথ্যা প্রচারণা চালাতে থাকেন যে, আমি আমার সম্মান বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। ভুট্টোর মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাজনৈতিক প্লাটফর্ম একটি সর্বোত্তম জায়গা হওয়ায় আমি রাজনীতিতে যোগাদান করি।

লাহোরের দিল্লী গেইটে আমি প্রথম ভাষণ দেই। জনগণ আমার ভাষণকে অভিনন্দন জানায়। পরদিন মাওলানা নূরানী ও মাওলানা আবদুল সাত্তার খান নিয়াজি আমার বাসভবনে আসেন এবং আমাকে জমিয়ত উলেমা-ই-পাকিস্তানে (জেইউপি) যোগাদানের আমন্ত্রণ জানান। আমি এ দু'জন খ্যাতিমান আলেমের সান্নিধ্যে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। আমি মাওলানা আবদুল সাত্তার খান নিয়াজিকে আগে থেকেই চিনতাম এবং একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবে তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। আমি বিশ্বাস করতাম যে, তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। মাওলানা নূরানীও ছিলেন অত্যন্ত উঁচু মানের মানুষ এবং ইসলাম সম্পর্কে ছিল তার গভীর জ্ঞান। সুতরাং আমি জেইউপিতে যোগদান করি।

আমি মিয়ানওয়ালি থেকে ভাখারে যাই। ফিরে আসার পথে মাওলানা মুফতি মেহমুদের ছেলে মাওলানা ফজলুর রহমান আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি আমাকে তার সঙ্গে ডেরা ইসমাইল খাঁ যেতে অনুরোধ করেন। মুফতি মেহমুদ সেখানে মাহফিলে ওয়াজ করবেন। মুফতি সাহেবকে আমি চিনতাম এবং গভীর শ্রদ্ধা করতাম। এজন্য আমি ডেরা ইসমাইল খাঁ যাই।

১৯৭৭-এ গঠিত হয় পিএনএ এবং রাজনৈতিক দলের প্রধানদের গ্রেফতার করা হয়। আমি তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকি। কোনো কোনো দিন আমাকে দূর-দূরান্তে দৈনিক ৮টি পর্যন্ত জনসভায় ভাষণ দিতে হয়েছে। পিএনএ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এবং ভুট্টোর গাত্রদাহ শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনী জনসভায় জনগণ আমাকে দেখে 'মর্দে মুজাহিদ, মর্দে গাজী– জেনারেল নিয়াজি, জেনারেল নিয়াজি' প্রভৃতি শ্লোগান দিত। শহর ও গ্রামে যেখানে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের জোটে সদস্যপদ দেয়া হতো আমি ছিলাম সেখানে ভীষণ জনপ্রিয়। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সফর করার পর আমাকে করাচি যেতে বলা হয়। করাচিতে আমার প্রথম সমাবেশে প্রায় ১৫ লাখ লোক সমবেত হয়।

পাকিস্তানে কোনো রাজনৈতিক সমাবেশে আর কখনো এত লোক হয় নি। লোকজন আমাকে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। আমি তাদের প্রশ্নের জবাব দেই এবং আমার জবাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট বলে মনে হয়। আমি বললাম যে, সত্য উদ্ঘাটনের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে গণ আদালত। ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও টিক্কা এবং আমাকে তলব করা হোক। জনগণ আমাদেরকে প্রশ্ন করবে। উপস্থিত লোকজনের ভেতর থেকে মনোনীত বিচারকদের একটি প্যানেল রায় দেবে এবং তাদের রায়ে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের শাস্তি হবে। ভুট্টো এ ধরনের একটি গণ আদালতে হাজির হতে অস্বীকৃতি জানান।

করাচির মালিরে একদিন এক জনসভা ছিল। পিপিপি'ও একইদিন পাশেই আরেকটি জনসভা আহ্বান করে। হাফিজ পীরজাদা এ জনসভায় ভাষণ দেবেন। পীরজাদা বক্তৃতা দেয়া শুরু করলে আমিও বক্তৃতা শুরু করি। আমার কণ্ঠ শুনে পীরজাদার জনসভার সব লোক আমার জনসভায় এসে পড়ে। তখন বলতে গেলে তার সভাস্থল ফাঁকা। পিপিপি'র হাতে গোনা কয়েকজন কট্টর কর্মী ও আয়োজক ছাড়া মাঠে আর কেউ ছিল না। রাগে-ক্ষোভে গজরাতে গজরাতে পীরজাদা সভাস্থল ত্যাগ করেন এবং পিপিপি'র জনসভা পণ্ড হয়ে যায়।

করাচি থেকে আমি হায়দারাবাদে যাই। সমাবেশের আগে একটি মিছিল বের হয়। আমি তাতে নেতৃত্ব দিই। শহর ও আশপাশের লোকজন সমাবেশে হাজির হয়। সকল রাস্তাঘাট ও বাড়ির ছাদ লোকে লোকারণ্য। হায়দরাবাদ ছিল সেদিন জনসমুদ্র। ভুট্টোর টনক নড়ে। সেদিন রাতেই লতিফাবাদে মেজর সাকিবের বাসভবন থেকে আমাকে গ্রেফতার করা হয় এবং মেজর সাকিবসহ আমাকে শুক্কুর কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

মেহমুদ আজম ফারুকী ও অধ্যাপক গফুর আহমেদ করাচিতে আমাকে সহায়তা করেন। অধ্যাপক গফুর আমার কাছে অনুপ্রেরণার এক উৎস হিসেবে প্রমাণিত হন। করাচিতে তিনি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতেন এবং আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব হয়। জনাব ফারুকী ও অধ্যাপক গফুর উভয়ে আমাকে এত ভালোবেসে ফেলেন যে, লাহোরে এলে তারা আমার সঙ্গে দেখা না করে যেতেন না। এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার পরও তারা তা করেছেন।

গ্রেফতার হবার আগে আমি করাচি কারাগারে আটক পিএনএ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। কারা কর্তৃপক্ষ আমাকে পূর্ণ সম্মান প্রদান করে। আমার জন্য ফটক খুলে দেয়া হয়। একমাত্র ভিপিআইপি'রাই এ সুযোগ পেয়েছে থাকে। একইভাবে শুক্কুর কারাগারে পৌঁছলেও আমাকে জেলার ও ডেপুটি জেলার অভ্যর্থনা জানান এবং আমার সম্মানে গেইট খুলে দেয়া হয়। ভুট্টোর আমলে কারা কর্তৃপক্ষের জন্য আমাকে সম্মান দেখানো ছিল সত্যিই বিপজ্জনক। জেলার ও ডেপুটি জেলার

অফিসে আমাকে চা পান করান এবং আমাকে যেখানে থাকতে হবে সেখানে তারা উভয়ে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যান।

শুক্কুর কারাগার

কারাগারে আমাকে ক্যাটাগরি-'এ'তে রাখা হয়। মীর আলী আহমেদ তালপুর ছাড়া অন্যান্য রাজনীতিকদের রাখা হয় 'বি' শ্রেণীতে। মীর আলী আমার মতো প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করেন। তিনি আমার পাশের পক্ষে থাকতেন। সব দলের নেতারাই ছিলেন কারাগারে। এসব নেতার মধ্যে ছিলেন জেইউপি'র ফরিদুল হক, হক্কানী সাহেব ও দোস্ত মোহাম্মদ ফায়েজী, জেইউআই'র মাওলানা আমরুতী, জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গফুর ও মাহমুদ আজম ফারুকী, তেহরিক-ই-ইশতেকলালের সালেহ মোহাম্মদ মান্ধখেল, জিয়ে সিন্ধের জনাব পালিজো ও আবু বকর জারদারী ও মুসলিম লীগের বোস্তান আলী হোতি। আমরা একসঙ্গে আবার খেতাম এবং একসঙ্গে নামায আদায় করতাম। জেইউপি'র মাওলানা হক্কানী নামাজে ইমামতী করতেন।

লে. জেনারেল জাহানজেব আরবাব ছিলেন সিন্ধুর সামরিক আইন প্রশাসক। একদিন শুনলাম তিনি কারাগার পরিদর্শনে আসছেন। কর্তৃপক্ষ তার পরিদর্শনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি জেলারকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আরবাবের পরিদর্শনকে কিভাবে দেখছেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনাকে সত্য বলতে কি স্যার, এসব পরিদর্শন হচ্ছে খামোখা। প্রকৃতপক্ষে, কয়েদী অথবা কারাগারের স্টাফদের ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। আমরা কারাগারে যেসব সামগ্রী তৈরি করি সেগুলোর ব্যাপারে তারা নির্দেশ দিতে আসেন।' আমি তাকে বললাম, 'আপনি তাকে বলুন যে, আমি এখানে আছি এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।' তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাতে কি হবে?' আমি জবাব দিলাম, 'তিনি আসবেন না। কারণ লুটতরাজ ও দুর্নীতির জন্য তাকে আমি পূর্ব পাকিস্তানে থেকে ফেরত পাঠিয়েছিলাম।' আরবাবকে এ বার্তা জানানো হয় এবং তিনি কারাগার পরিদর্শনে তার কর্মসূচি বাতিল করেন।

জিয়ার ক্ষমতা দখল

আমি ছাড়া সকল রাজবন্দি মুক্তি পান, সামরিক আইন জারি করা হলে। কয়েকদিন পর একজন সেনা কর্মকর্তা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি আমাকে বলেন, 'প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়াউল হক নির্দেশ নিয়েছেন যে, আপনাকে মুক্তি দানের আগে তিনি আপনার কাছ থেকে এ মুচলেকা চান যে, আপনি আর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবেন না।' আমি বললাম, 'বৎস, আমার তো

কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই এবং আমি রাজনীতি বুঝি না। আমি কারাগারে এসে দেখতে পাচ্ছি যে, আমি রাজনীতির কানাকড়িও জানি না। আমি উৎপীড়ক ভুট্টোর বিরুদ্ধে জনগণকে সাহায্য করার জন্য রাজনীতিতে যোগদান করেছি। তার পতন ঘটেছে এবং রাজনীতিতে আমার আর কোনো আগ্রহ নেই। তবে সরকারকে মুচলেকা দানের ব্যাপারে আমার জবাব হচ্ছে 'না'। এটা আমার নীতিবিরুদ্ধ। আমার যা পছন্দ আমি তাই করি এবং আমার ওপর কারো খবরদারি আমি মেনে নেব না।' জিয়াউল হকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় আমাকে কারাগারে পড়ে থাকতে হয়। আমাকে শুক্কুর কারাগার থেকে লাহোরে গৃহবন্দি অবস্থায় স্থানান্তর করা হয়। জিয়াউল হক বললেন, 'ভুট্টোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা রুজু করা হলে আপনি কি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন?' আমি বললাম, 'তাকে মুক্তি দেয়া হলে সাক্ষ্য দেব। নয়তো না। কেউ আমার পরম শত্রু হলেও তার পিঠে ছুরি মারার নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই।'

জিয়াউল হকের সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার তার আমলে আমাকে আরো ৬ মাস কারাগারে থাকতে হয়। ভুট্টোর আমলে ছিলাম তিন মাস। জিয়াউল হকের আমলে তিন মাস ছিলাম কারাগারে এবং বাকি তিন মাস গৃহবন্দি।

শুক্কুর কারাগারে ভুট্টো

ভুট্টোকে শুক্কুর কারাগারে আনা হয় সামরিক আইন জারির পর। আমি তখন সেখানেই। এটা ছিল আমার জন্য একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি আমাকে দেখেই এগিয়ে আসেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বললেন, 'নিয়াজি, আপনার প্রতি রুঢ় হওয়ায় আমি সত্যিই দুঃখিত। আমাকে ভুল পরামর্শ দেয়া হয়েছিল।' আমি তাকে আমার কক্ষে নিয়ে যাই এবং এক কাপ গরম কফি দেই। এরপর আমরা আলাপ করতে শুরু করি। তাকে উদ্বিগ্ন মনে হয় নি। তিনি বললেন, 'নিয়াজি আপনি ফিরে গেলে আমরা একসঙ্গে কাজ করবো।' আমি বললাম, 'জনাব ভুট্টো, এ কী করে সম্ভব? আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা এবং আমরা কম-বেশি একে অপরের শত্রু।' তিনি বললেন, 'নিয়াজি আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছিলাম এবং সংশোধনের চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু আপনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। যখন আপনি আমার কাছে প্রথম দিন এসেছিলেন, সেদিন আমি প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, এটা একটি সামরিক বিপর্যয় এবং এজন্য সেনাবাহিনী দায়ী। আমি আপনাকে কূটনৈতিক দায়িত্ব দিচ্ছি। কিন্তু আপনি বললেন, এটা একটি রাজনৈতিক পরাজয়। দ্বিতীয় বার আমি আপনার কাছে কাইউম খানকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি আপনাকে পাকিস্তানের বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি এ প্রস্তাবও নাকচ

করে দেন।' তিনি আরো বললেন, 'আমি আপনার সার্ভিস রেকর্ড দেখেছি এবং আপনি পূর্ব পাকিস্তানে কিভাবে যুদ্ধ করেছেন তা পর্যালোচনা করেছি। অতি সামান্য সম্পদ নিয়ে আপনি এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে পাঠানো আপনার বার্তা আমি পাঠ করেছি। এসব বার্তা পাঠে এ ধারণাই হয় যে, বার্তা প্রেরক অত্যন্ত সাহসী, অভিজ্ঞ, ধৈর্যশীল ও একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। আমি টিক্কার পরে আপনাকে সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি আমার কাছে ধরা দেন নি।' আমি বললাম, 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি নি। তাই আপনার কাছে যাই নি।' তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এখনো কারাগারে কেন?' আমি জবাব দিলাম, 'জিয়া আমাকে রাজনীতি ছাড়ার মুচলেকা দিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি মুচলেকা দেই নি। তাই আমি এখানে।' আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'এখন আপনি বলুন, আপনি আমাকে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন কেন?' তিনি বললেন, 'আপনি আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছিলেন। আপনার সমাবেশে জনতার ভিড় এবং আপনার ভাষণ পিএনএ'র আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার করছিল। পিএনএ'র আন্দোলনেকে দুর্বল করার জন্যই আমরা আপনাকে গ্রেফতার করি।'

ভুট্টোকে শুক্কুর কারাগার থেকে সরিয়ে নেয়া হয় সন্ধ্যায়। তিনি কারাগারের ডাক্তার (সাবেক সেনা কর্মকর্তা) এর মাধ্যমে আমার কাছে একটি বার্তা পাঠান। বার্তায় তিনি বলেন, 'আমাকে কফি পান করানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা আমার চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে। কারাগার থেকে মুক্তি পেলে একত্রিত হব আমরা। আমি আপনার সঙ্গে সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাব।'

আমার মতবিরোধ ছিল ভুট্টোর সঙ্গে। তাকে মোটেও পছন্দ করতাম না আমি। কিন্তু তাকে ফাঁসি দেয়ায় আমি খুব দুঃখ পাই। এ ধরনের মৃত্যু তার হওয়ার কথা ছিল না। অন্তত জিয়ার মতো একজন ক্ষমতাদখলকারীর হাতে নয়। জিয়া না ছিলেন একজন দক্ষ জেনারেল, না ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক। তাছাড়া তিনি দেশেরও কোনো কল্যাণ করতে পারেন নি। তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। তিনি ইসলাম নিয়ে কিছু রং তামাশা করেছিলেন। জেনারেল জিয়া দেশে কালাশনিকভ রাইফেল ও হেরোইনের সংস্কৃতি চালু করেন। তার আত্মীয় স্বজনদের ধনী হওয়ার সুযোগ দেন এবং ভারতের কাছে সিয়াচেন ছেড়ে দেন।

অধ্যায় ১৮

শেষ কথা

পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ হচ্ছে এক বীরত্বগাঁথা যুদ্ধ। কিন্তু আত্মসমর্পণে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায় এ বীরত্ব। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে উথাপিত পোলিশ অথবা রুশ প্রস্তাব গ্রহণ করে সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণের অসম্মান থেকে রক্ষা করা যেত। কিন্তু সেসময় যারা রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন তারা তাদের কায়েমী স্বার্থে জাতীয় সম্মান বিসর্জন দিয়েছেন। ক্ষমতাসীনরা "পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানে করা হবে"– এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ না করে কাজ করেছেন পূর্ব পাকিস্তানকে সরকারবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগে গৃহীত এম. এম. আহমেদ পরিকল্পনার ভিত্তিতে। এভাবে তারা ক্ষমতার দুটি কেন্দ্র–আওয়ামী লীগ ও সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিয়েছেন। আওয়ামী লীগকে হটানো হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ দিয়ে এবং সেনাবাহিনীর মাথা অবনমিত করা হয়েছে ইস্টার্ন কমান্ডকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়ে। খণ্ডিত পাকিস্তানে ভুট্টোর নিরংকুশ ক্ষমতা লাভের জন্যই এ দুটি কাজ করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান গ্যারিসন যে দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছে তা হচ্ছে তাদের দেশপ্রেম ও বীরত্বের প্রমাণ। তারা মূল ভূখণ্ড থেকে ১ হাজার মাইল দূরে লড়াই করেছে, সরকারি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পুনরুদ্ধার করেছে। এটা ছিল ১২ ডিভিশন সৈন্য, ৩৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ, শত শত জঙ্গিবিমান ও নৌ বলে বলীয়ান এক বিশাল বাহিনীর সঙ্গে দুর্বল, ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন একটি বাহিনীর অসম লড়াই। শক্তির ভারসাম্য না থাকা সত্ত্বেও ইস্টার্ন কমান্ড স্থানীয় বৈরি জনগোষ্ঠী, গেরিলা যুদ্ধ ও ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এমন এক ভূখণ্ডে আমাদেরকে একটানা দীর্ঘ ৯ মাস লড়াই করতে হয়েছে যে ভূখণ্ডের সঙ্গে রয়েছে সাড়ে তিন হাজার মাইল ব্যাপী বৈরি ভারতীয় সীমান্ত।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সৈন্যদেরকে একটি রাজনৈতিক বিপর্যয়কে সামরিক বিজয়ে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। সৈন্যরা সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে এ লক্ষ্য অর্জন করে। তারা ১৯৭১ সালের মে নাগাদ মুক্তি বাহিনী

গেরিলাদের পূর্ব পাকিস্তানের মাটি থেকে বিতাড়িত করে এবং দেশের দুটি অংশের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণে সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ মোকাবেলায় কোনো সার্বিক জাতীয় কৌশল ছিল না। হাই কমান্ড পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত আমাদের প্রাথমিক সফলতাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, শত্রুরা এ সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। তারা শান্তি বিনষ্ট, গেরিলা যুদ্ধ সংগঠন এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির একটি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়।

দেশ ও সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভারতের অপপ্রচারে। অসৎ উদ্দেশ্যে জান্তা এসব বানোয়াট ও অতিরঞ্জিত সংবাদ খণ্ডন করে নি। ফলে বিশ্ব এগুলো বিশ্বাস করে ফেলে। অযোগ্যতা অথবা জঘন্য অপরাধে লিপ্ত থাকার জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব দুরাচার কমান্ডার ও অফিসারকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, শত্রুর অপপ্রচারে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়। রাজনৈতিক ও সামরিক চক্রের পূর্ণ সহযোগিতা ও পরামর্শে তারা ইস্টার্ন কমান্ডের ওপর তাদের ব্যর্থতা ও অপরাধ চাপিয়ে দেয়। আমরা ভারতে যুদ্ধবন্দি থাকাকালে তারা মাঠ ফাঁকা পেয়ে যায়। তাই তারা তাদের ইচ্ছামতো গল্প শুনিয়েছে জাতিকে। এ সংকটে সম্পৃক্ত লোকজন উপস্থিত না থাকায় অপপ্রচার চালানোর সুযোগ পায় তারা। চক্রান্তকারীরা ইস্টার্ন কমান্ডের সঙ্গে প্রতারণা করে এবং আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে কোনো উত্তরাধিকারী সরকার না রাখার জন্যই তারা একাজ করে। ভুট্টোর অপকর্ম আড়াল করে রাখার জন্য যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক লোকজনকে ভারতের বন্দি শিবিরে পচিয়ে মারার চক্রান্ত করা হয়। জনগণের কাছে মিথ্যা বলা হয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর কাছে গোপন রাখা হয় সত্য। সত্য ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আটকা পড়ে।

পশ্চিম পাকিস্তানে করার কথা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের লড়াই। পশ্চিম রণাঙ্গনে পদাতিক বাহিনীতে ভারতের সঙ্গে সমতা, সাজোয়া বাহিনীতে শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বাধিনায়কের আওতায় যুদ্ধ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর তিন জন প্রধান থাকা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রকারীরা এতই ভেঙে পড়ে যে, তারা বিমান বাহিনীর পূর্ণ শক্তি ব্যবহার করে নি এবং যথাযথভাবে পরিকল্পিত হামলাও চালায় নি। আক্রমণকারী হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান ভূখণ্ড দখল করার পরিবর্তে সাড়ে ৫ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড হারায়। পক্ষান্তরে, আমরা শত্রুকে পূর্ব রণাঙ্গন থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্য সরিয়ে নেয়ার সুযোগ না দেয়াসহ আমাদের প্রতিটি মিশনে সফল হই। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের নৌবাহিনী দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর করাচি আক্রান্ত হয়। কিন্তু আমাদের নৌবাহিনী আক্রমণকারী শত্রুর ওপর একটি গুলিও ছোঁড়ে নি।

প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ছাড়া জাতিসংঘ প্রতিনিধির কাছে মেজর জেনারেল ফরমানের বার্তা হস্তান্তর, মার্কিন, সোভিয়েত, ফরাসি ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য তার অনুরোধ, আমার অনুমতি ছাড়া রুশ ও ভারতীয় সেনা প্রধানের সঙ্গে তার যোগাযোগ এবং পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতির পর প্রেসিডেন্ট ভবনের ওপর জঙ্গি বিমান নিয়ে এয়ার মার্শাল রহিম খানের উড্ডয়ন ইত্যাদি ঘটনাগুলো ভুট্টোকে ক্ষমতা আনার পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের এক একটি অংশ।

যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত না হয়েও অন্যের ব্যর্থতা ও দোষের জন্য যখন একজন সৈনিককে আত্মসমর্পণের মতো অসম্মানের মুখোমুখি হতে হয় তখন তা তার জন্য মৃত্যুর চেয়েও পীড়াদায়ক। আমাদের শাসক এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে অবস্থানরত স্বার্থপর অফিসাররা ইস্টার্ন কমান্ডের সব অফিসার ও সৈন্যদের ওপর এ অসম্মান চাপিয়ে দেয়। ১৩ ডিসেম্বর আমি শেষ ব্যক্তি জীবিত থাকা পর্যন্ত শেষ বুলেট' দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেই। আমার এ নির্দেশ ছিল সৈন্যদের জন্য একটি মৃত্যু পরোয়ানা। কিন্তু সৈন্যরা আমার নির্দেশ মেনে নেয় এবং তারা "লাব্বায়েক' জবাব দেয়। ওয়েস্টার্ন গ্যারিসনকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার স্বার্থে আমরা সকলেই জীবিত থাকা পর্যন্ত শেষ বুলেট দিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিলাম।

নতুন করে কোনো সৈন্য পাঠানো হয় নি আমাদের সৈন্য ঘাটতি পূরণে। তাই হতাহত সৈন্যদের স্থান পূরণে নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে সিএএফ'র সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আমরা আমাদের লড়াই করার শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করি। সহায়ক অস্ত্রশস্ত্র, সার্ভিস ও সিএএফ'র চমৎকার বিন্যাস ঘটিয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র সংকুচিত করি। আমরা দু'মাসেরও কম সময়ে রুশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় গেরিলাদের পরাজিত করি। আমাদের এ সাফল্য অলৌকিকতার চেয়ে কম ছিল না। বিশেষজ্ঞদের মতে বিদ্রোহ দমন অভিযানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আড়াই থেকে তিন লাখ সৈন্যের প্রয়োজন ছিল। অথচ আমরা মাত্র ৪৫ হাজার সৈন্য মোতায়েন করে এ কঠিন কাজ সম্পন্ন করেছি। আমাদের সৈন্যদের গেরিলা যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা অথবা প্রশিক্ষণ ছিল না। শুধু মুক্তিবাহিনী নয়, স্থানীয় জনগণও আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং বেসামরিক সরকার বলতে কিছুই ছিল না। আমরা গেরিলাদের দেশ থেকে উৎখাত করেছিলাম এবং তাদেরকে কোণঠাসা করে রেখেছিলাম। আমাকে সীমান্তে থামার নির্দেশ এবং পিছু হটে যাওয়া গেরিলাদের ধাওয়া করতে ভারতে প্রবেশে বাধা দেয়া না হলে আমি তাদের ধ্বংস করতে পারতাম। কারণ ভারতীয় বাহিনী সেসময় আমাদের পক্ষ থেকে আকস্মিক হামলা মোকাবেলায় মোটেও প্রস্তুত ছিল না। শুরুতেই বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত এবং পাকিস্তান অখণ্ড

এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপরাজেয় থাকতে পারত। মুক্তিবাহিনীর ছদ্মাবরণে ভারতীয়রা আমাদের ভূখণ্ডে লড়াই করেছিল। তাই মুক্তিবাহিনীকে পশ্চাদ্ধাবনে আমাদের ভারতে প্রবেশের যুক্তি ছিল রাজনৈতিক, সামরিক ও নৈতিকভাবে সঠিক। জান্তার মনঃপুত না হওয়ায় তারা আমাকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেয় নি। এক কথায় জান্তার লক্ষ্য ছিল ভারতকে বিজয়ী হতে দেয়া।

ভারতীয়রা মুক্তিবাহিনী এবং চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পূর্ব পাকিস্তানে আগ্রাসন চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতীয়রা ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর তাদের আগ্রাসন শুরু করে এবং ঢাকা দখলের জন্য তারা চতুর্দিকে থেকে আমাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। তারা ১২ দিনে ঢাকা দখলের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে সীমান্তে অথবা সীমান্তের আশপাশে নিশ্চল করে রাখি এবং ১৩ দিন তারা কোণঠাসা হয়ে থাকে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে বিলম্বিত, অপরিকল্পিত ও অপরিণামদর্শী হামলা শুরু করলে অঘোষিত যুদ্ধ প্রকাশ্যে যুদ্ধে রূপ নেয়। ২১ নভেম্বর থেকে যে লড়াই সীমান্তে সীমাবদ্ধ ছিল তা দ্রুত দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হলে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাক্ষরিত প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় সোভিয়েতে ইউনিয়ন ভারতের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

আমাদেরকে রাতে অথবা প্রতিকূল আবহাওয়ায় চলাচলে বাধ্য করে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ ধ্বংস করে দেয় ভারতীয় বিমান বাহিনী। তা সত্ত্বেও আমরা তাদের জান-মালের অবিশ্বাস্য ক্ষতিসাধধন করি, তাদেরকে আরো এক সপ্তাহ আটকে রাখি সীমান্তে এবং আমাদের সুবিধাজনক ভূখণ্ডে তাদেরকে নিয়ে আসতে সক্ষম হই। ভারতীয় বাহিনী আমাদের শক্তঘাঁটি ও দুর্গের কাছাকাছি এসে থেমে যায়। তখনো তারা ছিল ঢাকা থেকে বহু দূরে এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। এ অবস্থায় ভারতীয় সেনাবাহিনী বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে এবং তাদের সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায় তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই নাজুক। অন্যদিকে, আমাদের দুর্গ ও শক্তঘাটিতে সবকিছুই ছিল অক্ষত। আর্টিলারি ও অন্যান্য সমরাস্ত্র সরবরাহে ঘাটতি ছিল না। এছাড়া আমাদের মধ্যে সমন্বয়েরও কোনো অভাব ছিল না।

আমি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ দলিলে সই করার অপমান এবং ভারতের কাছে যুদ্ধবন্দি হওয়ার দুর্ভাগ্য এড়াতে পারতাম। আমার অধীনে হেলিকপ্টার ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করার মতো সময়ও ছিল। আমি আমার প্রয়োজন মতো অর্থ নিয়ে যে কোনো নিরপেক্ষ অথবা বন্ধু দেশে হেলিকপ্টারে করে চলে যেতে পারতাম। আমার অনুপস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক লোকজন

ও বিহারি এবং সৈন্যদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হতো। তাই আমি ঢাকায় থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেই। একজন সৈনিক ও একজন কমান্ডার হিসেবে সৈন্যদের সঙ্গে অবস্থান করা ছিল আমার কর্তব্য। আমি সৈন্যদের সঙ্গে আত্মসমর্পণের অপমান এবং শত্রুর হাতে বন্দি হওয়ার দুর্ভাগ্যের অংশীদার হই।

চরম প্রতিকূলতার মধ্যে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে আমার সৈন্যরা। তাদের কোনো বিশ্রাম অথবা স্বস্তি ছিল না। তাদের চারদিকেই ছিল শত্রু। এ পরিস্থিতিতেও তাদের মনোবল ছিল অনেক উঁচু। ইতিহাসে এমন নজির খুব কমই আছে যেখানে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী তাদের মূল ঘাঁটি থেকে বহু দূরে দূরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তির ভেতর এত দীর্ঘদিন এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে।

নেতৃত্বে অভাবনীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন আমার অধিকাংশ কমান্ডারই। কিন্তু ভুট্টো ও তার ক্রীড়নকদের অপপ্রচারে তাদের এ বীরত্বপূর্ণ উপাখ্যান ফিকে হয়ে যায় এবং নেতিকবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। ভুট্টো সৎ হলে এবং তার অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলে তিনি হামুদুর রহমান কমিশনের তদন্ত কাজের পরিধি বিস্তৃত করতে পারতেন। কমিশনের তদন্তের আওতা সম্প্রসারিত করা হলে রাজনৈতিক ঘটনাবলী তদন্তের আওতাভুক্ত হতো। লে. জেনারেল গুল হাসান ছিলেন সেসময় চিফ অভ আর্মি স্টাফ। ভুট্টো তদন্ত কমিশনের পরিধি সংকুচিত করায় তিনি প্রতিবাদ করেন নি। কারণ তিনি ভালো করেই জানতেন যে, সীমিত গণ্ডির ভেতর তদন্ত পরিচালনা করা হলে ইস্টার্ন গ্যারিসনের ওপর পূর্ণ দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া সম্ভব হবে। ভুট্টোর তল্পিবাহক হতে গিয়ে তিনি তার বিবেক, নীতি-আদর্শ সবকিছু বিকিয়ে দেন। ভুট্টো মন্ত্রিসভার একটি সাব-কমিটি হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট এক নজর দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ রিপোর্ট দেখে কমিটি এটাকে 'পক্ষপাতমূলক' বলে আখ্যায়িত করেছে এবং 'চরত্র হননের একটি প্রয়াস' বলে সমালোচনা করেছে। ভুট্টোর দলের লোকজন এ রিপোর্টকে 'একপেশে, সংক্ষিপ্ত ও অপর্যাপ্ত' হিসেবে উল্লেখ করেছে। একথাও উঠেছে যে, কমিশন তাদের তদন্তের পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবেও একটি প্রচলিত তদন্ত কমিশনের রীতি-নীতি অনুসরণ করে নি। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে ভুট্টো ও টিক্কা এ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পুরোপুরি বদলে ফেলেন যাতে কোনো প্রামাণ্য দলিল অবশিষ্ট না থাকে।

রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পুরো দায়িত্ব ইস্টার্নকমান্ডের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। ইস্টার্ন কমান্ডের ওপর রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় ব্যর্থতা চাপিয়ে দেয়ার পেছনে কাজ করেছেন জেনারেল ইয়াহিয়া জেনারেল হামিদ, গুল হাসান, টিক্কা ও ফরমান। ক্ষমতায় যাবার জন্য ভুট্টোর পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়োজন ছিল। এ প্রয়োজন পূরণে তৎকালীন সরকার ও সেনা সদর দপ্তর ন্যাক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আওয়ামী লীগের কাছে বাংলাদেশ ছেড়ে দিয়ে ভুট্টো তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী

মুজিবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান এবং সেনাবাহিনী যাতে কখনো তার প্রতি একটি হুমকি হয়ে দেখা দিতে না পারে সেজন্য তিনি ইস্টার্ন কমান্ডের আত্মসমর্পণের পেছনে কলকাঠি নাড়েন। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতায় আসেন এবং তার ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করার জন্য তিনি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেন এবং ৪৫ হাজার যুদ্ধবন্দি ও ৪৭ হাজার বেসামরিক লোকজনকে ভারতের বন্দি শিবিরে দীর্ঘকাল ফেলে রাখার বন্দোবস্ত করেন। যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক লোকজন দেশে ফিরে এলে ভুট্টোর কারসাজি ও অপকর্ম ফাঁস হয়ে যেত।

সিমলা গিয়ে ভুটো পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানান। সেনাবাহিনীকে ঘৃণা করতেন তিনি। সিমলা গিয়ে তিনি যে উক্তি করেন তাতে তার এ উৎকট মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি আমাদেরকে ব্রিটিশের কামানের খোরাক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ভুট্টো তড়িঘড়ি করে বাংলাদেশ স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশ ও কায়েদে আযমের পাকিস্তানের পুনরেকত্রীকরণের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেন।

ইস্টার্ন কমান্ডের তৎপরতাকে নিম্নোল্লেখিত পর্যায়ে বিচার করতে হবে :

পর্যায় ১ : ১৯৭১ সালের মে নাগাদ বিদ্রোহীদের পরাজিত করে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পুনরুদ্ধার এবং বিদ্রোহীদের ভারতীয় ভূখণ্ডে বিতাড়িত করা। এ সাফল্যকে টিক্কার সমর্থকরাও একটি 'অলৌকিক' ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

পর্যায় ২ : পূর্ব পাকিস্তানের একটি ভূখণ্ড দখল করে সেখানে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গেরিলাদের সহায়তাদানকারী ভারতীয়দের প্রচেষ্টা নস্যাৎ।

পর্যায় ৩ : পরোক্ষ যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ২১ নভেম্বর প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ১২ দিনে পূর্ব পাকিস্তান দখল করতে চেয়েছিল। কিন্তু ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা সীমান্তেই লড়াই চালাচ্ছিল। এ সময়ের মধ্যে তারা কোনো উল্লেখযোগ্য ভূখণ্ড দখল নিতে পারে নি।

পর্যায় ৪ : আমাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে ৩ ডিসেম্বর পশ্চিম রণাঙ্গনে বিলম্বিত লড়াই শুরু করা। পশ্চিম রণাঙ্গনে বিপর্যয়ে আমার অবস্থান আরো বেসামাল হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও আমার সৈন্যরা লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে এবং ভারতীয় সৈন্যদের সীমান্তে আরো এক সপ্তাহ আটকে রাখে। ভারতীয়রা তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং ঢাকা রক্ষায় চূড়ান্ত লড়াইয়ের অবস্থানে আমার সৈন্যদের পিছু হটে আসতে দেখে ভারতীয়রা পর্যন্ত তাজ্জব বনে যায়। ফরমান ও কাজী মজিদের মতো চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত সত্ত্বেও আমার সৈন্যরা দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে

তোলে এবং আমি ঢাকাসহ আমার সকল দুর্গ রক্ষায় প্রস্তুত ছিলাম। ইয়াহিয়া পোলিশ ও রুশ প্রস্তাব গ্রহণ করে না করে আমাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। ভুট্টো পাকিস্তান ও পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর ওপর অসহনীয় অপমান ও অসম্মান চাপিয়ে দেন।

আমাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া না হলে দীর্ঘদিন আমি পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করতে পারতাম। কারণ ভারতীয়রা ছিল এলোমেলো অবস্থায়। অন্যদিকে, আমরা তখনো প্রধান প্রধান শহর, সমুদ্র বন্দর ও বিমান বন্দর নিয়ন্ত্রণ করছিলাম। ঢাকার বাইরে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে হামলা করার জন্য তাদেরকে নতুন করে সৈন্য আনতে হতো। এতে তাদের সময় লাগত প্রচুর। যশোর ও ময়মনসিংহ ছাড়া আমার অন্যান্য দুর্গগুলো ভারতের ১১টি ডিভিশনকে ঠেকিয়ে রাখছিল এবং তাদেরকে দীর্ঘদিন আটকে রাখাও সম্ভব ছিল। এতে ভারতীয়দের অবিশ্বাস্য ক্ষয়ক্ষতি হতো। ঢাকা দখল করতে হলে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে হতো তাদের। ইস্টার্ন গ্যারিসন পরাজিত হয় নি। আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষায় আমাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়।

ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে একটি নয়া কমিশন গঠন করা অপরিহার্য, ১৯৭১ সালের বিপর্যয় সম্পর্কে সত্য উদঘাটন করতে হলে। নজিরবিহীন প্রতিকূলতা ও অসম্ভব বাধা-বিপত্তির মধ্যে ইস্টার্ন কমান্ড কিভাবে ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে এবং অন্যদিকে, সকল উপায় ও সম্পদ এবং সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও মাত্র ১০ দিনের লড়াইয়ে ওয়েস্টার্ন কমান্ড কেন সাড়ে ৫ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড হারিয়েছে তা খুঁজে বের করার জন্য একটি সামরিক মহড়ার আয়োজন করা হোক।

এ মহড়ায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সেনাবাহিনী প্রধান। এ মহড়ায় দুটি বাহিনী অংশগ্রহণ করবে। একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দেবেন টিক্কা খান, গুল হাসান ও তাদের অনুসারীরা এবং আরেকটি দলে থাকবো স্বয়ং আমি এবং আমার অফিসারগণ। এ মহড়া হবে খুবই আকর্ষণীয়। এ থেকে অনেক কিছু শেখা যাবে। এতে চেয়ারে উপবিষ্ট হয়ে যারা যুদ্ধের নীতি নির্ধারণ করেন তাদের সঙ্গে রণাঙ্গনে সশরীরে অংশগ্রহণকারী জেনারেলদের মৌলিক পার্থক্য ফুটে উঠবে।

বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট

মেজর জেনারেল (তখন আমি ছিলাম লেফটেন্যান্ট জেনারেল) এ. এ. কে. নিয়াজি দক্ষতার সঙ্গে তার ডিভিশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সমস্যা মোকাবেলায় তিনি বাস্তববাদী ও সাহসী। তার উদ্যম, সামরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা দিয়েছে।

তার কৌশলগত জ্ঞান চমৎকার এবং প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনে তার তৎপরতা উৎসাহব্যঞ্জক।

তিনি সর্বদা তার প্রতিরক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন এবং ডিভিশনের লড়াই করার সামর্থ্য বৃদ্ধি করেছেন। তার ফরমেশন অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছে এবং তিনি নিজে সন্তোষজনকভাবে সামরিক আইনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জেনারেল নিয়াজি একজন বাস্তববাদী সৈনিক এবং একটি সুশৃঙ্খল ডিভিশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি অনুগত ও দেশপ্রেমিক এবং আমি নিশ্চিত যে, তিনি বরাবরই উন্নতি লাভ করবেন। যুদ্ধে বরাবরই তাকে আমার পাশে পাব আমি।

স্বাক্ষর-
লে. জে.
কমান্ডার
(টিক্কা খান)

দ্বিতীয় কোরের সদর দপ্তর
মুলতান ক্যান্টনমেন্ট,
নং : পিএ/ ৩১-এ/সিসি
৮ নভেম্বর, ১৯৭১

জেনারেল আবদুল হামিদ খানের রিপোর্ট

জেনারেল নিয়াজিকে আমি ভালো করেই চিনি। তিনি আমার অধীনে দীর্ঘদিন বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে তিনি 'টাইগার' নামেই পরিচিত। জেনারেল নিয়াজি আমাদের সেনাবাহিনীতে সর্বাধিক পদকপ্রাপ্ত অফিসার।

১৯৭১-এ জেনারেল টিক্কা খানের স্থলাভিষিক্ত করা হয় তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের জটিল ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায়। একজন বাস্তববাদী সৈনিক ও বৈরি পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালনে সক্ষম জেনারেল নিয়াজি অপকট, সৎ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও নিবেদিত। প্রচণ্ড চাপ ও বৈরি পরিবেশে সৈন্য পরিচালনার সামর্থ্য তাঁর রয়েছে।

তিনি ১৯৭১-এর এপ্রিল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সংকট মোকাবেলা করেছেন এবং মাত্র দু'মাসে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে ছদ্মবেশে লড়াইরত বিএসএফ ও ভারতের নিয়মিত সৈন্যদের ভারতে তাড়িয়ে দেন। এ অভিযান অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ও সাহসিকতার সঙ্গে পরিচালনা করা হয়। এতে কৌশলগত দক্ষতা, নিপুণ পরিকল্পনা ও কঠোর শ্রমের প্রতিফলন ঘটেছে।

জেনারেল নিয়াজির পরিকল্পনা ছিল সুষ্ঠু এবং আমি ও প্রেসিডেন্ট উভয়ে এ পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা এবং পাকিস্তানের ভূখণ্ডে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ না দেয়ার জন্য। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধ ও ঘটনাবলীকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যেতে পারে না। দেশের অধিকাংশ সামরিক শক্তি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের বিজয় পূর্ব রণাঙ্গনের বিজয় নিশ্চিত করতে পারত।

অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা বিশেষ করে যোগাযোগ রুট ও বড় বড় শহর রক্ষা এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহী তৎপরতা মোকাবেলায় নিয়োজিত বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তাদানে জেনারেল নিয়াজির তিনটি পদাতিক ডিভিশন অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছে।

এ তিনটি ডিভিশন অবিচল সাহস, অদম্য উৎসাহ, চরম আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে লড়াই করেছে গোলন্দাজ সহায়তার ঘাটতি এবং কার্যত বিমান বাহিনীর ছত্রছায়া না থাকা সত্ত্বেও শত্রুর পঞ্চম বাহিনীর অবিরাম গোলযোগের মুখে। ইতিহাসে এমন নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তারা শত শত যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার এবং ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীর সমর্থপুষ্ট ১২ ডিভিশন ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। এ প্রচণ্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 'টাইগার' নিয়াজির নেতৃত্বে, আমাদের

বীর ও নিবেদিত প্রাণ সৈন্যরা অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রেখেছে। 'টাইগার' তাঁর সৈন্যদের শেষ রক্ত বিন্দু ও শেষ বুলেট দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের নির্দেশ এবং আমার পরামর্শে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। পূর্ব রণাঙ্গনে সামরিক নয়, রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে। এ রাজনেতিক বিপর্যয়ের বীজ বপন করা হয় বহু বছর আগে। রাজনৈতিক কারণে পূর্ব পাকিস্তানে অসন্তোষ দানা বেধে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অসন্তোষের জন্য ১৯৭১ সালে জেনারেল নিয়াজি ও তার বীর সিপাহী এক কথায় গোটা সেনাবাহিনীকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ইস্টার্ন গ্যারিসনের সাহসিকতা, দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা পরিস্থিতিকে পাল্টে দিতে পারে নি।

একটি উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটে, আত্মসমর্পণের নির্দেশ পালন করায়। জেনারেল নিয়াজির মতো সর্বোত্তম ফিল্ড কমান্ডার আমি কখনো দেখি নি এবং এমন একজন কমান্ডারের সঙ্গে আমার আর কোথাও কাজ করার সৌভাগ্য হয় নি। আমি তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তিনি তথাকথিত বহু দেশপ্রেমিকের চেয়ে দেশের জন্য অনেক বেশি আত্মত্যাগ করেছেন।

স্বাক্ষর-
আবদুল হামিদ খান
জেনারেল

এপ্রিল ১৯৭২

পরিশিষ্ট ৩

গোপনীয়

অবিলম্বে
সদর দপ্তর ইস্টার্ন কমান্ড
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
ফোন : ২৫১
৭২১/আর/এআই

১৫ এপ্রিল ১৯৭১

প্রতি	:	কমান্ডার, ৯ ডিভিশন	কমান্ডার সিএএফ
		কমান্ডার, ১৪ ডিভিশন	এসিসি পিএএফ
		কমান্ডার, ১৬ ডিভিশন	ওসি সিডো, বিএন
		ডিজি, ইফকাফ	ওসি ৬০৪ এফআইইউ
		কমান্ড ইপি লগ এরিয়া	ওসি, ৭৩৪ এফআইসি
		কনসেপ	২৭ জিএল সেকশন
ইনফো	:	সদর দপ্তর, এমএলএ জোন 'বি'	ডেট আইএসআই
অভ্যন্তরীণ	:	জিএস ব্রাঞ্চ	এ্যাস্টাবলিশমেন্ট ব্রাঞ্চ
ডিস্ট্রিক্ট	:	সদর দপ্তর, ডেফ কয়	

বিষয় : শৃখলা-সৈন্য

১. আমি এসে পৌঁছানোর পর থেকে সৈন্যদের লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার ভুরি ভুরি খবর পাচ্ছি। সম্প্রতি ধর্ষণের খবরও পাওয়া যাচ্ছে এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানিরাও রেহাই পাচ্ছে না। ১২ এপ্রিল দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানি মহিলাকে ধর্ষণ করা হয় এবং আরো দু'জনকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। শোনা যাচ্ছে যে, প্রত্যাবর্তনকারী পরিবারের মাধ্যমে লুণ্ঠিত মালামাল পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে।

২. আমি আরো খবর পাচ্ছি যে, এসব জঘন্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অফিসাররাও জড়িত রয়েছেন। উপর্যুপরি নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও কমান্ডারগণ এ চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছেন। আমার ধারণা, ইউনিট ও

সাব-ইউনিটের ওসি এবং ওএসসি'গণ এসব অপরাধ গোপন করেছেন ও প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

৩. আমি সকল কমান্ডারকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যে, অবিলম্বে এসব জঘন্য তৎপরতা বন্ধ এবং নির্মূল করা না হলে লড়াইয়ের সামর্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। এটা একটা সংক্রামক ব্যাধি এবং আপনাদেরকে এ সমস্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও সুদূরপ্রসারী পরিণাম সম্পর্কে পুরোপুর সচেতন হতে হবে। নয়তো একদিন তা আমাদের মা-বোন এবং আমাদের নিজস্ব লোকজনের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা যাবে। ইতিহাসে এমন বহু নজির রয়েছে যে, লুটতরাজ ও ধর্ষণের লিপ্ত হওয়ায় যুদ্ধে সৈন্যদের পরাজিত হতে হয়েছে।

৪. অতএব, আমি সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেককে সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। নয়তো শাস্তি পেতে হবে তাদেরকে। বিশৃঙ্খলা, অসদাচার ও অর্থনৈতিকতাকে কঠোরহস্তে নির্মূল করা হবে। এ ধরনের হীন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে দোষী প্রমাণিত হলে অফিসারসহ সকলকে কঠোর দণ্ড ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। আমি আমার সৈন্যদেরকে ভবঘুরে এ সদস্যতে পরিণত হতে দেব না। এ ধরনের লোকের প্রতি কোনো সহানুভূতি ও করুণা প্রদর্শন করা হবে না।

৫. আমি কমান্ডারদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের একটি মহান মিশন রয়েছে এবং আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে কখনো অনেক দূরে। কোনো বাধাই আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমাদেরকে বিরত রাখতে পারবে না। তবে বিশৃঙ্খলাই কেবল আমাদের ক্ষতি করবে।

৬. আমি রণাঙ্গনের প্রতিটি সৈনিককে শৃঙ্খলার একটি মূর্ত প্রতীক ও উদাহরণ হিসেবে দেখতে চাই। আমি অফিসারদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তাদের সম্মান ও আচরণের একটি বিধি রয়েছে এবং ভদ্রলোক ও অফিসার হিসেবে তারা এ আচরণ বিধি মেনে চলবেন। এ প্রদেশের জনগণের মন জয় এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জনে এ আচরণ বিধি মেনে চলা খুবই জরুরি।

৭. এ নির্দেশ পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত সব গোয়েন্দা সংস্থা, এমপি ও এসএসজিদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োজন।

স্বাক্ষর-

লে. জেনারেল

কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ড

(আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি)

গোপনীয়

<u>গোপনীয় / ব্যক্তিগত</u>

<u>অবিলম্বে</u>
সদর দপ্তর, ইস্টার্ন কমান্ড
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
টেলিফোন : ২১০ (মিলিটারি)
০০৫/ আর / জিএস (অপারেশন)

১৮ এপ্রিল, ১৯৭১

প্রতি : কমান্ডার, ৯ ডিভিশন
কমান্ডার, ১৪ ডিভিশন
কমান্ডার, ১৬ ডিভিশন
ইনফো : কমান্ডার, ইপি লগ এরিয়া,
অভ্যন্তরীণ
ডিস্ট্রিক্ট : (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্রাঞ্চ)

বিষয় : <u>ফিল্ডে শৃংখলা</u>

আমি আপনাদেরকে বেশ কয়েকটি চিঠি লিখেছি এবং আশা করি, আপনারা আমার চিঠির বিষয়বস্তু আপনাদের অধীনস্থ সব অফিসারের কাছে পৌছে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছি যে, এত দ্রুত ফলাফল পাওয়া যাবে না। যা হোক, এটা আমার জন্য খুবই বিরক্তিকর যে, ফিল্ডে কিছু মৌলিক ভুল হচ্ছে। এগুলো রোধ ও সংশোধন করা প্রয়োজন। কমান্ডার ও অফিসারগণ এসব দোষ-ক্রটির প্রতি নজর না দিলে আমরা কেবল সৈন্য ও অফিসারদের যুদ্ধের জন্য ক্ষতিকর বদভ্যাসেই উৎসাহিত বিষয়াদি এবং ফিল্ড শৃংখলায় বিশেষভাবে মনোযোগ দেবে।

কয়েকটি ইউনিটে সাম্প্রতিক সফরকালে আমার এ ধারণা হয়েছে যে, যুদ্ধে শৃঙ্খলার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। মনে হয়েছে অফিসার ও সৈন্যরা যে সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন। আমি যা দেখেছি সেগুলো সংশোধন করার জন্য আমি বিষয়গুলো আপনাদের নজরে আনতে চাই–

ক. যুদ্ধ কৌশল ও যুদ্ধ অনুশলীনের অভাব।

খ. অফিসার ও সৈনিকরা পুরোপুরি ভুলে গেছে যে, তারা যুদ্ধের মাঠে রয়েছে।

সুতরাং তাদেরকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল আমি আমার সম্মেলনে বলেছিলাম যে, সর্ব-স্তরের সৈন্যকে এফএসএমও-সহ সজ্জিত থাকতে হবে এবং সারাক্ষণ যথাযথভাবে অস্ত্র বহন করতে হবে। যৌক্তিক কারণে শিরস্ত্রাণসহ পোশাকে মিল থাকতে হবে। জেনারেল পদমর্যাদার অফিসার ছাড়া অন্যান্য সকলকে ফিল্ডে একই রকম পোশাকে সজ্জিত হতে হবে। সকল পর্যায়ের সেনাদের এফএসএমও (প্যাকসহ অথবা প্যাকবিহীন) পরিধান করতে হবে। তাদেরকে স্টিল হেলমেট পরতে হবে এবং ব্যক্তিগত অস্ত্র বহন করতে হবে। কমান্ডারের অধঃস্তন অফিসারদের মানচিত্র, বাঁশি, নোট বুক, কম্পাস, বাইনোকুলার, পয়েন্টার প্রভৃতি সামগ্রী বহন করতে হবে। অফিসে অথবা বিশ্রামকালে বেসামরিক পোশাক পরিধান করা যাবে। রণাঙ্গনে পিক ক্যাপ (ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামরিক টুপি) পরা যাবে না।

গ. প্রতিরক্ষাকালে অথবা স্থায়ী অবস্থানে সর্বক্ষণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। কোনো নতুন অবস্থান দখল করা মাত্র সেখানে যথাযথ প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আকস্মিক হামলা অথবা অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হবে। একটি নতুন অবস্থানে পৌঁছা মাত্র তৎক্ষণাৎ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং যুদ্ধ অনুশলীন অনুযায়ী প্রহরা চৌকি স্থাপন করতে হবে।

ঘ. 'গুচ্ছভাবে' চলাফেরা করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মর্টারের গোলাবর্ষণে ইতোমধ্যে এরকম চলাফেরা ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে আমরা সড়ক নির্ভর হয়ে পড়েছি এবং পায়ে চলাফেরা করতে ভুলে গেছি। আমরা কদাচিৎ দেশের ভেতর স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছি।

ঙ. অনুসন্ধিৎসু, গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষমতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমি এগুলোর ওপর জোর দিচ্ছি এবং আশা করছি যে, অধঃস্তন কমান্ডারগণ এমনভাবে কাজ করবেন যাতে ঊর্ধ্বতন কমান্ডারদের মিশনে সহায়ক হয়। পরস্পরের মধ্যে একবার যোগাযোগ হলে তা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে এবং কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

চ. অবহেলা দেখানো হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রের পরিচর্যায়। অস্ত্রশস্ত্রগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে, তেল দিতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। তেল ও পরিষ্কার করার মাল-মসল্লার কোনো অভাব নেই।

ছ. সৈন্যরা বৈরী আবহাওয়ায় টিকতে পারছে না এমন ধারণা করা হচ্ছে। সকল সেনাকে যে কোনো ধরনের আবহাওয়ার জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে অবশ্যই তৈরি হতে হবে। আবহাওয়া কখনো কখনো যুদ্ধে ও রণাঙ্গণে

আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। সেনাদের প্রতি মনোযোগে শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না। চরম প্রতিকূল অবস্থায়ও যথাযথ বিশ্রাম ও স্বস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

জ. মূল যোগাযোগের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হচ্ছে না। আমার এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, এমন অনেক দুর্বলতা রয়েছে যেগুলো অবশ্যই আপনাদের নজরে আসবে। বর্তমানে আমরা অসংগঠিত বিদ্রোহী ও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তবে আমাদেরকে একটি অত্যন্ত সুসংগঠিত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এটা খুবই জরুরি যে, সকল পর্যায়ের কমান্ডারদের অবশ্যই আনুগত্যের ওপর জোর দিতে হবে এবং নির্দেশ মেনে চলতে হবে। যুদ্ধের মেজাজ পুরোপুরি বজায় রাখার এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি নিশ্চিত করার এটাই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

স্বাক্ষর
লে. জে. কমান্ডার
(এ. এ. কে. নিয়াজি)

গোপনীয়

একটি গোপনীয় দলিল প্রকাশ
এ. টি. চৌধুরী কর্তৃক, দৈনিক ডন, ২৩ ও ২৬ জুলাই ১৯৮৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী : এখনো প্রকাশ করার সময় হয়নি!

এ রিপোর্টের লক্ষ্য হচ্ছে, বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত ও সমর্থিত–অখণ্ডণীয় প্রমাণের ভিত্তিতে একটি মিথ্যা নাটকের রহস্য উন্মোচন করা। একটি গণতান্ত্রিক সরকার জাতীয় ইতহিাসের একটি অবিস্মরণীয় ও ক্ষমাহীন ঘটনা সম্পর্কে জনগণকে অন্ধকারে রেখেছিল। এ সরকার এ ঘটনা তদন্তে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করেছিল। কিন্তু গোপন রাখা হয়েছে এ কমিশনের রিপোর্ট। জনগণের কাছে দায়বদ্ধ একটি গণতান্ত্রিক সরকার কেন এমন করতে গেল, এর রহস্য উদঘাটন করা প্রয়োজন।

তদানীন্তন সরকার হামুদ-উর-রহমান কমিশনের রিপোর্ট পরিবর্তন অথবা এ রিপোর্টের সমালোচনা না করে দু'তিন দশকের জন্য এ রিপোর্ট প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এটা সচিবালয়ের মোহাফেজখানায় তালাবদ্ধ করে রাখতে পারত। কারণ তখন আবেগ ছিল তুঙ্গে এবং পরিস্থিতি ছিল উথাল-পাতাল। পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে এ রিপোর্ট প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে তাতে খুব এটা দোষ হতো না। সব গণতান্ত্রিক দেশেই এমন করা হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সকল গণতান্ত্রিক দেশে ঐতিহাসিক দলিলগুলো গোপন রাখা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এগুলো প্রকাশ করা হয়। কারণ তখন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জীবিত থাকার সম্ভাবনা থাকে কম। ততদিনে জনগণের আবেগও প্রশমিত হয়ে আসে এবং ঘটনার বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করার মতো ইতিহাসবিদ ও প্রত্যক্ষদর্শীও খুব একটা উপস্থিত থাকেন না।

জনগণের নির্বাচিত সাবেক সরকার যেসব কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে :

(ক) কমিশনের রিপোর্টে দোষী প্রমাণিত কয়েকজন জেনারেলকে কোর্ট মার্শালে বিচার করার পরিবর্তে তাদেরকে অবসরে পাঠায় এবং অন্যান্যদের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিদেশে কূটনৈতিক দায়িত্বে নিয়োগ করে। অপরাধ ও ভুলের জন্য শাস্তি না দিয়ে কয়েকজনকে দেয়া হয় পুরস্কার।

(খ) বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে জনসমক্ষে এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। যে অংশ বাদ দেয়া হয়েছে সেখানে রয়েছে পরাশক্তিসহ কয়েকটি বিদেশি শক্তির পাঠানো অতি গোপনীয় বার্তা অথবা গোপনীয় সরকারি দলিল। নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো জাতীয় স্বার্থে সংরক্ষণ করা উচিত ছিল।

যুক্তিসঙ্গত পথ পরিহার করে পিপিপি সরকারের কর্তাব্যক্তিরা হামুদ রিপোর্টকে শুধু প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতেই পরিণত করে নি, তারা এ রিপোর্টকে একপেশে, সংক্ষিপ্ত ও পক্ষপাতমূলক আখ্যায়িত করে সমালোচনাও করেছে।

রিপোর্টটিকে অপর্যাপ্ত দেখতে পেয়ে ভুট্টোর লোকজন তাদের নেতাকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ করতে পারে নি। এ কমিশন গঠনের সময় ভুট্টো এর সীমারেখা বেঁধে দিয়েছিলেন এবং তদন্তের পরিধি সংকুচিত করেছিলেন।

বিশ্বস্ত সূত্রের ভিত্তিতে জানা গেছে যে, তদন্ত কমিশনকে সামরিক বিপর্যয়ের মধ্যেই তাদের তদন্ত সীমাবদ্ধ রাখার এবং আত্মসমর্পণের জন্য দায়ী রাজনৈতিক ঘটনাবলী চাপা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বিচারপতি হামুদ-উর-রহমান ঢাকার অনাকাঙ্ক্ষিত পতনের পূর্বের পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিচারের জন্য তদন্তের পরিধি বিস্তৃত করার সুপারিশ করেছিলেন বলে শোনা যায়। এখানে উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার।

এই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে কমিশন গঠনেও। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ কমিশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এমন একজন বিচারপতি যার সততা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই। তবে এ-কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি ছিলেন জন্মগতভাবে একজন পূর্ব পাকিস্তানি। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ায় তিনি অবশ্যই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তদন্তে তাঁর এ মানসিক দুর্বলতার প্রতিফলন ঘটা বিচিত্র নয়। তদন্ত কমিশনে কোনো নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সুযোগ্য কোনো সামরিক বিশেষজ্ঞকেও রাখা হয় নি। তবে একথা সত্য যে, তদন্ত কমিশন পরবর্তীকালে তদন্ত কার্যে দু'জন সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তাদের নিয়োগ বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিল না। সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে যে দু'জনকে নিয়োগ করা হয় তাদের একজন হলেন লে. জেনারেল আলতাফ কাদির এবং অন্যজন হলেন মেজর জেনারেল কোরেশী। মেজর জেনারেল কোরেশী 'পাকিস্তান আর্মি' নামে একটি বই লিখেছেন। তার সঙ্গে তদানীন্তন সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং সরকার তাকে খুব বিশ্বাস করতো।

তদানীন্তন সরকার হামুদ-উর-রহমান কমিশনের শর্তাবলী সীমিত করে দেয়ায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ কমিশনের রিপোর্টকে সরকার তার মন মতো করে তৈরি করাতে চেয়েছিল। তদানীন্তন সরকার বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের ব্যবচ্ছেদ এবং সামরিক বিপর্যয়ের রাজনেতিক পটভূমি গোপন রাখতে চেয়েছিল। এটা দুঃখজনক যে, তদন্ত কমিশন সরকারের এ হীন উদ্দেশ্যে নীরবে সায় দিয়েছে এবং ভুট্টোর হুকুম শিরোধার্য করেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে যে, রিপোর্টে 'ক্ষমতা দখলকারী' হিসেবে ইয়াহিয়ার বিচারের সুপারিশ করা হয়েছিল। তবে কমিশন ইয়াহিয়াকে অসময়ে আত্মসর্মপণের নির্দেশদান এবং পাকিস্তানের বিরাট ট্রাজেডির জন্য দায়ী করে বিচারের সুপারিশ করে নি। একথা সত্য যে, ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট আইউবকে হটিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। এটা তার যত বড় দোষ তার চেয়ে হাজার গুণ বড় দোষ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে বিপর্যয়ে তার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ভূমিকা। ইয়াহিয়াকে ছাড় দিয়ে সুপারিশ করা হলেও তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা তাঁর বিচারের চেষ্টা করে নি। এসব দেশপ্রেমিকরা পুরনো পাকিস্তানের ধ্বংস্তূপের ওপর 'নতুন পাকিস্তান'

গড়তে চেয়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, মূল খলনায়কে কেন অব্যাহতি দেয়া হলো? এটা কি এ জন্য যে, তার বিচার হলে মূল নায়কদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাবে?

এ বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্রের উল্লেখ করতে গিয়ে ভুট্টোর একজন জীবনীকার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, "১৯৭১-এর বিপর্যয়ের জন্য ইয়াহিয়া, মুজিব ও ভুট্টো দায়ী। তিনি আরো বলেছেন, অনেকের মতে, এ তিন জনের মধ্যে ভুট্টো ছিলেন সবচেয়ে চতুর রাজনীতিক। তাঁর কার্যকলাপের পরিণাম উপলব্ধি করার মতো যথেষ্ট শিক্ষা ও জ্ঞান তাঁর ছিল। সুতরাং এ বিয়োগান্ত ঘটনার সিংহভাগ দায়িত্ব অবশ্যই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে।

(ভুট্টো : আ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফি : সালমান তাসির)

ভুট্টো কেন হামুদ-উর-রহমান কমিশনের রিপোর্টে গোপন করেছিলেন তা উপরের উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভুট্টোর জীবনী লেখক সালমান তাসির আরেক জায়গায় লিখেছেন, "ভুট্টো এ রিপোর্ট প্রকাশে কখনো সাহস পান নি। কারণ যেসব রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও ভ্রান্তিতে দেশ ভেঙে গেছে তিনি সেগুলোতে অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।" হ্যাঁ, তিনি তাই ছিলেন। কমিশন যে পরিস্থিতিতে কাজ করছিল সে পরিস্থিতিতে ভুট্টোর অনুকূলে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেয়া ছাড়া কমিশনের গত্যন্তর ছিল না। কমিশন চূড়ান্ত রিপোর্টে ভুট্টোর ভূমিকা এড়িয়ে যায় এবং মুজিব ও ইয়াহিয়াকে দোষারোপ করে। নিজের দোষ প্রকাশ পাবার ভয়ে ভুট্টো গোপনে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছিলেন।

ঢাকার পতন ঘটার আগে ভুট্টো প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশে তিনটি শক্তিশালী পক্ষ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে আওয়ামী লীগ, সেনাবাহিনী ও পিপিপি। পিপিপিকে একটি একক শক্তিতে পরিণত করার জন্য এ ত্রিভুজ শক্তিকে ভেঙে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। ক্ষমতার একক উত্তরাধিকারী হিসেবে পিপিপি'র আবির্ভাবের জন্য তা ভেঙ্গে দিতে হয়েছে। ১৯৭১ সালের মার্চে এ 'তিনটি শক্তির' দুটি যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখনই এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে অবশিষ্ট পাকিস্তানের ক্ষমতার লাগাম ধরার জন্য ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানানো হলে এ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

ক্ষমতায় বসেই তিনি ক্ষমতার অন্যান্য কেন্দ্র ধ্বংস অথবা অন্তত সেগুলোকে দুর্বল করার জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। এ লক্ষ্য অর্জনের তিনি দুটি বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। একটি হচ্ছে যুদ্ধবন্দি এবং অন্যটি হচ্ছে হামুদ-উর-রহমান কমিশন। তিনি ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দির সাথে ৪৫ হাজার ছিল সৈন্য এবং বাদবাকিরা বেসামরিক লোকজন। এ সত্যকে কখনো তুলে ধরা হয় নি।

হামুদ-উর-রহমান কমিশন যত সত্য প্রকাশ করেছে, গোপন করেছে তার চেয়েও বেশি। ভুট্টো এ কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে এমন একটা ধারণা দিতেন যে, একটি টাইম বোমা রয়েছে তার কাছে। তিনি যাদের ভয় পেতেন তাদের মাথার ওপর ডেমোক্লিসের তরবারির মতো এ রিপোর্ট ঘোরাতেন এবং যাদের পুষতেন তাদের মাথার ওপর।

পরিশিষ্ট ৬

সরদার ফারুক আহমেদ খান লেঘারি
প্রেসিডেন্ট, ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান
প্রেসিডেন্টের সচিবালয়, ইসলামাবাদ

বিষয় : পেনশন পুনরুদ্ধার– জেনারেল অফিসার্স

জনাব,

১. পত্র-পত্রিকায় সম্প্রতি আপনার একটি বিবৃতি পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এ আবেদন পেশ করছি। আপনার বিবৃতিতে আপনি বলেছেন যে, ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে ন্যায়বিচার পাবার আশায় কলম তুলে নিয়েছি। আমি জানি যে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখাই প্রেসিডেন্টের মুখ্য দায়িত্ব। অন্যায়ের প্রতিবিধান করাই ইসলামের শিক্ষা। আমি আপনার কাছে আবেদন করতে আরো অনুপ্রাণিত হয়েছি একারণে যে, প্রায় সিকি শতাব্দি আগে পূর্ব পাকিস্তানে বিপর্যয় ঘটেছে এবং ইতোমধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে।

২. ১৯৭১ সালে জাতীয় ট্রাজেডি এবং পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরিণামে আমাকে ১৯৭৫ সালের ৫ মে সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করা হয় এবং আমাকে আমার কষ্টার্জিত পেনশন থেকে বঞ্চিত করা হয়। আমাকে পেনশন থেকে বঞ্চিত করায় শুধু আমাকেই নয়, একই সাথে আমার গোটা পরিবার এবং আমার আত্মীয় স্বজন যারা আমার আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল তাদেরকেও চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এক প্রশাসনিক নির্দেশে কোনো কারণ না দেখিয়ে আমাকে সার্ভিস থেকে অপসারণ করা হয়। আমি কোর্ট মার্শাল গঠন করার সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু আমার এ সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নি। কোর্ট মার্শাল গঠন করা হলে গোটা যুদ্ধ পরিচালনায় হাই কমান্ডের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অনেক অপ্রিয় সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়তো। হাই কমান্ড এবং আরো অনেকে তখন থেকে যারা সুখে-স্বাচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছে, তাদের সমষ্টিগত ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে কেবল আমাকে একা। আমাকে এককালীন একটি পেনশন দেয়া হয়। এ পেনশন এতই সামান্য যে, তা কোনোক্রমেই নিয়মিত পেনশনের পরিপূরক নয় এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত

জেনারেলের মর্যাদা ও অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৩. প্রিয় প্রেসিডেন্ট, মুখোশধারীদের চেহারা আড়াল করার জন্য বহু নির্দোষ লোকের মতো আমাকেও শাস্তি দেয়া হয়েছে। তবে এসব নির্দোষ লোক তাদের জীবদ্দশায় পুনর্বাসিত হয়েছেন। এজন্যই আমি আপনার কাছে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করছি। আমাকে অজ্ঞাত ও অশ্রুত কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

৪. আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে সুবিচারের আশায় কিছু ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছি :

ক) আমি কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলাম। কোর্ট মার্শাল গঠন করা হলে সত্য প্রকাশিত হতো এবং প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়ে যেত। কিন্তু আমাকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে দেয়া হয় নি। তারা আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনতে পারে নি। কোট মার্শাল গঠন করা হলে যুদ্ধের শুরুতেই কেন পশ্চিম পাকিস্তান ব্যর্থ হয়েছিল, সেই সত্য উন্মোচিত হতো এবং অন্যদিকে, এ সত্যও ফুটেও উঠতো যে, ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের শক্তির অনুপাত ১০ : ১ হওয়া সত্ত্বেও ইস্টার্ন কমান্ড প্রায় এক বছর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের শক্তির অনুপাত ছিল ১ : ১।

খ) ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথমবার শত্রুর সঙ্গে আমাদের সৈন্য ও সম্পদে সমতা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে আমাদের জন্য পরিস্থিতিও ছিল অনুকূল। সার্বিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সৈন্যরা তাদের অবস্থান গ্রহণ করে। সার্বিক জাতীয় পরিকল্পনার মূল বিষয়বস্তু ছিল, 'পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ করা হবে পশ্চিম পাকিস্তানে। " সীমিত সম্পদ ও সৈন্য থাকায় ইস্টার্ন গ্যারিসনের ভূমিকা ছিল শুধু টিকে থাকা। অন্যদিকে মূল ও চূড়ান্ত লড়াই হবে পশ্চিম রণাঙ্গণে। কারণ অধিকাংশ সম্পদ ও সৈন্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ছিল অনুগত, পশ্চাৎভাগ ও পার্শ্বভূমি ছিল নিরাপদ এবং গোটা নৌ ও বিমান বাহিনীও নিয়োজিত ছিল সেখানে।

গ) আমাদের সুবিধামতো ও পছন্দসই সময়ে যুদ্ধ শুরু করেও পশ্চিম রণাঙ্গনে আমরা শত্রু ভূখণ্ড দখল করার পরিবর্তে নিজেদের সাড়ে ৫ হাজার বর্গমাইল আয়তনের ভূখণ্ড হারাই। মাত্র ১০ দিনের লড়াইয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের এ বিপর্যয় সামরিক দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য, অবিশ্বাস্য ও ক্ষমার অযোগ্য।

ঘ) পক্ষান্তরে, চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইস্টার্ন গ্যারিসন সীমিত সম্পদের সাহায্যে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মিশন সম্পন্ন করে। কিন্তু আমাদের হাই কমান্ড অত্যন্ত অনুকূল অবস্থায় থেকেও মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং

পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান গ্যারিসনের সর্বনাশ ডেকে আনে।পশ্চিম পাকিস্তানকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার স্বার্থে আমাদেরকে পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগ এবং শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের চরম গ্লানি মেনে নিতে হয়। যাদের ভুলে ও ব্যর্থতায় পশ্চিম পাকিস্তানে বিপর্যয় ঘটেছে তাদের সবাই ছাড়া পেয়ে গেছে। অনেককেই সার্ভিসে রাখা হয় এবং পদোন্নতি দেয়া হয়। কাউকে কাউকে লোভনীয় চাকরিও দেয়া হয়। কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হয় নি। কারো বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত হয় নি। কিন্তু আমি জেনারেল নিয়াজি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ন্যস্ত সব দায়িত্ব সম্পন্ন করেও অন্যান্যদের ভুলের জন্য শাস্তি পেয়েছি কেবল একা।

ঙ) সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে জেনারেল টিক্কা খান এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, জেনারেল নিয়াজিকে কোর্ট মার্শালে বিচার করা সম্ভব নয়। কারণ তার বিরুদ্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য অভিযোগ নেই।

চ) হামুদ-উর-রহমান কমিশনের রিপোর্ট হচ্ছে একটি অতি গোপনীয় দলিল। কিন্তু এ রিপোর্টের অংশবিশেষ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এ রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

(১) ১৯৭১ সালে বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু বলির পাঁঠা বানানো হয় কেবল আমাকে।

(২) আত্মসমর্পণ করা হয় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে। পশ্চিম পাকিস্তানে শোচনীয় পরাজয়ের আংশকায় প্রেসিডেন্ট এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(৩) 'পিপিপি'র ৭-সদস্যের' একটি কমিটির সুপারিশে এ রিপোর্ট গোপন রাখা হয়।

(৪) এ রিপোর্টের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই এবং বাস্তবায়নের জন্য কোনো নির্বাহী আদেশ দিয়ে তা অনুমোদন করা হয় নি।

(৫) হামুদ-উর-রহমান কমিশনের টার্মস অভ রেফারেন্স ছিল সীমিত (বিপর্যয়ের সব দিক তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি)।

(৬) জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে 'ক্ষমতা দখলকারী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া ছিলেন সংকটের প্রধান স্থপতি। তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ছ) পাকিস্তানের ব্যবচ্ছেদ ঘটানোর জন্য জেনারেল ইয়াহিয়াকে দোষারোপ করা হলেও তিনি দুটি পেনশন ভোগ করেন (প্রেসিডেন্ট ও সি ইন সি) এবং সরকারি খরচে তাঁকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় বিদেশে। মৃত্যুর পর তাঁকে পূর্ব সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়। অন্যদিকে, আমাকে পেনশন থেকে

বঞ্চিত করা হয়। কারণ মাত্র দু'মাস সময়ে আমি :

(১) পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি। পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব কেউ নিতে চান নি। আমার আগে দু'জন সিনিয়র জেনারেল ব্যর্থ হয়েছিলেন।

(২) জীবন যাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনি।

(৩) গেরিলা ও ভারতীয় অনুচরদের উচ্ছেদ করি। এর আগে তাদের মনোবল ছিল খুব উঁচু এবং হামলা করার সামর্থ্য রাখত তারা। আমিই হচ্ছি সেই জেনারেল যার সৈন্যরা দু'মাসের কম সময়ে বজ্র অভিযানে গেরিলাদের পরাজিত করে।

(৪) জেনারেল ফজল মুকিম তাঁর বইয়ে আমাদের সাফল্যকে 'একটি অলৌকিক' ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

(৫) শত্রুদেরকে কোণঠাসা করা হয় এবং পরে তাদের উচ্ছেদ করা হয়। এ অভিযানে নিয়মিত সৈন্য ছিল ৩৪ হাজার এবং বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ছিল আরো ১১ হাজার। সব মিলিয়ে মোট ৪৫ হাজার। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, স্থানীয় জনগণের পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩ লাখ সৈন্যের প্রয়োজন ছিল।

(জ) ১৯৭১ সালে মে নাগাদ সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। এটা ছিল একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির আদর্শ সময়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বেদিতে পাকিস্তানের ৪৫ হাজার সৈন্যকে কোরবানি করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগের অশুভ ইচ্ছায় রাজনৈতিক নিষ্পত্তির এ সুযোগ হারানো হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে একটি সরকারবিহীন অবস্থায় পরিত্যাগের অশুভ লক্ষ্য অর্জনে এ পরিকল্পনা করা হয়।

ভারতীয়রা জয়লাভ করলে এবং নিয়াজি যুদ্ধে পরাজিত হলেই কেবল পূর্ব পাকিস্তানকে সরকারিহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করা সম্ভব। কিন্তু জান্তা যখন দেখতে পেল যে, আমি রণাঙ্গনে পরাজিত হব না তখন আমাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়া হয়। আমি এ নির্দেশ পালনে অস্বীকার করায় আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপর্যয়ের কথা শোনানো হয়। তারা দরিদ্র পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ এবং ধনী পশ্চিম পাকিস্তান শাসন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ঝ) সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতের মাটিতে যুদ্ধ সম্প্রসারণে আবার পরিকল্পনা পর্যালোচনা করেন এবং এ পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু ও কার্যকর বলে অভিমত দেন।কিন্তু সরকারি নির্দেশে আমার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তখন আমার প্রতি সরকারি নির্দেশ ছিল :

(১) ভারতের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যাবে না। ভারতীয় ভূখণ্ডে আমাদের সৈন্যরা প্রবেশ করতে পারবে না এবং ভারতীয় ভূখণ্ডে গোলাবর্ষণও করা যাবে না।

(২) শক্তি প্রয়োগে ভারতীয়দের পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে।

(ঞ) ১৯৭১-এর ১৩ ডিসেম্বর আমি "শেষ ব্যক্তি ও শেষ বুলেট" অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার চূড়ান্ত নির্দেশ দিই। এ নির্দেশের অর্থ ছিল লড়াই করে মৃত্যুবরণ করা। কোনো অফিসার অথবা সৈন্য এ নির্দেশ মেনে নিতে দ্বিধা করেন নি। সবাই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্দেশে এ নির্দেশকে 'আত্মসমর্পণের' নির্দেশে পরিবর্তন করতে হয়।সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদ ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. মালিক আমাকের আত্মসমর্পণে রাজি করান। ডা. মালিক আমাকে বলেছিলেন যে, আত্মসমর্পণে বিলম্ব করলে পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধে আরো বিপর্যয় ঘটবে। তারা যে-কোনো মূল্যে পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ বিরতি কামনা করছিল। ভীতি ও চাপ এমন মাত্রায় পৌঁছে যে, সরকার পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষায় পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দিতে অধীর হয়ে ওঠে। সুতরাং আমাদের মূল ঘাঁটি পশ্চিম পাকিস্তানকে ছিন্নভিন্ন হওয়া এবং ওয়েস্টার্ন গ্যারিসনকে অধিকতর হামলা থেকে রক্ষায় আমি আমার সুনাম, আমার উজ্জ্বল ক্যারিয়ার এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মহান ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেই এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আত্মসমর্পণে রাজি হই। সেসময় আমরা কোথাও পরাজিত হই নি এবং কোথাও কোথাও আমরা ভারতীয়দের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন জাপানি বাহিনীর ভাগ্যেও একই ঘটনা ঘটেছিল। পর্যাপ্ত নৌ ও বিমান সহায়তা এবং মিত্র বাহিনীর তুলনায় সামরিক ও কৌশলগতভাবে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও জাপানের ৫৮ ডিভিশন সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিল। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মোতায়েন জাপানি কমান্ড তাদের মাতৃভূমিকে অধিকতর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষায় নিঃশর্তভাবে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

৫। প্রিয় প্রেসিডেন্ট, সবচেয়ে উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা হিসেবে আমার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা ছিল যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে। একটি হচ্ছে, জাতীয় লক্ষ্য যা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় সরকার নির্ধারণ করেছিল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সামরিক বরাদ্দ। আমাকে যে সম্পদ দেয়া হয়েছিল সেগুলো ৩টি বাহিনীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ সম্পদের হিসাব থেকে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, যে কোনো মানদণ্ডে ইস্টার্ন গ্যারিসনের সাফল্য সন্তোষজনক।

পাকিস্তান

(ক) পদাতিক ডিভিশন	৩টি (দুটি ডিভিশনের ভারী অস্ত্র ছিল না)
খ) ট্যাংক রেজিমেন্ট	১টি রেজিমেন্ট (৩ স্কোয়াড্রন এম-২৪ মডেলের ট্যাংক, ৭৫ মিলিমিটার কামান সজ্জিত)
গ) বিমান বাহিনী	এক স্কোয়াড্রন (পুরানো মডেলের এফ-৮৬)
ঘ) বিমান ক্ষেত্র	একটি
ঙ) নৌবাহিনী	৪টি গানবোট

ভারত

ক) পদাতিক ডিভিশন	১২টি ডিভিশন (পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন)
খ) ট্যাংক রেজিমেন্ট	৬ টি রেজিমেন্ট (১৮ স্কোয়াড্রন, ১০৫ মিলিমিটার কামান সজ্জিত এবং নৈশকালে চলাফেরায় সক্ষম)
গ) বিমান বাহিনী	১৪ স্কোয়াড্রন (এফজিএ)
ঘ) বিমান ক্ষেত্র	৩টি, একটি বিমানবাহী রণতরী
ঙ) নৌবাহিনী	ভারতীয় নৌবাহিনীর অধিকাংশ যুদ্ধজাহাজ

নোট : ১৯৭১-এর মার্চ থেকে মুক্তি বাহিনীর ছদ্মবেশে বিদ্রোহীদের সহায়তাদানকারী নাশকতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত ভারতীয় সৈন্যদের এ হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। স্থানীয় জনগণ শুধু আমাদের প্রতি বৈরীই নয়, তারা আমাদের সঙ্গে লড়াই করেছে।

৬। শত্রু বাহিনীর কমান্ডার, বিদেশি প্রচার মাধ্যম এবং আমাদের নিজস্ব হাই কমান্ডও পূর্ব পাকিস্তান গ্যারিসন এবং এ গ্যারিসনের কমান্ডারের প্রশংসা না করে পারে নি। এসবের কিছু হচ্ছে :–

ক) "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন প্রবীণ সৈনিক, লম্বা-চওড়া, সুঠাম ও আত্মবিশ্বাসে তিনি বলীয়ান। সৈনিকদের জেনারেল হওয়ার সুনাম তার রয়েছে। তিনি প্রাণবন্ত একজন মানুষ।"
(ইন্ডিয়ান আর্মি আফটার ইন্ডিপেনডেন্স, পৃষ্ঠা ৪৩৮)

খ) 'প্রদীপ্ত নিয়াজিকে সৈনিকদের জেনারেল হিসেবে চিত্রিত করা হয়।"
(দ্য লিবারেশন অভ বাংলাদেশ, মেজর জেনারেল সুখবন্ত সিং)

গ) "চৌকস গার্ড অভ অনার প্রদান করায় অ্যাডমিরাল মাউন্টব্যাটেন এ মেজরের প্রশংসা করেন এবং তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ যুদ্ধের রেকর্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। ১৯৪৩ সালে বিলাতে প্রেরিত সরকারি চিঠি-পত্রে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয় এবং কোহিমার জঙ্গলে অসাধারণ বীরত্ব ও নেতৃত্ব

প্রদর্শনের জন্য তাঁকে 'মিলিটারি ক্রস'-এ ভূষিত করা হয়।

(ফৌজি আকবর, ২৫ মে ১৯৪৬)

ঘ) "পূর্ব পাকিস্তানে শত্রুর সর্বশেষ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপনি এবং আপনার কমান্ডের সৈন্যরা যে বিস্ময়কর সাহস প্রদর্শন করেছেন তাতে আমি গভীরভাবে অভিভূত।"

(সি.-ইন.-সি. ইয়াহিয়া ২৯ নভেম্বর ১৯৭১)

ঙ) "পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছে তা অদম্য সাহসের একটি মহাকাব্য এবং ইসলামের সৈনিকদের সর্বোচ্চ ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে।"

(১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাষণ)

চ) **'বিশ্বে তাঁর মতো লোক খুব কমই আছে।'** "মার্কিন গোয়েন্দা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এ শিরোনামে এক খবরে বলা হয় যে, জেনারেল নিয়াজি ও তাঁর সৈন্যদের প্রতিরোধ যুদ্ধের ইতিহাসে নজিরবিহীন। সরবরাহ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত কোনো সেনাবাহিনী এমন অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে এত দীর্ঘদিন লড়াই করে নি।" (স্টার স্পেশাল, ওয়াশিংটন, ডিসেম্বর ১৯৭১)

৭। মেজর থেকে পরবর্তী পদগুলোতে আমার দ্রুত পদোন্নতি হয়েছে এবং উপমহাদেশ বিভক্তির আগে ও পরে উভয়কালে অবধারিতভাবে বিশেষ দায়িত্ব ও মিশনের জন্য আমাকে বাছাই করা হতো। এসব মিশন শেষে প্রশংসা ও পদক দুটিই পেতাম আমি। আমি সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত অফিসার এবং নিম্নবর্ণিত রেকর্ড অনুযায়ী আমি আমার সমান বয়স ও একই সার্ভিস গ্রুপে বিশ্বের যে কোনো সেনাবাহিনীর যে কোনো অফিসারের সঙ্গে নিজেকে সহজেই তুলনা করতে পারি :

ক) দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ

(১) এমসি (মিলিটারি ক্রস)। ভারত থেকে প্রেরিত ব্রিটিশ সরকারি চিঠিপত্রে আমার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। সাহসিকতা, দক্ষতা, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠার জন্য প্রশংসাপত্রও প্রদান করা হয়। (ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কোনো ভারতীয় অফিসারের জন্য এরূপ পদক ও প্রশংসাপত্র লাভ একটি বিরল ঘটনা)।

(২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আসামে এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হাতাহাতি লড়াইয়ে আমার হাতে একজন জাপানি মেজর নিহত হয়। এ ঘটনার পর আমাকে 'টাইগার'

খেতাব দেয়া হয়। এ খেতাব পরিণত হয় আমার ডাক নামে। লেফটেন্যান্ট থেকে আমাকে সরাসরি মেজর পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। (পাকিস্তানে যুদ্ধ পরিচালনায় কৃতিত্বের জন্য আমাকে 'তারিক বিন-জিয়াদ' নামে ডাকা হতো।)

(৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমি একটি রাজপুত রেজিমেন্টের দায়িত্বে ছিলাম। আমার রেজিমেন্ট আমাকে 'অমর সিং রাঠোর' নামে ডাকতো।

(খ) পাকিস্তান অপারেশন

১। সিন্ধুতে পঙ্গপাল দমন অভিযানে সাফল্যের জন্য আমাকে 'সিতারা ই-খিদমত' পদকে ভূষিত করা হয়।

২। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য আমি 'হিলাল-ই-জুরাত' খেতাব পাই।

৩। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে আমাকে 'হিলাল-ই-জুরাত' এবং 'সিতারা-ই-পাকিস্তান' পদকে ভূষিত করা হয়। (আমি দু'বার 'হিলাল-ই-জুরাত' খেতাবে ভূষিত হওয়ার দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছি)

গ) পদক : আমার বুকে ২৪টি পদক শোভা পেয়েছে (সেনাবাহিনীতে আমার চেয়ে বেশি পদক আর কেউ পান নি)

৮। আমার ব্যর্থতা এটাই যে, আমি ভাগ্যান্বেষী, তোষামোদকারী, স্বার্থপর, উচ্চাভিলাষী ও ষড়যন্ত্রকারী চক্রের কোনো অংশীদার হতে পারি নি। যা সত্য তাই বলেছি আমি এবং সত্য কথা বলতে কখনো দ্বিধা করি নি। আমি ক্ষমতার রাজনীতি এবং সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখাকে ঘৃণা করেছি। আমি আমার সিনিয়র ও জুনিয়র উভয়ের প্রতি ছিলাম অনুগত। আমি একথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, অন্য যে কোনো লোকের চেয়ে আমার দেশ ও দেশের সশস্ত্র বাহিনীর কল্যাণে বেশি কাজ করেছি আমি।

৯। অফিসার ও জিসিও উভয়কে আমি কমিশন প্রদানের ক্ষমতা রেখেছি। এ ধরনের ক্ষমতা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কও ভোগ করেন নি। আমি সিতারা-ই-জুরাত পর্যন্ত বীরত্বপূর্ণ খেতাব প্রদান করতে পারতাম। কাউকে পদক প্রদানের বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সরকার প্রধান। কিন্তু আমাকে এ বিরল ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এটা ছিল আমার প্রতি সরকারের আস্থার নিদর্শন। আমার ওপর সরকারের এ বিশ্বাস ছিল যে, কাউকে পদক প্রদানের ক্ষেত্রে আমার বিবেচনা হবে সন্দেহের অতীত। এ ধরনের ক্ষমতা আর কোনো কমান্ডিং জেনারেল ভোগ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই।

১০। জনাব, আত্মসমর্পণের নির্দেশ পেয়ে (১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমি আত্মসমর্পণের নির্দেশ পাই, তবে আমি আত্মসমর্পণ দলিলে সই করি ১৬

ডিসেম্বর ১৯৭১-এ) সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আমি আমার দেশের আর্থিক সম্পদ রক্ষায় ঢাকার ব্যাংকগুলো থেকে নগদ অর্থ (বিদেশি মুদ্রাসহ) ও স্বর্ণ সরিয়ে ফেলি। আমি তখন এসব অর্থ-কড়ি ও স্বর্ণ নিয়ে কোনো নিরপেক্ষ দেশে পালিয়ে গেলে সেখানে আমাকে বাধা কে দিত? রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের নজির আধুনিক সমাজে কোনো বিরল ঘটনা নয়। আমি ইচ্ছে করলে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতাম। অন্যান্য জেনারেলদের জীবন মানের তুলনায় আমি হত দরিদ্র জীবন যাপন করছি। আমি আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর এবং ভারতে একজন যুদ্ধবন্দি হয়ে বসবাসের অসম্মান থেকেও রেহাই পেতে পারতাম। আমি কর্নেল মোহাম্মদ খানের তত্ত্বাবধানে সকল নোট জ্বালিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম।

১১। কিন্তু সংকটকালে চৌর্যবৃত্তি এবং সৈন্য ও জনগণকে ত্যাগ করা নিয়াজির ধর্ম নয়। হেলিকপ্টারে করে ঢাকা থেকে পালিয়ে যাবার পরিবর্তে আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেই। পশ্চিম পাকিস্তানি ও বিহারিদের জীবন রক্ষায় সকল সম্পদ ব্যবহার করেছি। নয়তো তাদের হাজার হাজার লোককে মেরে ফেলা হতো। আমাদের মা-বোনদের ধর্ষণ করে কলকাতায় পতিতালয়ে পাঠানো হতো। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিদ্রোহী ও ভারতীয়রা যা করেছিল তারা তাই করতো এবং চূড়ান্তভাবে আমার সৈন্যদেরকে মুক্তিবাহিনীর করুণার ওপর ছেড়ে দিতে হতো। এক পর্যায়ে জেনারেল মানেকশ হুমকি দেন যে, আত্মসমর্পণ দলিল চূড়ান্ত না হলে এবং তাতে আমি স্বাক্ষর না দিলে তিনি মুক্তি বাহিনীকে লেলিয়ে দেবেন। আমি তাঁর হুমকিতে বেসামরিক লোকজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে আত্মসমর্পণে রাজি হই। আমার সঙ্গে আলোচনা করে জেনেভা কনভেনশন অনুসারে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দুঃসময়ে আমি আমার প্রাণপ্রিয় সৈন্যদের পরিত্যাগ করি নি। কিন্তু ইতিহাসে এমন প্রচুর নজির রয়েছে যেখানে দুঃসময়ে পৃথিবী খ্যাত জেনারেলগণ তাদের সৈন্যদের পরিত্যাগ করেছেন। জামায় পরাজিত হয়ে মহাবীর হ্যানিবল তার সৈন্যদের ছেড়ে গিয়েছিলেন। ফরাসি বীর নেপোলিয়ন দু'বার তার সৈন্যদের পরিত্যাগ করেছিলেন। একবার মিশরে এবং আরেকবার রাশিয়ায়। ১৯৭১ সালের মার্চে লে. জেনারেল ইয়াকুব খান পদত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সৈন্যদের ত্যাগ করেন।

১২। জনাব প্রেসিডেন্ট, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও সামরিক বিপর্যয়ের জন্য যারা দায়ী তাদের কারো কোনো ক্ষতি হয় নি। এখানেই ঘটনার শেষ নয়। তাদের প্রত্যেককে অবসর গ্রহণের পর লোভনীয় চাকরি

দেয়া হয়। কিন্তু ৪০ বছরের চাকরি জীবনে আমার কষ্টার্জিত পেনশন থেকে আমাকে ও আমার পারিবারকে বঞ্চিত করার কোনো যুক্তিগত কারণ আমার বোধগম্য নয়। প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করা এবং তাদেরকে রক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানে বিপর্যয়ের জন্য আমাকে বলির পাঁঠা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শেষ দিন পর্যন্ত এ বিরাট ট্রাজেডিতে যে কয়জন শীর্ষ ব্যক্তি জড়িত ছিলেন তাদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার একটি বর্ণনা নিচে দিচ্ছি :

ক) জেনারেল ইয়াহিয়া খান : দুটি পেনশন এবং বিদেশে সরকারি খরচে চিকিৎসা সুবিধা লাভ। এ নীতিনির্ধারক, চক্রান্তকারী ও ওয়াদা খেলাপকারীকে একজন বীরের সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়।

খ) জেনারেল আবদুল হামিদ : জেনারেল ইয়াহিয়ার ডান হাত। কার্যত সি-ইন-সি'কে পেনশন মঞ্জুর করা হয় এবং সরকারি ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়।

(গ) লে. জেনারেল পীরজাদা : প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার। তিনি যুদ্ধে কখনো একটি গুলির আওয়াজও শোনেন নি। ইয়াহিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন তিনি এবং তার বিরুদ্ধাচরণকারীদের সঙ্গে হাত মেলান। তাকে পূর্ণ পেনশন দেয়া হয়।

(ঘ) লে. জেনারেল গুল হাসান : তিনিও পাকিস্তানের কোনো যুদ্ধে একটি গুলির আওয়াজ শোনেন নি। তথাপি তিনি আরোহণ করেন শীর্ষ পদে। তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান গ্যারিসনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান। সব জেনারেলই পূর্ব পাকিস্তানে বদলি এড়িয়ে যান। আমি ছিলাম সিনিয়রিটির তালিকায় দ্বাদশ। এত জুনিয়ার জেনারেল হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান গ্যারিসন কমান্ড করার জন্য আমাকেই নির্বাচন করা হয়। প্রেসিডেন্ট আমার চেয়ে সিনিয়র জেনারেলদের তৎপরতা ও দক্ষতা মূল্যায়ন করে সন্তুষ্ট হতে না পেরে আমাকেই এ পদের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে সকল শর্তই ছিল আমাদের অনুকূলে। কিন্তু ডিভিশন ও কোর পরিচালনায় চিফ অভ জেনারেল স্টাফ জেনারেল গুল হাসানের ব্যর্থতায় পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের বিপর্যয় ঘটে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি বৃদ্ধি ও সাজ-সরঞ্জাম পাঠানোর জন্য আমার কাছে সুচিন্তিতভাবে মিথ্যা বার্তা পাঠান। তিনি পেশাগতভাবে আমার পদাবনতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ঐসব লোকদের একজন যারা আমাকে পরাজিত দেখতে চেয়েছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ক্ষমাহীন ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁকে সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিযুক্তি দেয়া হয়। তবে ভুট্টো তাঁকে অপসারণ করেন। তিনি তাঁকে পূর্ণ পেনশন দিয়েছিলেন এবং তাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিদেশে পাঠানো হয়।

(ঙ) এয়ার চিফ মার্শাল রহিম : ১৯৭১-এর যুদ্ধে বিমান বাহিনী পরিচালনায় তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ও তাঁর বিমান বাহিনী আত্মগোপন করে। এ সুযোগে ভারতীয় বিমান বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানের আকাশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং পূর্ণ পেনশন পান। এছাড়া, তাকে রাষ্ট্রদূতও করা হয়।

(চ) লে. জেনারেল জাহানজেব আরবাব : তার জিওসি তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে একটি ব্রিগেডের কমান্ড থেকে অপসারণ করেন এবং লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে বিচারের জন্য তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত পাঠান। তদন্তে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। তা সত্ত্বেও তিনি ব্রিগেডিয়ার থেকে মেজর জেনারেল এবং পরে লে. জেনারেল পদে উন্নীত হন। অবসর নেয়ার পর তিনি পূর্ণ পেনশন পান।

ছ) মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী :

(১) ১৯৭১-এর মার্চে সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল ফরমান আলী। এ অভিযান এত নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর ছিল যে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপোসের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় জাতিসংঘ প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং প্রেসিডেন্ট, আমার নিজের এবং গভর্নরের অনুমোদন ও সম্মতি ছাড়া জাতিসংঘ প্রতিনিধির কাছে একটি অতি গোপনীয় বার্তা হস্তান্তর করেন। তিনি আমাদের না জানিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান ও রুশদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(২) তিনি তাঁর ভাগিনার মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীর কাছে ৮০ হাজার টাকা (১৯৭১ সালে এটা অনেক টাকা) পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ভাগিনা ছিলেন হেলিকপ্টারের একজন পাইলট। এ ঘটনা জানানো হয়। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। তাঁকে ফৌজি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান করা হয় এবং এরপর তিনি মন্ত্রীও হন। তিনি এখন প্রচুর অর্থের মালিক। যা দেখে অনেকেই ভ্রূ কুচকাচ্ছেন।

(জ) মেজর জেনারেল তাজাম্মুল হোসেন : কোর্ট মার্শালে তাঁর বিচার হয় এবং তাঁকে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আসলাম বেগের পরামর্শে তাঁকে মুক্তি দেয়ার পর তাঁর পেনশন পুনর্বহাল করা হয়।

ঝ) আরো দু'জন অফিসারের পেনশন পুনর্বহালের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সেগুলো হচ্ছে :

(১) কর্নেল খানজাদা : তিনি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর শাস্তি হয়, কিন্তু ফিল্ড মার্শাল আইউব খান তাঁর পেনশন মঞ্জুর করেন।

(২) মেজর জেনারেল আকবর খান : ১৯৫১ সালে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায়

তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। কিন্তু তাঁর পেনশন মঞ্জুর করা হয়। ১৯৭২ সালে ভুট্টো তাঁকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

১৩। উপরোক্ত উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অফিসারদের পেনশন দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হওয়া ছাড়াই আমি পেনশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

১৪। যাদের সিদ্ধান্তে আমার অনশন বন্ধ হয়েছে এবং যার জন্য আমি ও আমার সন্তানরা কষ্ট ভোগ করেছি তার কিছুটা বিবরণ আপনার কাছে পেশ করেছি। সুপ্রিম কমান্ডার হিসেবে যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবিধান করার সর্বোচ্চ ক্ষমতা আপনার রয়েছে। ন্যায়বিচারের মূল স্তম্ভ হচ্ছে যে, 'আপনি একজনকে যে সুবিধা দেবেন, অন্যান্যদের একই সুবিধা দিতে হবে।' এটা হচ্ছে সাম্যের বিধান এবং এর কোনো ব্যতিক্রম কাম্য নয়। প্রত্যেকের জন্য বিচারের একই মানদণ্ড থাকতে হবে। আইন মন্ত্রণালয় অথবা পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতির কাছে বিষয়টি পাঠানো হলে তাঁরা সাম্যের আইনকে অগ্রাহ্য করবেন না। ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ন্যায়বিচারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং ইসলাম মজলুম মানবজাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এক জন্যই বিশ্বে ইসলামের প্রসার ঘটেছে।

১৫। আমি কি এ কারণে দুর্ভোগ পোহাব যে, আমি কেন্দ্র থেকে এক হাজার মাইল দূরে বিচ্ছিন্ন একটি রণাঙ্গনে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছি যেখানে সামরিক বিবেচনার চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে? যেখানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল? পূর্ব পাকিস্তান সংকটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত প্রত্যেকে যেখানে হয় পুরোপুরি পুনর্বাসিত নয়তো পেনশন অথবা গুরুত্বপূর্ণ চাকরি পেয়েছে?

১৬। জনাব প্রেসিডেন্ট, পূর্ব পাকিস্তানের শেষ কমান্ডারকে কি বাকি জীবন দৈন্যের মধ্যে কাটাতে হবে এবং তার সন্তান-সন্ততিকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে এবং তারা কি বসবাসের অযোগ্য গৃহে বসবাস করবে? নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্য কি এ জেনারেল ও তার পরিবারকে শাস্তি দেয়া হবে :

(ক) যেখানে ইতোমধ্যেই দু'জন জেনারেল ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনীর হাল ধরার জন্য কেউ ছিল না সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ব গ্রহণ?

(খ) সামরিক অভিযান ও বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে এসেছিলেন সেখানে চরম প্রতিকূলতার ভেতর পূর্ব পাকিস্তানে এগারো মাস পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন রাখা।

(গ) হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি এবং লাখ লাখ বিহারিকে গণহত্যার মুখে ঠেলে না দেয়া এবং হাজার হাজার নারীদের ধর্ষিতা ও পতিতালয়ে বিক্রি হতে না দেয়া এবং সৈন্যদেরকে নেতৃত্ব দানের জন্য আত্মসমর্পণের পর

কমান্ড পরিত্যাগ না করা।

(ঘ) যেখানে আমি খুব সহজে পালাতে পারতাম সেখানে পালিয়ে না গিয়ে আত্মসমপর্ণ দলিলে স্বাক্ষরের গ্লানি বহন এবং ভারতে যুদ্ধবন্দি শিবিরে বিড়ম্বিত জীবন-যাপন।

(ঙ) সর্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত অফিসার হওয়ায়।

(চ) নিরপেক্ষ আইন থেকে বঞ্চিত হওয়ায়।

(ছ) বছরের পর বছর শোষণ বঞ্চনা থেকে উত্থিত একটি রাজনৈতিক বিপর্যয় এবং রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরিণতি হিসেবে সামরিক বিপর্যয়। (নিয়াজি একজন কাপুরুষ এবং অনেকের কৃতদোষে ফলভোগী ব্যক্তি)।

১৭। একজন সৈনিকের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার যে তার সি.ইন.সি বার্ষিক প্রতিবেদনে তার যুদদ্ধক্ষেত্রে কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

১৮। জনাব প্রেসিডেন্ট, কারো প্রতি বিদ্বেষ থেকে আমি আপনার কাছে এ আবেদন করি নি। আমার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে কারো কারো নাম উল্লেখ করতে হয়েছে। আমি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের কাছে ন্যায়বিচার চাই। আমার প্রতি দু'দশকের বেশি অন্যায় করা হয়েছে। লে. জেনারেল হিসেবে আমি ৪ বছর দায়িত্ব পালন করেছি। আমাকে লে. জেনারেল হিসেবে অবসর দিয়ে এবং পূর্ব থেকে কার্যকর পেনশন মঞ্জুর করলেই আমার প্রতি এ যাবৎ যে অন্যায় করা হয়েছে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আপনি আমার প্রতি এতটুকু সুবিচার করলে আমি আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকবো।

১৯। আমার সৈন্যরা যেখানে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার ভেতর বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছিল সেখানে আমি তার চেয়ে ভালো নেতৃত্ব কিভাবে দিতে পারতাম? সকল পর্যায়ের কমান্ডে চমৎকার নেতৃত্ব থাকার কারণেই কেবল তা সম্ভব হয়েছে। এখানে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

(ক) কামালপুর চৌকিতে আমাদের এক তরুণ কাপ্টেন ভারতের একটি ব্রিগেডকে ২১ দিন ঠেকিয়ে রেখেছিল। তরুণ ক্যাপ্টেন আহসান মালিকের চৌকিতে ছিল ৭৫ জনের একটি কোম্পানি। ৭৫ জনের মধ্যে ছিল ৩৯ জন নিয়মিত সৈন্য এবং বাদবাকি ৪৫ জন মুজাহিদ। অন্যদিকে ভারতের ৩ হাজার সৈন্যের সেই ব্রিগেডে ছিল ১৮টি ফিল্ড গান ও ১৮টি মর্টার। প্রতিদিন অন্তত দুবার শত্রু বিমান ক্যাপ্টেন মালিকের চৌকিতে বোমাবর্ষণ করেছে। তাতেও পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের অবস্থান ধরে রাখে।

(খ) হিলিতে একটি পাকিস্তানি ব্যাটালিয়ন (৯শ' সৈন্য) ভারতের একটি পদাতিক ডিভিশন ও একটি ট্যাংক ব্রিগেডকে (৩ রেজিমেন্ট ট্যাংক) ২০ দিন প্রতিরোধ করেছিল। ভারতের এ পদাতিক ডিভিশনে ছিল ৫ ব্রিগেড (১৫ ব্যাটালিয়ন) সৈন্য। এ ব্যাটালিয়নকে ৪০ মাইল দূরে বগুড়ায় কিছু

হটার নির্দেশ দেয়া হয়। যথারীতি নিরাপদে তারা পিছু হটে আসে। হিলিতেও দিনে দু' বার বিমান হামলা হতো।

(গ) বগুড়ায় ট্যাংক রেজিমেন্টের দফাদার সারোয়ার আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানান এবং তাঁর একটি মাত্র ট্যাংক নিয়ে গোলাবর্ষণ করতে করতে ভারতের অবস্থানের ভেতর ঢুকে পড়েন। তাঁর ট্যাংক ধ্বংস হয়ে গেলে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া নাগাদ তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। ভারতীয় সৈন্যরা দিক পরিবর্তনে বাধ্য হয় এবং দফাদার সারোয়ারকে সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়।

(ঘ) আমাদের আরেকজন সৈন্যকে ভারতীয়রা সামরিক মর্যাদায় দাফন করে। তাঁর সাহসিকতায় শত্রুরাও অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বছরের পর বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়। লাখ লাখ সৈন্য এতে অংশ নেয়। কিন্তু এ যুদ্ধে মাত্র একজন সৈন্য শত্রুর হাতে সামরিক মর্যাদায় সমাহিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। এ ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন একজন ব্রিটিশ সার্জেন্ট। তিনি ওয়েস্টার্ন ডেজার্টে জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল রোমেলকে হত্যা করতে গিয়ে নিহত হন। আমি মাত্র ৪৫ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করেছি এবং ভারতের সঙ্গে ২৬ দিন প্রকাশ্য যুদ্ধ হয়। এ সময়ে ভারতীয়রা আমাদের ৪ জন বীর যোদ্ধাকে সামরিক মর্যাদায় দাফন করে।

২০। সাহস, দক্ষতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার এমন উদাহরণ আর কাছে কিনা সন্দেহ। যে সৈন্যরা এমন প্রবাদ প্রতিম বীরত্ব প্রদর্শন করেছে এবং শত্রুর হাতে সামরিক মর্যাদায় সমাহিত হওয়ার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছে, তাঁদের রণনৈপুণ্য ও আত্মত্যাগের পেছনে কি তাঁদের কমান্ডারের কোনো অবদান নেই?

২১। পূর্ব পাকিস্তানের কমান্ডার হিসেবে আমার সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হলে আমার প্রতি শেষ অবিচারের অবসান ঘটবে। অন্যদের ভুল ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত থেকে আমি মুক্তি চাই।

আপনার একান্ত অনুগত,
লে. জেনারেল (অব.)
এ. এ. কে. নিয়াজি

তারিখ : ২৩ এপ্রিল, ১৯৯৫ — ১, শামি রোড, লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পছন্দ না হলে, উপরোক্ত পত্রের উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই।

পরিশিষ্ট ৭

যুদ্ধের ধারণা

একটি বড় ফ্রন্টে প্রতিরক্ষার ধারণা

পাকিস্তানের জন্মের পর ভারতের একতরফা যোদ্ধা-মনোভাব মোকাবেলায় কোনো স্থায়ী সামরিক কৌশল গ্রহণ করা হয়নি। একটি কার্যকর প্রতিরক্ষা ধারণা উদ্ভাবনে বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এসব গবেষণায় বিবেচ্য বাস্তব উপাদানগুলো সামরিক বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করেছে। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হতো :

ক) পাকিস্তানের ভৌগোলিক গভীরতা কম। তাই ক্লাসিক্যাল ধারণা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর হামলা চালানোর জন্য শত্রুকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, রুশরা শহর বন্দর জ্বালিয়ে দিয়ে এবং সেখান থেকে পিছু হটে শত্রুকে ফাঁদে ফেলার জন্য ভূখণ্ডের ভেতরে নিয়ন্ত্রণ রেখে (এলওসি) প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেয়। এ কৌশলে তারা শত্রুকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় এবং ফাঁদে ফেলে তাদের ধ্বংস করে। নেপোলিয়ন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের তারা এভাবে ফাঁদে ফেলে পরাজিত করেছিল। পাকিস্তান যদি এভাবে বিনা যুদ্ধে ভূখণ্ড খালি করে দিত তাহলে ভারতীয়রা বিনা আয়াসে বিশাল অঞ্চল দখল করে নিত।

খ) অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ও শিল্প কেন্দ্র, সড়ক ও রেল যোগাযোগ এবং নদ-নদী সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি। আমরা শত্রুর ক্ষতি সাধন এবং তাদের রক্ত ঝরানো ছাড়া এগুলো খালি করে দিতে পারি না। জাতীয় সেনাবাহিনী সীমান্তে অথবা সীমান্তের ওপারে লড়াই করে। আমাদের দেশের প্রতি বর্গমাইল ভূখণ্ড পবিত্র এবং প্রতিরক্ষার উপযুক্ত। এটা মনে রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র দখলদার সেনাবাহিনীই এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করতে পারতো।

গ) পশ্চিম পাকিস্তানে লাহোর, কাসুর, শিয়ালকোট অথবা বাহ্ওয়ালনগর এবং পূর্ব পাকিস্তানে খুলনা, যশোর, রাজশাহী, দিনাজপুর, সিলেট অথবা কুমিল্লার মতো যে কোনো শহর হারানোর ফলে জাতীয় মনোবল এবং জনগণের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

ঘ) পাকিস্তানে বিশাল সীমান্ত, অসংখ্য রাস্তাঘাট, বিস্তৃত এলাকা এবং অদ্ভুত ক্রিয়াশীল পরিবেশ রয়েছে। বস্তুত ভূখণ্ড রয়েছে পর্যাপ্ত। তবে সৈন্য সংখ্যা খুবই নগণ্য। এ জন্য আমাদেরকে সীমান্ত রক্ষা করতে হয় এবং এ কাজ যে কোনো বিচারে বিরাট। সুতরায় পুঁথিগত সামরিক শিক্ষা অনুযায়ী কার্যকরভাবে প্রতিরক্ষা সংগঠন করা একজন আত্মরক্ষাকারীর পক্ষে দুরূহ ব্যাপার।

অতএব, পাকিস্তান সেনাবাহিনী পারস্পরিক সহায়তাদানকারী বিভিন্ন স্তরভিত্তিক প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ের একটি সামরিক মতবাদ গ্রহণ করে। এ প্রতিরক্ষা মতবাদে শত্রুকে ছিন্নভিন্ন এবং তাকে দুর্বল করে দেয়া এবং মূল শক্তি নিয়ে আমাদের ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে হামলা করার আগে তাদের সর্বোচ্চ ক্ষতিসাধনের বিষয় বিবেচনা করা হয়। প্রাথমিকভাবে, যতদূর সামনে যাওয়া যায় ততদূর সামনে গিয়ে অনুপ্রবেশ পথগুলোতে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। অগ্রবর্তী অবস্থানের পতন হলে পরবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনে পিছু হটে আসতে হবে এবং মধ্যবর্তী প্রতিরক্ষা লাইনের পতন ঘটলে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য শক্ত ঘাঁটি ও দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে এ প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রয়োগ করা হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী সামরিক বিবেচনায় যতটুকু সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রধান প্রধান অনুপ্রবেশ পথগুলোতে প্রাথমিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলা হয়। হিলি, চৌগাছা, বেনাপোল, আখাউড়া ও কুমিল্লা ছিল এ ধরনের প্রাথমিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ। সীমান্ত চৌকি নয়; প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার ভিত্তিতে অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা লাইন স্থাপন করা হয়।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়; বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানেও যুদ্ধ পরিচালনায় শক্ত ঘাঁটি ও দুর্গভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পূর্ব থেকে নির্ধারিত শহর ও বন্দরে স্থাপিত শক্তঘাঁটি ও দুর্গের ভিত্তিতে আমরা প্রতিরক্ষামূলক তৎপরতা চালাই। শক্তঘাঁটিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ নাও থাকতে পারে। তাই টহলদান, মাইন স্থাপন ও রেকির মাধ্যমে এসব ফাঁক-ফোঁকর পূরণ করা হয়। শক্তঘাঁটি হচ্ছে মূলত লড়াইয়ের সেই ঘাঁটি যেখান থেকে শত্রুর ওপর হামলা এবং তাদের সৈন্য ও সমরাস্ত্রের প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় শত্রুর তৎপরতা মন্থর হয়ে পড়ে এবং তখন তারা পশ্চাৎভাগে তাদের যোগাযোগ লাইন রক্ষায় সৈন্য মোতায়েনে বাধ্য হয়। শত্রু হয়রানিতে পড়ে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ রেখা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফাঁক-ফোঁকরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং শত্রুর নিয়ন্ত্রণ রেখা বিচ্ছিন্ন করার জন্য শক্তঘাঁটি থেকে অভিযান পরিচালনা করা হয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীকে তুলনামূলকভাবে একটি বিশাল এলাকা রক্ষা করতে হয় বলে এ মতবাদ এখনো বহাল রয়েছে। প্রয়োজনীয় সৈন্য বণ্টনের মাধ্যমে পাশ কাটিয়ে যাওয়া শত্রুকে লাঞ্ছিত করার কৌশল ডিভিশনাল কমান্ডার গ্রহণ করতে পারেন।

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ সার্বিক ধারণা, প্রয়োগ এবং তা বাস্তবায়নে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের ভূমিকা :

ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে সশস্ত্র বাহিনীর অধিকাংশ মোতায়েন রাখা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পূর্ব পাকিস্তানে রাখা হতো ডিভিশন আকারের একটি বাহিনী। সশস্ত্র বাহিনীর এরূপ বিন্যাসের কারণেই এ ধারণার জন্ম হয়েছিল যে, 'পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নির্ভর করে' অথবা 'পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ করা হবে পশ্চিম পাকিস্তানে।' এ ধারণার অনুবাদ করলে এ অর্থই দাঁড়ায় যে, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতে হবে পশ্চিম

রণাঙ্গন থেকে এবং এ রণাঙ্গন থেকে হামলা চালিয়ে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড দখল করতে হবে। অন্যদিকে, পূর্ব রণাঙ্গন আত্মরক্ষামূলক বা সীমিত লড়াই চালিয়ে যাবে এবং অধিকাংশ ভারতীয় সৈন্যকে ব্যস্ত রাখতে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে যতক্ষণ যুদ্ধের ফয়সালা না হয় ততক্ষণ ভারতীয় সৈন্যদের সেখানে আটকে রাখতে হবে। বিশদ গবেষণা ও বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ ধারণা গৃহীত হয় এবং ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়া নাগাদ এটাই ছিল আমাদের সামরিক কৌশলের প্রধান স্তম্ভ। এ ধারণার আওতায় পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সঙ্গে আমাদের লড়াই হয় এবং লড়াইয়ের পরিকল্পনা বিচ্ছিন্ন ছিল না। বরং তা ছিল সার্বিক কৌশলের একটি অপরিহার্য অংশ। উভয় রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল পরস্পরের পরিপূরক ও পরস্পর নির্ভরশীল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স উভয় রণাঙ্গনের যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করতো। সেনাবাহিনীর প্রধানের অধীনে কর্মরত সিজিএস ছিলেন সামরিক তৎপরতায় সমন্বয় সাধন এবং যুদ্ধ পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য দায়ী। যথারীতি একে অপরকে সহায়তা দানের লক্ষ্যে যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। বিচ্ছিন্নভাবে যে কোনো তৎপরতা চালানো হলে বিপর্যয় নেমে আসতে পারতো।

পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডটি ভারত পরিবেষ্টিত। সুতরাং ইস্টার্ন গ্যারিসন ছিল ভারতের মুঠোর মধ্যে। খোলা ছিল শুধু আকাশ ও সমুদ্র পথ। যুদ্ধের শুরুতে এ দুটি পথও বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধে নিয়োজিত একটি সেনাবাহিনীর জন্য শত্রুর হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার চেয়ে ভয়ংকর পরিস্থিতি আর কিছু হতে পারে না। ভেতর থেকে অবরোধ ভেঙে দিয়ে অবরুদ্ধ বাহিনী মূল ফ্রন্টের সঙ্গে যোগদানে ব্যর্থ হলে মূল ফ্রন্টকে বাইরে থেকে চূড়ান্ত আঘাত হেনে শত্রুকে অবরোধ প্রত্যাহারে বাধ্য করতে হবে নয়তো অবরোধ ভেঙে ফেলতে হবে। অবরোধ ভাঙা সম্ভব না হলে অবরুদ্ধ বাহিনীর ধ্বংস সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ রকম ভূরি ভূরি নজির ইতিহাসে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১৯৪১ সালে ইউক্রেনের যুদ্ধ, স্টালিনগ্রাদ, সিঙ্গাপুর, ক্রিট, মালয়, সিনাই, গোলান মালভূমি এবং সাম্প্রতিকালের অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম। এসব ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার অথবা হাই কমান্ডের নির্দেশ ছাড়াই সামরিক কমান্ডারগণ আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছেন। অন্যদিকে, আমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং প্রেসিডেন্টের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হামিদ ও গভর্নর মালিকের পরামর্শে আত্মসমর্পণ করেছি।

এটা মোটামুটিভাবে গৃহীত হয়েছিল যে, ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ে সার্বিক ধারণা অনুযায়ী ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের হামলা শুরু করলে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনীকে পদানত করতে লড়াইয়ে লিপ্ত হলে পশ্চিম রণাঙ্গনে শত্রুর সঙ্গে শক্তির একটি আনুপাতিক ভারসাম্য রক্ষায় ইস্টার্ন গ্যারিসনকে অধিকাংশ ভারতীয় সৈন্যদের ব্যস্ত এবং তাদেরকে এখানে আটকে রাখতে হবে। শত্রুর সঙ্গে সৈন্য ও সমরাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব অথবা সমতার সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের এলিট রিজার্ভ ফোর্স ক্ষিপ্র ও তীব্র হামলা শুরু করবে এবং ভারতের

স্পর্শকাতর ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড দখল করবে এবং এভাবে সামরিক ভারসাম্য পাল্টে দেবে। (উঁচু মানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাজোয়া ডিভিশনের সমন্বয়ে এলিট স্পেশাল রিজার্ভ ফোর্স গঠন করা হয়েছিল এবং সাজোয়া ডিভিশনের নেতৃত্বে ছিলেন চৌকস অফিসারগণ। রিজার্ভ ফোর্সকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে যুদ্ধের চেহারাই পুরোপুরি পাল্টে যেত)। ফলে হৃত ভূখণ্ড পুনর্দখলে ভারতীয়রা পূর্ব রণাঙ্গন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে পশ্চিম রণাঙ্গনে মোতায়েন করবে। সে ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ ইস্টার্ন গ্যারিসনের ওপর থেকে চাপ উঠে যাবে। এ সময়ে পরাশক্তির হস্তক্ষেপে একটি যুদ্ধবিরতি হবে এবং পরবর্তী দর কষাকষির জন্য অধিকৃত ভারতীয় ভূখণ্ড ধরে রাখতে হবে।

নিম্নোক্ত হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে এ কৌশলগত ধারণা গৃহীত হয় :

(ক) ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ হবে তীব্র, ভয়াবহ ও স্বল্পকাল স্থায়ী। বিশ্ব শক্তি এ অঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক, কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থে দু'এক সপ্তাহের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করবে।

(খ) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশে যুদ্ধের পক্ষে জনগণের বিপুল সমর্থন পাওয়া যাবে।

(গ) চীনের প্রকাশ্য হুমকি মোকাবেলায় ভারতকে চীন সীমান্তে সৈন্য মোতায়েনে বাধ্য হতে হবে এবং চীনা হুমকিতে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে হামলায় সংযত হবে।

ইস্টার্ন গ্যারিসনকে চরম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এক অসম্ভব যুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে। বাঙালিরা বিদ্রোহ করে এবং পরাশক্তির সহানুভূতির পাল্লা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। চীনারা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপে অনীহা প্রকাশ করে। এ কারণে সামরিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ছিল প্রচণ্ডভাবে ভিন্ন। ইস্টার্ন গ্যারিসন ক্ষমতালিপ্সুদের চক্রান্তের বেড়াজালে আটকা পড়ে। প্রদেশে বিদ্রোহ যুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ করে। আমরা জনসমর্থন হারিয়ে ফেলি। রাজনৈতিক ও সামরিক মিশন বাস্তবায়ন এবং বাঙালি বিদ্রোহ ও বহিঃশক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনীর হুমকি মোকাবেলায় পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত সৈন্য ছিল মুষ্টিমেয়। সামরিক বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, কেবলমাত্র বিদ্রোহ দমনেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আড়াই থেকে তিন লাখ সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য মোতায়েনের প্রয়োজন ছিল। বহিঃশক্তির হুমকি মোকাবেলায় সৈন্য মোতায়েনের পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল আরো অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, কাশ্মীরি মুজাহিদদের দমনে ভারত ৭ লাখ সৈন্য মোতায়েন করেছে। কিন্তু এক বিশাল দায়িত্ব পালনে ইস্টার্ন গ্যারিসনের ছিল মাত্র তিনটি অর্ধসজ্জিত দুর্বল ডিভিশন। নিয়মিত সৈন্য ছিল ৩৪ হাজার এবং আরো ১১ হাজার ছিল সিভিল আর্মড ফোর্সের সদস্য। ইস্টার্ন গ্যারিসনের কোনো ভারী ট্যাংক, ভারী ও মাঝারি পাল্লার আর্টিলারি ও ট্যাংক-বিধ্বংসী গান ছিল না। বিএএফ'র অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল থ্রি নোট থ্রি রাইফেল।

চোরাচালান দমন উপযোগী ৪টি গানবোট ছিল। চট্টগ্রামে একটি ক্রুজার ছিল। কিন্তু আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তা প্রত্যাহার করা হয়। আমাদের বিমান বাহিনীতে ছিল এক স্কোয়াড্রন সেকেলে এফ-৮৬ স্যাবর জেটের একটি বহর। এয়ার মার্শাল রহিম খানের নির্দেশে পূর্ব সতর্কীকরণ রাডার পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নেয়া হয় এবং সি-১৩০ পরিবহন বিমানটিও প্রত্যাহার করা হয়। অন্য দিকে, ভারতীয়রা মোতায়েন করে ১২ ডিভিশন সৈন্য, একটি প্যারা ব্রিগেড ও ৩৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ। অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের দিক থেকে প্রতিটি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন ছিল নিয়মিত পদাতিক ব্যাটালিয়নের মতো সুসজ্জিত। ব্রিগেড ও ব্যাটালিয়নে সংগঠিত হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ভারতীয় নিয়মিত ফরমেশনের সঙ্গে একীভূত হয়। লাখ লাখ বাঙালি বিদ্রোহী আমাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। ভারতীয়রা ব্যবহার করেছিল সোভিয়েত নির্মিত এসইউ-৭ ও মিগ-২১ জঙ্গিবিমানের ১৭টি স্কোয়াড্রন। এসব সর্বাধুনিক জঙ্গীবিমান ৪টি বিমানঘাঁটি ও বিমানবাহী রণতরী 'বিক্রম' থেকে উড়ে আসতো। আগরতলায় নিয়োজিত ছিল ১২২টি হেলিকপ্টার। এছাড়া, ভারতীয়দের ছিল বিমানবাহী রণতরী ও প্রচুর যুদ্ধজাহাজের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স।

সৈন্যের অনুপাত ছিল মারাত্মকভাবে অকিঞ্চিৎকর, ইস্টার্ন গ্যারিসনে এলাকার তুলনায়। ৪৫ হাজার সৈন্যকে আড়াই হাজার মাইল স্থল সীমান্ত এবং ৫শ' মাইল সমুদ্রসীমা রক্ষায় লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে ৪শ' মাইল রক্ষায় ইঙ্গ-ফ্রাঙ্কো বাহিনী ১১১টি ডিভিশন মোতায়েন করে। অর্থাৎ এ ফ্রন্টের প্রতি সাড়ে তিন মাইলের জন্য ছিল একটি করে ডিভিশন। তাবুকে ৩০ মাইলের একটি ভূখণ্ড রক্ষার দায়িত্বে ছিল অস্ট্রেলীয় বাহিনীর ২৪ হাজার সৈন্য। তারপরও বলা হয়েছিল যে, এ ভূখণ্ড রক্ষায় যথেষ্ট সৈন্য মোতায়েন করা হয়নি। মিসরের আল-আমিনে দ্বিতীয় দফা লড়াইয়ে ৪০ মাইলের একটি এলাকা রক্ষায় মার্শাল রোমেল ২৭ হাজার জার্মান ও ৫০ হাজার ইতালীয় সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন।

খুবই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল তখন পাকিস্তানের ওয়েস্টার্ন গ্যারিসন। এ গ্যারিসনকে কেবলমাত্র ভারতের সঙ্গে ১ হাজার ৬শ' মাইল সীমান্ত রক্ষা করতে হয়েছে। ইরান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলিম দেশগুলো থাকায় ওয়েস্টার্ন গ্যারিসনের পশ্চাদ্ভাগ ছিল নিরাপদ। এ গ্যারিসনে ছিল ১২ ডিভিশন সৈন্য এবং আরো ছিল ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন কয়েকটি সাজোয়া ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত এলিট রিজার্ভ ফোর্স। এছাড়া ছিল বিমান ও নৌবাহিনীর পূর্ণ শক্তি। সুপ্রিম কমান্ডার জেনারেল ইয়াহিয়ার অধীনে তিন বাহিনীর তিনজন প্রধান এবং আরো অনেক জেনারেল, অ্যাডমিরাল ও এয়ার মার্শাল ছিলেন। ওয়েস্টার্ন গ্যারিসন জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনও পেয়েছে। অর্থনৈতিক শক্তিও তাদের পেছনে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের অর্ধেক সমর শক্তি নিয়োজিত ছিল। এ অবস্থায় জেনারেল টিক্কার অধীনস্থ এলিট রিজার্ভ ফোর্স পরিকল্পনা অনুযায়ী চূড়ান্ত হামলা শুরু করতে পারলেই যুদ্ধের

মোড় ঘুরে যেত। এলিট রিজার্ভ ফোর্সের পরিকল্পিত হামলার ওপরই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের জয় পরাজয় প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ছিল। রিজার্ভ ফোর্সের সফল অভিযান পরিচালনায় অক্ষমতা, সংখ্যার দিক থেকে হীনবল ও অর্ধসজ্জিত ইস্টার্ন গ্যারিসনের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক তৎপরতায় বিরূপ প্রভাব পড়ে। যুদ্ধ পরিচালনায় ওয়েস্টার্ন গ্যারিসনের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। প্রতিরক্ষা ধারণার মূল কথা ছিল যে, সময়মতো ও কার্যকরভাবে এ ধারণা প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, সময়মতো ও কার্যকরভাবে এ ধারণা কাজে লাগানো হয়নি। ইয়াহিয়া খান ৩ ডিসেম্বর বিলম্বিত যুদ্ধ শুরু করেন। মাত্র কয়েক দিনের যুদ্ধে তিনি সাড়ে ৫ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড হারান। তিনি যুদ্ধ শুরু করতে ১৩ দিন বিলম্ব করেন। এ ফাঁকে ভারতীয় সেনাবাহিনী ইস্টার্ন ফ্রন্টে তাদের অবস্থা সংহত করার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়ে যায়। সাড়ে ৫ হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড দখল করার পর ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে সামরিক ভারসাম্য ভারতীয়দের অনুকূলে চলে যায়। ভারতীয়রা মারালার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে এবং রেতি বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে অবস্থান গ্রহণ করে। করাচি বাদবাকি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও ওয়েস্টার্ন গ্যারিসন শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়। টিক্কার মানসিক দুর্বলতার জন্য বহুল প্রত্যাশিত হামলা ইপ্সিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়। ইস্টার্ন গ্যারিসন এক বিস্তৃত সেনাবাহিনী হিসেবে লড়াই করে। এ গ্যারিসনকে এর নিজের হাই কমান্ড পরিত্যাগ করেছিল। ইস্টার্ন গ্যারিসনের আত্মসমর্পণ সকল পক্ষ–মুজিব, ভুট্টো, ইয়াহিয়া ও পরাশক্তিগুলোর মনঃপূত হয়। কি চমৎকার পরিকল্পনা! মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশের এবং ভুট্টো খণ্ডিত পাকিস্তানের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হবেন। অধিকতর বিপর্যয় ঘটার আগে পশ্চিম পাকিস্তানকেও রক্ষা করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষায় ইস্টার্ন গ্যারিসনের এ অসম্মানকে ক্ষুদ্র মূল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক গভীর চক্রান্ত কার্যকর করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা পায়। তবে খড়গ পতিত হয় ইস্টার্ন গ্যারিসনের মাথার ওপর। দাবার ছকে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নয়; পশ্চিম পাকিস্তানের রণাঙ্গনেও পরাজয় ঘটেছে।

পতনে টিক্কার ভূমিকা সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম ডেকে এনেছে। পাকিস্তান ভাঙার পেছনে তাঁর ভূমিকা ভুট্টো অথবা ইয়াহিয়ার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। এমন কুৎসিত ও কলঙ্কিত ভূমিকা পালন করার পরও তাঁকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অভ স্টাফ পদে নিযুক্তি দেয়া হয়। হামুদুর রহমান কমিশন তাঁর কার্যকলাপ এড়িয়ে যায় এবং কমিশন তাঁকে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়।

ডক্টর মালিকের চিঠি

লন্ডন ১৩ মার্চ। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ড. মালিক তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে এক চিঠিতে লিখেছেন যে, সেনাবাহিনী এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি ও অবাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তান রক্ষায় বিরাট আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন যা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তিনি আরো লিখেছেন, যদি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রতারণা করা না হতো এবং তারা ষড়যন্ত্রের শিকার না হতো তাহলে তারা পরাজিত হতো না। তিনি লিখেছেন, পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে আমি সম্ভাব্য সব ত্যাগ স্বীকার করেছি এবং একজন দেশপ্রেমিক পাকিস্তানি হিসেবে আমি দোষীদের শাস্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তান ধ্বংস করতে পাকিস্তানের দুশমনদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। যদি ইয়াহিয়া খান প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ না করতেন, তাহলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাল্টা হামলা চালিয়ে আসাম দখল করতে পারতো। কিন্তু তিনি ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজিকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেননি। তিনি আমাদেরকে অন্ধকারে রাখেন এবং আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে, বিদেশি শক্তি পূর্ব পাকিস্তানের সহায়তায় এগিয়ে আসবে।

ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকা প্রবেশে উদ্যত হলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমাদেরকে যুদ্ধ বন্ধ এবং আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জেনারেল ফরমানের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ গ্রহণে জাতিসংঘকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি আরো সতর্ক করে দেন যে, জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ না করলে তারা পশ্চিম পাকিস্তান হারাবেন।

নয়া-ই-ওয়াক্ত, ১৪ মার্চ ১৯৭২
লেখক কর্তৃক উর্দু থেকে অনুবাদকৃত।